রুশ বিপ্লব
ও
প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী

চিন্মোহন সেহানবীশ

ম নী ষা

প্রকাশ
১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০
১ জুন ১৯৭৩

প্রকাশক :
দিলীপ বসু
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪।৩ বি বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্রীসত্যজিৎ রায়

মুদ্রক :
শ্রীসিদ্ধার্থ মিত্র
বোধি প্রেস
৫ শংকর ঘোষ লেন
কলিকাতা ৬

মূল্য : আঠারো টাকা

ডাঃ গঙ্গাধর অধিকারী

ও

অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

ইতিহাস নয়, ইতিহাসের কিছু মালমশলা জড়ো ক'রে যথাসাধ্য কালানুক্রম অনুযায়ী সাজানোর চেষ্টামাত্র। তবু আশা যাঁরা পরে এ-পর্বের ইতিহাস লিখবেন এ লেখা তাঁদের হয়তো কিছুটা কাজে লাগবে আর আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বল্পজ্ঞাত এই অধ্যায় সম্পর্কে উদ্দীপিত করবে সাধারণ পাঠকের আগ্রহ।

এই-সব মালমশলা ও ছবি জোগাড় হয়েছে দেশের ও বিদেশের যে-সব মহাফেজখানা, ম্যুজিয়ম, বিদ্বৎ-প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে তাঁদের উল্লেখ যথাস্থানেই করা হয়েছে। শুধু ১৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত রমেশচন্দ্র দত্তের "An Apology for Pubna Rioters" ও ২০-২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "The Indian Economic Problem" প্রবন্ধের হদিশ যে আমি যথাক্রমে অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য ও ডা: সুমিত সরকারের কাছ থেকে পেয়েছি, সে-কথা অনবধানতাবশত বাদ পড়ে গেছে। এখানে তাঁদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বর্তমান পুস্তকের প্রকাশ ধারাবাহিক ভাবে শুরু হয়েছিল সাপ্তাহিক 'কালান্তর' পত্রিকায় ১৯৭০-৭১ সালে। বেশ-কিছুটা রদবদল ও সংযোজনের পর এবারে তা প্রকাশিত হচ্ছে বই আকারে। এর কিছু কিছু অংশের ইংরেজী তর্জমা প্রকাশিত হয়েছিল দিল্লীর *Mainstream* পত্রিকায়। আর 'পরিশিষ্টে' সংযোজিত কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল 'বিচিন্তা' পত্রিকাতেও। ঐ পত্রিকা-গুলির কর্তৃপক্ষকে তাই ধন্যবাদ জানাই।

আর-একটি কথা। বইটি ছাপা হয়েছে বহুদিন ধরে। তাই এতে কিছু অসংগতি হয়তো রয়ে গেল; যেমন ১৭৩ পৃষ্ঠায় যাঁকে জীবিত বলে লেখা হয়েছে সেই প্রবীণ বিপ্লবী, ভূপতি মজুমদার মহাশয়ের মৃত্যু ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। আর বহুদিন ধরে ছাপা হয়েছে বলেই অধ্যাপক অরুণকুমার বসুর *Indian Revolutionaries Abroad* শিরোনামার তথ্যপূর্ণ বইটির সদ্‌ব্যবহারও করা যায় নি এ-বই লেখার সময়ে।

অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে আমার অনুরোধে লেখা শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের যে রচনাটি তাঁর অনুমতিক্রমে ঈষৎ সংক্ষেপিত আকারে বইয়ের 'পরিশিষ্টে' সংযোজিত হয়েছে, তার জন্য আমি তাঁর কাছে গভীর কৃতজ্ঞ। প্রকাশনার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীদিলীপ বসু ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী প্রমুখ 'মনীষা'র কর্মীবৃন্দ; মুদ্রণব্যবস্থার জন্য বোধি প্রেসের শ্রীমান সিদ্ধার্থ মিত্র এবং নিউ এজ প্রিণ্টার্স-এর শ্রীমান প্রসূন বসু; প্রচ্ছদপটের জন্য শ্রীসত্যজিৎ রায়, মানচিত্রের জন্য বন্ধুবর অধ্যাপক সুনীল মুন্সী ও চিত্রসজ্জার জন্য শ্রীশ্যামল সেন; সযত্নে প্রুফ দেখার জন্য শ্রীমান সুবিমল লাহিড়ী আর নির্দেশপঞ্জী রচনায় সহায়তার জন্য প্রীতিভাজন শ্রীমান দীপংকর সরকারের কাছে আমি বিশেষভাবেই ঋণী। বইটিতে ব্যবহৃত চিত্রের ফোটো-কপির জন্য ক্যালকাটা মাইক্রোফিল্ম সার্ভিসেস-এর শ্রীব্রজকিশোর সিংহ ও শ্রীপ্রতাপ সিংহ এবং ব্লক তৈরির জন্য স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এনগ্রেভিং কোম্পানির কর্তৃপক্ষের সহায়তাও উল্লেখযোগ্য।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোপাল হালদার, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিষ্ণু দে, শ্রীকালীচরণ ঘোষ, শ্রীতপতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতো শ্রদ্ধাভাজনেরা এবং সাপ্তাহিক 'কালান্তর'-সম্পাদক শ্রীরণধীর দাশগুপ্তের মতো বহু বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন এ বই প্রকাশের ব্যাপারে যে আগ্রহ দেখিয়েছেন তাতে আমি সত্যই অভিভূত। আর যে-দুজনের কাছ থেকে আমি এ-কাজে নানাভাবে সাহায্যই শুধু নয়, অবিরাম প্রেরণালাভ করেছি, বইটি নিবেদিত হল তাঁদের নামে। তবে সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য যে একমাত্র আমিই দায়ী, তা বলা বাহুল্য।

আর সব শেষে বলার এই যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র সহায়তা ছাড়া এ-কাজ আদৌ সম্ভব হত না আমার পক্ষে।

১৯ ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড
কলিকাতা ২৯
২১ মে ১৯৭৩

চিন্মোহন সেহানবীশ

বিষয়সূচী

পৃষ্ঠপট ৩
ভারতীয় বিপ্লবী : বিলাতে ২৩
প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী : ফ্রান্সে ৩৮
প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী : জার্মানিতে ৬১
প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী : স্টকহল্মে ৭৩
ভারতীয় বিপ্লবী : পেট্রোগ্রাড ও মস্কোয় ৮৩
ভারতীয় বিপ্লবী : কাবুল ও মধ্য-এশিয়ায় ১১৮
তাসখন্দে ভারতীয় কমিউনিস্টদের পার্টি গঠন ১৬৩
অবনীনাথ-প্রসঙ্গে ১৭০
প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী : মস্কোয় ১৯৮
প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী : পশ্চিম গোলার্ধে ২৩১
বীরেন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে ২৩৮
রুশ-বিপ্লব ও ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা ২৪৪
পরিশিষ্ট
১ রবার্ট ডেল ওয়েন-কে লেখা রামমোহনের চিঠি ২৫৩
২ বিদেশী শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ২৫৫
৩ মিখায়েল পাভ্‌লোভিচের লেখা 'বিপ্লবীদের ছবি' ২৬৩
৪ ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস ২৭৯
৫ লেনিনগ্রাডে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা ২৯২
৬ কাবুল-মিশনের নেতা, মহেন্দ্রপ্রতাপের রিপোর্ট ২৯৭
৭ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : জার্মানিতে সুভাষচন্দ্র ৩০৭
৮ স্টকহল্মে কমিটির কাজের রিপোর্ট ৩০৯
৯ লাহোরের ১৫জন 'মুজাহিদ' ছাত্র ৩১২
১০ সোভিয়েতদেশে আরো কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবী ৩১৩
১১ অবনীনাথ প্রসঙ্গে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৩২
১২ নলিনী গুপ্ত-প্রসঙ্গে ৩৭৫
১৩ 'বার্লিন কমিটি' তুলে দেওয়ার প্রস্তাব ৩৭৭
নির্দেশপঞ্জী ৩৭৯

চিত্রসূচী

'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকা

'সোনার বাংগলা' ইস্তেহার

শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা, ভিখাজী রোস্তম কামা

বীরেন্দ্রনাথ চিঠির উত্তরে ক্রুপস্কায়ার চিঠি, লেনিনের কাছে প্রথম ভারতীয় বিপ্লবী

'Indian Sociologist' পত্রিকা,

'টাইমস' পত্রিকা ও কৃষ্ণবর্মা

'তলোয়ার' পত্রিকা

'গদর' পত্রিকা ও পুস্তিকা

মহেন্দ্রপ্রতাপ, মৌলানা বরকতুল্লাহ্, 'অস্থায়ী ভারত সরকারে'র প্রশাসন বিভাগীয় শীলমোহর, মৌলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে, সুরেন্দ্রনাথ কর

'দাউদ আলি' দত্ত (তরুণ বয়সে), 'দাউদ আলি' দত্ত (মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে)

বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (প্রবীণ বয়সে), বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ('মির্জা আলি হায়দারে'র ছদ্মবেশে)

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (সস্ত্রীক)

বীরেন্দ্রনাথের কাছে বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির চিঠি, বীরেন্দ্রনাথ প্রসংগে সর্বোচ্চ সোভিয়েত সামরিক আদালতের রায়, বীরেন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্পর্কে সরকারী ঘোষণা

'সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংঘে'র নেতৃবর্গ

ব্রাসেল্স সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিদল, ব্রাসেল্স সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলী

'কমিন্টার্নে'র' তৃতীয় কংগ্রেসে মানবেন্দ্রনাথ, 'India in Transition' গ্রন্থের নামপত্র, মানবেন্দ্রনাথ রায়

অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়, ছাত্রদের মধ্যে অবনীনাথ

অবনীনাথ ও 'ইণ্ডিয়ান কমিটি ফর রাশিয়ান রিলিফ', ভারতবিষয়ক গ্রন্থরচনার অনুমতি চেয়ে অবনীনাথের চিঠি, অবনীনাথের পাসপোর্ট

আগনেস স্মেডলি, রোজা ফিটিংহফ

বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান বাহিনী থেকে পলাতক ভারতীয় সিপাহী

লেনিনের জন্য ভারতীয় বিপ্লবীর জাতীয় আন্দোলন-বিষয়ক গ্রন্থতালিকা
আবদ্দুল মজিদ, জাফর হাসান—মহম্মদ আলি—নূর মহম্মদ, রফিক আহ্মদ, শওকৎ উসমানি, হবীব ওয়াফা
নাজির সিদ্দিকি, আবদ্দুল করিম
তাসখন্দে ভারতীয় বিপ্লবীদের পত্রিকা—'জমীনদার'
মুহাজিরীন কাফিলার যাত্রাপথ
'গদর' দলের নেতৃবর্গ, সন্তোখ সিং, রতন সিং
'অ্যাডভান্স-গার্ড', 'ম্যাসেস অফ ইণ্ডিয়া' ও 'ভ্যানগার্ড'—পত্রিকা
প্রেম সিং গীল, কোলাচালা সীতারামাইয়া
সপুরজী সাকলাৎওয়ালা, রজনী পাম দত্ত

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ক্রমশ আমাদের দেশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। রুশ বিপ্লবের সংগে সংশ্লিষ্ট ধ্যানধারণায় যে-সব ভারতবাসী তখন আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন ধরনের মানুষ। কংগ্রেসের সচেতন অংশ—বিশেষ করে 'চরমপন্থী' লাল-বাল-পালেরা তো ছিলেনই—অন্যদিকে ইংরেজ সরকারের মুখে ক্রমাগত ঐ বিপ্লবের মুণ্ডপাত শুনতে শুনতে দেশের বহু বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষও বুঝেছিলেন যে, ব্যাপারটা তা হলে বোধ হয় ভালোই! আবার স্বভাবতই এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে নানা বিদ্রোহ-প্রচেষ্টার সংগে জড়িত জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী। তাঁদের কেউ কেউ অস্ত্র বা অর্থ সংগ্রহের তাগিদে বা যুদ্ধবিদ্যা শেখার উদ্দেশ্যে অথবা ভারতের অবস্থা সম্পর্কে দুনিয়ার মানুষকে অবহিত করার জন্য তখন স্বেচ্ছায় নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন বিদেশে। সেই প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের উপরেই হয়তো সবার আগে এবং সব থেকে বেশি মাত্রায় প্রভাব পড়েছিল সেদিন রুশ বিপ্লবের। সম্প্রতি এঁদের সম্পর্কে কিছুটা কৌতূহল দেখা যাচ্ছে এদেশে এবং বিদেশেও আর তারই তাগিদে নতুন কিছুকিছু তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে নানা দিক থেকে। মনে হচ্ছে ঐ-সব তথ্যের ভিত্তিতে এবার একটা চেষ্টা করা দরকার প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের উপরে সেদিন রুশ বিপ্লবের প্রভাব বিচারের। তবে তার আগে পৃষ্ঠপট হিসেবে আরো কিছু জানা খবর ফের মনে পড়ানো দরকার ইতিহাসের খেই ধরানোর জন্যে। অবশ্য চিন্তা-ভাবনার পৃষ্ঠপটের কথাই এখানে বলছি, এ দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার যে বাস্তব পৃষ্ঠপটে ঐ-সব ভাবনার একদা উদ্ভব ঘটেছিল, তার বিচার এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। আরো একটা কথা, এই পটভূমির আলোচনা একান্তভাবে বাংলাদেশের প্রসংগেই।

পৃষ্ঠপট

সমাজতান্ত্রিক চিন্তাকে এংগেল্‌স কল্পনাশ্রয়ী (Utopian) ও বৈজ্ঞানিক (Scientific)— দুই মোটা ভাগে ভাগ করেছেন তাঁর এক সুপরিচিত গ্রন্থে। কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা হিসেবে তিনি সেখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন তিন জনের— বৃটেনের রবার্ট ওয়েন আর ফ্রান্সের সেন্ট সাইমন ও ফুরিয়ের-এর।

রবার্ট ওয়েনের সংগে আমাদের রামমোহন রায়ের পরিচয় ১৮৩২ সালের শেষে বা ১৮৩৩ সালের গোড়ায়, রামমোহনের বিলাতে অবস্থানের সময়ে। প্রথম আলাপের দিনেই দু'জনের মধ্যে এক প্রগাঢ় আলোচনা শুরু হয়। তার বিষয় সমাজতন্ত্রে ধর্মের স্থান। 'Universal Man' ও 'ভারত-পথিক' রামমোহন আবার একটি বিশিষ্ট ধর্মমতেরও প্রবক্তা, ব্রাহ্মসমাজ ও ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, আর অন্যদিকে রবার্ট ওয়েনের বিশ্বাস নেই প্রচলিত খৃস্টধর্মে, হয়তো বা ঈশ্বরের অস্তিত্বেও। তাই আলোচনায় স্বভাবতই মতৈক্য ঘটে নি। কিন্তু না ঘটলেও রামমোহন যে ওয়েনের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের প্রতি সেদিন শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন তার প্রমাণ ওয়েনের পুত্র রবার্ট ডেল ওয়েনকে লেখা তাঁর একটি চিঠি। ১৮৩৩ সালের ১৯ এপ্রিল তারিখে লেখা তাঁর সেই চিঠিটি এখন সংরক্ষিত রয়েছে নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরিতে। শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস ও শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গংগোপাধ্যায়-সম্পাদিত সোফিয়া ডবসন কলেটের যে রামমোহন জীবনী ১৯৬২ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে তার ৪৯৪-'৯৫ পৃষ্ঠায় চিঠিটির পূর্ণপাঠ পাওয়া যায় (দ্র. পরিশিষ্ট ১)।

এই চিঠির এক জায়গায় আছে এই কথাগুলি :

"...লক বা নিউটনের মতো মানবহিতৈষী কি ধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন ? না। বরং তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন ধর্মের মধ্যে ক্রমে ক্রমে যে-সব বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, তার অপসারণের। মুহূর্তের জন্য আমরা যদি মেনে নিই যে, ধর্মের ঈশ্বরতত্ত্ব কোনো যুক্তিবাদীকে তুষ্ট করার মতো করে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়, তা হলেও আমার মনে হয় নিরপেক্ষ বিচারে আমরা এ ধারণায় পৌঁছতে রাজী হব যে প্রেম ও

দাক্ষিণ্য যার মধ্যে নিহিত সেই ধর্মব্যবস্থা (খৃস্টান ধর্ম) আমাদের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেনের সুযোগ ঘটিয়ে এবং আমাদের অনিষ্টকর সন্দেহ ও মনোবৃত্তিকে দমন করে পরিপোষণ করতে পারে আমাদের সুখ ও আনন্দের। এ ঘটনাটি লক্ষ করে আমি দুঃখিত যে, আপনার অতি মহদাশয় পিতৃদেব ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে এতাবৎ বিড়ম্বিত করে এসেছেন তাঁর সাফল্যকেই। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, উপরে উল্লিখিত অর্থে তিনি খৃস্টধর্মেরই অনুগামী, যদিও সে বিষয়ে তিনি নিজে অবহিত নন।...আপনাকে ও আপনার পিতৃদেবকে আপনাদের মহৎ কর্মপ্রয়াসে সাফল্যমণ্ডিত দেখার কামনাই আমাকে এ-সব বলার সাহস যুগিয়েছে—আমার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে আশা করি আপনি সে বেয়াদবি মার্জনা করবেন।"

রামমোহনের মৃত্যু ১৮৩৩ সালে। মার্কসের বয়স তখন ১৫ বছর। অর্থাৎ আজকের দিনে যাকে নিয়ে পণ্ডিতমহলে অত মাতামাতি সেই 'তরুণ মার্কস'ও তিনি হয়ে ওঠেননি তখনো। রামমোহনের লেখায় তাই মার্কসের উল্লেখ আশা করা যায় না।

রামমোহনের মৃত্যুর পর ডিরোজিও-পন্থী 'তরুণ বাংলা'র (Young Bengal) প্রতিনিধিরা প্রগতিশীল চিন্তানায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন সমাজে। তাঁদের পত্রিকা 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে' তাঁরা এই মত সেদিন প্রকাশ করেছিলেন যে জমির স্বত্ব রায়তের। আবার দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলেত থেকে ১৮৪২ সালে চার্টিস্ট আন্দোলনের দাবিদাওয়ার প্রতি কিছুটা সহানুভূতি জানিয়ে যে চিঠিগুলি পাঠিয়েছিলেন তাও প্রকাশিত হয়েছিল ঐ পত্রিকায়। তরুণ বাংলার এক প্রতিনিধি— এভারেস্ট শিখরের উচ্চতা নির্ণয়ের কারণে যাঁর নাম আমাদের কাছে সুপরিচিত, সেই রাধানাথ শিকদার বেগার খাটুনির বিরুদ্ধে কুলীদের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ গড়ে তোলারও প্রাথমিক চেষ্টা করেছিলেন। মতামতের দিক থেকে এঁদের উপরে কিন্তু সেদিন কল্পনাশ্রয়ী সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ততটা নয় যতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল ফরাসী বিপ্লবের বাণী আর ভলটেয়ার ও টম পেনের মতো বিপ্লবীদের চিন্তা। বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর, ***History of Political Thought From Rammohun to Dayananda (1821-84)*** গ্রন্থে (পৃ ৮৩-৮৪) লিখেছেন যে, টম পেনের ***Age of Reason***

বইটির দাম কাগজে ১ টাকা বিজ্ঞাপিত হলেও ডিরোজিও-পন্থীদের আগ্রহের ফলে দেখতে দেখতে নাকি চড়ে যায় ৫ টাকায়। তিনি এ ঘটনারও উল্লেখ করেছেন যে, ১৮৩০ সালের বড়দিনের দিন হিন্দু কলেজের ছাত্ররা নাকি অক্টরলোনি মনুমেন্টের চূড়োয় ফরাসী তেরংগা ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়েছিলেন, অবশ্য ইউনিয়ন জ্যাকের পাশাপাশি!

'তরুণ বাংলা'র তখনকার মনোভাবের আর একটি দৃষ্টান্ত অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় দিয়েছেন তাঁর *Awakening in Bengal* গ্রন্থে। হিন্দু কলেজের ছাত্র ও পরে সুপরিচিত 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, কৈলাসচন্দ্র দত্ত তাঁর সময়ের একশো বছর পরে অত্যাচারী বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের এক কাল্পনিক বিবরণ ('১৯৪৫ সালে ৪৮ ঘণ্টার বৃত্তান্ত') ১৮৪৫ সালের ৬ জুন তারিখের *Calcutta Literary Gazette* পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তাতে ছিল এ-ধরনের কথা:

"দিনের পর দিন অত্যাচার কমার বদলে বেড়েই চলেছে এবং 'হাউস অফ লর্ডস' বা 'হাউস অফ কমনসে' আবেদনে কোনো প্রতিবিধান ঘটছে না দেখে তিনি (অর্থাৎ ভারতীয় দেশপ্রেমিক) ভারতের বড়লাট লর্ড ফেল বুচার (নামটি লক্ষণীয়) মহোদয়কে তাঁর আসন থেকে হটিয়ে দেশের সব থেকে দেশপ্রেমিক মানুষদের নিয়ে গঠিত এক সরকার প্রতিষ্ঠা করার দুঃসাহসী সংকল্প গ্রহণ করলেন।...বিদ্যুৎ চমকের মতো বিদ্রোহ চিন্তা অতি দ্রুত একদা শান্ত শিষ্ট মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। ঐতিহাসিক বা চারণদের পক্ষে বিপ্লবী দলের বাড়াবাড়িকে খুব রঙ ফলিয়ে হয়তো দেখানো সহজ কিন্তু তাঁদের পরিস্থিতির কথা তিনিই সঠিক বিচার করতে পারবেন যিনি তাঁদের সংগে সমভাবে দুঃখভোগ করেছেন, যাঁদের পরিবার বন্ধু ও সংগীগণ নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন বা যিনি দেখেছেন শহরও, গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে এবং হাজার হাজার মানুষকে তাদের গ্রাম ও দেশ ছাড়া হতে...।"

ব্যাপারটি কি আশ্চর্য রকম হালের মনে হয় না? অথচ এটি লেখা সিপাহী বিদ্রোহেরও বারো বছর আগে।

কিন্তু যে ঘটনায় সেদিন শুধু 'তরুণ বাংলা' নয়, সারা বাংলাই তোলপাড়

হয়েছিল সেটি হল ১৮৫৯-৬২ সালের সুপরিচিত নীল আন্দোলন। এর আগে ডিরোজিও-পন্থীরা যে তাঁদের পত্রিকায় জমিতে রায়তের স্বত্বের কথা বলেছিলেন তা আগেই দেখেছি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত তারও আগে ১৮৪৯ সালে লিখেছিলেন যে, বাংলার কৃষকের দুই শত্রু— জমিদার ও নীলকর। কিন্তু এর আগে ৮৫ বছর ধরে একটার পর একটা কৃষক বিদ্রোহ ঘটতে থাকলেও এই প্রথম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা বেশ ব্যাপকভাবে সহানুভূতি জানালেন, এমন-কি, কেউ কেউ যথাসাধ্য সহায়তাও করলেন এই কৃষক অভ্যুত্থানে। এক দিকে তাই যেমন ঘটল রফিক মণ্ডল, বিষ্ণু বিশ্বাস, দিগম্বর বিশ্বাস প্রভৃতি কৃষক নেতাদের পরিচালনায় প্রচণ্ড সংগ্রাম অন্যদিকে তেমনি দেখা গেল তারই সমর্থনে হরিশ মুখার্জির সম্পাদনায় 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার অশ্রান্ত প্রচার; তার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে নীলকরদের মামলা ও প্রায় সর্বস্বান্ত অবস্থায় তাঁর অকালমৃত্যু; দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা ও অভিনয়; মাইকেল কর্তৃক সে নাটকের ইংরেজী তর্জমা এবং সেই তর্জমা প্রকাশের জন্য লঙ সাহেবের অর্থ ও কারাদণ্ড; কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক বিচারালয়ে সেই জরিমানা প্রদান; শিশিরকুমার ঘোষের তৎপরতা, আর সোম-প্রকাশ, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি পত্রিকার এই আন্দোলন সংক্রান্ত প্রগতিশীল ভূমিকা।

এ-সব কথা আমরা মোটামুটি সবাই জানি। কিন্তু যেটা অনেকেই জানি না সেটা এই যে, ১৮৭০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হল: **What is the aim of communism? Describe the schemes propounded by Fourier and St. Simon respectively**; (অর্থাৎ, কমিউনিজমের লক্ষ্য কি? ফুরিয়ের ও সেন্ট সাইমন যথাক্রমে যে পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন তার বর্ণনা দাও। বিমানবিহারী মজুমদার লিখিত উপরি-উক্ত গ্রন্থের ৪৫০ পৃষ্ঠার পাদটীকায় এ ঘটনার উল্লেখ দ্রষ্টব্য)।

আমরা এখনো জানিনা কে এই প্রশ্ন করেছিলেন, তখন ইতিহাসের এম. এ. পরীক্ষার পাঠ্য বিষয় কী ছিল— যার থেকে এমন প্রশ্ন আসতে পারে বা এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্রদের কী পাঠ্যপুস্তকই বা পড়ানো হত। তবে সংশ্লিষ্ট ***Calcutta University Calendar* (*1870-71*)**-এর **clxv** পৃষ্ঠায় লেখা আছে ঐ প্রশ্নপত্রের পরীক্ষক ছিলেন মিঃ লেথব্রিজ (সম্ভবত ইনিই প্রকাশ

করেছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত ইংরেজী তর্জমা)।

আর একটা কথাও অবশ্য এখানে মনে রাখা দরকার— এই প্রশ্নে যে কমিউনিজমের উল্লেখ রয়েছে তা নিশ্চয়ই আজ আমরা যে কমিউনিজমের সঙ্গে পরিচিত সেই বস্তু নয়। প্রসঙ্গ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ওয়েন, সেন্ট সাইমন, ফুরিয়ের প্রভৃতির কল্পনাশ্রয়ী সাম্যবাদী সমাজের কথাই এখানে বলা হয়েছে।

কিন্তু ১৮৭১ সালে হান্টার সাহেব যখন তাঁর *Indian Musalmans* বইয়ে (১৯৪৫ সনে কলকাতার 'কমরেড পাবলিশার্স' প্রকাশিত সংস্করণের ১০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ভারতীয় ওয়াহাবিদের ধর্ম ও রাজনীতি উভয়তই চরম বিরুদ্ধপন্থী প্রমাণের জন্য তাঁদের '...Communists and Red-Republicans in Politics' (অর্থাৎ 'রাজনীতিক্ষেত্রে কমিউনিস্ট ও লাল প্রজাতন্ত্রী') আখ্যা দিলেন তখন কমিউনিজম আর নিছক বুদ্ধিজীবীর মানসস্বর্গ রইল না, সেটা হল ধর্মের আবরণে পরিচালিত কৃষক বিদ্রোহ থেকে উদ্ভূত এক ধরনের সাম্যচিন্তা যার নজির চতুর্দশ শতক থেকে ইউরোপের ইতিহাসে মেলে ভূরিভূরি।

ঐ ধরনের আর-এক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ১৮৭৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় (সংখ্যার উল্লেখ নেই— বিমানবিহারী মজুমদার লিখিত উপরি-উক্ত গ্রন্থের ৪৫০-৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ঐ লেখায় ময়মনসিংহ জেলার সুসং পরগনায় 'টিপু পাগলা' নামে একজন কৃষক নেতার উল্লেখ করা হয়েছে যিনি 'পাগলপন্থী' নামে পরিচিত তাঁর কৃষক অনুবর্তীদের জমিদারকে খাজনা দিতে নিষেধ করতেন। শেষ পর্যন্ত সরকার টিপু পাগলার বিদ্রোহ দমন করে ও টিপুকে ৪৫ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। ঐ প্রবন্ধে টিপুকে পূর্ব বাংলার লুই ব্লাঙ্ক নামে অভিহিত করা হয়। তুলনা হয়তো সঠিক নয়, কিন্তু এক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক তা হল এই যে, এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখকের মতো কোনো কোনো ব্যক্তি এ সময়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের খবর রাখছেন কিছু কিছু।

এই অনুমান যে সঠিক তা বোঝা যায় দু বছর আগের, অর্থাৎ ১৮৭১ সালের একটি ঘটনা থেকে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৮৬৪ সালে 'প্রথম আন্তর্জাতিকে'র প্রতিষ্ঠা। ঐ সংস্থার সাধারণ সংসদের বাৎসরিক কার্যবিবরণী মস্কোর প্রগতি প্রকাশনী কর্তৃক মস্কো থেকে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। তার

১৮৭০-৭১ সাল সংশ্লিষ্ট খণ্ডে ১৮৭১ সালের ১৫ অগাস্ট তারিখে সাধারণ সংসদের এক সভার কার্যবিবরণী দেওয়া হয়েছে। সভায় উপস্থিতদের মধ্যে নাম পাওয়া যাচ্ছে মার্কস, এঙ্গেলস প্রভৃতির। কার্যবিবরণীতে আছে এই খবর :

"আগের সভায় কার্যবিবরণী পঠিত ও অনুমোদিত হওয়ার পর সম্পাদক জানান যে লিভারপুল ও লিস্টারশায়ারের লাফবরোতে শাখা গঠিত হয়েছে। তিনি কলিকাতা থেকে লেখা একটি চিঠিও পাঠ করেন যাতে ভারতবর্ষে একটি শাখা প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা চাওয়া হয়েছে। সম্পাদককে নির্দেশ দেওয়া হল ঐ শাখা প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিয়ে চিঠি লিখতে তবে পত্রলেখককে জানাতে হবে যে, ঐ শাখাকে স্বনির্ভর হতে হবে। তাঁকে ঐ সমিতিতে দেশের মানুষকে গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপরে জোর দিতেও বলা হল"—*The General Council of the First International, 1870-1871 : Minute*, পৃ. ২৫৮।

এখন প্রশ্ন হল, ১৮৭১ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকের শাখা গঠনের অনুমতি চেয়ে কলকাতা থেকে চিঠি লিখল কে? যে বইয়ে এ চিঠির খবর পাওয়া গেল তার ৫৩০ পৃষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট একটি 'নোটে' (২৭৬ নং) ঐ চিঠির যে অংশটি উদ্ধৃত করা হয়েছে তা হল এই রকম :

"জনসাধারণের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ বর্তমান এবং বৃটিশ সরকারকে পূর্ণ মাত্রায় সকলেরই অপছন্দ। করভার অতিরিক্ত আর খাজনা সবই খেয়ে যায় ব্যয়বহুল এক আমলাতন্ত্রকে পুষতে। অন্যান্য স্থানের মতো শাসক শ্রেণীর বিলাস-ব্যসনের সঙ্গে এখানেও শ্রমিকের দীন-হীন অবস্থার বৈপরীত্য মর্মান্তিক— সেই শ্রমিকের অবস্থার যাদের মেহনত থেকেই সৃষ্টি হয় ঐ অপব্যয়িত সম্পদের। শাখা খোলা হলে 'আন্তর্জাতিকে'র নীতি জনসাধারণকে নিয়ে আসবে তার সংগঠনের ভিতরে।"

১৮৭১ সালের ১৯ অগাস্ট তারিখের ১৫১ সংখ্যা *'Eastern Post'* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল চিঠির এই অংশটি— এ-কথাও জানা গেল উপরের 'নোট' থেকে। কিন্তু পত্রলেখকের নামের উল্লেখ সেখানেও নেই। তখন পত্রিকার ঐ সংখ্যাটি সন্ধানের চেষ্টা হল পত্রলেখকের পরিচয় জানার উদ্দেশ্যে। বৃটেনের সাম্যবাদী আন্দোলনের ইতিহাস রচয়িতা জেমস্ ক্লুগম্যানের সাহায্যে পত্রিকার ঐ সংখ্যাটির খোঁজ পাওয়া গেল। কিন্তু দেখা গেল সেখানেও এর

বেশি নতুন কোনো খবর নেই। কিন্তু ঐ পত্রিকারই ২ সেপ্টেম্বর (১৮৭১) সংখ্যায় শ্রীযুক্ত ক্লুগম্যান মারফৎ পাওয়া গেল আর এক সভার খবর :

"আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের সাধারণ সংসদের চিরাচরিত সাপ্তাহিক সভা অনুষ্ঠিত হয় গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায়, ২৫৬ হাই-হোবর্ন-স্থ সংসদ কক্ষে। সভাপতি ছিলেন ডাঃ মার্কস।

"পৃথিবীর সব কোণা থেকে বহু চিঠিপত্র পাওয়া গেল। ভারতবর্ষ থেকে প্রাপ্ত এক চিঠিতে 'আন্তর্জাতিক' সেখানে যে আগ্রহের উদ্রেক করেছে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল। এটা অনুভব করা গেল যে, ঐ দেশে 'আন্তর্জাতিক' সংস্থার প্রতিষ্ঠা নবযুগের সূচনা করবে। এতাবৎ যা ঘটেছে তার থেকে অনেক বড়ো বিপ্লব সেখানে ঘটবে তার ফলে। ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর বাসনা-কামনার ঠিক অনুগামী সংস্থা ঐ 'আন্তর্জাতিক'। ঐ সংস্থা প্রতিদ্বন্দ্বী জাতি ও গোষ্ঠীগুলিকে একটি অবিভাজ্য সমগ্রতায় বাঁধবে এবং শ্রমিকদের সাহায্য করবে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার জয় করতে। মূলধনের যে বাস্তব রথচক্রের তলায় নিষ্পেষিত হয় শ্রম ("Capital, the real juggernaut which crushes down labour") তাকে আর দেওয়া হবে না মনুষ্যশক্তিকে ঐভাবে জ্বালানির মতো ব্যবহার করতে···পরন্তু তাকে বশে আনা হবে খোদ ঐ শ্রমিকদের।"

দুই সভার তারিখের সান্নিধ্য থেকে মনে হয় কলকাতার ও ভারতবর্ষের চিঠি দুটি পৃথক চিঠি নয়, একটি চিঠিই। তবে সভা নিশ্চয়ই দুটি যার মধ্যে দ্বিতীয়টির সভাপতি স্বয়ং মার্কস। আর ভাষা থেকে— বিশেষ করে 'Capital, the real juggernaut which crushes down labour' ধরনের ভাষা এবং 'নব-যুগের সূচনা', 'এতাবৎ যা ঘটেছে তার থেকে অনেক বড়ো বিপ্লব সেখানে ঘটবে তার ফলে'— এই ধরনের বাগ্‌বিন্যাস থেকে বোধ হয় দ্বিতীয় সভার যে বিবরণী *Eastern Post* পত্রিকার ২ সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল খুব সম্ভবত তার মুসাবিদাও মার্কসের।

এ প্রসঙ্গে আমার জার্মান বন্ধু শ্রীযুক্ত জিমার মার্কস-সার্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ৬০ খণ্ডে তাঁর যে রচনাসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে তার ১৮শ খণ্ডের ১০ম পৃষ্ঠার এই অংশটির দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। 'প্রথম আন্তর্জাতিক' কোনো কোনো একান্ত সংকীর্ণমনা শাখা সম্পর্কে

কিছুটা কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করায় প্রতিক্রিয়াশীল মহল থেকে ঐ সময়ে যে স্বাধীনতা খর্ব করার অভিযোগ উঠেছিল তার জবাব দিতে গিয়ে মার্কস বিদ্রূপ করে লিখলেন "শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের এতই 'ভীষণভাবে অবদমিত' মনে করেছিল যে, সাধারণ সংসদ ইয়োরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এমন-কি, পূর্ব ভারত থেকে শাখা অনুমোদনের আবেদন ও নতুন নতুন শাখা গড়ার জন্য চিঠিপত্র পেতে শুরু করল।"

তবু পত্রলেখকের পরিচয় এখনো রহস্যাবৃত রয়ে গেল। তবে আবার একটা অনুমান করা চলে এক্ষেত্রেও। 'প্রথম আন্তর্জাতিকে'র সাধারণ সংসদের কার্যবিবরণী থেকে প্রথম যে উদ্ধৃতিটি দেওয়া হয়েছে তার শেষ লাইনে আছে: "তাঁকে (অর্থাৎ 'প্রথম আন্তর্জাতিকে'র সম্পাদককে) ঐ সমিতিতে দেশের মানুষকে গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার উপরে জোর দিতে বলা হল।" একটা দেশে 'আন্তর্জাতিকে'র মতো সংস্থার শাখা গঠনের সময়ে সে-দেশের মানুষকে তার অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে কেন? এর থেকে কি মনে হয় না যে পত্রলেখক সম্ভবত বিদেশী ছিলেন আর সময়টা যেহেতু ১৮৭১, সম্ভবত ইংরেজই ছিলেন?

আরো একটা অনুমান: ১৮৫৪ সালে কলকাতা থেকে রানীগঞ্জ রেলপথ চালু হয়েছে— তার কিছু দিনের মধ্যেই রেলওয়ে ওয়ার্কশপও গজিয়ে উঠেছে অল্পবিস্তর। তবে ইঞ্জিনীয়ার বা মেকানিক তখন এ দেশের লোকেরা হতেন না— সবই আসতেন বিলেত থেকে। হয়তো বা উনিশ শতকের চল্লিশের কোঠার চার্টিস্ট আন্দোলনের ছোঁয়াচ-লাগা তেমনি কোনো ইংরেজ বা তারই সন্তান ঐ পত্রের লেখক। অনুমান প্রমাণ নয়, তবু কথাটা পাঠকদের ভেবে দেখার জন্য রাখলাম।

১৮৭১ সালে কেশবচন্দ্র সেন তাঁর সুপরিচিত এক পয়সার দৈনিক পত্রিকা 'সুলভ সমাচারে' লিখলেন:

> ..."বাস্তবিক বড় মানুষ কাহারা?...এ-দেশের ছোট লোকেরা। তাহারা না থাকিলে কার বা ভাত জুটিত, কে বা গাড়ী চড়িয়া ঘোড়দৌড় দেখিতে যাইত আর কেই বা তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিত। দেখ সামান্য লোকেরা আমাদের সর্বস্ব দিতেছে। তাহাদের ধনে আমরা বড়মানুষী করিতেছি।...

"...পৃথিবীতে এমন এক সময় আসিবে যখন ছোট লোকেরা আর চুপ করিয়া থাকিবে না, আর দুঃখে মাটির শয্যায় পড়িয়া থাকিবে না। এখনি বিলাতে তাহারা এমনি বলবান হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহারা আর রাজাকে মানে না। আপনাদের অধিকার, আপনাদের বিক্রম আপনারাই প্রকাশ করিতে যায়" ('বড় লোক', সুলভ সমাচার, ১ খণ্ড, ৪০ সংখ্যা, ৩২ শ্রাবণ ১২৭৮, পৃ. ১৫৯)।

আমরা আজ যাকে 'কমিউনিজম' বলে জানি তার সংগে অবশ্য এ ধরনের চিন্তার বিস্তর ফারাক। তবু এর পিছনেও আভাস পাওয়া যায় 'বিলাতে' শ্রমিক আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি সম্পর্কে চেতনার।

১৮৭১ সালে প্যারি কমিউনের খবরও এ-দেশে পেঁছিছিল। শিশিরকুমার ঘোষ তখন তাঁর গ্রাম থেকে ইংরেজী-বাংলা, দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক হিসাবে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশ করছিলেন। তাতে খবর বেরোল "কি চলছে ফ্রান্সে? নিছক অরাজকতা। 'লাল প্রজাতন্ত্র' সবাইকেই বিশ্বাসঘাতক ঠাওরাচ্ছে। জনকয়েক জেনারেলকে মারা হয়েছে গুলি করে" (২৭ এপ্রিল, ১৮৭১)।

এর মধ্যে 'লালজুজুর ভয়' নিশ্চয়ই রয়েছে। কিন্তু অন্যপক্ষের নৃশংসতার কথাও জানা যায় আর-একটি খবর থেকে। ১৮৭১ সালের ১৫ অগাস্ট তিনজন ভারতীয় তরুণ বিলেতে লেখাপড়া শেষ করে বেড়াতে গিয়েছিলেন ফ্রান্সে। তখন সবে মাস-তিনেক হল 'প্যারি কমিউন' বিধ্বস্ত হয়েছে প্রতিবিপ্লবী জল্লাদদের হাতে। ধ্বংসের চিহ্ন তখনো প্যারিসের সর্বত্র ছড়ানো। রাজধানীও সরানো হয়েছে ভের্সাইতে। তিন বন্ধু প্যারিস থেকে গেলেন ভের্সাই বেড়াতে। সেখান থেকে রাতের গাড়িতে প্যারিস ফিরবেন এমন সময় তাঁদের বিদেশী চেহারা ও জামা পোশাক দেখে পুলিস তাঁদের আটক করল 'কমিউনার্ড' —অর্থাৎ হালের ভাষায় 'কমিউনিস্ট' সন্দেহে। ফলে সে রাত তাঁদের কাটাতে হল হাজতে। পরদিন অনেক কষ্টে মুক্তি। তাঁদের একজনের ভাষায়: "ভাগ্য ভালো আমাদের নিছক সন্দেহবশেই বিচার ও গুলি করে মারা হয় নি—ঐ অন্ধকারের দিনগুলিতে যেমনটা ঘটেছিল বহু নিরীহ মানুষের বেলায়" J. N. Gupta, *Life and work of Ramesh Chunder Dutt*, —পৃ. ৩২

এখানে একটা মজার ব্যাপার কিন্তু এই যে, কমিউনিস্ট হিসাবে প্রথম যে তিনজন ভারতীয় সেদিন এ-ভাবে নিগৃহীত হয়েছিলেন ভিনদেশে, তাঁরা হলেন স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহারীলাল গুপ্ত। বিলেত থেকে আই. সি. এস. পরীক্ষা পাস করার পর ঐ তিন হবু সিভিলিয়ানেরই সেদিন এই বিপত্তি ঘটেছিল বিদেশ বেড়াতে গিয়ে। সুরেন্দ্রনাথের অবশ্য শেষ পর্যন্ত আর সিভিলিয়ানি করা হয় নি ঘটনাচক্রে। তার বদলে জাতীয় আন্দোলনের নেতা হিসাবে তিনি হয়েছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি— যেমন অবসর গ্রহণের পর হয়েছিলেন রমেশচন্দ্র দত্তও।

রমেশচন্দ্র তাঁর ঐ সময়কার বিলাতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখেছিলেন যে, ইংরেজ শ্রমিকরা "ঈর্ষা ও যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট হৃদয়ে সেই বৈষম্যগুলিকে লক্ষ করেন যা তাঁদের অন্যান্য শ্রেণীর অত নিচে ঠেলে রেখেছে। তাঁরা মনে করেন যে, সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য পরিবর্তন একান্তই প্রয়োজন— তার চেহারা যেমনই হোক-না কেন। ইংলণ্ডের শ্রমজীবী শ্রেণীগুলি তাই শুধু চরমপন্থী নয়, তাঁদের অনেকেই প্রজাতন্ত্রীও বটে। প্রজাতান্ত্রিকতা সম্পর্কে তাঁরা খুব একটা কিছু না বুঝলেও সাম্য সম্পর্কে তাঁদের একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে আর সেই সাম্যই তাঁদের লক্ষ্য। অবশ্য শহরের শ্রমজীবীদের ক্ষেত্রেই শুধু এই চরমপন্থার কথাটা খাটে"—R. C. Dutt, *Three Years in Europe*, S. K. Lahiri & Co., ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৩৮।

উপরের এই খবরগুলি পাওয়া যায় *Mainstream* পত্রিকার ১৯৭০ সালের ২৫ জুলাই সংখ্যায় (পৃ. ২৩-২৫) প্রকাশিত শ্রীযুক্ত কালীপদ বিশ্বাসের একটি প্রবন্ধে।

১৮৭৪ সালের মে মাসে ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট নেতা, শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারত শ্রমজীবী' নামে এক সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন (এ ধরনের পত্রিকা এদেশে এটিই সর্বপ্রথম। এর আগে ১৮৭০ সালে তিনি 'শ্রমজীবী সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করেন বরাহনগরে)। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় শিবনাথ শাস্ত্রীর 'শ্রমজীবী' নামে এক কবিতা! তার কয়েকটি ছত্র এই রকম :

ওই দেখ সাগরের পারে,
শ্রমজীবী শত শত
কেমন সংগ্রামে রত

এই ব্রত— রবে না আঁধারে
আয় তোরা দেখি যে সবারে।

—তত্ত্বকৌমুদী, ১ ও ১৬ চৈত্র, ১৩৭৪ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত।

সাগরপারের কোন্ সংগ্রামের কথা এখানে বলছেন শিবনাথ? 'প্যারি কমিউন', না জার্মান সমাজতন্ত্রীদের আন্দোলন? ঐ আন্দোলন সম্পর্কেই অমৃতবাজার পত্রিকা তখন লেখে 'গত সাধারণ নির্বাচনগুলিতে এই সত্য উদ্ঘাটিত হয়েছে যে, প্রায় ১০ লক্ষ এমন নির্বাচক রয়েছেন যাঁরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা সোস্যালিস্ট। প্রিন্স বিসমার্ক ইতিমধ্যেই ভয় পাচ্ছেন তাঁদের'।

এ খবরও পাওয়া গেছে শ্রীকালীপদ বিশ্বাস-লিখিত উপরি-উক্ত প্রবন্ধে।

১২৮১ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত, কমলাকান্তের 'সোশিয়ালিস্টিক বিড়ালে'র কথা সকলেরই জানা। ১২৮৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন "যে সকল সামাজিক দুঃখ নিত্য ও অনিবার্য, তাহারও উচ্ছেদের জন্য মনুষ্য যত্নবান হইয়া থাকে। সামাজিক দরিদ্রতা নিবারণ জন্য যাহারা চেষ্টিত, ইয়োরোপের সোশিয়ালিস্ট, কমিউনিস্ট প্রভৃতি নামে তাহারা খ্যাত" ('বিবিধ প্রবন্ধ', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ৩৭০)।

১৮৭৯ সালে প্রকাশিত 'সাম্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন: "...'ভূমি সাধারণের' এই কথা বলিয়া রুসো যে মহাবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার নিত্য নূতন ফল ফলিতে লাগিল। অদ্যাপি তাহার ফলে ইউরোপ পরিপূর্ণ। 'কম্যুনিজম' সেই বৃক্ষের ফল। ইন্টারন্যাশনল সেই বৃক্ষের ফল..." ('সাম্য', বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃ. ১৪)।

'কম্যুনিজম', 'সোশিয়ালিস্ট', 'কম্যুনিস্ট' প্রভৃতি শব্দ এই ভাবে প্রথম ব্যবহার করলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র। আর 'প্রথম আন্তর্জাতিক' অর্থে 'ইন্টারন্যাশনল' শব্দের প্রয়োগও এ-দেশে প্রথম তাঁরই হাতে। এর থেকে বোঝা যায় যে, প্রথম আন্তর্জাতিকের খবর শুধু যে কানে পৌঁচেছিল বঙ্কিমের তাই নয়, তিনি কিছুটা অনুধাবনও করেছিলেন তার তাৎপর্য।

বঙ্কিমচন্দ্র ঐ প্রবন্ধে উল্লেখ করেন রবার্ট ওয়েন, লুই ব্লাংক ও ক্যাবে (Etienne Cabet) প্রমুখের নাম আর সেন্ট সাইমন ও ফুরিয়েরের মত বোঝাবার জন্য ব্যবহার করেন 'সেন্ট সাইমনিজম' ও 'ফুরীরিজম' এই শব্দ দুটি। প্রুধোঁ-র উল্লেখও রয়েছে 'সাম্যে' কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার 'প্রথম আন্তর্জাতিকে'র প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে নাম নেই মার্কস ও এঙ্গেলসের।

১৮৮১ সালে হাওড়া থেকে প্রকাশিত হয় অভয়চরণ দাশ মহাশয়ের বিখ্যাত বই *The Indian Ryot— Land Tax, Permanent Settlement and the Famine*। রমেশচন্দ্র দত্তের *India under the Early British Rule* ও *India in the Victorian Age*-এর দু'দশক আগে প্রকাশিত ঐ বইয়ে অভয়চরণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কঠোর সমালোচনা করেন ও লেখেন :

"...জমিদার ও রায়তের বিবাদ বঙ্গদেশকে দুই বিশাল শিবিরে বিভক্ত করেছে যারা উভয়েই উভয়ের বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত। গুরুতর দাঙ্গাহাঙ্গামা ও শান্তিভঙ্গ, রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ড, গ্রামে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ, ফসল কেটে নেওয়া ও ঐ ধরনের অন্যান্য অত্যাচার— এ-সব তো এখন প্রাত্যহিক ঘটনা"।

অভয়চরণ এখানে যে অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন সেটা বিশেষ করে ১৮৭৩ সালের পাবনা বিদ্রোহের সময়কার বলে মনে হয়। এর কয়েক বছর আগে রমেশচন্দ্র দত্ত সেই পাবনা বিদ্রোহীদের সমর্থনে "An Apology for Pubna Rioters" নামে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন (*The Bengal Magazine*, September, 1873, পৃ. ৫৪-৬১)—'ERCYDAE' (অর্থাৎ তাঁর নামের ইংরেজী আদ্যক্ষর তিনটির উচ্চারণ অনুযায়ী) ছদ্মনামে। পুরো প্রবন্ধটি কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে *Mainstream* পত্রিকার ২২ অগাস্ট ১৯৭০ সংখ্যায়।

অভয়চরণ দাশের রচনার উপরে সেদিন পশ্চিমের সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রভাব কার্যকর হয়েছিল কি না, জানি না এমন-কি, প্রায় কোনো খবরই আমার জানা নেই ঐ আশ্চর্য মানুষটি সম্পর্কে। তবে *The Indian Ryot* সংক্রান্ত দুটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত এই বইয়ের এক কপি গত বছর দেখে এসেছি লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যবিদ্যা বিভাগে—'মিনায়েভ সংগ্রহে'র মধ্যে (সেই রুশ সংস্কৃতজ্ঞ ও ভারততাত্ত্বিক মিনায়েভ, যিনি

উনিশ শতকের শেষ দিকে তিনবার এসেছিলেন আমাদের দেশে, তিন সপ্তাহেরও বেশিকাল থেকে গেছেন আমাদের এই কলকাতা শহরে এবং সাক্ষাৎ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তিব্বত পর্যটক শরৎচন্দ্র দাস, রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর প্রভৃতির সঙ্গে। বঙ্কিমচন্দ্র মিনায়েভকে তাঁর যে বইগুলি তাঁর নাম স্বাক্ষর করে উপহার দেন সেগুলিও সযত্নে রক্ষিত রয়েছে ঐ 'মিনায়েভ সংগ্রহে')। অভয়চরণের ঐ বই এ-দেশেও এখন খুবই দুষ্প্রাপ্য তাই লেনিনগ্রাডে কিভাবে তার কপি পেঁাছল, এই প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে। তার জবাব মিলল নামপত্রের ঠিক আগের পৃষ্ঠাতেই। সেখানে রয়েছে একটি স্বাক্ষর রেভারেণ্ড জে. লঙের— অর্থাৎ আমাদের সেই 'অসময়ে হরিশ মোলো, লঙের হোলো কারাগারে'র বিখ্যাত জেমস লঙ সাহেব। সম্ভবত লঙ সাহেবই তাঁর এই বইখানি মিনায়েভকে দিয়েছিলেন আর মিনায়েভ মারফৎ সেটি পেঁাচেছিল তখনকার সেন্ট পিটার্সবার্গ বা আজকের লেনিনগ্রাড শহরে। আবার এও হতে পারে যে লঙসাহেব নিজেই বইখানি নিয়ে গিয়েছিলেন ঐ দেশে। কারণ রাশিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বহুদিনের। আয়ার্ল্যাণ্ডে তাঁর জন্ম হলেও তাঁর শৈশব ও বাল্য কেটেছিল রাশিয়ায়। 'নীলদর্পণ'-সংশ্লিষ্ট মামলায় এক মাস কারাদণ্ড ভোগের পরও তিনি বেশ কিছুকাল কাটান ঐখানে রুশ প্রবচন ইত্যাদি সংগ্রহের কাজে। সর্বশেষে ১৮৭২ সালে, তিনি যখন পাকাপাকিভাবে ভারতবর্ষ ছেড়ে দেশে ফিরে যান তখনও তিনি তৃতীয়বার ভ্রমণ করেন রাশিয়ায়। আসলে মিনায়েভ ও লঙ দুজনাই সেদিন ছিলেন ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে সেতুর মতো।

লেনিনগ্রাডে লঙ সাহেব স্বাক্ষরিত অভয়চরণ দাশের বইখানি যে আছে— সে খবর আমি পেয়েছিলাম সোভিয়েত গবেষক ডাঃ কোমারভের কাছে।

The Indian Ryot বিষয়ে দ্বিতীয় খবর এই যে, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সময় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেবের কাছে ডাঃ গঙ্গাধর অধিকারী এই বইখানির সন্ধান পান এবং মুজফ্‌ফর সাহেবের মারফৎ বইটি মীরাটে আনিয়ে প্রভূত পরিমাণে সেটি ব্যবহার করেন '১৮ জন কমিউনিস্টের বিবৃতি'র কৃষি-সংক্রান্ত অংশটি রচনাকালে।

১৮৯১ সালে রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' পত্রিকায় (মাঘ, ১২৯৮, পৃ. ২৪৯-৫০) 'ক্যাথলিক সোস্যালিজম' নামে একটি প্রবন্ধে লেখেন :

"য়ুরোপে কিছুদিন হইতে সোস্যালিস্ট নামক এক দলের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাহারা সর্বসাধারণের মধ্যে ধন সমভাবে বিভাগ করিয়া দিতে চায়। এতকাল এই সোস্যালিজম মত প্রায় নাস্তিকতার সহচর স্বরূপ ছিল। প্রায় সমস্ত সোস্যালিস্ট পত্রই নাস্তিকতার গোঁড়ামি প্রচার করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি একটা পরিবর্তন দেখা যাইতেছে।···রোমান ক্যাথলিক মণ্ডলীর অধিপতি স্বয়ং পোপ লিও অল্পদিন হইল তীর্থযাত্রী একদল ফরাসী মজুরদের সম্বোধন করিয়া আপনার অনকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা একটা লক্ষণস্বরূপ ধরা যাইতে পারে। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় প্রায়ই প্রবল পক্ষকে আশ্রয় করিয়া বললাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। রোমের মোহান্তটি য়ুরোপের নাড়ি টিপিয়া বসিয়া আছেন। সোস্যালিজমের আসন্ন উন্নতি ও ব্যাপ্তি নিশ্চিত অনুমান না করিলে তাঁহারা যে সহসা ইহার প্রতি প্রকাশ্য প্রসন্নতা দেখাইতেন ইহা তেমন সম্ভবপর বোধ হয় না। তাঁহারা এমন বালুকার পরে কখনই চরণ ক্ষেপ করিতেন না যাহা দুই দণ্ডে ধসিয়া যাইবে।'

কিন্তু সোস্যালিজম সম্পর্কে এর চাইতে সুষ্ঠুতর ধারণা প্রকাশ পেল পরের বছর 'সাধনা'য় প্রকাশিত (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯, পৃ. ৮৭-৯১) রবীন্দ্রনাথের 'সোশ্যালিজম' প্রবন্ধে। যেমন

"···সোশ্যালিস্টরা চাহে, যে, এই পণ্য উৎপাদন ও বিতরণ কোনো বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির হস্তে না থাকিয়া সাধারণ সমাজের হস্তে পড়ে। তাহারা বলে, ধন উৎপাদন এবং বণ্টন সমস্ত সমাজের কাজ। সম্প্রতি কেবল সম্পত্তিবান ব্যক্তিদের মর্জি এবং স্বার্থের উপরে তাহার নির্ভর থাকাতে জনসাধারণ স্ব স্ব অবস্থার সম্পূর্ণ উন্নতির সম্ভাবনা হইতে বঞ্চিত হইতেছে।···ধনহীন স্বাধীনতা অসম্ভব, কথাটা সত্য। সেই জন্যই ধন সাধারণের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া বিশেষ আবশ্যক—কারণ, তাহা ব্যতীত স্বাধীনতা সর্বসাধারণের মধ্যে কিছুতেই ব্যাপ্ত হইতে পারে না।···সোশ্যালিজম সকলের মধ্যে ধনের সমবিভাগ করিয়া দিয়া পুনশ্চ সকলকে একতন্ত্রের মধ্যে বাঁধিতে চাহে এবং এই উপায়ে সকলকে যথাসম্ভব স্বাধীনতার অধিকারী করিতে চাহে. মানবসমাজে ঐক্য এবং স্বাধীনতার সামঞ্জস্য ইহার উদ্দেশ্য।"

এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক আর্নেস্ট বেলফোর্ট ব্যাক্সের মতামত সংক্ষেপে হাজির করেছেন। ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত অধ্যাপক ব্যাক্সের ***Religion of Socialism*** বইখানি খুব সম্ভব ঐ সময় নাগাদ পেঁাছেছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে।

১৮৯৩ সালেও রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীকে একটি চিঠিতে লেখেন: "সোসিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি নে— যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তা হলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারী হতভাগ্য" (ছিন্নপত্রাবলী, পত্র ৯৫)।

এর থেকে বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ঐ সময়ে সোশ্যালিজমকে দেখেছেন একান্তভাবে সামাজিক ন্যায়-অন্যায়ের দিক থেকেই। তাঁর মনে তখনো যথেষ্ট সংশয় এর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে।

গত শতাব্দীর শেষ দশকে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'তেও দেখা যায় বিদেশের শ্রমিক আন্দোলনের খবর। যেমন: "বার্লিনে এক বিক্ষোভ মিছিল বার হল বেকারদের। বেশ কয়েক হাজার বেকার জনৈক সোশ্যালিস্টের নেতৃত্বে ঐ মিছিলে যোগ দিয়ে সম্রাটের প্রাসাদের দিকে যায় আর দাবি জানায়— রুটির। ফলে যে সংঘর্ষ বাধে তাতে পুলিস তরোয়াল ও জনতা হটানোর লাঠি চালাতে থাকে। বেশ কিছু লোক হতাহত হয় এর ফলে।"

অথবা

"গতকাল (১৮৯৩ সালের ২৩ এপ্রিল) সোশ্যালিস্টদের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে নাগরিকদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে পুলিসের। খোলা তরোয়াল হাতে তাড়া ক'রে পুলিস জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে সক্ষম হয়।"

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা, এলান্ অক্টেভিয়ান্ হিউমের এক খোলা চিঠি ঐ সময়ে খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। তার এক জায়গায় ছিল:

"জনসাধারণ (ভারতবর্ষের মানুষ) খুবই ধৈর্যশীল, খুবই নিরীহ। ফ্রান্সের মানুষও তাই ছিল তাদের রাজা ও উচ্চবর্গের প্রায় সবাইকে খতম করার দশ বছর আগে অবধি।··· ক্ষুধা আর দুর্দশাই ভেড়াকে রূপান্তরিত করেছিল নেকড়ে বাঘে।"

হিউমের চিঠির এই-সব কথা বিলেতে কংগ্রেসের যে শাখা ছিল তার সদস্যদের কাছে (এঁদের মধ্যে দাদাভাই নৌরজী ছিলেন) এত কড়া বোধ হয়েছিল

যে, তাঁরা ত্রস্ত ও বিব্রত হয়ে এর প্রতিবাদ করেছিলেন কাগজে। ঐ বিতর্কে অমৃতবাজার সমর্থন জানায় হিউম-কে। হিউমও সমালোচকদের জবাবে আর-একটি চিঠি পাঠান খবরের কাগজে। অনেকের অনুমান, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল 'সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনল' বা 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র দৃষ্টি ভারতবর্ষের দুর্দশার দিকে ফেরানো। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র লণ্ডন সংবাদদাতা তখন ছিলেন *Prosperous British India*-র লেখক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ, উইলিয়ম ডিগবি। তিনিও 'পত্রিকা'য় লিখলেন:

"হিউমের চিঠি প্রকাশিত হয়েছে ইউরোপের সমাজতন্ত্রীদের বাৎসরিক সম্মেলনের ঠিক আগেই। ঐ সম্মেলন স্বভাবতই প্রভূত পরিমাণে অস্বাচ্ছন্দ্যের উদ্রেক করেছে সারা ইউরোপীয় মহাদেশ জুড়ে।"

"সারা ইউরোপীয় মহাদেশ জুড়ে" মানে অবশ্য এখানে সারা ইউরোপের উপনিবেশ-মালিক মহলে। প্রসঙ্গত এটিই সম্ভবত আমাদের দেশে 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র প্রথম উল্লেখ। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র এই উদ্ধৃতিগুলি নেওয়া হয়েছে শ্রীকালীপদ বিশ্বাসের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ থেকে।

১৮৯৩ সালের ১৩ নভেম্বর অরবিন্দ ঘোষ এক প্রবন্ধে লেখেন: "নিম্নশ্রেণীর ক্ষমতা ও সভ্যতার ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতির গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার ঝোঁকের উপরেই নির্ভর করছে গোটা জাতির ভবিষ্যৎ।"

ঐ বছর ৪ ডিসেম্বর আর-একটি প্রবন্ধেও অরবিন্দ লিখলেন: "আমাদের মধ্যে যারা প্রলেটারিয়েট তারা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত ও দুর্দশায় জর্জরিত। কিন্তু এখন যখন আন্তরিকতা, শক্তি ও বিচারবিবেচনার দিক থেকে মধ্যশ্রেণী অক্ষম প্রতিপন্ন হয়েছে তখন আমরা পছন্দ করি চাই না করি, ঐ দুর্দশাগ্রস্ত ও অজ্ঞ প্রলেটারিয়েটের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের আশার, আমাদের ভবিষ্যতের একমাত্র ভরসা।"

আমরা আজ 'প্রলেটারিয়েট' বলতে যা বুঝি খুব সম্ভবত অরবিন্দ সে অর্থে শব্দটি এখানে ব্যবহার করেন নি। বরঞ্চ এর সঙ্গে মিল বোধ হয় চিত্তরঞ্জনের "Swaraj for the masses, not for the classes" অথবা "Swaraj for the 90%"-এর ধারণার। তবু 'প্রলেটারিয়েট' শব্দটি সম্ভবত অরবিন্দই প্রথম ব্যবহার করলেন এ দেশে।

অরবিন্দের সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ দুটি আছে তাঁর *New Lamps for Old* নামের প্রবন্ধ-সংকলনে।

রোমাঁ রলাঁ তাঁর *Life of Vivekananda*-র ১৬৬ পৃষ্ঠায় ভগিনী ক্রিশ্চিনের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা থেকে এই উদ্ধৃতি দিয়েছেন :

"বত্রিশ বছর আগে (অর্থাৎ ১৮৯৬ সালে) তিনি বিবেকানন্দ আমায় বলেছিলেন : "নবযুগের সূচনা হবে যে অভ্যুত্থানে তা ঘটবে রাশিয়ায় অথবা চীনে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না কোথায়— তবে এ দুইয়ের মধ্যে একটিতে হবেই।··· দুনিয়ায় এখন তৃতীয় যুগ চলেছে বৈশ্যদের (ব্যবসায়ী, তৃতীয় বর্গের মানুষ) আধিপত্যে। চতুর্থ যুগ হবে শূদ্রদের (প্রলেটারিয়েট) পরিচালনায়।"

১৯০০ সালে প্যারিসে বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা হয় নৈরাজ্যবাদী রুশ নেতা ক্রপটকিনের সঙ্গে। তাঁদের আলাপের বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে নৈরাজ্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ প্রভৃতি মতগুলিকে বিবেকানন্দ কী দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর **"I am a Socialist"** প্রবন্ধটি পড়লে (অদ্বৈত আশ্রম কর্তৃক ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত বিবেকানন্দের *Caste, Culture and Socialism* পুস্তিকার শেষ প্রবন্ধ)। ঐ প্রবন্ধের এক জায়গায় আছে :

"দিন আসবে যখন প্রত্যেক দেশে শূদ্ররা তাদের সহজাত শূদ্র প্রকৃতি ও আচরণাদি সমেত··· প্রতিটি সমাজেই পূর্ণ আধিপত্য লাভ করবে। ঐ নব শক্তির প্রত্যুষলগ্নের প্রথম রশ্মিগুলি ইতিমধ্যেই ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে পাশ্চাত্য দুনিয়ার উপরে··· সোস্যালিজম, এনার্কিজম, নিহিলিজম এবং ঐ ধরনের গোষ্ঠীগুলি আসন্ন সমাজবিপ্লবেরই অগ্রদূত।"

অর্থাৎ ঐ-সব মতবাদের তাৎপর্য সম্পর্কে তখনই কিছুটা অবহিত স্বামী বিবেকানন্দ।

অরবিন্দের বন্ধু, সহকর্মী ও একান্ত ভক্ত চারুচন্দ্র দত্তও ঐ সময়ে বিলাতে ছিলেন আই. সি. এস. পরীক্ষা দেবার জন্য। পরে সিভিলিয়ান হবার পরেও তিনি বরাবর যোগাযোগ রাখতেন বিপ্লবীদের সঙ্গে ও তার জন্য তাঁকে ফলভোগও করতে হয় কর্তৃপক্ষের হাতে। 'পুরানো কথা-উপসংহার' নামে তাঁর স্মৃতিকথায় (পৃ. ৫) তিনি লেখেন :

"১৮৯৬-৯৭ সালে আবহাওয়া বেশ অনুকূল ছিল। দেশে দুর্ভিক্ষ ও

প্লেগের প্রকোপ, পুনাতে দুজন সাহেব কর্মচারীর হত্যা, রানী ভিক্টোরিয়ার জয়ন্তী উৎসবে যোগ দেবার জন্য ভারতকে ধরে টানাটানি— এসবই আমাদিকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে চলেছিল গুপ্ত রাজদ্রোহের অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে। আমাদের এই কাজে সাহেব মুরুব্বীরও অভাব ছিল না। সদ্য দশ বছর জেল খেটে বেরিয়ে এসেছেন ফিনিয়ান বিদ্রোহী মাইকেল ডেভিট, সমাজতান্ত্রিকদের কর্তা হাইণ্ডমান, নৈরাজ্যবাদী কানিংহাম, শ্রমিক দলের নেতা আগুনের ফুলকি টম মান— এদের সকলের সঙ্গেই আমাদের ক্ষুদ্র দলটির ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।"

অর্থাৎ দুই দেশের বিপ্লবীদের মধ্যে— এঁদের মধ্যে টম মানের মতো বিপ্লবী শ্রমিক নেতাও ছিলেন— কিছুটা প্রাথমিক যোগাযোগের চেষ্টা শুরু হয়েছে নতুন শতকের মুখোমুখি।

তবু একটু ব্যাপার লক্ষণীয়। অনেকের লেখাতেই সমাজতান্ত্রিক মতবাদ, আন্দোলন ও তার নেতৃবর্গের অনেকের নাম থাকলেও কেউই কিন্তু এতাবৎ মার্কস বা এঙ্গেলসের উল্লেখ করেন নি। অথচ যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করলাম তার মধ্যে ঐ দুই বিপ্লবীর চিন্তা ও কর্মকাণ্ড পূর্ণ পরিণতিতে পেঁচেছে, ভারতবর্ষে ইংরেজশাসনের স্বরূপ ও তার ভবিষ্যৎ ফলাফল, সিপাহী-বিদ্রোহের যথার্থ তাৎপর্য এবং সাধারণভাবে ভারত-ইতিহাস বিষয়ে তাঁদের অসংখ্য অমূল্য রচনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, ১৮৮৩ সালে মার্কসের ও ১৮৯৫ সালে এঙ্গেলসের মৃত্যু হয়েছে, তারপরেও কেটে গেছে বেশ কয়েক বছর। এই আশ্চর্য অনুল্লেখের কারণ আমার জানা নেই।

ঐ দুই অতিকায় পুরুষের মধ্যে এ দেশের কাগজপত্রে প্রথম উল্লেখ দেখা যায় কিন্তু এঙ্গেলসের (তবে বন্ধুবর ডাঃ কোমারভ আমায় জানিয়েছেন যে এরও ১০ বছর আগে ১৮৯০ সালে বোম্বাইয়ে নাকি এক সভায় আলোচনা হয়েছিল 'ফেবিয়ান সমাজবাদ' বিষয়ে এবং তার মধ্যে কেউ নাকি প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছিলেন মার্কসের)।

বিখ্যাত *Dawn* পত্রিকার ১৯০০ সালের মার্চ-জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ঐ পত্রিকার ততোধিক বিখ্যাত সম্পাদক, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একটি রচনা —"The Indian Economic Problem"। তার মধ্যে ছিল এই কথাগুলি :

"যে-সব বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্ট বা ব্লু বুকে ১৮৩৩ থেকে ১৮৪২ সালের মধ্যে কারখানা খনি ও ওয়ার্কশপগুলিতে শিল্পজীবনের অবস্থা বিষয়ে খোঁজখবর করা হয়েছিল সেগুলির দিকে এক নজর তাকালেই অথবা এংগেলসের *Condition of the Working Class in England in 1844*-এর পৃষ্ঠাগুলি পড়লেই শিল্পবিপ্লবের ফলে ইংরেজ শ্রমিকশ্রেণীর যে মানসিক অবনতি ও দুরবস্থা ঘটেছিল তার সম্পর্কে আর কারো কোনো সংশয় থাকে না।"

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ১৯০০ সালেই *Dawn* পত্রিকার সম্পাদক এংগেলসের ঐ বই পড়েছিলেন এবং সেটিকে সরকারী কমিশনের রিপোর্ট ও ব্লু বুকের মতোই প্রামাণিক গণ্য করেছিলেন।

এ-দেশে মার্কসের নামের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৯০৩ সালে 'অমৃতবাজার পত্রিকায়'। লেখাটির নাম "Rise of foreign socialists : Their remarkable growth in the continent in recent years"। সংশ্লিষ্ট কথাগুলি এই :

"ফ্রান্স ও জার্মানিতে কিন্তু সম্প্রতি সমাজতন্ত্রীদের সংখ্যা আশ্চর্য দ্রুত-গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন জার্মানরা সমাজতন্ত্রের পুরানো প্রবক্তাদের কোনো-না-কোনো ছক-কাটা মত অনুসরণের চেষ্টা করেছে। তাঁদের নেতারা গভীর চিন্তাশীল ব্যক্তি এবং তাঁদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ মাত্রায় আন্তরিক। তাঁদের মধ্যে একটি নরমপন্থী দলের আবির্ভাব হয়েছে যাঁরা ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার সংগে যে দায়িত্ববোধ এসে পড়ে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এখন অনেক বেশি ধীর স্থির ও করিৎকর্মা কার্ল মার্কসের অনুবর্তী তাত্ত্বিকদের চাইতে।"

লেখাটি এ দেশের কোনো লেখকের নয়, বিদেশী পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি। উল্লেখ নামমাত্র আর সে-উল্লেখেও মার্কসের প্রতি মামুলী বিরূপ মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীযুক্ত কালীপদ বিশ্বাসের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধেই পাওয়া গেছে এই খবরটিও।

বাংলা দেশে— যদিও বাংলা ভাষায় নয়— মার্কসের সত্যকার উল্লেখ, এমন-কি, তাঁর মতামতের সশ্রদ্ধ বিচার প্রথম পাওয়া যায় *Modern Review* পত্রিকায় (১৯১২ সালের মার্চ সংখ্যা, পৃ. ২৭৩-৮৬) প্রকাশিত লালা হরদয়ালের

"Karl Marx, a Modern Rishi" প্রবন্ধে। বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী ও 'গদর' দলের সম্পাদক লালা হরদয়াল ঐ সময়ে আমেরিকায় সমাজতন্ত্রীদের সান্নিধ্যে আসেন ও কিছুটা চর্চা করেন মার্কসবাদের। তার ফলেই ঐ প্রবন্ধ।

কিন্তু এ প্রসংগে আর-একজনের নাম না করলে অন্যায় হবে— তিনি কেরালার রামকৃষ্ণ পিল্লাই। তাঁর সম্পর্কে বিশদ খবর জানি না— তিনি বিদেশ গিয়েছিলেন বলেও বোধ হয় না। 'স্বদেশাভিমানী' নামে পরিচিত রামকৃষ্ণ পিল্লাই ১৯১২ সালেই হরদয়ালের উল্লিখিত রচনা অবলম্বনে মালায়লি ভাষায় একটি জীবনী লিখেছিলেন কার্ল মার্কসের। তা ছাড়া একটি মালায়লি সাপ্তাহিক পত্রিকায় তিনি ১৯১৩-১৪ সালে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন সমাজবিকাশের নিয়ম, সমাজতন্ত্র ও 'কমিউনিস্ট ইস্তেহার' সম্পর্কে। যতদূর জানি কোনো ভারতীয় ভাষায় 'ইস্তেহার' সম্পর্কে এটিই প্রথম আলোচনা।

'*New Age*' পত্রিকায় (১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০) এন. ই. বলরামের একটি প্রবন্ধে 'স্বদেশাভিমানী' রামকৃষ্ণ পিল্লাই সম্পর্কে উপরের এই খবরটুকুই শুধু পেয়েছি। আরো বিশদ তথ্য সংগ্রহ হওয়া দরকার এ-ব্যাপারে।

ভারতীয় বিপ্লবী : বিলাতে

আমাদের মতো পরাধীন দেশে জাতীয় বিপ্লবী বলতে তাঁদেরই বুঝি যাঁদের লক্ষ্য ছিল ইংরেজ-শাসনমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা আর সে লক্ষ্যে পেঁছানোর জন্য যাঁরা একদিন তাঁদের প্রাণকে পণ রেখে এগিয়ে গিয়েছিলেন গুপ্ত আন্দোলন ও সীমায়িত সশস্ত্র সংগ্রামের দুর্গম রক্তাক্ত পথে। স্বাধীন ভারতের রূপ কী হবে, সে বিষয়ে তাঁদের ধারণা হয়তো তেমন স্পষ্ট ছিল না। অনেক সময়, বিশেষ করে গোড়ার দিকে তাঁদের চিন্তায় মধ্যযুগীয় ও ধর্মীয় সংস্কার প্রবল ছিল, এমন-কি, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ছাপও কখনো ধরা পড়ত তাঁদের চিন্তায় ও কর্মে। মাঝে মাঝে তাঁদের মধ্যে দলাদলি, সংকীর্ণতাও প্রকট হয়ে উঠত— তারই প্ররোচনায়, কখনো-বা কংগ্রেসের উপদলগুলির শরিকী কোঁদলের শিকার ব'নে তাঁরা ছুরি ধরতেন পরস্পরের বিরুদ্ধেও। লোকচক্ষুর আড়ালে বছরের পর বছর গোপন কাজকর্ম চালাতে গিয়ে তাঁদের মধ্যে কিছুটা গ্লানি, আবিলতাও হয়তো দেখা দিয়েছিল শেষ পর্যায়ে। আর সবশেষে —লক্ষ্য-সিদ্ধির যে পথ তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন তার পিছনে ছিল এই ভ্রান্ত ধারণা যে, ইতিহাসের স্রষ্টা সাধারণ মানুষ নন— তাঁরা হলেন নিষ্ক্রিয় জনতা মাত্র— প্রকৃত ইতিহাস-স্রষ্টা হলেন অসামান্য শক্তিধর কোনো নায়ক বা বড়জোর মুষ্টিমেয় নেতৃবৃন্দ।

তবু এ-সব দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁরা যে জাতীয় কংগ্রেসের প্রায় তিন দশক আগে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, শুধু স্বপ্নই নয়, তার জন্য অস্ত্র হাতে করে প্রাণ দেওয়া-নেওয়া করেছিলেন অকাতরে— এটাই তাঁদের পরম গৌরব। আমাদের সমগ্র জাতীয় মুক্তি আন্দোলনও মহিমান্বিত তাঁদের সেই মহৎ আত্মদানের ঐতিহ্যে।

বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের তৎপরতার কথা প্রথম শোনা যায় উনিশ শতকের শেষ দশকে। ১৮৯১-৯২ সালে কেমব্রিজের ছাত্র অরবিন্দ ঘোষ নাকি সেখানে একটি গুপ্ত সমিতি গড়েছিলেন—'Lotus and Dagger' নামে। শ্রীগিরিজাশংকর রায়চৌধুরী তাঁর 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলায় স্বদেশী যুগ' গ্রন্থে

(পৃ. ৫৪) লিখেছেন : "লণ্ডনেও ঐ সমিতির শাখা ছিল। এই গুপ্ত সমিতির উদ্দেশ্য ছিল কোনও সশস্ত্র উপায়ে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা।"

'Lotus and Dagger' সম্পর্কে বিশদ খবর আমার জানা নেই। তবে নাম শুনে মনে হয় যে, আনুমানিক ১৮৭৭ সাল নাগাদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত যে 'সঞ্জীবনী সভা'র কথা রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে, এই সমিতিও মোটামুটি তারই সগোত্র— অর্থাৎ 'উত্তেজনার আগুন পোহানো'র ব্যাপারটা বেশ প্রকট ছিল উভয়ক্ষেত্রেই।

ঐ সময়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে বলে রাখা দরকার। স্বাভাবিকভাবেই বিদেশ বলতে তখন আমরা বুঝতাম প্রধানত বিলেত বা বৃটেন। প্রবাসী বিপ্লবীদের কাজও যে ঐখানেই শুরু হয়েছিল তাও আমরা দেখলাম। আবার অরবিন্দ যখন বিলেতে গুপ্ত সমিতি গড়ায় ব্যস্ত, ঠিক তখনই আবার দেখা যায় দাদাভাই নৌরজীর মতো প্রতিষ্ঠাবান কংগ্রেসী নেতাও সেখানে কংগ্রেসের শাখা পরিচালনা করছেন আর বৃটিশ লিবারাল পার্টির প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হচ্ছেন বৃটিশ পার্লামেন্টে। আর ঐ দুই পক্ষের সম্পর্ক কিছুটা আঁচ করা যায় চারুচন্দ্র দত্তের লেখা থেকে। আমরা আগেই জেনেছি ১৮৯৬ সাল নাগাদ চারুচন্দ্র বিপ্লবী কাজকর্মের সূত্রে কিছুটা ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন আইরিশ ফিনিয়ান আন্দোলনের নেতা, মাইকেল ডেভিট, বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলন ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশনের নেতা হাইণ্ডমান, নৈরাজ্যবাদী কানিংহাম ও বিপ্লবী শ্রমিক নেতা টম মানের সঙ্গে। সেই প্রসঙ্গেই চারুচন্দ্র লেখেন :

> "আমাদের সর্বজনমান্য ভারতীয় নেতা ছিলেন ঋষিতুল্য দাদাভাই নৌরজী। আমরা তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতাম, কিন্তু তিনি আমাদের এইসব সাহেব মুরুব্বীদিকে ভালো চোখে দেখতেন না, কেবলই বলতেন, 'এই সমস্ত নামকাটা সেপাইদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িও না।' পুরানো নেতারা তো ইংরেজদের তুষ্ট করে এঁটোকাঁটা আদায় করাকেই রাজনীতি বলে জানতেন" ('পুরানো কথা-উপসংহার', পৃ. ৫)।

অর্থাৎ দু পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ যেমন আছে তেমনই আছে দৃষ্টিভঙ্গীর বিপুল ব্যবধান। চারুচন্দ্র গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন দাদাভাই নৌরজীকে কিন্তু খুব একটা কর্ণপাত করছেন না তাঁর উপদেশে, তাঁর নিষেধ সত্ত্বেও গিয়ে

মিশছেন হরেকরকম 'নামকাটা সেপাইদের' সঙ্গেই। আবার দাদাভাইকেও দেখা যাচ্ছে টম মানের সঙ্গে না হলেও, হাইণ্ডমানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, তাঁর লেখা বই গিয়ে পেঁছিচ্ছে জার্মান সমাজতন্ত্রী পণ্ডিত কার্ল কাউটস্কির লাইব্রেরিতে, ১৯০৪ সালে আমস্টার্ডামে অনুষ্ঠিত 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র সম্মেলনে তাঁকে বক্তৃতা দিতেও দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে (দ্র. ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', পৃ ১৫৭)।

অর্থাৎ কংগ্রেসী ও বিপ্লবী দুজনেই আন্তর্জাতিক সমর্থন খুঁজছেন তাঁদের দাবিদাওয়ার পিছনে। আর সে সমর্থনের জন্য তাঁরা যেমন যাচ্ছেন অন্য পরাধীন দেশের জাতীয় বিপ্লবীদের কাছে, তেমনই আবার বৃটিশ ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশের শ্রমিক আন্দোলনের নেতাদের কাছেও (দ্র. পরিশিষ্ট ২)।

লক্ষ্য করতে হবে যে, প্রথম যে জাতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে ভারতীয়রা যোগাযোগ করেন তাঁরা হলেন আইরিশ। এর কারণও অনুমান করা কঠিন নয়। বৃটেনে থেকে তাঁদের সঙ্গেই যোগাযোগ করার সব থেকে সুবিধা, দ্বিতীয়ত ভাষার দিক থেকেও তাঁদের বেলাতেই অসুবিধা সব থেকে কম। কাজেই ফরাসী বিপ্লব আর মাৎসিনি, গ্যারিবলডি বা কার্বোনারিদের কথা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ নেতারা অনেক দিন থেকে বলে এলেও কার্যক্ষেত্রে যোগাযোগ কিন্তু প্রথম ঘটল আইরিশদের সঙ্গে। এরও দু'দশক আগে ১৮৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার বিলেত গিয়ে পার্লামেন্টের অধিবেশনে যা দেখেছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছিলেন এইভাবে :

"...হৌসে Irish memberদের ভারী যন্ত্রণা ; সে বেচারিরা যখন বক্তৃতা করতে ওঠে তখন হাউসে যে অরাজকতা উপস্থিত হয় সে আর কী বলব ! চার দিক থেকে ঘোরতর কোলাহল আরম্ভ হয়, অভদ্র মেম্বরেরা হাঁসের মত 'ইয়া' 'ইয়া' করে চেঁচাতে থাকে। বিদ্রূপাত্মক 'hear' 'hear' শব্দে বক্তার স্বর ডুবে যায়।... আইরিশ মেম্বরেরা এই রকম জালাতন হয়ে আজকাল খুব প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েছেন। হাউসে যে-কোনো কথা ওঠে, প্রায় সকল বিষয়েই তাঁরা বাধা দেন ; আর প্রতি প্রস্তাবে এক জনের পর আর-এক জন করে উঠে দীর্ঘকালব্যাপী বক্তৃতায় হাউসকে বিব্রত করে তোলেন। ... আমার স্বভাবতই আইরিশ মেম্বরদের প্রতি টান..." ('য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র', রবীন্দ্রশতবর্ষপূর্তি সংস্করণ, পৃ. ৪৬-৪৭)।

পরাধীন দেশের মানুষের পরস্পরের প্রতি এই 'স্বাভাবিক টানেই' আবার পার্লামেন্টের আইরিশ সদস্যরা ভারতীয় প্রশ্নে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধতা করতেন প্রবলভাবে। চারুচন্দ্রের লেখা এই ঘটনাটিও উল্লেখযোগ্য এ প্রসঙ্গে :

"... দাদাভাই সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও আমরা ডেভিট প্রভৃতি সাহেব বন্ধুদিকে ভারতের মঙ্গলকামী বলেই জানতাম।... একদিন ডেভিট আমাকে ও আমার এক বন্ধুকে নিজের বাসাতে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'আমাদের আইরিশ নেতা রেডমণ্ডের আদেশমত আমি ভারতবাসীদের কাছে একটা প্রস্তাব করছি। তোমাদের যদি বিশ্বাস না হয় ত চল, এখনই রেডমণ্ডের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, তিনি নিজমুখে বলবেন।' আমরা বললাম, 'আপনিই বলুন, রেডমণ্ডের কাছে যাবার কোন দরকার নেই'। প্রস্তাবটি হল এই—'ভারত যদি আয়র্লণ্ডের জাতীয় দলকে বৎসরে আট লক্ষ টাকা দেয় ত আমরা ভারতকে বৃটিশ প্রজাসভাতে আমাদের আয়ত্তাধীন আটটি আসন ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছি। এই আটজন ভারতীয় সকল আইরিশ ব্যাপারে আমাদের মতে মত দেবেন, আর আমরা সমগ্র আইরিশ জাতীয় দল সব ভারতীয় ব্যাপারে কংগ্রেসের মত সমর্থন করব।' ডেভিট সমস্ত কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়ে আমাদিকে দাদাভাইয়ের কাছে ছুটে যেতে হুকুম করলেন, 'যেমন করে পার, বুড়ো নৌরজীকে রাজী কর। তারপর তোমাদের রেডমণ্ডের কাছে নিয়ে যাব। আমাদের আইরিশ দল গরীব, বছরে আট লক্ষ টাকা পেলে আমাদের খুব উপকার হবে আর তোমাদেরও আটজন লোক পার্লামেন্টে বসাতে পারলে মস্ত লাভ।' আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ব্যবস্থা ভালোই মনে হল। কিন্তু নৌরজী ভালো করে শুনলেনই না আমাদের কথা, 'যাও, যাও, ছোকরারা আমাকে জ্বালাতন কোরো না, আমি ব্যস্ত আছি' বলে আমাদিকে তাড়িয়ে দিলেন। আমি আজও বিশ্বাস করি কথাটার মধ্যে ধাপ্পাবাজি একটুও ছিল না" ('পুরানো কথা—উপসংহার', পৃ. ৬-৭)।

আমাদের জাতীয় আন্দোলনের কাছে সেদিনকার এই আইরিশ প্রস্তাব নিশ্চয়ই খুবই চমকপ্রদ আর দাদাভাইয়ের কাছে তো ব্যাপারটা অবিশ্বাস্যও ঠেকেছিল। তাই ঐ পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান। তবু ঐ ঘটনার মধ্যে ধরা পড়ে দেশী বিদেশী বিপ্লবীদের কাণ্ডকারখানা সম্পর্কে মডারেট কংগ্রেসী নেতার সংশয় ও

সতর্কতাও। আর ঐ ধরনের অতিসতর্ক মনোভাবের উল্টো দিকে আইরিশ বিপ্লবীদের সংগে ভারতীয় বিপ্লবীদের মনের টান বারবার প্রকাশ পেয়েছে পরবর্তী কালেও— আয়ারল্যাণ্ডের বিপ্লবী আন্দোলনের সংগে যুক্ত আইরিশ নিবেদিতার ভারতবর্ষে আগমন ও বাঙালী বিপ্লবীদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন থেকে ডি. ভ্যালেরার সংগে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা পর্যন্ত। বাংলা দেশের বিপ্লবী কর্মীদের প্রায় অবশ্যপাঠ্য ছিল একসময়ে ড্যান ব্রীনের *My fight for Irish Freedom* ও 'ইস্টার বিদ্রোহ ও গেরিলা যুদ্ধে'র মতো বই। কর্কের মেয়র, টেরেন্স ম্যাকসুইনীর ৭২ দিনের অনশনে তিলে তিলে আত্মদান উদ্বুদ্ধ করেছে আমাদের তরুণ সমাজকেও। ভগৎ সিং-এর সহকর্মী, যতীন দাসের অনুরূপ মৃত্যুবরণের সময়ে সে ঘটনার উল্লেখ করতে ভোলে নি আমাদের কোনো জাতীয়তাবাদী পত্রিকাই।

কংগ্রেসীদের মধ্যে যাঁরা 'চরমপন্থী' বা আরো পরে 'বামপন্থী' নামে পরিচিত হয়েছিলেন স্বভাবতই বিপ্লবীদের মতো তাঁরাও অন্য পরাধীন দেশের বিপ্লবীদের সংগে যোগাযোগ করার ব্যাপারে তৎপর ছিলেন। শুধু তাই নয় এঁরা উভয়েই শুধু অন্য পরাধীন দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনেরই নয়, 'শত্রুর শত্রুকে মিত্রজ্ঞান' করার সহজ যুক্তিতে বৃটিশবিরোধী অন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্য গ্রহণেও বিমুখ হন নি কোনো দিন। ১৯০৫ সালে স্বয়ং তিলক বোম্বাইয়ের রুশ কন্সালকে (জার সরকার) অনুরোধ জানিয়েছিলেন ভারতীয়দের সামরিক শিক্ষার জন্য রাশিয়া পাঠানোর ব্যবস্থা করার (দ্র. Girish Mathur, "Tilak and the Russians", *Patriot*, 30 June 1968)। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তাঁদের এই ঝোঁক যে বিশেষ করেই প্রকট হয়ে উঠেছিল— এ তো আজ সর্বজনবিদিত ঐতিহাসিক ঘটনা।

সে যাই হোক, যে ব্যাপারটি এখানে আমাদের বিশেষ আলোচ্য তা হল, ভারতীয় বিপ্লবীদের সংগে ইয়োরোপীয় সমাজতন্ত্রী ও শ্রমিক-আন্দোলনের যোগাযোগের ঘটনা। কারণ তারই সূত্রে একদা ভারতীয় বিপ্লবীদের উপরে— বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন প্রবাসী তাঁদের উপরে প্রবল প্রভাববিস্তার করেছিল রুশ-বিপ্লব। এবার সেই কথাতেই আসি।

অরবিন্দ ঘোষ ১৮৯১-৯২ সালে বিলেতে প্রথম গুপ্ত সমিতি গড়লেও তাঁর সত্যকার বিপ্লবী তৎপরতার ক্ষেত্র ছিল বরোদা ও বিশেষ করে কলকাতা। কিন্তু

যে তিনজন ভারতীয় বিপ্লবী সর্বপ্রথম বিদেশেই তাঁদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন তাঁরা হলেন পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা, সর্দার সিং রাওজী রানা ও শ্রীমতী ভিকাজী রোস্তম কামা।

পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার জন্ম ১৮৫৭ সালের ৪ অক্টোবর, গুজরাট রাজ্যের কচ্ছের অন্তর্ভুক্ত মান্দাভী গ্রামে। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি তরুণ বয়সেই খ্যাতি অর্জন করেন। এমন-কি, সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জোরে তিনি ১৮৭৫ সালে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অক্সফোর্ডের সংস্কৃত ভাষার জগদ্-বিখ্যাত অধ্যাপক মনিয়ার উইলিয়ামসেরও। সেই সূত্রে ১৮৭৯ সালের শেষ দিকে তাঁর বিলাত যাত্রা। অক্সফোর্ড থেকে কৃতিত্বের সংগে পরীক্ষা পাসের পর তিনি সেখানেই সংস্কৃত, মারাঠী ও গুজরাটী ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইতিমধ্যে তিনি ব্যারিস্টারিও পাস করেন এবং ভারতসচিব কর্তৃক ১৮৮১ সালে বার্লিনে ও ১৮৮৩ সালে লাইডেনে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ সম্মেলনে প্রেরিত হন ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসেবে। ১৮৮৩ সালের শেষভাগে তিনি ফিরে আসেন ও অল্পকাল ব্যারিস্টারি করার পর দেওয়ানের কাজ করেন রাটলাম, উদয়পুর ও জুনাগড় রাজ্যে। ১৮৯৭ সালের নভেম্বর মাসে দেওয়ানির কাজে ইস্তফা দিয়ে তিনি আবার বিলাত যাত্রা করেন এবং তেত্রিশ বছর ধরে বিচিত্র কাজকর্ম চালিয়ে দেহরক্ষা করেন বিদেশের মাটিতেই।

কৃষ্ণবর্মার রাজনৈতিক জীবনের সবটাই কাটে বিদেশে— প্রধানত লণ্ডন ও প্যারিসে আর শেষ ক'বছর জেনিভায়। জ্ঞান চর্চা ও অর্থোপার্জনের নিরুপদ্রব জগৎ থেকে হঠাৎ কেন তিনি সব ছেড়ে বিদেশে বিভুঁয়ে এই-সব বিপজ্জনক কাণ্ডকারখানায় মাতলেন, তার খানিকটা জবাব মেলে ১০ বছর পরে ১৯০৭ সালে তাঁর *Indian Sociologist* পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে। কৃষ্ণবর্মা লেখেন :

> "১৮৯৭ সালে নাটু ভাইদের গ্রেপ্তার ও তিলকের মামলার সময় আমার প্রত্যয় হল যে, বৃটিশ-ভারতে ব্যক্তিস্বাধীনতার কোনো দাম নেই, সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা বলে কোনো জিনিসই নেই আর বৃটিশ-ন্যায়পরায়ণতার কথা একটা ভাঁওতা মাত্র। সুতরাং স্বদেশ ত্যাগ করে আমি ইংলণ্ডবাসী হলাম।"

কৈফিয়ৎটি আমাদের কাছে আশ্চর্য বোধ হতে পারে। তবে কিন্তু মনে

রাখতে হবে প্রথম থেকেই কৃষ্ণবর্মা বিপ্লবী কাজকর্ম শুরু করেন নি। দেশে থাকতে তিনি সামাজিক মতামতের দিক থেকে ছিলেন আর্যসমাজ ও দয়ানন্দের অনুবর্তী। তাঁর কাছে স্বধর্ম ও স্বরাজ্য ছিল অবিচ্ছেদ্য। দ্বিতীয়বার বিলেতে আসার পর কিছুটা তিলকের সমর্থক হিসাবেই রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব। তিনি তাই বিলাতের কংগ্রেস শাখার সংগে সহযোগিতা করলেন না, কারণ সেখানে তখন আধিপত্য দাদাভাই নৌরজীর মতো মডারেট নেতার। তিনি বরং যোগাযোগ করলেন হাইণ্ডমান প্রমুখ বৃটিশ সমাজতন্ত্রী নেতা, আইরিশ গণতন্ত্রী ও অন্যান্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগে।

১৮৯৯ সালে একটি ঘটনায় তাঁর সংগে মডারেট চিন্তার ব্যবধান আরো-বেড়ে গেল। বৃটেনের সংগে ঐ বছর যুদ্ধ বাধে বুয়রদের। বৃটিশ-পদানত দেশ-গুলিতে এর ফলে স্বভাবতই বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। আইরিশরা তো সেখানে স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনী পাঠায় ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে। আমাদের দেশেও এর ঢেউ এসে লাগে। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

"...সভ্যতার ভিন্নতা আছে; সেই বৈচিত্র্যই বিধাতার অভিপ্রেত ...যে আদর্শ অন্য আদর্শের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, তাহা আদর্শই নহে।

সম্প্রতি য়ুরোপ এই অন্ধবিদ্বেষ সভ্যতার শান্তিকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে।...সেইজন্যই বোয়ারপল্লীতে আগুন লাগিয়াছে, চীনে পাশবতা লজ্জাবরণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং ধর্মপ্রচারকগণের নিষ্ঠুর উক্তিতে ধর্ম উৎপীড়িত হইয়া উঠিতেছে" ("সমাজভেদ", 'স্বদেশ', রবীন্দ্র-রচনাবলী ১১, পৃ. ৪৮৮-৮৯)।

মানিকতলা বোমা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগোও তাঁর 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা' গ্রন্থে (পৃ. ৪) সেদিনের কথা লিখছেন এইভাবে :

"বুয়র যুদ্ধের পূর্বে অবিসিনিয়ায় ইতালীর পরাজয় এবং খুঁজলে কালা আদমি দ্বারা গোরা লোকের পরাজয়ের আরও এক আধটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে; কিন্তু এ সব খবর আমাদের দেশের খুব কম লোকেই রাখে। তাই এ দেশের দৃঢ় ধারণা হয়ে গেছল যে, গোরার বিরুদ্ধে কালা কখনও জয়ী হতে পারে না। বুয়র যুদ্ধ থেকে আমাদের সে ধারণা উল্টে গেল।"

সেই বুয়রেরাই আজ দক্ষিণ-আফ্রিকায় কালা আদমিদের বনের পশুর মতো শিকার করে বেড়াচ্ছে। তাই সেদিন তাদের প্রতি পরাধীন দেশগুলির স্বতোৎসারিত সহানুভূতি কতটা তাদের প্রাপ্য ছিল— সে নিয়ে আজ তর্ক উঠতে পারে। কিন্তু সেদিন সে বিচার স্বভাবতই ছিল না— অন্য পরাধীন দেশের মতো ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামীরাও উৎফুল্ল হয়েছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে বুয়রদের প্রচণ্ড সংগ্রামের খবরে। এমন সময়ে নাটালের অধিবাসী, অখ্যাত এক ভারতীয় ব্যারিস্টার— মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী এগিয়ে এসে ভারতীয় রেড ক্রস বাহিনী গড়লেন ইংরেজদের সেবাশুশ্রূষার জন্যে।

ব্যাপারটা ঐ আবহাওয়ায় এতই বিসদৃশ ও অপ্রত্যাশিত ঠেকল যে, এ খবরে জ্বলে উঠলেন কৃষ্ণবর্মা। যে বৃটেন শোষণ করতে করতে ভারতবর্ষকে দাঁড় করিয়েছে প্রায় ধ্বংসের মুখে, সেই বৃটেনের বিরুদ্ধে আজ যখন একটি ছোটো জাতি উঠে দাঁড়িয়েছে তার স্বাধীনতার জন্য, তখন বৃটিশ-পদানত ও শোষিত ভারতবর্ষের কোনো আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্ন মানুষ যে বৃটিশের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারে— এ তাঁর কল্পনাতীত। 'এমন কাজ শুধু অবিবেচনা-প্রসূত নয়, সম্পূর্ণ ন্যায়ধর্মবর্জিতও',— ঘোষণা করলেন শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা।

অর্থাৎ উত্তরকালে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের অসামান্য নেতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতেই কৃষ্ণবর্মার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ রাজনীতির আসরে। বৃটিশদের খাবার টেবিল থেকে 'এঁটোকাঁটা আদায়ের' রাজনীতিতে তিনি কিছুদিন থেকেই বিশ্বাস হারিয়েছিলেন, তবে এই ঘটনায় বিচলিত হলেও এর পরেও তিনি সরাসরি পা বাড়ান নি বিপ্লবের পথে। তখনো তিনি তাঁর গুরু হার্বার্ট স্পেন্সরের 'অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুধু ন্যায্যই নয়, অবশ্যকর্তব্যও বটে; অপ্রতিরোধ পরার্থপরতা ও স্বার্থবুদ্ধি— উভয়ের পক্ষেই হানিকর'— এই বাণীতে আস্থা রেখে বৃটিশ সরকারের সংগে বড়জোর অসহযোগের কথাই ভাবছেন। জাতীয় লক্ষ্যও তাঁর তখনো পর্যন্ত স্বাধীনতা নয়, 'হোম রুল'। তাই ১৯০৫ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন 'ইণ্ডিয়ান হোম রুল সোসাইটি', *The Indian Sociologist* নামে তাঁর বিখ্যাত ইংরেজী মাসিক-পত্র আর 'ইণ্ডিয়া হাউস' নামে ভারতীয় ছাত্রদের এক বোর্ডিং হাউস। ইতিমধ্যে তিনি হার্বার্ট স্পেন্সরের নামে ছ'টি ও দয়ানন্দ সরস্বতীর নামে একটি ফেলো-

শিপ দানের ব্যবস্থা করেছিলেন যার সাহায্যে ভারতীয় ছাত্ররা ইংলণ্ডে এসে পড়াশুনো করতে পারবেন এই শর্তে যে, তারপর দেশে ফিরে তাঁরা সরকারী চাকুরি নিতে পারবেন না। আর সেই ছাত্রদের থাকার জন্যই হল 'ইণ্ডিয়া হাউসে'র ব্যবস্থা। ঐ 'ইণ্ডিয়া হাউসে'র ছাত্র হিসাবেই এর কিছুদিনের মধ্যে বিলেতে এলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকার। হরদয়াল, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রতিবাদী আচার্য, মৌলানা বরকতুল্লাহ্ ও মাধব রাও প্রমুখ বিপ্লবীগণ ক্রমে এসে জুটলেন তাঁর চারপাশে। কৃষ্ণবর্মাকেও দেখা গেল, ১৯০৫ সালের কংগ্রেসে সভাপতি কে হবেন— গোখ্লে না তিলক এই নিয়ে আলোচনা করতে। সে আলোচনা প্রসংগে তিনি এবার তীব্র শুধু নয়, কিছুটা তিক্ত সমালোচনাও করলেন গোখ্লের, তথা আবেদন আর নিবেদন-সর্বস্ব মডারেট রাজনীতির। ১৯০৬ সালে তাঁকে বরিশাল সম্মেলন ছত্রভংগ করার ও সুরেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তারের কড়া প্রতিবাদ জানাতে হল তাঁর 'হোমরুল সোসাইটি'র সভা থেকে। 'স্বাধীন ভারতের সংবিধান কী হওয়া উচিত?—এ বিষয়ে প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে তার জন্য ঘোষণা করলেন হাজার টাকা পুরস্কার। ১৯০৭ সালে সিপাহী-বিদ্রোহের অর্ধশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভারত সরকার মহাসমারোহে বিজয়োল্লাস করবে শুনে সে অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ঐ বিদ্রোহের প্রকৃত ঘটনা ও তাৎপর্য প্রচারে উদ্যোগী হলেন। এ-কাজে বিশেষ সহায়ক হলেন সাভারকর— সম্ভবত তাঁর *Indian War of Independence* গ্রন্থের সূচনা ঐসূত্রেই। ১৯০৭ সালে লাজপৎ রায় ও সর্দার অজিত সিং-এর নির্বাসনের খবরে প্যারিসে ও লণ্ডনে ভারতীয়দের যে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হল এবং এ প্রসংগে *The Indian Sociologist*-এ দেশবাসীর কাছে শ্রীমতী কামার যে জ্বলন্ত আবেদন প্রকাশিত হল— উভয়েরই সুর অত্যন্ত চড়া। ফলে 'টাইমস' থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিলিতি কাগজের পাতায় যে কুৎসার বান ডাকল তার ফলে কৃষ্ণবর্মাকে ইংলণ্ড ছেড়ে প্যারিসে এসে যোগ দিতে হল সর্দার সিং রাওজী রানা ও শ্রীমতী কামার সংগে।

তারপর বিবর্তন আরো দ্রুত লয়ে। ১৯০৮ সালে মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর ঘটনার পর সরকারী দমননীতি চলতে থাকলে এ ধরনের সশস্ত্র প্রতিঘাত যে অবশ্যম্ভাবী— এই মত সমর্থনের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর পত্রিকায় মার্কিন সাংবাদিক লেরয় স্কটের লেখা "Terrorist" প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন।

সেখানে তরুণ এক রুশ বিপ্লবী (সোশ্যাল রেভলিউশনারি) রসায়নবিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণ দিয়েছিলেন স্কট (আশ্চর্যের ব্যাপার ঐ বছরেই ১৩১৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল 'ভেরা সেজোনোভা' নামে। সে প্রবন্ধটিরও লেখক ঐ লেরয় স্কট এবং ওটিও ভেরা সেজোনোভা নামে এক তরুণী রুশ সোশ্যাল রেভলিউশনারির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ। প্রবন্ধের শেষে স্কট জানিয়েছিলেন যে, ভেরা এই সাক্ষাৎকারের অল্পকালের মধ্যেই ক্রনস্টাড সৈন্যাবাসের মধ্যে ধরা পড়েন এবং তাঁকে গুলি করে মারা হয়। প্রবন্ধটির শেষে 'প্রবাসী' সম্পাদক একটি ছোটো নোটে জানান যে, 'শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রবন্ধের বাহুল্য অংশ বাদ দিয়া ইহা সংক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন।' স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যটিও এরপর ছাপা হয় যার সূচনায় ছিল : "এই প্রবন্ধের নায়িকার স্বদেশপ্রেমে আত্মোৎসর্গের আশ্চর্য বিবরণটি আমাদের নিষ্ঠা উদ্রেকের উপযোগী বলিয়াই এটিকে আপনার নিকট পাঠাইতেছি")।

এরপর প্রকাশিত হল কৃষ্ণবর্মার *Ethics of dynamite and the British despotism in India*। অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ থেকে তাঁর বিবর্তন ঘটল অগ্নিমন্ত্রের সাধনায়।

কৃষ্ণবর্মার ঐ সময়কার একটি কাজ হল ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, কানাই-লাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও পরে মদনলাল ধিংড়া— এই পাঁচজন শহীদের পুণ্য স্মৃতিতে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য পাঁচটি বৃত্তি ঘোষণা। এরপর গণেশ দামোদর সাভারকার ও হেমচন্দ্র কানুনগোর নামে তিনি আরো দুটি বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। সাভারকার ও হেমচন্দ্র, উভয়েই ইতিমধ্যে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন তাঁদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে হেমচন্দ্র ও গণেশ সাভারকারের ছোট ভাই, বিনায়ক সাভারকারের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত যোগাযোগ ঘটেছিল বিদেশেই। বিনায়ক সাভারকারের মুক্তি ও ফ্রান্সে বসবাসের অধিকার রক্ষার আন্দোলনেরও তিনি ছিলেন অন্যতম পরিচালক।

১৯১৪ সালে যুদ্ধ লাগার কিছু আগে কৃষ্ণবর্মা প্যারিস ছেড়ে জেনিভা চলে যান। সে জন্যই তাঁর অন্য দুই সঙ্গী, রানাজী ও শ্রীমতী কামার মতো তাঁকে বন্দী অবস্থায় কাটাতে হয় নি যুদ্ধের সময়ে।

ভারত-শ্রমজীবী।

সচিত্র মাসিকপত্র।

মূল্য এক পয়সা। শ্রমেই মনুষ্যের মহত্ত্ব। মূল্য এক পয়সা।

৬ষ্ঠ খণ্ড। বরাহনগর ১২৮৭ সাল আশ্বিন। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

গ্রাহকদিগের প্রতি নিবেদন।

বর্তমান বৎসরের পাঁচ মাস অতীত হইয়া গেল, অদ্যাপি আমরা কোন গ্রাহক মহাশয়ের নিকট ১২৮৭ সালের অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত হইলাম না। তজ্জন্য আমরা গ্রাহকগণের নিকট বিনীত ভাবে নিবেদন করিতেছি, যে তাঁহারা সত্বর বর্তমান বর্ষের অগ্রিম মূল্য বরাহনগর শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। যাঁহাদের নিকট ১২৮৬ সালের মূল্য কতক বাকী বা অনাদায় রহিয়াছে তাঁহারা এক সঙ্গে দুই বৎসরের মূল্য পাঠাইবেন।



ম্যাঞ্চেষ্টার নগর।

ম্যাঞ্চেষ্টার, লণ্ডন নগরের একত্রিশ ক্রোশ দূরে ইরয়েল নদীর তীরে অবস্থিত। ঐ নদী দিয়া লিবারপুল এবং অন্যান্য স্থান হইতে জলপথে মাল আমদানী করার বিলক্ষণ সুবিধা। এই নগর তুলার ব্যবসায়ের জন্য অত্যন্ত বিখ্যাত। ম্যাঞ্চেষ্টারের পূর্বধারে নদী। ঐ নদীর পশ্চিম তীরে স্যালফোর্ড নামক পল্লী নির্মিত হইয়াছে। এবং নদীর উপর ছয়টী সাঁকো প্রস্তুত করিয়া পূর্ব ও পশ্চিম উভয়দিকের লোকের যাতায়াতের সুবিধা করা হইয়াছে। ঐ নগরটী সর্বপ্রকারে অতিশয় উন্নতিলাভ করিয়াছে। ঐ নগরে অনেকগুলি বড় বড় [illegible], কাটিবার দোকান, বিদ্যালয়, নানাপ্রকার কল এবং বহুবিধ

'ভারত-শ্রমজীবী'—১৮৭৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত ভারতবর্ষের প্রথম শ্রমজীবী-সম্পর্কিত পত্রিকার একটি পৃষ্ঠা।

দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ১২।

(অধ্যাপক শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে)

সোণার বাঙ্গলা।

বাঙ্গালি! কুমিল্লার হাঙ্গামায় নিজের বাহুবলের পরিচয় পাইলে; এক্ষণে আর ভীত হইওনা নিজের বাহুর শক্তি বৃদ্ধি কর। জানিও যেবাহু কুমিল্লায় তোমার ধন, প্রাণ, মান রক্ষা করিয়াছে, সেই বাহুবলই তোমায় স্বরাজ্য দিবে। যে বাহুতে বন্দুক ধরিয়া তুমি আত্মরক্ষা করিয়াছ, সেই বন্দুক সংযুক্ত বাহুই তোমারে স্বাধীনতা প্রদান করিবে।

বাঙ্গালি! কেন ভয় পাও, কিসের ভয়? প্রত্যেক স্থানে দলবদ্ধ হও, গুপ্ত সভা করিয়া নিজদের ও দেশকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত কর। যে, যেপ্রকারে পার অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখ। প্রত্যেকেই ব্যায়াম দ্বারা শরীরকে সমরের উপযোগী কর।

বাঙ্গালি! বন্দুক নাই বলিয়া ভয় পাও কেন? পৃথিবীর যেসব দেশ সংগ্রাম করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; তাহারাও প্রথমে নিরস্ত্র ছিল; কুঠার, বর্শা, তরবারীই তাহাদের বিদ্রোহের প্রথম উপকরণ ছিল। পরে শত্রুর হস্তের অস্ত্র নানা প্রকারে কাড়িয়া লইয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়াছিল। তোমার দেশে অনেক অস্ত্র আছে, তাহা লইয়াই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।

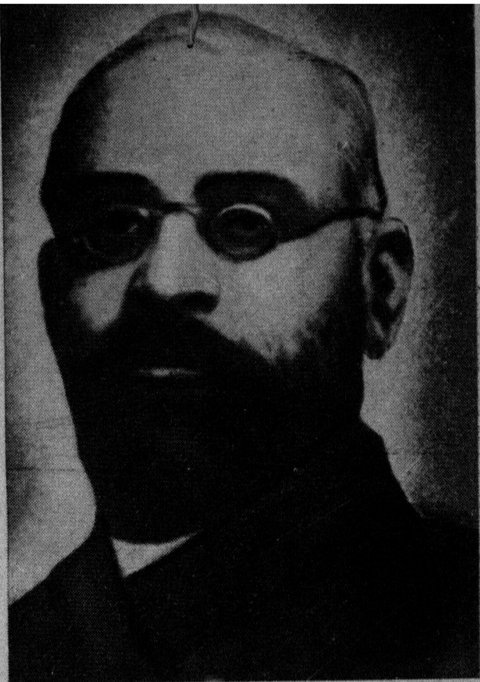
বাঙ্গালি! নিরুপায় বলিয়া হতাশ হইওনা রুশের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখ তাহারা কিরূপ বিপ্লব চালাইতেছে। তোমাকেও প্রথমে তদ্রূপ করিতে হইবে। জানিও সাহসই মুক্তির সাধন। অর্থের জন্য কাতর হইওনা; অনুসন্ধান করিলেই অর্থ মিলিবে।

বাঙ্গালি! জানিও দুইবার তুমি স্বাধীনতা লাভের সুযোগ হারাইয়াছ; এক্ষণে বারবার তিনবার। এ সুযোগ হারাইলে আর কখন সুবিধা পাইবে না, জানিও এইবার জীবন মরণ খেলা, এইবার শেষ পরীক্ষা।

বাঙ্গালি! মনে রাখিও তুমি "বয়কট" গ্রহণ করিয়া ইংরাজের সহিত বিরোধ বাধাইয়াছ, এক্ষণে আর হটিলে চলিবে না। এক্ষণে বল "হয় স্বাধীনতা লাভ, নয় রণক্ষেত্রে মৃত্যু।"

বাঙ্গালি! স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হও, উঠ জাগ, প্রাণ দিয়া জন্মভূমির বন্ধন মোচন কর।

'সোনার বাঙ্লা' ইস্তাহার—১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে টাউন হলের প্রতিবাদ-সভায় বিতরিত বিপ্লবীদের বেআইনী ইস্তাহার। এর চতুর্থ অনুচ্ছেদে ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের



(উপরে) শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা।
দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ২৮-৩৭
('অজয়-ভবন' সংরক্ষণশালার সৌজন্যে)



(নিচে) ভিকাজী রোস্তম কামা
দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ৪৮-৬০
('অজয়-ভবন' সংরক্ষণশালার সৌজন্যে)

(উপরে) বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চিঠির জবাবে লেখা এই চিঠিতে ক্রুপস্কায়া জানিয়েছেন যে লেনিনের সঙ্গে কোন ভারতীয় বিপ্লবীর সাক্ষাৎ সম্পর্কে তাঁর কোন কথা এখন আর মনে নেই। দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ২৯৬। ('Link' পত্রিকার সৌজন্যে)

(নিচে) লেনিনের কাছে প্রথম ভারতীয় বিপ্লবী মহম্মদ হাদি ('খৈরী ভাই'দের একজন)। দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ৮৪-৮৯। ('Link' পত্রিকার সৌজন্যে)।

THE

INDIAN SOCIOLOGIST

AN ORGAN OF FREEDOM, AND OF POLITICAL, SOCIAL, AND RELIGIOUS REFORM.

"EVERY MAN IS FREE TO DO THAT WHICH HE WILLS, PROVIDED HE INFRINGES NOT THE EQUAL FREEDOM OF ANY OTHER MAN."—HERBERT SPENCER, *Principles of Ethics*, Section 272.

"RESISTANCE TO AGGRESSION IS NOT SIMPLY JUSTIFIABLE BUT IMPERATIVE. NON-RESISTANCE HURTS BOTH ALTRUISM AND EGOISM."—*The Study of Sociology*, Chap. 8.

Edited by SHYAMAJI KRISHNAVARMA, M.A. (Oxon.).

VOL. IV.—No. 9.] LONDON, SEPTEMBER, 1908. ONE PENNY, MONTHLY.

SUBSCRIPTION—Single Copy 1½d., 12 Months 1s. 6d. Post free, to all parts of the world.

NOTICE.

CHANGE OF ADDRESS.

In future all Literary Communications, Orders for the INDIAN SOCIOLOGIST, and Money Postal Orders, or Cheques, should be sent to SHYAMAJI KRISHNAVARMA, 10, Avenue Ingres, Passy, Paris, France.

The charge for letters to France from India, England, and other foreign countries, is 2½d. per ounce. The charge for a Post Card is 1d.

THE ETHICS OF DYNAMITE AND BRITISH DESPOTISM IN INDIA.

SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR—LIKE CURES LIKE

The latest phase of "The Unrest in India" demands on moral and political grounds the earnest consideration of everyone interested in the regeneration of that country; we therefore propose to discuss in this article the bearings of the so-called anarchy and anarchists on the present alien despotism there with special reference to the ethics of dynamite, as promised in our last issue.

The presence of the English in India can be viewed from only three standpoints, viz.:—

(1) They are there for the benefit of the Indian people.

(2) They are indifferent whether good or evil results from their presence.

(3) They are there merely for serving their own selfish ends by the means of an organised robbery on a vast scale and with the help of a military force necessarily against the wills of the natives of India.

WHY ENGLAND HOLDS INDIA?—ENGLISH AND FRENCH OPINION.

Every one acquainted with the history of India knows that the English did not go there as philanthropists, but that, on the contrary, they went there with mercenary motives. The enormity of their high-crimes and misdeeds in past times can be well imagined when even the directors of the East India Company admitted that "the vast fortunes acquired in the inland trade have been obtained by a scene of the most tyrannical and oppressive conduct that was ever known in any age or country." A high-minded French *savant*, Monsieur J. Techeuer, in his remarkable book entitled "Des Sentiments de Justice *accusateurs de l'Angleterre s'accumuleront en si grand nombre, que leur masse imposante pourra prendre le nom de Pyramide de l'iniquite anglaise*."

(For him who wants to go deeper into the subject, the facts which implicate England will accumulate in such large numbers that the enormous mass might be fitly called "The Pyramid of English Iniquities.") He admirably points out that John Spencer addressed the Great Mogul in 1759 in the name of the English, an humble supplication in which we find a statement to the effect that "We have no other project in this part of the world but that of trade, and we have no intention of invading and governing towns and countries." This was the starting-point of the English Power in India, the first step gained by the great mercenary nation on the territory of the old Mogul Empire having ended in crushing under its heels the very Empire whose protection it had so meekly solicited and obtained, much against the sound advice of the Nawab of Bengal, who in 1756 left instructions to his successor in the following memorable words:—

"The hearts of the English are given up to the love of gold and lust of power, and their actions have shown to all the East, how little they heed the precepts they have received from God. Their politics, their power are in opposition to their faith. Once again I tell you, Oh my son, crush the English. If you allow them to have in your land factories and soldiers, the country you rule will soon be theirs."

The reason why England holds India at the present time is not that India should be benefited, but that "*India must be bled*," as the late Prime Minister, Lord Salisbury remarked, for the enrichment and glorification of England, while the late *Liberal* Secretary of State for India, Lord Kimberley, publicly declared "There is one point upon which I imagine, whatever may be our party politics in this country, we are all united, that we are resolutely determined to maintain our supremacy over our Indian Empire . . . Let us firmly and calmly maintain our position in that country; let us be thoroughly armed as to our frontier defences, and then I believe we may trust to the old vigour of the people of this country, come what may, to support our supremacy in that great Empire." From the late Viceroy, Lord Curzon, who holds that "the rule of India, being a British rule, and any other rule being in the circumstances of the case impossible, the tone and standard should be set by those who have created and are

'ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট'—শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকার একটি পৃষ্ঠা। 'Ethics of Dynamite' প্রবন্ধের সূচনা এটিতে দেখা যাচ্ছে। দ্রষ্টব্য॥ পৃঃ ৩০ ও ৩২।

('অজয়-ভবন' সংরক্ষণশালার সৌজন্যে)

"The Times" May 23rd '08

SEDITIOUS INDIAN PROPAGANDA IN LONDON.

Three years ago this summer Mr Shyamaji Krishnavarma, M A, of Oxford, inaugurated the "India House" at Highgate as a hostel for Indian students in London, the inmates being lodged and boarded at very moderate fees. There can be no question that the real object of the enterprise has been to promote the bitter anti-British feeling and the revolutionary views set forth in the *Indian Sociologist*, a penny monthly started by Mr Krishnavarma in January, 1905, and the teachings of which were indicated in a question addressed to the Secretary of State for India by Mr. Rees last July. Lord Morley was asked whether his attention had been called to Mr. Krishnavarma's paper —

In which it is said in an editorial article that, if man is to be dubbed an ardent native rebel simply because he advises his countrymen to shake off an oppressive foreign yoke, we confess we are proud to be called such, and in which it is further said that there is a school of Indian patriots whose ideal is, not only to have independence in government in India by ousting the English from that country, but also to recover untold millions of money of which the Indian people have been unjustly deprived, which ideal involves the occupation of England by India till such claims are satisfied, and whether, since the editor claims that he is a British subject, the Government will consider the propriety of moving the Public Prosecutor to proceed against this person in view to his ultimate expulsion as an undesirable alien, who endeavours to debauch the loyal subjects of his Majesty."

The Secretary of State did not accept this suggestion, but Mr. Krishnavarma deemed it prudent to leave England and settle in Paris, whence he edits the *Indian Sociologist*, which is still published in this country. The only action taken by the Indian authorities [has] been to prohibit its circulation in the dependency, a prohibition which can be and, no doubt, is evaded. Meanwhile the propaganda against the maintenance of British rule in any form still goes on at "India House." Its revolutionary spirit may be judged from the terms of a red-ink circular distributed to many Indian students in this country at the beginning of the month inviting them to a meeting held at the hostel on the 51st anniversary of the commencement of the Mutiny by the revolt of the sepoy regiments at Meerut—an anniversary falling this year on the same day of the week—a Sunday. The gathering was secret, Europeans being carefully excluded, [an]d Indians present are reticent as to what took place. The circular invitations, headed "Bande Mataram," are in the following terms:—

"To Commemorate
the Anniversary of the
INDIAN NATIONAL RISING
of 1857
A MEETING OF INDIANS
IN ENGLAND
will be held at
INDIA HOUSE,
65, Cromwell-avenue, Highgate, N.,
on Sunday, the 10th of May, 1908,
At 4 p.m. precisely
You and all your Indian friends are cordially invited to be present."

The "programme" printed on the opposite page shows that a purpose of the meeting was to hold up to admiration as "martyrs" the principal leaders of the rebellion, including the infamous Nana Sahib, who was responsible for the breach of faith with the Cawnpore garrison and the wholesale massacre of English women and children. The programme commences and ends with "national songs," and the other items are:—

National prayer. Tributes to the sacred memory of Emperor Bahadur Shah, Shrimant Nana Saheb, Rani Lakshmibai, Maulvi Ahmad Shah, Raja Kuvar Singh and other martyrs. Declarations of self-denial. President's speech. Distribution of Prashad."

It is an evidence of the activity of the anti-British propaganda among Indian sojourners here that close upon 100 Indian students attended, some of them having travelled from Oxford, Cambridge, and even Edinburgh to be present. The chair was occupied by a young man from Western India of good connexions, who alleges that he is the rightful heir to a chieftainship for which the Government has chosen another claimant. The meeting lasted four hours, and much stress was laid upon the penalty alleged to be inflicted on India by alien rule.

"The Times", June 2, '08.

INDIAN PROPAGANDA

TO THE EDITOR OF THE TIMES.

Sir,—A cutting from *The Times* of May 23 has been sent to me from London with the heading "Seditious Indian Propaganda in London," which is an all round attack on myself, my paper, the *Indian Sociologist*, and my "India House." You say:—"There can be no question that the real object of the enterprise has been to promote the bitter anti-British feeling and the revolutionary views set forth in the *Indian Sociologist*." It is a libel to charge me with the promotion of the anti-British feeling, if the word "anti-British" is taken in the sense that I detest or dislike all Englishmen. I have drawn my inspiration of political freedom from the teachings of several great and good Englishmen who have been the ornaments of your race. That I am not anti-British in this particular sense of the word is best proved by the facts that I showed my appreciation of genuine British worth some years ago in my own humble way by founding a lectureship in memory of Mr Herbert Spencer in the University of Oxford (the last four lecturers under the foundation being Mr. Frederic Harrison, the late Hon. Auberon Herbert, Dr. Francis Galton, and Mr Benjamin Kidd—all Englishmen of note), by associating the name of the well-known Irishman, Edmund Burke, with another lectureship, by instituting an Indian travelling fellowship in honour of Dr. Richard Congreve; and by requesting Mr. H. M. Hyndman to open "India House" at Highgate—all of them belonging to different schools of thought.

You gave your readers to understand that, in consequence of a question addressed to the Secretary of State for India by Mr. Rees, M.P., last July, I "deemed it prudent to leave England and settle in Paris." The truth is that, for reasons which I have explained elsewhere, I left London and settled here fully seven weeks before the question appeared in the newspapers and in the Parliamentary proceedings of July 30, 1907.

As to the commemoration of the anniversary of the Indian national rising of 1857 at "India House" in London, on Sunday, May 10, which is particularly hateful to you, I need only remark that my numerous countrymen, both ladies and gentlemen, assembled on that occasion, representing, as they did, all races and religions of India, were fully justified in holding up to admiration as martyrs the principal Hindu and Mahomedan leaders of that national rising which was "the legitimate effort of a nation to shake off an oppressive foreign yoke," to give the words of Dr Richard Congreve, who, "believing the cause of the English in India to be unjust, that of the Hindus just," and "believing consequently the English success to be the triumph of force over right," publicly protested, "in the name of humanity," against the Thanksgiving of May 1, 1859, which he regarded as "an outrage on all the higher feelings of mankind," and who published that protest as a placard throughout London.

In conclusion I hope that you will extend to me the same courtesy as you usually show to your correspondents by publishing this letter in fairness to me.

Yours faithfully,

SHYAMAJI KRISHNAVARMA, Editor of the *Indian Sociologist*.

10 Avenue Ingres, Passy, Paris, May 28.

শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার বিরুদ্ধে বিলাতে প্রচার ও কৃষ্ণবর্মার জবাব। দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ৩১।
('অজয়-ভবন' সংরক্ষণশালার সৌজন্যে)

Single Copy Six pence
Annual Subscription Five shillings
Strictly in advance

THE TALVAR

Ghazion men bu rahegi jab talak iman ki
Tab to London tak chalegi tegh Hindusthan ki
EMPEROR BAHADUR SHAH

AN ORGAN OF INDIAN INDEPENDENCE

Vol I | BERLIN, 10th March 1910 | No 5

AN APPEAL. As the enemy has prohibited the circulation of this paper in Hindusthan every reader is earnestly requested to help in its circulation as much as he possibly can. All remittances and communications to be sent to Madame B. R. CAMA, Poste Restante, Bureau de Poste, Rue Montaigne, PARIS, who has kindly consented to receive orders and payments on our behalf.

FALSE ECONOMY.

The Cry for Economy

When events that are destined to upset the existing order of things march crowding upon each other in the twinkling of an eye and empires that took centuries for their making are rushing headlong to their doom, when the history of an age is made and unmade in a day and births momentous are ushered into the world at the sight of which the earth quakes and the heavens are disturbed, it is a sad thing to find that there should be some even in the Nationalist camp, who cry piteously that we are throwing away the lives of so many of our glorious martyrs with no adequate return of advantage to the Nation's cause, and that therefore we should not waste our strength in unproductive martyrdom but try to economise our resources by securing the highest value for our every sacrifice. Such men seem to think that they can higgle with Providence as they can do in a village market and get the price of the liberty of the nation reduced. They think as if the course of History can be diverted for their sakes [illegible]

The New Spirit and Its Demands

But these men [illegible] to the all important truth that historical events do not happen at random but in strict obedience to the laws of the universe [illegible] as well as of the internal nature of man. That is the reason why the Revolutionary movement that is marching on with the stride of a giant has staggered them although they were among the first apostles of the New Faith and had done much consciously or unconsciously to bring [illegible] its existence. They wanted to preach the Gospel but now wish to avoid the crown of thorns. They wanted for their nation the glory of a resurrection but want to escape the indispensable precondition of crucifixion. But [illegible] the wheel was set in motion by laws in the working of which they were but unconscious instruments the chariot has begun to roll forth and neither their trembings nor their vanity can change the appointed course by so much as an inch. The Spirit, the Kali they so [illegible]

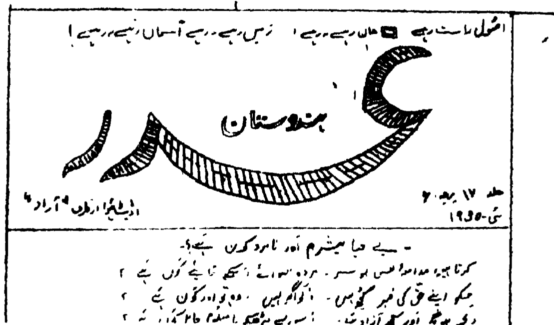
his bowels are torn off! No reduction of price, no cheap [illegible]

The Futility of Calculation — the Mightiness of Sacrifice

In fact what is the true economy in such cases as the almost world-wide struggle for the liberation of Hindusthan [illegible] saving of lives or sacrifice? If on economic [illegible] are urged for the fear and vanity [illegible] in them on account of their being centred in our petty selves. Hence we [illegible] realise that [illegible] nation's [illegible] only through the working of the Divine Law in the hands of which our individual selves are but instruments, the cry for economy [illegible] for the line of least resistance will appear to be nothing short of [illegible]. Economy in what? In the expenditure of the energies of the individual or of the nation as a [illegible]? If you are satisfied with economy in the former then alone [illegible] you weigh the worth of each individual and the suffering it entails upon that individual and try to balance the one with the other in each case. In the days of Congress politics it was very well to settle individual accounts for you could see both the ends meet [illegible] balance drawn—so many speeches on the platform, and so much profit in the end by attracting customers and clients by the building up of a splendid practice in the law courts, [illegible]

'বন্দেমাতরম্' শ্রীমতী কামা কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশ একটি পত্র। [illegible]

('অভয় ভবন সংরক্ষণশালার সৌজন্যে')


ہندوستان غدر

A FEW FACTS ABOUT

BRITISH RULE IN INDIA

The following facts concerning the effect of British rule in India are all taken from the writings of British officials or parties loyal to the British Government:

"I do not hesitate to say that half our agricultural population never know from year's end to year's end what it is to have their hunger fully satisfied."—(SIR C. A. ELLIOTT, One Time Lieutenant Governor of Bengal.)

In 1880. "There remain 40,000,000 of people who go through life on insufficient food." SIR W. W. HUNTER.

In 1893 the PIONEER sums up Mr. Grierson's facts regarding the various sections of the population in Gaya. "Briefly, it is that all the persons of the labouring classes, and 10 per cent of the cultivating and artisan classes, or 45 per cent of the total population, are insufficiently clothed, or insufficiently fed, or both. In Gaya district this would give about a million persons without sufficient means of support. If we assume that the circumstances of Gaya are not exceptional and there is no reason for thinking otherwise it follows that nearly 100,000,000 of people in British India are living in extreme poverty."

In 1901 "The poverty and suffering of the people are such as to defy description. In fact, for nearly fifteen years there has been A CONTINUOUS FAMINE IN INDIA owing to high prices."

[illegible] William Hunter's remarks were made the population [illegible] increased [illegible] is alleged to have

---

There is no truth in the assertion made by British newspapers that India is loyal to the British or sympathizes with their cause. India is from one end to another Dis-Affected. The country is seething with anti-British revolutionary ferment.

Why does India hate the British? The answer follows.

—EDITOR HINDUSTAN GADAR

JUNE, 1915.

(উপরে) আমেরিকায় 'গদর' দলের পত্রিকার একটি পৃষ্ঠা।
(নিচে) 'হিন্দুস্থান গদর' কর্তৃক প্রকাশিত একটি পুস্তিকার প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা
('অজয়-ভবন' সংরক্ষণশালার সৌজন্যে)

কৃষ্ণবর্মার শেষ জীবন কাটে সুইজারল্যাণ্ডে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁর মতবিরোধ ঘটতে থাকে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ তরুণ সহকর্মীদের সঙ্গেই শুধু নয়—এমন-কি, শ্রীমতী কামা ও রানাজীর মতো প্রবীণ বিপ্লবীদের সঙ্গেও। ফলে রাজনৈতিক দিক থেকে তিনি শেষ জীবনে আর সক্রিয় ছিলেন না তেমন। কয়েক বছর অনিয়মিতভাবে বেরোবার পর *Indian Sociologist*-এর প্রকাশনাও একেবারেই বন্ধ হয়ে যায় ১৯২৩ সাল থেকে।

তবে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণবর্মার কিছুটা যোগাযোগ হয় 'বার্লিন কমিটি'র ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে। হরদয়াল, মহেন্দ্রপ্রতাপ, সম্ভবত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তও তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ঐ সময়ে। যে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিরোধ সব থেকে বেশি হয়েছিল, তিনিই তখন এক চিঠিতে তাঁর তিক্ত সমালোচনার জন্য কৃষ্ণবর্মার কাছে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেন এবং নিজ হাতে তুলে নেন বিরোধের কাঁটা।

ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা' পড়ে মনে হয় যুদ্ধের পরের বছরগুলিতে কৃষ্ণবর্মা রাজনৈতিক দিক থেকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করলেও নজর রাখছিলেন ইয়োরোপ, তথা সারা দুনিয়ার নতুন শক্তি-সাম্যের উপরে। আর কিছুটা হয়তো অনুধাবনের চেষ্টাও করছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যুদয়, 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক'-এর প্রতিষ্ঠা ও পরে তাঁরই সহকর্মী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ব্রাসেলসে 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতা সমর্থক সংঘ' (League against Imperialism and for National Independence) স্থাপনের মতো ঘটনার তাৎপর্য।

১৯২৬ সালে জওহরলাল নেহরু ঐ সুইজারল্যাণ্ডেই দেখা পান কৃষ্ণবর্মার। তিনি লিখেছেন :

"শ্যামাজী ও তাঁর স্ত্রী নিঃসন্তান, নিরাত্মীয়, নির্বান্ধব অবস্থায়, কোনো সংযোগ, প্রায় কোনো মানুষের সংস্পর্শ ছাড়াই তাঁদের নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে চলেছিলেন। তিনি তখন অতীতের এক প্রতীক— সত্যই তাঁর কাল ফুরিয়ে যাবার পরেও তাঁর সেই জীবন। বর্তমান কালের সঙ্গে তাঁর বনিবনা মাত্র ছিল না— তাঁকে উপেক্ষা করেই তখন দুনিয়া চলেছিল এগিয়ে। তবু তাঁর চোখে তখনো ছিল পুরানো কালের কিছুটা দীপ্তি আর তাঁর সঙ্গে

আমার মিল সামান্যই থাকলেও তাঁর প্রতি সহানুভূতি ও বিবেচনা না দেখিয়ে আমি পারি নি।" — *An Autobiography*, Bodley Head, পৃ. ১৪৯-১৫০।

বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্ত যখন জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে ফ্র্যাঙ্কফুর্টে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন, তখন তিনিও কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে দেখা করেন সুইজারল্যাণ্ডে। সম্মেলন থেকে ফেরার পথে ১৯৩০ সালে তিনি আবার যখন দেখা করতে আসেন, কৃষ্ণবর্মা তখন মৃত্যুশয্যায়। ১৯৩০ সালের ৩১ মার্চ শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার মৃত্যুকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ইন্দুলাল যাজ্ঞিক-লিখিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার জীবনী *Life and Time of an Indian Revolutionary* বই থেকে জানা যায় যে, কৃষ্ণবর্মার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীরা বিচারকক্ষেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। কৃষ্ণবর্মা সম্পর্কে অধিকাংশ তথ্য সেই বই ও ডাঃ অবিনাশ ভট্টাচার্যের 'ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা' থেকে নেওয়া।

আরো দুটি খবর উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণবর্মা প্রসঙ্গে। প্রথমটি এই যে, ১৯১২ সালের ২০ অক্টোবর কৃষ্ণবর্মাকে এই চিঠি লেখেন স্বয়ং ম্যাক্সিম গর্কি:

"*Indian Sociologist* পাঠানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং সর্বান্তঃকরণে আপনার হাতে হাত মেলাই, সমগ্র মানবতাকে যে দেশ মানবাত্মার গভীরতম অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান দিয়েছে সেই সুমহান ভারতবর্ষের ও ভারতীয় জনসাধারণের মুক্তির সাধনায় আপনার যে হাত অক্লান্তভাবে সক্রিয়।

"আপনাকে কি আমি অনুরোধ করতে পারি *Review* পত্রিকার জন্য এমন একটি প্রবন্ধ লিখতে যে প্রবন্ধ রাশিয়ার গণমানসকে কিছুটা ধারণা দেবে মুক্তি ও ন্যায়ধর্মের জন্য ভারতীয় আন্দোলনের ?

"আমরা পেতে চাই ঐতিহাসিক চরিত্রের এক প্রবন্ধ যাতে থাকবে মুক্তির সন্ধানে ভারতীয়রা যে সংগ্রাম চালাচ্ছেন তার সম্পর্কে সমুজ্জ্বল সব তথ্য। যদি সম্ভব হয় তবে জানুয়ারি সংখ্যার জন্য ৬০,০০০ বা ৮০,০০০ অক্ষরের একটি রচনা হলে ভালো হয়। অনুবাদ করবেন ইংরেজী ভাষায় সুদক্ষ এক ব্যক্তি।

"আমার অনুরোধ রাখতে পারলে আমি বিশেষ আনন্দিত হব ও কৃতজ্ঞ থাকব। এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির পরিচয় আমাদের ঘটাতেই হবে, যাঁরা ন্যায় বিচারের জন্য সতৃষ্ণ, যাঁরা মননশীলতা অনুযায়ী জীবনযাপনে ইচ্ছুক— তাঁদের সবাইকেই উপলব্ধি করতে হবে তাঁদের ঐক্য, তাঁদের লক্ষ্যের, তাঁদের আত্মার ঐক্য। ঐক্যবদ্ধভাবে অপরাজেয় শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তাঁরা পরাস্ত করবেন দুনিয়ার সমস্ত অশুভ শক্তিকে।

"আপনি কৃষ্ণবর্মা, ভারতের মাৎসিনি, আপনি জানেন আপনার সুমহান দেশবাসীর অন্তরের কামনা আর আপনি বুঝবেন সমকালীন ভারতবর্ষের জীবনের কোন্ খবর রুশ জাতিকে জানতেই হবে।

"আপনার পত্রের প্রতীক্ষায় রইলাম, কামনা করি আপনার চমৎকার স্বাস্থ্যের।

কাপ্রি, ভিলা সেরাফিনা,

২০-১০-১৯১২ এম. গর্কি"

—*Shyamaji Krishnavarma : Life and Time of an Indian Revolutionary*, পৃ. ৩৩৫।

গর্কির চিঠির জবাবে কৃষ্ণবর্মা যে চিঠি লেখেন তার পুরো বয়ান জানা নেই। তবে 'সোভিয়েতস মীক্ষা' পত্রিকার গর্কি জন্মশতবর্ষপূর্তি সংখ্যায় (বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৬, ৬ এপ্রিল ১৯৬৮, পৃ. ৪৭-৫৪) প্রকাশিত পিয়তর বারান্নিকোভের (বিখ্যাত সোভিয়েত ভারততাত্ত্বিক, আলেক্সাই বারান্নিকোভের পুত্র) একটি প্রবন্ধ "ম্যাক্সিম গর্কি ও ভারত" পড়ে জানা যায় যে, গর্কির চিঠির জবাবে কৃষ্ণবর্মা ১৯১২ সালের ২৮ অক্টোবর গর্কিকে লেখেন :

"এ-কথা জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, ইউরোপে এমন মানুষও রয়েছেন যাঁরা রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে আন্তরিকভাবেই ভালোবাসেন এবং শুধু নিজেদের স্বাধীনতাই নয়, বিশ্বের সমস্ত নিপীড়িত জাতির স্বাধীনতাই যাঁদের একান্ত কাম্য।"

কৃষ্ণবর্মা গর্কিকে এও জানান যে, কর্মব্যস্ততার জন্যই তিনি রুশ পত্রিকায় লেখা পাঠাতে পারছেন না। তবে তিনি গর্কিকে তাঁর *Indian Sociologist* পত্রিকার কপি পাঠান ও তার সঙ্গে এক চিঠিতে জানান :

"আপনি এই পত্রিকায় তথ্যের ভিত্তিতে নিজের মতো করে একটা প্রবন্ধ

রচনা করে নিতে পারেন আর তাতে আমার মতামত যেখানে ব্যক্ত হবে সেখানে আমার নামও উল্লেখ করতে পারেন।"

বারান্নিকোভ ঐ প্রবন্ধে এ-খবরও জানান যে, ১৯১২ সালে সেন্ট পিটার্স-বুর্গের 'সোভ্রেমেন্নিক' ('সমকালীন') পত্রিকায় গর্কির "বিদেশী জীবনের কাহিনী" নামে যে লেখাটি প্রকাশিত হয় তার রচনা কৃষ্ণবর্মার প্রেরিত ঐ-সব তথ্যের ভিত্তিতেই।

বড়লাটের সফর নাকি ভারতবাসীর মনে আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করেছে— ভারত সরকারের এই দাবির অসারতা দেখানোর জন্য গর্কি ঐ প্রসঙ্গে সেখানে লিখলেন : "বড়লাট যাওয়ার দু'ঘণ্টা আগে কোনো লোক কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতিপত্র ছাড়া ঘরের বাইরে বেরোতে পারবে না"— এই ছিল সরকারী নির্দেশ। গর্কি লিখলেন : "এই শাসনের স্বরূপ স্পষ্ট পরিস্ফুট হচ্ছে সরকার কর্তৃক জাতীয় নেতা সাভারকারের নিগ্রহে। সকলেই জানেন যে, গোপনে তাঁর বিচার সম্পন্ন হয়েছে—সে বিচারের সংবাদ পর্যন্ত ছাপানো নিষিদ্ধ। তাঁকে মোট ৪৮ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে— অর্থাৎ ১৯৬০ সাল পর্যন্ত চলবে তাঁর কারাবাস। বছরে একবার মাত্র তাঁকে চিঠি লিখতে দেওয়া হবে তাঁর স্ত্রীর কাছে।"

পঞ্চম জর্জের অভিষেক উৎসবে বরোদার গায়কোয়াড় কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের মনোভাব প্রকাশ করেন। তার ফলে বিলেতের রক্ষণশীল কাগজগুলি তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে থাকে নানারকম। প্রসঙ্গত গর্কি লিখলেন :

"*Daily Express* লিখছে : বরোদা রাজ্যকে দীর্ঘকাল ধরে ভারত সরকার সন্দেহ করে আসছে বিদ্রোহের আশ্রয়স্থল হিসেবে। স্বয়ং গায়কোয়াড় তাঁর ঘনঘন ইয়োরোপ সফরের সময় নাকি প্রায়ই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন বিপ্লবী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে। *Daily Telegraph* দাবি করেছে তাঁর অপসারণের। সন্ত্রস্ত গায়কোয়াড় শেষ পর্যন্ত *Times* পত্রিকায় টেলিগ্রাম করে জানাতে বাধ্য হয়েছেন যে, ১৯০৭ সালে কৃষ্ণবর্মা ইংলণ্ড ছেড়ে চলে যাবার পর 'আমার আর দেখা হয় নি তাঁর সঙ্গে'।"

গর্কি এ-ঘটনার উপরে মন্তব্য লিখলেন : "এই হল ভারতবাসী ও ইংরেজদের পরস্পরের "রাজনৈতিক" সম্পর্ক।"

দ্বিতীয় খবর এই যে, প্যারিসে থাকার সময়ে কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে পরিচয় হয়

এম. পাভলোভিচ নামে জনৈক মার্কসবাদী প্রাচ্যতত্ত্ববিদের। ইনি রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির সদস্য ছিলেন এবং ১৯০৯ থেকে ১৯১৭ সালের আগস্ট পর্যন্ত প্যারিসে ছিলেন রাজনৈতিক নির্বাসনে। বিপ্লবের পর পাভলোভিচ সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাচ্যতত্ত্ব-চর্চা বিশেষ করে আধুনিক ভারত সম্পর্কে গবেষণা এবং ঐ বিষয়ে পত্রিকা পরিচালনাও করেছিলেন।

পাভলোভিচ—ভি. গুর্নোক্রিয়াজিন ও এস. ভেল্টমানের সহযোগে ১৯২৫ সালে রুশ ভাষায় একটি বই প্রকাশ করেন 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবর্ষ" নামে। তার একটি অধ্যায় 'কয়েকটি বিপ্লবীর ছবি' সম্প্রতি রুশ ভাষা থেকে বাংলায় তর্জমা করেছেন শ্রীমতী কনক বড়াল। তার থেকে কৃষ্ণবর্মা সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য এখানে প্রকাশ করা হল :

..."সশস্ত্র আক্রমণের সমর্থকেরা ছিলেন চরমপন্থী। তাঁদের দাবি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা— পুরোদস্তুর স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এই চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত সংবাদপত্র-সম্পাদক ও লেখক, শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা। 'ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট' নামে তিনি একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। 'স্বভাবতই এ-পত্রিকার প্রচার নিষিদ্ধ হয় ভারতবর্ষে'। ...কৃষ্ণবর্মার বিরাট ও মহান ব্যক্তিত্ব আমাকে বিশেষ ভাবেই আকৃষ্ট করে। তিনি ছিলেন দীর্ঘকায় ও রাশভারী। তাঁর মুখশ্রী সুন্দর ও চোখ দুটি বুদ্ধিদীপ্ত। আচার-ব্যবহারও অতিশয় সম্ভ্রান্ত ধরনের।...কৃষ্ণবর্মা বলতেন, 'যেদিন ভারতের মাটিতে একজন ইংরেজ রাজপুরুষকেও দেখা যাবে না, যখন ভারতবর্ষে ইংরেজী সরকারের পুলিস, সৈন্য প্রভৃতিরা আর থাকবে না— এক কথায় ভারতবর্ষ যেদিন আপন দাসত্ব বর্জন করে তাদের মুখোমুখি দাঁড়াবে, তখনই ঘটবে ভারতভূমিতে ইংরেজ শাসনের অবসান!' ...বৃটিশ বুর্জোয়ারা তাদের কাগজে ভারতীয় বিপ্লবীদের কাজকর্ম সম্পর্কে যা লেখে ব্যাপারটা আদৌ সে-রকম নয়— এই ছিল কৃষ্ণবর্মার মত। তাঁর মতে ভারতবর্ষে কোনো নৈরাজ্যবাদী মতের অস্তিত্ব নেই, এমন-কি, ভারতীয়দের কাছে ঐ কথাটার অর্থই পরিষ্কার নয়। ভারতীয় বিপ্লবীরা স্বাধিকার ও ভারত থেকে ইংরেজ বিতাড়নের কথাই বলেন।"

প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী : ফ্রান্সে

দ্বিতীয় যে ভারতীয় বিপ্লবী প্রবাসে তাঁর কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন তিনি হলেন সর্দার সিংজী রাওজী রানা। তাঁর জন্ম ১৮৭০ সালে, সৌরাষ্ট্রের লিম্বডি নামের প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যে। অর্থাৎ শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার মতো ইনিও গুজরাতি। ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য তিনি কৃষ্ণবর্মার এক বছর পরে ১৮৯৮ সালে ইংলণ্ড যান। সেখানে অনতিবিলম্বে যোগাযোগ হয় কৃষ্ণবর্মার সংগে। ব্যারিস্টারি পাস করলেও তিনি দেশে ফিরে ব্যারিস্টারি করেন নি। জনৈক ভারতীয় মুক্তা-ব্যবসায়ীর অনুরোধে ব্যবসায়ে নামেন মুক্তা ও জহরতের। আবার অন্য দিকে চলতে থাকল রাজনীতি চর্চা। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি কৃষ্ণবর্মা-প্রতিষ্ঠিত "ইণ্ডিয়ান হোম রুল সোসাইটির" সহ-সভাপতি এবং দাদাভাই নৌরজী প্রতিষ্ঠিত 'লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটির' আজীবন সদস্য নির্বাচিত হলেন। প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই তিনি ছিলেন 'ইণ্ডিযান হাউস'-এরও শুভানুধ্যাযী, আবার পরে বিনায়ক সাভারকার প্রতিষ্ঠিত 'অভিনব ভারত সংঘ' ও 'ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটির'ও সদস্য।

কিছুদিন পরে কাজের সুবিধার জন্য রানাজী তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত করেন প্যারিসে, যদিও বহুদিন অবধি তাঁর যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে লণ্ডনের সংগেও। অতঃপর প্যারিসে ভারতীয়দের যে বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে ওঠে শ্রীমতী কামার সংগে তিনিই ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা।

কৃষ্ণবর্মার প্রেরণায় রানাজীও তিনটি ফেলোশিপের পত্তন করলেন ২০০০ টাকার— রানা প্রতাপ, ছত্রপতি শিবাজি ও তৃতীয়টি কোনো মুসলমান ঐতিহাসিক পুরুষের নামে (শেষ নামটি জানতে পারি নি)। উদ্দেশ্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদী তরুণেরা যাতে কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন স্বাধীন দেশে ঘুরে। ইংরেজী মাসিকপত্র 'বন্দেমাতরম্' ও পরে 'তলোয়ার' ও *Indian Freedom* পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারেও তাঁর ছিল বিশেষ উৎসাহ।

১৯০৬ সালে আমাদের মেদিনীপুরের এক বিপ্লবী তরুণ হেমচন্দ্র কানুনগো (দাস) লণ্ডন ঘুরে উপস্থিত হন প্যারিসে (পরবর্তীকালে সুপরিচিত আলিপুর বোমার মামলায় এঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়)। উদ্দেশ্য— বোমা তৈরির

কৌশল আয়ত্ত করা— বিদেশী বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে। সেখানে এ উদ্দেশ্য পূরণে তাঁর প্রধান সহায়ক হলেন রানাজী— এমন-কি, তিনি হেমচন্দ্রের জন্য একটি ল্যাবরেটরি তৈরি করে দেন আর রুশ ও পোলিশ বিপ্লবীদের বোমা তৈরির কেতাব তর্জমা করানোরও ব্যবস্থা করেন ইংরেজী ভাষায়।

এ বই সম্পর্কে জেমস্ ক্যাম্বেল কার-এর *Political Trouble in India, 1907-17* তে (পৃ. ৬১-৬২) লেখা হয়েছে :

"ঐ বইয়েরই কপি পাওয়া যায় মানিকতলা বাগানে। অনেকগুলি নোট বইতে সেটিকে তখন কপি করে নেওয়া হচ্ছিল। আর-একটি কপি পাওয়া যায় গণেশ দামোদর সাভারকার-এর নাসিকের বাড়ি তল্লাসী করার সময়। আর তৃতীয় কপিটা পাওয়া যায় লাহোরে ভাই পরমানন্দের এক বাক্সে। ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার ভিক্টোরিয়া-তে বোমা ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অনুসন্ধানের সময় দেখা যায় ঐ বইয়েরই একটি কপি প্যারিস থেকে ১৯১৪ সালের জানুয়ারি মাসে পাঠানো হয়েছিল সাহরির হরনাম সিংহ-এর কাছে।"

একটা কথা বলা দরকার এ-প্রসঙ্গে। পণ্ডিত কৃষ্ণবর্মা, রানাজী ও শ্রীমতী কামা সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য আমি পেয়েছি ডঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা' বইটিতে। তবে তিনি যে সেখানে লিখেছেন : 'কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আন্দামান হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে হেমচন্দ্র দাস তাঁহার সংকলিত বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা নামক গ্রন্থে তাঁহার বোমা প্রস্তুত শিক্ষা সম্পর্কে যে সকল তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে শ্রীরানা যে তাহাকে কিছুমাত্র সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করেন নাই' (পৃ. ৫০) —এ কথাটি ঠিক নয়। 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা'র ১৯৮ পৃষ্ঠায় হেমচন্দ্র লিখেছেন :

"আর একজন ভারতীয় ভদ্রলোক সেখানে ছিলেন ; তাঁর জহরতের কারবার সেখানকার ভারতবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে ছিল ক্ষুদ্র রকমের ; কিন্তু তাঁর প্রাণটি ছিল বোধ হয় সবচেয়ে বড়। তাঁর সহানুভূতিতে সুদূর বিদেশেও ঘরে আছি বলেই মনে হত। অনেকের কাছে বিমুখ হয়ে, শেষে তাঁরই কৃপাতে একটি ছোট ল্যাবরেটারি হয়ে গেল।"

এর আগে, ১৮৬ পৃষ্ঠায় ঐ জহরতের ব্যবসায়ী যে কে হেমচন্দ্র তাও স্পষ্ট

করেই লিখেছেন। কাজেই সম্ভবত সতর্কতার কারণে (হেমচন্দ্রের বই প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে) এ-প্রসঙ্গে তাঁর নাম উল্লেখ না করলেও রানাজীর কাছে হেমচন্দ্রের ঋণস্বীকার যথেষ্টই পরিষ্কার ও অকৃপণ।

নানা কৌশলে ভারতবর্ষে রিভলভার, পিস্তল পাঠানোর ব্যাপারেও রানাজী ছিলেন উদ্যোগী। নাসিকের ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকসনকে ১৯০৯ সালে ও টিনা-ভেলির ম্যাজিস্ট্রেট এশে-কে ১৯১১ সালে যে পিস্তল দিয়ে হত্যা করা হয়, সেগুলি ছিল রানাজী ১৯০৯ সালে বিনায়ক সাভারকারকে যে ২০টি অটোমেটিক ব্রাউনি পিস্তল গুলিসমেত পাঠিয়েছিলেন, তারই দুটি। ইণ্ডিয়া হাউসের রাঁধুনী ছত্রভুজ আমিন মারফত ওগুলি পৌঁছেছিল ভারতবর্ষে।

১৯১৪ সালে যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে রানাজী তাঁর জার্মানপত্নী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র রণজিৎ সিং সমেত মার্টিনিক দ্বীপে অন্তরীণ হন। পাঁচ বছর পর ১৯১৯ সালে যখন তিনি বন্দীদশা থেকে অবশেষে মুক্তি পেলেন তখন তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ কারণ তাঁর স্ত্রী ও পুত্র দুজনারই ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছিল বন্দী অবস্থায়।

প্যারিসে ফিরে এসে রানাজী আবার ধীরে জোড়া লাগাতে থাকেন পুরানো ব্যাবসা ও কর্মজালের ছিন্নসূত্রগুলি। সহকর্মিণী শ্রীমতী কামাকে তিনি পরামর্শ দেন দেশে ফেরার— কৃষ্ণবর্মার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সুইজারল্যাণ্ডে ছুটে যান তাঁর বিধবা স্ত্রী ভানুমতীর কাছে আর কৃষ্ণবর্মার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ২০ লক্ষ ফ্রাংক দান করে 'এণ্ডাওমেণ্ট' প্রতিষ্ঠা করেন ভারতীয়দের জন্য।

প্যারিসে রানাজীর বাড়ি সর্বদাই অবারিতদ্বার ছিল প্রবাসী ভারতীয়দের কাছে। রবীন্দ্রনাথ, লাজপৎ রায়, বিঠলভাই প্যাটেল, সেনাপতি বাপাত, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক, লালা হরদয়াল, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভাই পরমানন্দ প্রমুখ বিশিষ্ট ভারতীয়রা সকলেই পরিচয় পেয়েছেন রানাজীর সহৃদয় আতিথেয়তার। মৃত পুত্র রণজিতের নামে তিনি তাঁর লাইব্রেরিটি দান করেন বিশ্বভারতীকে।

১৮৯৮ থেকে ১৯৪৮—পুরো পঞ্চাশ বছর একটানা বিদেশে কাটিয়ে এই প্রবীণ বিপ্লবী আবার ফিরে আসেন স্বদেশে। প্রায় নব্বই বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় স্বাধীন ভারতবর্ষের মাটিতেই।

রানাজীর জীবনের আর-এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্তমান ক্ষেত্রে যা বিশেষ করেই প্রাসঙ্গিক, সেটি হল ১৯০৭ সালে তাঁর ও শ্রীমতী কামার আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে যোগদান। প্রসংগটি বিশদভাবে বলা যাবে শ্রীমতী কামার সম্পর্কে আলোচনার সময়ে। ইতিমধ্যে আরো দুজন ভারতীয় বিপ্লবীর কথা বলব যাঁরা ঐ সময়ে কিছুকাল এঁদের সংগে কাটিয়ে ভারতবর্ষে ফিরে যান তাঁদের বিপ্লবী কাজের সূত্রে— একজন স্বেচ্ছায়, আর-একজন বন্দী অবস্থায়।

বিনায়ক দামোদর সাভারকার ১৯০৬ সালের জুন মাসে সর্দার সিং রাও রানা প্রদত্ত এক বৃত্তি নিয়ে বিলাত যাত্রা করেন। তাঁর ও তাঁর বড়ো ভাই, গণেশ দামোদর সাভারকারের বিপ্লবী কার্যকলাপের কাহিনী সম্পর্কে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। তার বিস্তারিত আলোচনা আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক নয়। শুধু বিনায়ক সাভারকারের বিলাত-প্রবাস কালের কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য।

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার জীবনের বিচিত্র বিবর্তনের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তিনি ছিলেন লেখক, সাংবাদিক ও বক্তা। 'ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি'র মতো শিথিল ধরনের প্রতিষ্ঠান বা 'ইণ্ডিয়া হাউসে'র মতো কিছুটা নতুন ধরনের ছাত্রাবাসও তিনি সংগঠিত করেছিলেন একের পর এক। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রধানত বিপ্লবী মন্ত্রের প্রচারক— বিপ্লবী সমিতির সংগঠক নয়।

বিলাতে পেঁছানোর অল্পদিনের মধ্যেই সেই অভাব পূরণ করলেন বিনায়ক সাভারকার। এমন-কি, 'ইণ্ডিয়া হাউসে' তাঁর বিপ্লবী সংগঠন— 'অভিনব ভারত সংঘে'র (নাসিকে তিনি ১৯০০ সালে যে 'মিত্র মেলা' প্রতিষ্ঠা করেন তারই পরবর্তী রূপ) একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করে বহু প্রবাসী ভারতীয়কে তিনি আকৃষ্ট করলেন তার ভিতরে। এটি ছিল মূলত গুপ্তসমিতি আর তারই প্রকাশ্য রূপ হল 'ফ্রী ইণ্ডিয়া সোসাইটি'।

সাভারকারের ব্যক্তিত্ব অনেককেই সেদিন টেনেছিল গুপ্ত সমিতির কাজে। তখনই তাঁর একটা বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ ও তার উপযোগী কর্মপন্থা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর পূর্বোল্লিখিত বইয়ে সাভারকারের সেদিনকার মতামত সম্পর্কে লিখেছেন এইভাবে :

"ভারতের সাধারণ লোকের মধ্যে ইংরেজ-বিদ্বেষ অতিরিক্ত মাত্রায় জাগাতে

পারলে, নানা ঘটনাচক্রে দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে শুরু করে ক্রমে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের মত দ্বিতীয়বিদ্রোহের উদ্ভব হবে। আজকালের উচ্চশিক্ষিত (অর্থাৎ বোধহয় বিলেত-ফেরত) নেতাদের মত বিচক্ষণ নেতা ছিল না বলেই '৫৭-র চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। এখন কিন্তু সে রকম অভাব একেবারে নেই। তখন ভারতের সর্বত্র বৈপ্লবিক ভাব প্রচারের চেষ্টা হয় নি, এখন সমস্ত ভারত গুপ্ত সমিতিতে ছেয়ে ফেলতে হবে। এই সমিতিগুলির প্রধান কাজ হবে, নতুন নতুন বৈপ্লবিক সাহিত্যের সৃষ্টি করে এবং অন্য নানা উপায়ে আপামর জনসাধারণকে বিদ্রোহের ভাবে মরিয়া করে তোলা।

"তখনকার বিদ্রোহে হিন্দু মুসলমান একযোগে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছিল; এখন যে সকল মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে একযোগে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়বে অথবা হিন্দুর ধর্ম মেনে নেবে, তারা নব অর্জিত স্বাধীনতার ভাগ পাবে, নচেৎ ইংরেজের মত শত্রু বলে পরিগণিত হবে। এইরূপে আবার ভারত হিন্দুর দেশে পরিণত হলে আমাদের ভারতীয় রাজাদের মধ্যে যে বিশেষ করে এই ভারতীয় স্বাধীনতা-সমরে সাহায্য করবে, সে সার্ডিনিয়ার রাজা দ্বিতীয় ইমানুয়েল যেমন সমগ্র ইতালীর রাজা হয়েছিলেন, তেমনই ভারতে একচ্ছত্র সম্রাট হবে। অন্যান্য রাজ্য ও প্রদেশগুলি তাদের সুবিধামত ঐ সম্রাটের অধীন গণতান্ত্রিক প্রদেশ (Republican States) অথবা আপন আপন প্রাদেশিক রাজার অধীন রাজ্যে (Monarchical States) পরিণত হবে। দুনিয়ার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হলে যতদূর সম্ভব হয় ততখানি সংস্কার করে সনাতন আর্য সভ্যতা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সভ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। অবশ্য জাতিভেদ থাকবে না; কিন্তু চতুর্বর্ণ থাকবে। ব্রাহ্মণই থাকবে দেশের শাসনদণ্ডের শিরোমণি। অন্যান্য বর্ণগুলিও যথাবিধি আপন আপন কাজ করতে থাকবে। উজ্জয়িনী হবে রাজধানী, ভাষা হিন্দী আর অক্ষর হবে নাগরী।" —'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা', পৃ. ১৯২-৯৩।

বিনায়ক সাভারকারের পরবর্তী রাজনৈতিক বিবর্তন কিন্তু এই গোড়ার যুগের ধ্যানধারণা থেকে সহজেই অনুমান করা চলে—যায় 'হিন্দু, হিন্দী হিন্দুস্তানের' রণধ্বনি পর্যন্ত।

সেই সাভারকারই ১৯১০ সালে বন্দী অবস্থায় জাহাজ থেকে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে পেঁছিন মার্সেই বন্দরে আর ফরাসী পোর্ট পুলিস ফের তাঁকে বন্দী করে তুলে দেয় বৃটিশদের 'মোরিয়া' জাহাজের রক্ষীদের হাতে— এ-সব কাহিনী সকলেরই জানা। এরই সূত্রে শ্রীমতী কামা, কৃষ্ণবর্মা, রানাজী, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ভারতীয় বিপ্লবীরা রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণের অধিকারের (Right of Political Asylum) দাবিতে সেদিন প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন ফ্রান্সে। ফরাসী সমাজতন্ত্রী দল ও তাদের মুখপত্র 'লু-মানিতে'ও (*L' Humanite*) যোগ দেয় ঐ অধিকার রক্ষার আন্দোলনে। 'লু-মানিতে'য় লেখা হল :

"ইংরেজের শাসনে অতিষ্ঠ এই ভারতবাসী ফ্রান্সের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন। তাঁকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা শুধু যে গর্হিত অপরাধ তাই নয়, তার দ্বারা ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে ফ্রান্সের চিরাচরিত মৌলিক অধিকারই।"

মনে রাখতে হবে এর কিছুদিন আগে স্যর উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলিকে হত্যা করার অপরাধে ভারতীয় বিপ্লবী মদনলাল ধিংড়া যখন বিলেতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন তখন বিখ্যাত জার্মান শ্রমিক নেতা আগস্ট বেবেলের 'ফরভেয়ার্ত্স' (*Vorwaerts*) পত্রিকায় এবং ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টির পত্রিকা 'লু-মানিতে'-তে "ভারতীয় শহীদ মদনলাল ধিংড়া" নামে যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল তাতে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছিল বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিবের হীন মনোবৃত্তির। লেনিনও যে সেদিন ধিংড়ার ঘটনা লক্ষ্য করেছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর '*Collected Works*' (ইংরেজী সংস্করণ), ৩৯ খণ্ডের ৫৭১ পৃষ্ঠায় এইভাবে :

'স্যর কার্জন ওয়াইলির হত্যাকারী "হতভাগ্য তরুণে'র (ধিংড়া) বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার (যে তরুণ তাঁর আত্মপক্ষের সমর্থনের দলিল তৈরি করেছিলেন ইংরেজীতে)।"

তেমনি আলিপুর বোমার মামলা চলার সময়ে রাজসাক্ষী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে যখন জেলের মধ্যে গুলি করে মারা হয় তখন বিখ্যাত ফরাসী সমাজতন্ত্রী নেতা, জ্যোরে 'লু্মানিতে' পত্রিকায় লেখেন :

"ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা জেলের মধ্যে থাকিয়া যে প্রকারে আততায়ীকে

হত্যা করিয়াছে, ইহা ইউরোপের বৈপ্লবিক ইতিহাসে কখনও ঘটে নাই"—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', পৃ. ১২৮।

এ-সবের অনেক পরে চন্দননগর থেকে মতিলাল রায় প্রমুখ বিপ্লবীদের যখন ভারতীয় পুলিসের হাতে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছিল তখন 'তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে'র মুখপত্র, 'ইণ্টারন্যাশনাল প্রেস করেস্পণ্ডেন্স' (যা সংক্ষেপে 'ইনপ্রেকর') পত্রিকায় (খণ্ড ৪, সংখ্যা ১৩, ২১. ২. ১৯২৪) তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল সে অপচেষ্টার। তারপর থেকে অবশ্য এমন ধরনের ঘটনা ঘটেছে বারবার।

অর্থাৎ প্রকৃত আন্তর্জাতিকতাবোধে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন গোড়া থেকেই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে পরাধীন দেশের জাতীয় আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়াতে।

আর ঠিক এর উল্টো দিকে সাম্রাজ্যবাদীরাও যে ঐ ঘটনার সূত্রে কিভাবে একজোট হয়েছিল তা বোঝা যায় ঐ সময়ে ভারত সরকারের গোয়েন্দা প্রধানের ১৯১০ সালের ২ আগস্ট তারিখের এই সাপ্তাহিক রিপোর্টে :

"ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে শ্রীমতী কামা, রানাজী ও তাঁদের বন্ধুদের গোপনসভার ভিতরকার খবর পাওয়া যায়। ফরাসী পুলিশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এখন চমৎকার আর মার্সাইতে সাভারকারকে বৃটিশদের হাতে তুলে দেওযার ব্যাপারে যেহেতু ফরাসী খবরের কাগজের মহলে বেশ কিছুটা বিরূপ সমালোচনা হয়েছে, তাই চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে তাঁরা গোলমালে না পড়েন এ ব্যাপারে"—*Home Pol-B Proceedings*, Sept. 1910, Nos. 51-59, P 3।

যাই হোক, সাভারকারের ব্যাপারে বিপ্লবীদের মিলিত আন্দোলনের দরুন সমস্যাটি গড়ায় হেগের আন্তর্জাতিক আদালত অবধি। এর আগে কৃষ্ণবর্মা প্রসঙ্গে যে রুশ মার্কসবাদী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ, এম. পাভলোভিচের রচনাটির উল্লেখ করা হযেছে তাতে লেখা হয়েছিল :

"হেগের ট্রাইব্যুনালে সাভারকারের পক্ষ অবলম্বন করেন ফরাসী সমাজতন্ত্রী, জাঁ লুঙে (কার্ল মার্কসের দৌহিত্র— গ্রন্থকার)। তিনি আন্তর্জাতিক আইনের রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী -বিষয়ক কয়েকটি ধারা উল্লেখ করে ভারতের কারাগার থেকে অবিলম্বে সাভারকারের মুক্তির ও ফ্রান্সের যে

স্থানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ঠিক সেইখানেই তাঁকে ফিরিয়ে দেবার দাবি জানান। তিনি এ'ও বলেন যে দোষী ইংরেজ-পুলিসদের তুলে দিতে হবে ফরাসী সরকারের হাতে। কিন্তু সব দেশের সমাজতন্ত্রীরা অবাক হয়ে দেখলেন যে বুর্জোয়া আইনজ্ঞ ও শান্তিবাদীদের (Pacifists) নিয়ে গঠিত হেগের ত্রিশক্তি ট্রাইব্যুনাল আশ্রয়প্রার্থী সাভারকারকে ফরাসী দেশের সীমানার মধ্যে গ্রেপ্তার করা হলে তাঁদের রায়ে, "সাভারকারের দায়িত্ব ইংরেজ সরকারের" অভিমত প্রকাশ করলেন। এই রায়ে তাঁরা রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রার্থীর অধিকারকে খর্ব করে তাঁদের বিদ্বেষ প্রকাশ করেছিলেন বিপ্লবের বিরুদ্ধে।...হেগ ট্রাইব্যুনালের রায়ে খুব সংকীর্ণ করে ফেলা হয়েছে রাজনৈতিক পলাতকের (আশ্রয়প্রার্থীর) অধিকারকে।...দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে যদি ক্রপটকিনকে রুশ সৈন্যেরা বৃটিশ রাজত্বের সীমানার ভিতরে বৃটিশ পুলিসের সহায়তায় গ্রেপ্তার করত ও বৃটিশ সরকারের অজ্ঞাতে তাঁকে পাচার করে দিত রাশিয়ায়— তা হলেও বৃটিশ সরকার আদেশ দিতেন না ক্রপটকিনের মুক্তির।

"সাভারকারের বিচারের এই রায় থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে ইংরেজ সরকারের বে-আইনী কাজের হাত থেকে ভারতীয় বিপ্লবীদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে এই-সব বুর্জোয়া আন্তর্জাতিক ত্রিশক্তি কমিশন ও ট্রাইব্যুনালের কিছু করণীয় নেই। হেগ ট্রাইব্যুনালে যোগদানকারী আইনজ্ঞরা শুধু জানলেন যে সাভারকার একজন বিপ্লবী আর তিনি স্বপ্ন দেখছেন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের, তাঁরা জানলেন যে ইংরেজ সরকার তাই তাঁকে মুক্তি দিতে নারাজ আর এ'ও বুঝলেন যে ফরাসী সরকার শুধু গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্যই।"

পাভলোভিচের সঙ্গে সাভারকারের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল কিনা তা ঐ প্রবন্ধ থেকে বোঝা যায় না, তবে তিনি যে সাভারকারের বিপ্লবী কাজকর্ম সম্পর্কে যে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন তা জানা যায় ঐ লেখা থেকে। যেমন, তিনি লিখেছেন :

"কৃষ্ণবর্মা প্যারিসে চলে যাবার পর ১৯০৭-০৮ সালে 'ইণ্ডিয়া হাউসের' দায়িত্ব ন্যস্ত হয় সাভারকারের উপরে। তিনি সেখানে বহু সভার অনুষ্ঠান করেন ভারতীয়দের। সেখানেই প্রথম পালিত হয় 'সিপাহী বিদ্রোহের' বাৎসরিক দিবস।"

১৯০৯ সালের জুলাই মাসে ভারতীয় রাজভক্তেরা ইংরেজ সরকারের কাছে নতজানু হয়ে তাদের অধীনতা ও আনুগত্য প্রকাশ করে আর উচ্চপদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষকে হত্যার অপরাধে অপরাধী বলে অভিহিত করে ধিংড়াকে। সাভারকার এর তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং বলেন যে "এমন মানুষের মতো কাজ করেছে যে তরুণ তার বিচার কোনো বিচারালয়ের এক্তিয়ারভুক্ত হতে পারে না।···ধিংড়ার কাজ সমর্থনের জন্য তখনই সাভারকারকে 'গ্রেজ ইন' থেকে বহিষ্কার করা হল এবং শিক্ষাপর্ব শেষ হওয়ার সংগে সংগে তাঁর নাম কেটে দেওয়া হল ছাত্রদের তালিকা থেকে।"

ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন এই ঘটনার পর 'কৃষ্ণবর্মা ও সাভারকার লণ্ডন হইতে তাঁহাদের ব্যারিস্টারের সনদচ্যুত হন এবং বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মাধব রাও এই দুইজন ছাত্রের নাম কাটিয়া তাহাদের আইন কলেজ (Inn) হইতে বিতাড়িত করা হয়। শেষোক্ত দুইজন পরে প্যারিসে পলাইয়া আসেন' ('অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', পৃ ১৫৯)। এমন-কি, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যতালিকা থেকেও সেদিন নাম কেটে দেওয়া হয় কৃষ্ণবর্মার।

•

হেমচন্দ্র কানুনগো ১৯০৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ইয়োরোপে যান। 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা'য় তিনি লিখেছেন :

> "সেই সময় ইংলণ্ডের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশনের বিখ্যাত নেতা এবং মাৎসিনীর বন্ধু, মিঃ এইচ. এম. হাইণ্ডমানের সম্পাদিত 'জাস্টিস' নামক পত্রিকা, স্বনামখ্যাত বিপ্লবীপন্থী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা, এম. এ. মহাশয়ের 'ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট' এবং আমেরিকার 'গ্যেলিক আমেরিকান' নামক পত্রিকার মিঃ ফ্রীম্যানের সহিত আমাদের 'যুগান্তরের' আদানপ্রদান চলত। 'যুগান্তরের' আদর্শের প্রতি ঐ পত্রিকাত্রয়ের সম্পাদকগণের নাকি প্রগাঢ় সহানুভূতি ছিল।···তাই এঁদের নামে তিনখানি পরিচয়-পত্র পেয়ে বড়ই ধন্য হয়ে গেছলাম।"

হেমচন্দ্র ১৯০৭ সালে প্যারিসে 'কোনো এক বিশিষ্ট সোশ্যালিস্ট দলের নেতার' (লেখক তাঁর নাম উল্লেখ করেন নি —গ্রন্থকার) সংস্পর্শে আসেন। তিনি হেমচন্দ্রকে জানান যে তাঁদের সমিতির সভ্য হতে হলে তিনজন খ্যাতনামা সোশ্যালিস্টের অনুমোদন দরকার (পৃ. ২০২)। যাঁর মারফৎ এই যোগাযোগ

তিনি "য়ুরোপের কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু দর্শনের স্কলার ছিলেন। তারপরে বেনারসে তিন বছর থেকে সত্যব্রত সামশ্রমী প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এ দেশের নানাবিধ দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। আর সেইসঙ্গে এ দেশের রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থাও পর্যবেক্ষণ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন, পরে য়ুরোপে একজন Orientalist বলে খ্যাতি অর্জনও করেছিলেন। এই কারণে আমাদের সঙ্গে আলাপের জন্য তিনি উক্ত সোশ্যালিস্ট সংঘ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলেন" (পৃ. ২০৪)।

হেমচন্দ্ররা এঁর নামকরণ করেছিলেন Ph. D.। ইনি এবং স্টুটগার্ট সমাজতান্ত্রিক সম্মেলন ফেরত, শ্রীমতী কামা ও রানাজী হেমচন্দ্রের নাম অনুমোদন করায় তিনি উক্ত সোশ্যালিস্ট দলে ঢুকতে পেরেছিলেন শেষ পর্যন্ত (পৃ. ২০৫)। এর থেকে বোঝা যায় যে শ্রীমতী কামা ও শ্রীযুক্ত রানা ইতি-মধ্যেই অর্থাৎ ১৯০৭ সালেই সদস্য হয়েছিলেন ঐ সমাজতন্ত্রী দলের।

হেমচন্দ্রের বইয়ে Ph. D. সম্পর্কে আরো অনেক কথা লেখা আছে। যেমন, তিনি 'শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মাকে বহু আলোচনার পর তাঁর মতই যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে প্রকৃষ্টতম— এ কথা নাকি স্বীকার করাতে পেরে-ছিলেন এবং সে-আলোচনার পর নাকি বদলে গিয়েছিল 'ইণ্ডিয়ান সোশিও-লজিস্টের' সুর (পৃ. ২০৮)। আমরা কিন্তু এখনো জানি না ঐ Ph. D-র প্রকৃত পরিচয় বা তিনি কোন্ দেশের লোক ছিলেন। মনে হতে পারে হয়তো পূর্বোল্লিখিত রুশ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ, এম. পাভলোভিচই ঐ Ph. D.। কিন্তু তিনি বেনারসে সত্যব্রত সামশ্রমী প্রভৃতির কাছে তিন বছর শিক্ষা গ্রহণ করেন নি এবং ১৯০৯ সালের আগে প্যারিসে পেঁৗছেছিলেন বলেও বোধ হয় না। অন্তত 'বিপ্লবীদের ছবি' নামে প্যারিসে প্রবাসী ভারতীয়দের যে বিবরণ থেকে এর আগে কয়েকবার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তার কাল লেখা হয়েছে ১৯০৯ থেকে ১৯১৪ সাল। অবশ্য তিনি যে ১৯১৭ সালের আগস্ট অবধি প্যারিসেই ছিলেন তার প্রমাণ ঐ বিবরণেই পাওয়া যায়। সে যাই হোক হেমচন্দ্র লিখেছেন (পৃ. ২১০-১২):

"Ph. D. মশায় এবং তাঁর দলের আর একজন ভূতপূর্ব সামরিক কর্মচারী আমাদের শেখাবার ভার নিয়েছিলেন। শেষোক্ত ভদ্রলোক তাঁদের দেশের রাজসরকারের তরফ থেকে 'মিলিটারি এতাসে'…হয়ে ভারতে বহুকাল ছিলেন।

ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে তিনিও একজন বিশেষজ্ঞ বলে তাঁদের সমিতি থেকে এ কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন। এঁরা ইংরেজী ও ফরাসী ভাষাতে একরকম করে কথা বলতে পারতেন।

"আমাদের শিক্ষা শুরু হল। ক্রমে জগতের তুলনামূলক ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি তত্ত্ব থেকে শুরু করে সোশ্যালিজম কমিউনিজম আদি হরেক রকম চিজ একসঙ্গে খিচুড়ী পাকিয়ে গিলে ফেলতে লাগলাম।…

"কিন্তু আমাদের এই বোমা শেখানোর ব্যাপারে উক্ত সোশ্যালিস্ট গুরুমশায়রা প্রথমে রাজী ছিলেন না। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে, ভারতবাসী তখন বৈপ্লবিক তাণ্ডবকাণ্ডের জন্য প্রস্তুত হতে পেরেছে। সমস্ত ভারত জুড়ে বিশালভাবে সুনিয়ন্ত্রিত গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলবার আগে …বৈপ্লবিক তাণ্ডব-ব্যাপার আরম্ভ করলে, তার ফল যে মারাত্মক হবেই তা অকাট্য যুক্তি ও নানা দেশের নজীর দ্বারা বুঝিয়ে আমাদের ঐ কাজ থেকে আপাততঃ নিবৃত্ত করতে বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন।…

"এই সকল ধর্মের কাহিনী শোনবার মতো মনের অবস্থা আমাদের মোটেই ছিল না। *Political Trouble in India, 1907-1917* গ্রন্থে (পৃ. ৪০৮) জেমস ক্যাম্বেল কার লিখেছেন যে হেমচন্দ্র নাকি প্যারিসে বোমা তৈরি শিখেছিলেন নিকলাস সাফ্রান্সকি নামে এক রুশ নৈরাজ্যবাদীর কাছ থেকে। একটা জিনিস লক্ষণীয় এখানে—হেমচন্দ্র ও তারপরেও অনেক দিন পর্যন্ত ভারতবর্ষের জাতীয় বিপ্লবীরা আন্তর্জাতিক শ্রমিক ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বা পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করতে এগিয়ে গেছেন মতাদর্শের টানে ততটা নয়, যতটা অস্ত্রশস্ত্র লাভের বা যুদ্ধবিদ্যা শেখার বা আন্দোলন চালানোর জন্য টাকাপয়সা জোগাড়ের মতলবে। তবু অনেক সময়েই সে যোগাযোগের ফল ভালোই হয়েছে শেষ পর্যন্ত—মতাদর্শের প্রাথমিক দুর্বলতা ও অস্বচ্ছতা কাটিয়ে তাঁদের অনেকেই হয়ে উঠতে পেরেছেন অবিচল কমিউনিস্ট। কেউ কেউ অবশ্য ফিরে গেছেন তাঁদের পুরানো অভ্যস্ত পথেই।

কৃষ্ণবর্মা ও রানাজীর পাশাপাশি ঐ সময়কার প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের তৃতীয় প্রধান চরিত্র শ্রীমতী ভিকাজী রোস্তম কামা ('মাদাম কামা' নামেই সমধিক পরিচিত)। ১৮৬১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর বোম্বাই-এর এক পার্শী

ব্যবসায়ী পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম— সোরাবজী ফ্র্যামজী প্যাটেল। ১৮৮৫ সালে তাঁর বিবাহ হয় বিখ্যাত প্রাচ্যতাত্ত্বিক, অধ্যাপক খুরসেদ্‌জী রোস্তমজী কামার পুত্র, রোস্তম, কে. আর. কামা নামে এক ধনী পার্শী সলিসিটারের সংগে। কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু মতবিরোধের সূত্রে তাঁদের মধ্যে মনান্তর দেখা দেয়। স্বামী রোস্তম কামা ছিলেন কিছুটা মন্থর অগ্রগতির নীতিতে বিশ্বাসী। ১৯০৮ সালে *Bombay Chronicle* প্রকাশকালে তিনি ছিলেন ফিরোজ্‌শা মেহ্‌তার সহকারী ও পরে ঐ পত্রিকার প্রধান পরিচালকও হয়েছিলেন। অন্যদিকে শ্রীমতী কামা ছিলেন অবিলম্বে ভারতবর্ষে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবির সমর্থক। শুধু রাজনীতি নয়, অন্যান্য ব্যাপারেও এই দৃষ্টিভংগীর ব্যবধান প্রকট হয়ে উঠল ক্রমে ক্রমে। যেমন শোনা যায় বোম্বাই-এ প্লেগের সংক্রমণ দেখা দিলে শ্রীমতী কামা নিবেদিতার মতো দিনরাত আর্ত-শুশ্রূষায় নাকি আত্মনিয়োগ করেন স্বামীর মতামতের তোয়াক্কা না করে।

এ সবের ফলে শেষ অবধি অনিবার্য হল বিচ্ছেদ। ১৯০১ সালের শেষ দিকে শ্রীমতী কামা দেশ ছেড়ে পাড়ি দিলেন ইউরোপে। প্রথমে লণ্ডনে। সেখানে দাদাভাই নৌরজীর সহকারী হিসেবে কিছুদিন চালালেন কংগ্রেসের প্রচারের কাজ। ইতিমধ্যে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হল কৃষ্ণবর্মা ও রানাজীর সংগে এবং অনতিবিলম্বে কংগ্রেসের মডারেট নীতির আওতা ছাড়িয়ে শ্রীমতী কামা জড়িত হয়ে পড়লেন তাঁদের কাজকর্মে। বক্তা ও সাংবাদিক হিসাবে শীঘ্রই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল বিপ্লবী মহলে। যেমন ১৯০৭ সালে লালা লাজপৎ রায় ও সর্দার অজিত সিং-এর নির্বাসনদণ্ডের খবরে তিনি যে সুতীক্ষ্ণ আবেদনে তাঁর দেশবাসীকে উদ্দীপ্ত করেন নবতর সংগ্রামী প্রয়াসে, সেটি নিউ-ইয়র্কে আইরিশ স্বাধীনতাকামীদের পত্রিকা *Gaelic American*-এ ও ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সমাজতন্ত্রীদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের সমর্থন-সূচক মন্তব্যসহ। বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী-দের সংগেও গড়ে উঠল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা'য় (পৃ. ৬৮) লিখেছেন যে ১৯১৩ সালে যখন প্যারিসে তাঁর সংগে শ্রীমতী কামার সাক্ষাৎ হয় তখন

"তিনি (অর্থাৎ শ্রীমতী কামা —গ্রন্থকার) আইরিশ স্বাতন্ত্র্যবাদীগণের পত্র, পোলিশ জাতীয়তাবাদীগণের আবেদন, মিশর, তুরস্ক, মরক্কো এবং

আরও নানাদেশের মুক্তিকামীগণের সংগে যেসব পত্রালাপ হইতেছে তাহা দেখাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিলেন।"

১৯০৭ সালে শ্রীমতী কামা লণ্ডন থেকে প্যারিসে চলে যান এবং ঐ বছর অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অল্প কিছুদিনের এক সফরের পর সেখানেই অতঃপর শুরু করেন তাঁর বিপ্লবী কাজকর্ম। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পর্কে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে ডাঃ ভট্টাচার্যের উল্লিখিত বই থেকে :

নাসিকের ম্যাজিস্ট্রেট, জ্যাকসনকে হত্যা করার সূত্রে সাভারকারকে জড়িত করা হয়। ওদিকে 'ইণ্ডিয়া হাউসের' রাঁধুনী, ছত্রভুজ আমিন ঐ মামলায় ধরা পড়ে রাজসাক্ষী হয়! সে বিবৃতিতে জানায় কিভাবে সে প্যারিসে রানাজীর বাড়ি থেকে ব্রাউনিং পিস্তলের বাক্স নিয়ে পৌঁছে দিয়েছিল বোম্বাইয়ে। শ্রীমতী কামা দেখলেন এরপর রানাজীকেও জড়াবে মামলায় আর রানাজী ও সাভারকার —দুজনেই এভাবে মামলায় জড়িয়ে পড়লে বিপন্ন হবে সমগ্র আন্দোলন। তখন এঁদের বাঁচানোর জন্য তিনি প্যারিসের বৃটিশ কনসাল জেনারেলের দপ্তরে গিয়ে তাঁকে জানালেন যে 'পিস্তলের বাক্স রানাজীর বাড়িতে ছিল সত্য কিন্তু তিনি এর কিছু জানতেন না, সাভারকারও সে সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। উভয়েই নির্দোষ। আমিই পিস্তলগুলি সংগ্রহ করেছিলাম, আমিই সেগুলিকে বাক্সবন্ধ করেছিলাম। আমিই ছত্রভুজ আমিনের সংগে সেগুলো বোম্বাইতে পাঠিয়েছিলাম। এই পিস্তলের ব্যাপারে সব দায়িত্ব আমার, আমিই সম্পূর্ণ দোষী।'

সাভারকারের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে ইতিমধ্যে যথেষ্ট আন্তর্জাতিক জটিলতার সৃষ্টি হওয়ায় বৃটিশ সরকার কিন্তু আবার শ্রীমতী কামাকে নিয়ে সেদিন যে আর-এক দফা জল ঘোলা করতে ভরসা পায় নি, এটাই বাঁচোয়া।

কিন্তু এ-সবের পাশাপাশি শ্রীমতী কামার মনে ক্রমে ক্রমে আর-এক ধরনের প্রভাবও যে কাজ করছিল তার প্রমাণ মেলে পাভ্‌লোভিচের পূর্বোল্লিখিত লেখাটিতে (দ্র. পরিশিষ্ট ৩)। পাভ্‌লোভিচ লিখেছেন :

"শ্রীমতী কামা এতোয়ানের একটি ছোট্ট মামুলী ধরনের বোর্ডিং হাউসে থাকতেন। তাঁর সেই ছোট্ট ঘরটিতে প্রায়ই ভীড় জমত ভারতীয় বিপ্লবীদের, বিশেষ করে তরুণদের। মাঝবয়সী ও স্বাস্থ্যের দিক থেকে ক্ষীণজীবী হলেও শ্রীমতী কামা ছিলেন আশ্চর্যরকমের জীবন্ত ও দৃঢ়চিত্তসম্পন্না নারী।

কৃষ্ণবর্মার চাইতে তাঁর ব্যক্তিত্ব আমার মনে গভীরতম রেখাপাত করেছিল আর তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছিল খুব শীঘ্রই। আমি নিয়মিত তাঁর সঙ্গে দেখা করতাম আর আলোচনা করতাম ভারতের বিপ্লব সম্পর্কে। শ্রীমতী কামা খুবই আগ্রহান্বিত ছিলেন রুশ-বিপ্লবের ঘটনা সম্পর্কে, বিশেষ করে ১৯০৫ সালের বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা সম্পর্কে —যে আগ্রহ কৃষ্ণবর্মার মধ্যে কিন্তু দেখা যায় নি। যে মার্কসবাদী তত্ত্বে ঐ ভূমিকার কথা পাওয়া যায় তার সম্পর্কেও তিনি পড়াশুনো করেছিলেন কিছুটা। রুশ সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল গর্কির উপরে। একবার তিনি আমাকে অনুরোধ করেন গর্কির বিখ্যাত কবিতা "বাজ-পাখির গান" ("Song of the Falcon") সম্পর্কে তাঁকে বলতে। কবিতার বিষয়বস্তু যাতে তিনি বুঝতে পারেন সেজন্য তিনি আমায় বলেন তার ফরাসী তর্জমা করতে। দিন কয়েকের মধ্যে আমি তার অনুবাদ শ্রীমতী কামাকে দিই। মনে পড়ে আমি যখন ঐ তর্জমা তাঁকে দিলাম তখন তাঁর দু' চোখে আনন্দাশ্রু বইতে লাগল। তর্জমাটি যে ভালো হয় নি, এ ব্যাপারে আমি নিঃসংশয়। তবুও পরিপাটি করে লেখা গর্কির কবিতার অনুবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন: 'এ তো একটি ছোট্ট কবিতা— প্রবন্ধ বা বক্তৃতা হিসাবে ধরলেও এটি চমৎকার। এ কিন্তু তোমাদের টলস্টয়ের একেবারে উল্টো আর ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমাদের যে সংগ্রাম তার শত্রুদের বিরুদ্ধেও এটি একটি হাতিয়ার'।"

একটা ব্যাপার লক্ষ করা দরকার এ প্রসঙ্গে। ১৯০৫ সালের রুশ-বিপ্লব সম্পর্কে এ দেশের কাগজপত্রেও কিছুটা লেখালেখি চলছিল ঐ সময়ে। 'প্রবাসী' ও *Modern Review* পত্রিকায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও আফ্রিকা থেকে প্রকাশিত *Indian Opinion* পত্রিকায় গান্ধীজীও ঐ বিপ্লবকে অভিনন্দন করেছিলেন জারতন্ত্রী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রুশ জনগণের অভ্যুত্থান হিসেবে (ঐ প্রসঙ্গে তাঁরা সেদিন সেন্ট পিটার্সবুর্গের কুখ্যাত পিটার ও পল দুর্গে আটক মাক্সিম গর্কির মুক্তিও দাবি করেছিলেন, যদিও লেনিনের নামের সঙ্গে তাঁদের বা কোনো ভারতবাসীরই তখন পরিচয় ঘটে নি)। কিন্তু গান্ধীজী বা রামানন্দবাবু কেউই ঐ বিপ্লবের পিছনে শ্রমিকশ্রেণীর বা 'রুশ সোশ্যাল

ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি''র অথবা মার্কসবাদের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, শ্রীমতী কামার মতো।

কৃষ্ণবর্মার মতো শ্রীমতী কামার সঙ্গেও পত্রালাপ হয়েছিল গর্কির। এর আগে পিয়তর বারান্নিকোভের যে লেখাটির উল্লেখ করেছি তাতে আছে ১৯১২ সালে গর্কি শ্রীমতী কামাকে লেখেন:

"'ভারতের নারী, তার বর্তমান অবস্থা এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তার ভূমিকা'— এই বিষয়ের উপর রুশ পত্রিকার জন্য আপনার কাছে কি একটি লেখা প্রত্যাশা করতে পারি? গঙ্গার তীরে মহান ভারতের গণতন্ত্রকামীরা ও নারীগণ কিভাবে জীবন কাটাচ্ছেন এবং সংগ্রাম চালাচ্ছেন— সে সম্পর্কে রাশিয়ার গণতন্ত্রকামী মানুষ ও নারীসমাজকে যদি আপনি একটি প্রবন্ধ মারফৎ অবহিত করেন, তবে তারা চিরকৃতজ্ঞ থাকবে আপনার কাছে" (পৃ. ৪৮)।

এ চিঠির জবাবে শ্রীমতী কামা ১৯১২ সালের ৩১ অক্টোবর গর্কিকে লেখেন:

"আমার দেশ ও তার জন্য সংগ্রামের কাজে আমার সমগ্র জীবন নিবেদিত। আমার দেশের আদর্শ সম্বন্ধে যদি কোনো প্রবন্ধ লিখতে পারি তার জন্য— অর্থাৎ আপনার অনুরোধ রক্ষার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব" (পৃ. ৪৮)।

শ্রীমতী কামা গর্কিকে এ'ও জানান যে বিপ্লবী বিনায়ক সাভারকারের লেখা একটি বই তিনি ইতিমধ্যেই গর্কিকে পাঠিয়েছেন। ইভা লুন্তারুনিকের যে বইয়ের কথা আগে লিখেছি তার থেকে জানা যায় যে গর্কি ১৯১২ সালের ১৪ নভেম্বর সাভারকারের সিপাহী-বিদ্রোহ-সম্পর্কিত বইটির বিষয়ে সপ্রশংস উল্লেখ করেন তাঁর একটি লেখায়। হয়তো সেই বইটি পাঠানোর কথাই শ্রীমতী কামা গর্কিকে জানিয়েছিলেন ঐ চিঠিতে।

শ্রীমতী কামার জীবনের আর-একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯০৭ সালের অগাস্ট মাসে 'দ্বিতীয় (সমাজতন্ত্রী) আন্তর্জাতিকের' সপ্তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় স্টুটগার্ট শহরে। সম্মেলনে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল দুটি মূল প্রশ্ন— উপনিবেশবাদের প্রশ্ন এবং ঘনায়মান বিশ্বযুদ্ধের প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর মনোভাবের প্রশ্ন।

উপনিবেশবাদের প্রশ্ন সম্পর্কে প্রস্তাব রচনার জন্য সম্মেলনে যে কমিশন গঠিত হয় তার অধিকাংশ সদস্য সেদিন এই মত প্রকাশ করেন যে এর আগের কয়েকটি সম্মেলনে যে-সব উপনিবেশ-বিরোধী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তা নাকি বড়ই নেতিবাচক ও তাই তাঁরা কমিশনে 'সমাজতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক নীতি' অনুসরণের এক খসড়া প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ওলন্দাজ প্রতিনিধি ভান কল (Van Col) ও জার্মান প্রতিনিধি বার্নস্টাইনের মতো সুবিধাবাদী নেতারা। খসড়া প্রস্তাবটি সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশনে পেশ করা হলে কিন্তু তার তীব্র বিরোধিতা করলেন লেনিন, রোজা লুক্সেমবুর্গ প্রভৃতি মার্কসবাদী নেতৃবর্গ। ফলে ঐ প্রস্তাব নাকচ করে সম্মেলন ১২৭-১০৮ ভোটে দ্ব্যর্থহীন এক প্রস্তাব গ্রহণ করল সব রকম উপনিবেশ-ব্যবস্থার কঠোর নিন্দা ক'রে। এ প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে ইয়োরোপের সবক'টি উপনিবেশের মালিক দেশের অধিকাংশ প্রতিনিধি সেদিন ঐ চূড়ান্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন, একটি মাত্র দেশ বাদে—রাশিয়া। রুশ শ্রমিক-আন্দোলনের পক্ষে এটি নিশ্চয়ই পরম গৌরবের কথা (দ্র. রজনী পাম দত্ত, *The Internationale*, পৃ. ১০৯-১০)।

এই ঘটনাবলীর পৃষ্ঠপটে লেনিন সম্মেলন শেষ হওয়ার অল্পদিনের মধ্যে সম্মেলন সম্পর্কে পর পর দুটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রথমটিতে উপনিবেশবাদের প্রশ্নে তিনি লেখেন :

"নির্বিত্ত অথচ শ্রমিক নয়, এমন কোনো শ্রেণী শোষকদের উৎখাত করতে পারে না। গোটা সমাজকে যে চালু রাখে একমাত্র সেই শ্রমিক শ্রেণীই পারে সমাজবিপ্লব ঘটাতে। তবে ঔপনিবেশিক নীতির প্রসারের ফলে ইয়োরোপের প্রলেটারিয়েট আংশিকভাবে নিজেকে এই অবস্থায় দেখতে পাচ্ছে যেখানে তার মেহনত নয়, বরং উপনিবেশের প্রায় দাসে পরিণত অধিবাসীদের মেহনতই গোটা সমাজকে বাঁচিয়ে রাখছে। যেমন বৃটিশ বুর্জোয়ারা বৃটিশ শ্রমিকদের চাইতে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উপনিবেশের কোটি কোটি মানুষের কাছ থেকে মুনাফা কামিয়ে থাকে অনেক বেশি। কোনো কোনো দেশে এ ব্যাপারটি প্রলেটারিয়েটকে উপনিবেশ-সংশ্লিষ্ট উগ্র জাতীয়তাবাদে সংক্রামিত করার বৈষয়িক ভিত্তি জুগিয়ে থাকে" (*Collected Works*, খণ্ড ১৩, পৃ. ৭৭)।

অর্থাৎ ভারতবর্ষের মতো উপনিবেশ থেকে লুণ্ঠিত মোটা মুনাফার জোরে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজেদের দেশের শ্রমিকদের একাংশকে ঘুষ দিয়ে 'অভিজাত শ্রমিকে' (labour aristocracy) পরিণত করে এবং শ্রমিক আন্দোলনে সবরকম সুবিধাবাদ ও নানা বিপত্তির উৎস সেইটেই— এই হল লেনিনের প্রতিপাদ্য।

স্টুটগার্ট সম্মেলনের এই-সব আলোচনা-প্রসঙ্গে একটি কথা ভারতবাসী হিসাবে আমাদের বিশেষ করেই স্মরণীয়। সেটি এই যে ঐ সম্মেলনে উপনিবেশ-সংক্রান্ত আলোচনার সময়ে সেদিন লেনিন, লুক্সেমবুর্গ, লিবক্নেখ্‌ট্‌ প্রভৃতি মার্কসবাদী বিপ্লবীদের সুরে সুর মিলিয়েছিলেন ভারতবর্ষের দুই জাতীয় বিপ্লবী—শ্রীমতী ভিকাজী রোস্তম কামা আর সর্দার সিংজী রাওজী রানা। এঁরা দুজন যাতে প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনে যোগ দিতে না পারেন তার জন্য সেদিন প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন বৃটিশ শ্রমিক নেতা (ও পরবর্তীকালে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী) র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড (মনে রাখতে হবে পট্টভি সীতারামাইয়া তাঁর জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসের ১৩৩ পৃষ্ঠায় জানিয়েছেন যে স্ত্রী-বিয়োগ না হলে ঐ ম্যাকডোনাল্ডই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হতেন ১৯১১ সালে)।

কিন্তু ফরাসী শ্রমিক নেতা জ্যোরে, জার্মান নেতৃবর্গ বেবেল, লিবক্নেখ্‌ট্‌ ও লুক্সেমবুর্গ বৃটিশ প্রতিনিধি দলের মধ্যে একমাত্র হাইণ্ডমান প্রভৃতির চেষ্টায় শ্রীমতী কামা ও রানাজী শেষ পর্যন্ত যোগ দিতে পারলেন সম্মেলনে।

শ্রীমতী কামা ঐ সম্মেলনেই স্বাধীন ভারতবর্ষের এক তিন-রঙা পতাকা (দ্র. পরিশিষ্ট ৪) তুলে ধরেন এবং তাকে অভিবাদন করে এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন সম্মেলনের সামনে :

> "ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্ব থাকা ভারতের প্রকৃত স্বার্থের পক্ষে নিশ্চিত ভাবেই মারাত্মক ও প্রচণ্ড রকম ক্ষতিকর আর যেহেতু পরিপূর্ণ সমাজবাদী রাষ্ট্রের দাবি এই যে, কোনো জাতিরই অত্যাচারী বা স্বৈরাচারী ধরনের সরকারের অধীনস্থ থাকা উচিত নয়, তাই সারা দুনিয়ার মুক্তি-প্রেমিকদের উচিত ঐ প্রপীড়িত দেশের অধিবাসী, সমগ্র মানবজাতির এক-পঞ্চমাংশকে দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করা"—ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা', পৃ. ৬৩-৬৪।

ঐ প্রস্তাবের সমর্থনে শ্রীমতী কামা এক জোরালো বক্তৃতা করেন। প্রসংগত তিনি বলেন: "আমরা চাই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। আমরা দাবি তুলছি ন্যায়ধর্মের, নিজেদের সব-কিছু নিজেরাই পরিকল্পনা করার"।

ঘনায়মান বিশ্বযুদ্ধের প্রতি শ্রমিক-আন্দোলনের মনোভাব সম্পর্কেও স্টুটগার্টে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৯০০ সালে প্যারিস সম্মেলনই গৃহীত হয়েছিল সামরিকতাবাদের বিরুদ্ধে রোজা লুক্সেমবুর্গের প্রস্তাব। ১৯০৪ সালে আমস্টার্ডাম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল রুশ-জাপান যুদ্ধের মধ্যে। তখন সেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিক-আন্দোলনের তীব্র মনোভাবের প্রতীক হিসেবে সম্মেলন-মঞ্চে রুশ প্রতিনিধি দলের নেতা, প্লেখানভ হাত মিলিয়েছিলেন জাপানী প্রতিনিধি দলের নেতা, সেন কাটায়ামার সংগে। (রজনী পাম দত্ত তাঁর *The Internationale* গ্রন্থে লিখেছেন যে এ ঘটনার দশ বছর পরে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্লেখানভ সে সত্যরক্ষা করতে পারেন নি বটে, কিন্তু সেন কাটায়ামা তাঁর প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন এবং পরে কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের)।

স্টুটগার্ট সম্মেলনের সময়ে আরো ঘনিয়ে উঠেছিল মহাযুদ্ধের আশংকা। তাই সম্মেলনের অনেকটা সময় জুড়ে চলেছিল আসন্ন যুদ্ধ-সম্পর্কিত আলোচনা। শেষপর্যন্ত গৃহীত হয়েছিল জার্মান নেতা, আগস্ট বেবেলের এক প্রস্তাব— লেনিন, রোজা লুক্সেমবুর্গ, মার্তভ প্রভৃতি রুশ ও পোলিশ সদস্যদের এক সংশোধনী সমেত। তার ফলে প্রস্তাবের মূল কথা দাঁড়াল এই যুদ্ধ যাতে না বাধে তার জন্য প্রতিটি দেশের শ্রমিক-আন্দোলন যথাসাধ্য চেষ্টা করবে, তাদের দেশে শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতর মাত্রার দিকে খেয়াল রেখে। তবু যদি যুদ্ধ বাধে তা হলে শ্রমিকদের চেষ্টা হবে যত শীঘ্র সম্ভব তা বন্ধ করার আর যুদ্ধের ফলে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেবে তার সুযোগ নিয়ে জনসাধারণকে উদ্দীপিত করার এবং চিরতরে অবসান ঘটানোর ধনিকদের শ্রেণী-শাসনের।

দশ বছর পরে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বহু নেতাই কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি ভংগ করে শ্রমিকদের জড়ো করেছিলেন তাঁদের নিজের নিজের দেশের যুদ্ধমান সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির পিছনে। চুরমার হয়ে গিয়েছিল তাই শ্রমিক-আন্তর্জাতিকতা। শুধু লেনিন ও বলশেভিক দল, রোজা লুক্সেমবুর্গ, কার্ল

লিবক্লেখ্ট্ ও তাঁদের 'স্পার্টাকুস গোষ্ঠী' এবং সেন কাটায়ামার মতো সাচ্চা বিপ্লবীরা সেদিন তুলে ধরেছিলেন শ্রমিক-আন্তর্জাতিকতার রক্তপতাকা। আর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল 'তৃতীয় (কমিউনিস্ট) আন্তর্জাতিক'।

স্টুটগার্ট সম্মেলনেও পদে পদে পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল বহু সমাজতন্ত্রী নেতার ঐ ধরনের সুবিধাবাদী দৃষ্টির আর তার বিরুদ্ধে লেনিনের প্রচণ্ড রাজনৈতিক সংগ্রামের। সেখানে ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে শ্রীমতী কামা ও রানাজী উপস্থিত থাকলেও লেনিনের সঙ্গে তাঁদের সেদিন সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হয়েছিল কি না তা সঠিক জানা যায় না। তবে তাঁদের উপস্থিতি যে লেনিনের নজরে পড়েছিল তা জানা যায় ঐ সম্মেলন সম্পর্কে তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধের এই লাইনটি থেকে :

> "স্টুটগার্টে ৮৮৪ জন প্রতিনিধি এসেছিলেন ইউরোপ, এশিয়া (জাপান ও ভারতবর্ষ থেকে কয়েকজন), আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার (দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে একজন প্রতিনিধি) ২৫টি দেশ থেকে"—*Collected Works*, খণ্ড ১৩, পৃ. ৮২।

আর শ্রীমতী কামার উপরে যে লেনিন সেদিন বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং তার ফলে কামার পক্ষে স্টুটগার্ট সম্মেলনে যোগদান যে সত্যই নূতন তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল— তার প্রমাণ পাওয়া যায় আর-একজন ভারতীয় বিপ্লবী, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। অনেক বছর পরে ১৯৩৪ সালের ১৮ মার্চ বীরেন্দ্রনাথ লেনিনগ্রাডের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি কর্তৃক অনুষ্ঠিত 'প্যারি কমিউন' দিবসে এক বক্তৃতা (দ্র. পরিশিষ্ট ৫) প্রসঙ্গে বলেন :

> "লেনিনের কথা আমি প্রথম শুনি ১৯১০ সালের গ্রীষ্মকালে। লণ্ডন-প্রবাসী ছাত্র হিসেবে আমরা তখন—তার পরেও বহু বছর যাবৎ ছিলাম— জাতীয় বিপ্লবী। আমাদের যোগাযোগ ছিল কেয়ার হার্ডি, হাইণ্ডমানের মতো বৃটিশ শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে। লণ্ডন-সম্মেলনে বলশেভিজম প্রতিষ্ঠার মতো যুগান্তকারী ঘটনার আমরা কোনো খবরই রাখতাম না। (বীরেন্দ্রনাথ ১৯০৩ সালে লণ্ডনে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে বলশেভিক ঝোঁকের উদ্ভবের উল্লেখ করছেন —গ্রন্থকার) ১৯১০ সালের জুলাই মাসে আমি প্যারিসের প্রবাসী ভারতীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে গিয়ে জুটলাম, কারণ আসন্ন গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য আমাকে পালাতে

হয়েছিল ইংলণ্ড থেকে। সেই প্রবাসীদের মধ্যে একজন ছিলেন নারী— শ্রীমতী ভিকাজী কামা। তিনি সমাজতন্ত্রী হয়েছিলেন ও যোগ দিয়েছিলেন ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টি'তে (১৯১০ সালের ৯ আগস্ট তারিখের সাপ্তাহিক রিপোর্টে ভারত সরকারের গোয়েন্দা প্রধান লিখেছিলেন : "প্যারিসের খবরের কাগজে প্রকাশ যে ভারতীয় সমাজতন্ত্রী হিসেবে অভিহিত 'La citoyenne' কামা সেইনের সমাজতন্ত্রী ফেডারেশনের সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন" *Home Pol-B Proceedings*, Sept. 1910, Nos. 51-59, পৃ. ১২— গ্রন্থকার)।

"আমিও ঐ দলে যোগ দিই ১৯১০ সালে। শ্রীমতী কামা ১৯০৭ সালে স্টুটগার্ট সম্মেলনে (সমাজতন্ত্রী আন্তর্জাতিকের) যোগ দিয়েছিলেন প্রতিনিধি হিসেবে। ঐ সম্মেলন সম্পর্কে লেনিন তাঁর প্রথম রিপোর্টে সেখানে ভারতীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতির কথা বলেছিলেন, তবে কারো নাম উল্লেখ করেন নি। ভিকাজী কামা আমাদের লেনিন ও রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের কথা আর যুদ্ধ ও জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁদের মনোভাবের কথা প্রায়ই বলতেন। কিন্তু আমরা কেউই তখন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলের মধ্যেকার বিভেদের আর লেনিনের ভূমিকার তাৎপর্য ধরতে পারি নি।" (জার্মান ভাষায় বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতার কপি পাওয়া গেছে বার্লিনের অধ্যাপক হর্স্ট ক্রুগারের মারফৎ সোভিয়েত গবেষক, ডাঃ কোমারভের কাছ থেকে। জার্মান থেকে ঐ বক্তৃতাটি ইংরেজীতে তর্জমা করেছেন ডাঃ গঙ্গাধর অধিকারী)।

আর শ্রীমতী কামা যে তখনই সেই তাৎপর্য ধরতে পেরেছিলেন— এ কথাও ঐ উদ্ধৃতি থেকে সুস্পষ্ট। আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাই বিপুল গুরুত্ব শ্রীমতী কামার, কারণ তাঁর আগে এতটা সচেতনতা লক্ষ করা যায় নি আর-কোনো ভারতীয়ের মধ্যে।

এখন প্রশ্ন— তারপর কী ঘটল? পাভলোভিচ লিখেছেন :

"১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে প্যারিসে বাস করার সময়ে শ্রীমতী কামা বহু ফরাসী ও রুশ বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কার্যকলাপের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করে কড়া পুলিস পাহারায় পাঠানো হয় দক্ষিণ ফ্রান্সে এক গ্রামে। ফ্রান্সে

যুদ্ধরত ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে যাতে তিনি কোনো যোগাযোগ না করতে পারেন, তারই জন্য···এই ব্যবস্থা।"

এমন-কি, কথা ওঠে রানাজীর মতো তাঁকেও ফ্রান্সের উপনিবেশে নির্বাসনে পাঠানোর।

ভিশি শহরের এক পুরানো স্যাঁতসেঁতে দুর্গের মতো বাড়িতে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকতে থাকতে এমনিই শ্রীমতী কামার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য 'কয়েকজন ফরাসী সমাজতন্ত্রী ও রুশ বন্ধুবান্ধবের বিশেষ চেষ্টায় রুগ্না ও বৃদ্ধা কামাকে অনুমতি দেওয়া হয় খাস ফ্রান্সেই বসবাসের।

পাভলোভিচ লিখেছেন :

"শ্রীমতী কামা খুব মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন রুশবিপ্লবের ঘটনাবলী। ১৯১৭ সালের অগাস্ট মাসে আমার রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তনের সময়ে শ্রীমতী কামা আমার হাতে গর্কি'র কাছে লেখা একটি চিঠি দেন। তিনি গর্কি'কে অনুরোধ জানিয়েছেন। ঐ চিঠি রুশ কাগজে প্রকাশ করতে। দুঃখের বিষয় সে চিঠিটি হারিয়ে যায়।"

১৯৩৫ সালে শ্রীমতী কামা অবশেষে দেশে ফিরে আসেন ও প্রায় দশমাস রোগভোগের পর ১৯৩৬ সালের ১২ অগাস্ট বোম্বাইয়ের পার্শী জেনারেল হাসপাতালে মারা যান। সাভারকার তাঁর জীবনীতে লিখেছেন :

"শ্রীমতী কামা সকলের অজ্ঞানতে বোম্বাইয়ে মারা গেলেন সম্পূর্ণ অকৃতজ্ঞ এক পরিবেশে।"

যুদ্ধের পর থেকে মৃত্যুকাল অবধি কামার জীবনের ঐ পর্বের তেমন কোনো খবরাখবর জানা যায় না। যে রুশ-বিপ্লবের ঘটনা তিনি অত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন তারই প্রভাবে যখন সারা পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন নবরূপ ধারণ করল বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি'র মধ্যে, তখন কী ছিল তাঁর ভাবনা? আমরা জানি ইয়োরোপের অধিকাংশ সোশ্যালিস্ট পার্টি থেকে সংখ্যালঘু অংশ বেরিয়ে এসে সেদিন প্রতিষ্ঠা করেছিল ঐ-সব কমিউনিস্ট পার্টি। একমাত্র ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টি'রই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কমিউনিস্ট হয়ে যায় আর সংখ্যালঘু অংশ বেরিয়ে গিয়ে সোশ্যালিস্ট পার্টি গড়ে। শ্রীমতী কামা ১৯১০ সালেরও আগে থেকে ছিলেন ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টি'র সদস্যা।

ঐ প্রচণ্ড তাৎপর্যমণ্ডিত পার্টি ভাঙা-ভাঙির সময়ে কী ছিল তাঁর ভূমিকা? সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে তিনিও কি সেদিন কমিউনিস্ট হয়েছিলেন?

এ প্রশ্নের জবাব সঠিক জানি না তবে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে' ২৬৫-৫৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

"মাডাম কামা বামপন্থীয় ছিলেন। শুনিয়াছি তিনি রুশ বলশেভিক মতবাদে সহানুভূতিসম্পন্না ছিলেন। ১৯২৫ খৃস্টাব্দে লেখক (অর্থাৎ ভূপেন্দ্রনাথ —গ্রন্থকার) যখন প্যারিসে তাঁহার কাছে বিদায় লন তখন তিনি ইংরেজি ও ফরাসী মিশ্রিত ভাষায় লেখককে বলেন : "Keep your flag high like Admiral Togo and organize the Ouvriers et paysans of India" (অ্যাডমিরাল টোগোর ন্যায় তোমার পতাকা উচ্চ রাখিয়ো এবং ভারতের শ্রমিক ও কৃষকদের সংঘবদ্ধ করো)।

ঐ বইয়েরই আর-এক জায়গায় ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে ১৯২১ সালে বার্লিনে শ্রীমতী এভেলিন রায় তাঁকে বলেছিলেন 'মস্কোয় একটি আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন হইবে। আমার উপর খাঁটি হিন্দু নারী (ভারতীয়) আনয়ন করিবার ভার পড়িয়াছে। দেখি, প্যারিসের মাডাম কামা যদি আসেন' (পৃ. ৩০৪)। শ্রীমতী কামা অবশ্য কখনো সোভিয়েত দেশে গেছেন বা সেখান যাবার কোনো আমন্ত্রণ পেয়েছেন এমন প্রমাণও পাই নি, যদিও আমাদের কাগজপত্রে অনেক সময়ে লেখা হয় তাঁকে নাকি সোভিয়েত দেশে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন স্বয়ং লেনিন। 'তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে'র মুখপত্র *International Press Correspondence*-এর পুরোনো ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ ১৯২৪ সালের ১ মে তারিখের সংখ্যার (ভল্যুম ৪, খণ্ড ২৭, পৃ. ২৬৩, ৬৫) একটি প্রবন্ধের দিকে আমার নজর পড়ে। প্রবন্ধের নাম 'ভারতবর্ষ ও দূর প্রাচ্যে নারী আন্দোলন'। লেখিকা ভি. কাম্পারোভা সেখানে ভারতবর্ষের নারী-আন্দোলনের কয়েকজন নেত্রীর নাম উল্লেখ করেছেন। ভারতীয় নামের সঙ্গে অপরিচয়ের দরুন নামের বানান সবক'টিই ভুল। তবু প্রথম দুটি নাম চেনা গেল—সরলাদেবী ও সরোজিনী নাইডু। তৃতীয়টি বোঝাই গেল না। আর চতুর্থ নাম সম্পর্কে সেখানে লেখা ছিল এই কথা : '...the famous old revolutionary, Rusham Shama who is now a communist'। প্রশ্ন হল এই 'রুশম শ্যামা' কে? 'বিখ্যাত প্রবীণা বিপ্লবী' দূরে থাক্, ঐ নামের

কোনো বিপ্লবীকেই তো আমরা জানি না। অন্যদিকে ক্রমাগত বানান ভুলের বহর থেকে কি অনুমান করা চলে না যে 'রুশম শ্যামা' নয় আসলে লেখিকা বলতে চেয়েছেন 'রুস্তম (বা 'রোস্তম') কামা?' বিশেষ করে যখন মনে রাখা যায় যে ল্যাটিন 'C' অক্ষরের উচ্চারণ রুশ (সিরিলিক) হরফে 'শ'-এর মতো আর তাই 'কামা' সহজেই পর্যবসিত হতে পারেন 'শামা'য়।

এই অনুমান যদি সত্য হয় তা হলে বিখ্যাত প্রবীণা জাতীয় বিপ্লবীর হয়তো শেষ জীবনে রূপান্তর ঘটেছিল কমিউনিস্ট বিপ্লবীতে।

প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী : জার্মানিতে

বিশ শতকের গোড়ায় যে-সব তরুণ ভারতীয় বিপ্লবী লণ্ডনে ও পরে প্যারিসে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা ও শ্রীমতী কামার চারপাশে জড়ো হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িত শুধু ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনেরই নয়, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনেরও আদি যুগের বহু বিচিত্র ঘটনা।

ভারতবাসীদের মধ্যে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিজ্ঞানের 'ডক্টরেট' উপাধির অধিকারী ও হায়দ্রাবাদের নিজাম কলেজের অধ্যক্ষ, স্বনামধন্য অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা, বীরেন্দ্রনাথ ১৯০১ সালের ৩১ অক্টোবর বিলাত যাত্রা করেন আই. সি. এস. হওয়ার জন্য। পরীক্ষায় কৃতকার্য না হয়ে তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে যোগ দেন 'মিডল টেম্পল ইন্'-এ। ওদিকে আবার তিনি ক্রমশই জড়িয়ে পড়তে থাকেন কৃষ্ণবর্মা প্রভৃতি বিপ্লবীদের রাজনৈতিক কাজকর্মে। শেষ পর্যন্ত ব্যারিস্টার হওয়া আর তাঁর হয় নি। ১৯০৯ সালে মদনলাল ধিংডার হাতে স্যার উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলী নিহত হওয়ার পর বৃটিশ সরকার যে দমননীতি চালায় তার ফলে তিনি ও মাধব রাও বিতাড়িত হন মিডল টেম্পল ইন্স থেকে। আর কৃষ্ণবর্মা ও সাভারকারের ব্যারিস্টারির সনদও ঐ সময়ে বাতিল হয়ে যায় সরকারী নির্দেশে।

বীরেন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে 'ইণ্ডিয়া হাউসে'র ছাত্রদের এবং 'অভিনব ভারত সংঘ' ও 'ফ্রী ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র সদস্যদের রাজনৈতিক শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলেন। আবার শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা ১৯০৭ সালে লণ্ডন ছেড়ে প্যারিসে যাওয়ার পর 'ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট' পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্বও এসে পড়ে প্রধানত তাঁরই উপরে। তা ছাড়া আইরিশ, মিশরী, পোলিশ প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাও ছিল তাঁর কাজ। ডঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা' গ্রন্থে এ ধরনের বহু তথ্য আছে এ বিষয়ে। তবে ঐ বইয়ের ৬৩ ও ৭৩ পৃষ্ঠায় তিনি যে বলেছেন, বীরেন্দ্রনাথ ১৯০৭ সালে শ্রীমতী কামা ও রানাজীর সঙ্গী হিসাবে যোগ দিয়ে-

ছিলেন স্টুটগার্ট সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে— এ কথাটি ঠিক নয়। হেমচন্দ্র কানুনগো ঐ সময়ে প্যারিসে ছিলেন শ্রীমতী কামা ও রানাজীর মতোই। তিনি তাঁর 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা'য় লিখেছেন :

'এই সময় জার্মানীর স্টুটগার্ট বিশ্ব সোশ্যালিস্ট কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে প্যারিস থেকে ভারতীয় ডেলিগেটরূপে দুজন প্রেরিত হয়েছিলেন। এঁদের একজন ছিলেন পূর্বোক্ত রানা সাহেব। আর-একজন স্বনামধন্যা মাদাম কামা।"

হেমচন্দ্র বীরেন্দ্রনাথের বা তৃতীয় কোনো ভারতীয়ের নাম উল্লেখ করেন নি এ প্রসংগে।

তা ছাড়া ১৯৩৪ সালে লেনিনগ্রাডে স্বয়ং বীরেন্দ্রনাথের যে বক্তৃতার ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে তাতেও স্টুটগার্ট সম্মেলনে শ্রীমতী কামার যোগদানের এবং শ্রীমতী কামা যে প্যারিসে ফিরে তাঁদের কাছে 'লেনিন ও রুশ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের কথা আর যুদ্ধ ও জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁদের মনোভাবের কথা প্রায়ই বলতেন' এ কথাই বলা হয়েছে। এর থেকেও অনুমান করা নিশ্চয়ই অন্যায় নয় যে বীরেন্দ্রনাথ নিজে স্টুটগার্ট সম্মেলনে যোগ দেন নি— সেখানকার আলোচনাদি সম্পর্কে যাবতীয় খবর তিনি পেয়েছিলেন শ্রীমতী কামার কাছ থেকেই।

১৯১০ সালের জুলাই মাসে বীরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য প্যারিসে চলে যান। সেখানে তিনি শ্রীমতী কামা, রানাজী প্রভৃতির সংগে যোগ দিয়ে 'বন্দেমাতরম্' ও 'তলোয়ার' পত্রিকা পরিচালনায় বিশেষ সহায়তা করেন। আর যা করতেন তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় ১৯১০ সালের জুন মাসে হায়দ্রাবাদের জনৈক শ্রীকিষণকে লেখা তাঁর এই চিঠি থেকে (গুপ্ত সংখ্যালিপিতে লেখা এই চিঠি মাঝপথে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে) :

"গত হপ্তা থেকে কোনো চিঠি পাচ্ছি না। এখানে তাই খুবই উদ্বেগ। কলকাতা যাবার আগে আমাকে চিঠি লিখো ও জানিয়ো হায়দ্রাবাদের অবস্থা কী দাঁড়াচ্ছে। কলকাতা গেলে আমার বন্ধু বিজয়ের সংগে দেখা কোরো— গুণু তার সংগে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবে। তখন আলাদা করে তার সংগে কাজকর্মের কথা আলোচনা কোরো ও বোলো সে যেন তোমায় আলাপ করিয়ে দেয় সুকুমারের সংগে। তাকে অর্থাৎ সুকুমারকে

বোলো যে আমি ওখান থেকে রাইফেল পাঠাতে পারি কিন্তু তার জন্যে দরকার কলকাতা বা চন্দননগরে একটা পুরোনো আসবাবপত্রের দোকান খোলা। তা হলে আমরা মাস কয়েক সেখানে আর-কিছু না পাঠিয়ে শুধু নানা আসবাবপত্র পাঠাতে থাকব, তার পর পাঠাব কাজের জিনিস। টাকাটা পাঠাতে হবে মাডাম কামার কাছে আর নির্দেশাদি ভালো হয় এখানে আসছেন এমন কোনো বিশ্বস্ত বন্ধু মারফৎ পাঠাতে পারলে। পরোয়ানা জারী হয়েছে বলে আমাকে ও রাও-কে কেটে পড়তে হয়েছে। গুণুর সঙ্গে দেখা করলে সে তোমায় সব কথা জানাবে।"—James Campbell Ker, *Political Trouble in India : 1907-1917*, পৃ. ১৯৮।

এ চিঠিতে উল্লিখিত 'গুণু' বীরেন্দ্রনাথের মেজো বোন, মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায়ের ডাকনাম, 'বিজয়' হলেন একদা 'অনুশীলন সমিতি'র সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ বিখ্যাত ব্যারিস্টার বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা 'বি. সি. চ্যাটার্জি' আর 'সুকুমার' 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের পুত্র, শ্রীসুকুমার মিত্র। সুকুমারবাবুর বয়স এখন ৮৫। তাঁকে এ চিঠি দেখালে তিনি বলেন যে ১৯১০ সালে একই দিনে তাঁদের ৬ কলেজ স্কোয়ারের বাড়ি এবং বি. সি. চ্যাটার্জি ও অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়িতে কেন খানাতল্লাসী হয়, তা এর থেকে বোঝা যায়।

রুশ, পোলিশ, আইরিশ, মিশরী ও তুর্কী বিপ্লবীদের সঙ্গেও বীরেন্দ্রনাথের যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে প্যারিসেই। আবার জ্যোরে, লুংগে প্রভৃতি যে-সব সমাজতন্ত্রী নেতা তখন লু'মানিতে পত্রিকার পরিচালনা করতেন তিনি তাঁদেরও সান্নিধ্যে আসেন এই সময়েই; এরই সূত্রে ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি যোগ দেন ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টি'তে।

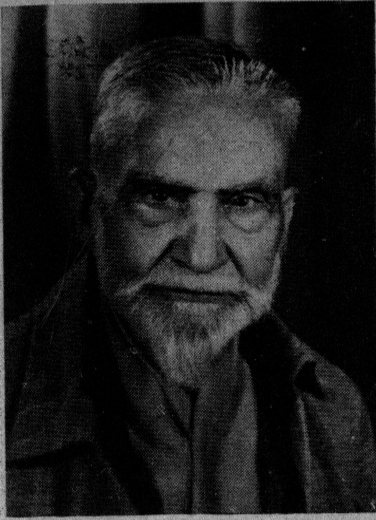
বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন অনুমান করেই সম্ভবত বীরেন্দ্রনাথ ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ ফ্রান্স ছেড়ে জার্মানি চলে যান। যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ও ডঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য উদ্যোগী হয়ে জার্মান পররাষ্ট্র বিভাগের ব্যারেন ওপেনহাইমের সঙ্গে একটা ১৫ দফা চুক্তি (অবিনাশচন্দ্রের পূর্বোল্লিখিত বইয়ে ছাড়া ঐ চুক্তির শর্তগুলি কিন্তু আর কোথাও দেখি নি) করেন জার্মানির সাহায্যে ভারতে বিদ্রোহ ঘটানোর উদ্দেশ্যে। এই চুক্তির সূত্রে ভারতীয় ও

জার্মান উভয় পক্ষকে নিয়ে গোড়ায় একটি 'ভারতবন্ধু জার্মান সমিতি' গঠন করা হল। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই ঐ সমিতির জায়গায় শুধু ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত হয় Indian Independence Committee বা I. I. C. (সংক্ষেপে 'বার্লিন কমিটি' নামে সুপরিচিত)। ১৯১৫-১৬ সাল পর্যন্ত ঐ কমিটির সম্পাদক ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ, তারপর ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রথম দিকে কমিটির সভাপতি ছিলেন ডঃ মনসুর কিন্তু ঐ সভাপতির পদ বিলুপ্ত করা হয় কিছুদিনের মধ্যেই। এই সময় থেকেই লণ্ডন ও প্যারিসের জায়গায় প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের কেন্দ্র হয়ে ওঠে বার্লিন।

বীরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে গোড়ার থেকেই চেষ্টা শুরু হল সমস্ত প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের ও তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জার্মানির অস্ত্র ও অর্থ সাহায্যের খবর সমেত দেশে ফেরত পাঠানোর। আমেরিকায় যে-সব বিপ্লবীরা কাজ করতেন— বিশেষ করে সেখানকার বিখ্যাত গদর পার্টির সংগে যোগাযোগের জন্য পাঠানো হল ধীরেন্দ্র-কুমার সরকার (অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের ভাই) ও এন. এস. মারাঠেকে। আবার এঁদের যোগাযোগের ফলে লালা হরদয়াল, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, তারকনাথ দাশ, বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, জীতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী প্রমুখ বিপ্লবী আমেরিকা থেকে বার্লিনে এলেন। (চম্পকরমণ পিল্লাই ও ডঃ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত তো প্রথমেই সুইজারল্যাণ্ড থেকে পৌঁছে গিয়েছিলেন বার্লিনে এবং দাদা চানজী কেরসাম্প, গোপাল পরাঞ্জপে, ডঃ সুকতাঙ্কার, সিদ্দিকি, কারণ্ডিকার, মনসুর আহম্মদ, রহমান, শোভান প্রভৃতির সংগে মিলে যোগ দিয়েছিলেন 'বার্লিন কমিটি'তে। পরে সতীশচন্দ্র রায়, সম্ভাশিব রাও, ডঃ যোশী, শ্রীশচন্দ্র সেন, জীতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ও ডঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, কেদারেশ্বর গুহ ও আরো কয়েকজন কমিটির নির্দেশ নিয়ে জার্মানি থেকে ফিরে গেলেন ভারতবর্ষে। (দ্র. ডক্টর অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, "বার্লিনের ভারতীয় বিপ্লব কমিটির কথা", দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকা, ৩০ মার্চ ১৯৫২)।

'বার্লিন কমিটি' আমেরিকার 'গদর পার্টি'র সংগে যেমন যোগাযোগ করে তেমনি আবার বাগদাদ, সুয়েজখাল, পারস্য ও আফগানিস্তানে ঐ চারটি বিপ্লবী মিশন পাঠায়। ১৯১৫ সালের গোড়াতেই কমিটি মৌলানা বরকতুল্লা, তারকনাথ দাশ ও পার্শী বিপ্লবী দাদা চানজি কেরসাম্পের নেতৃত্বে একটি দলকে ইস্তাম্বুলে

১৯১৫ সালে কাবুলে প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার



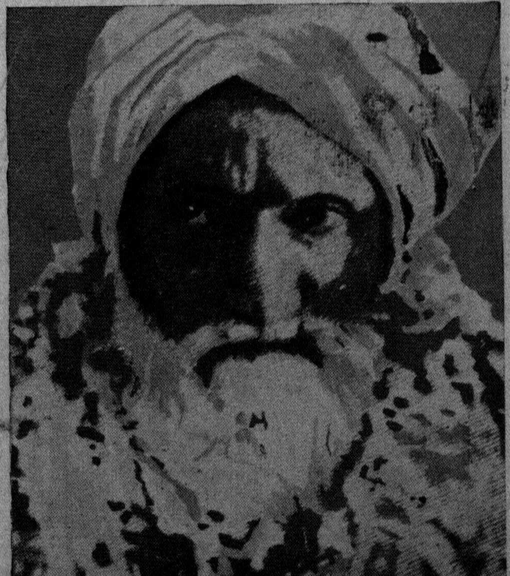
(উপরে) অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেণ্ট, মহেন্দ্রপ্রতাপ। দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ৬৫-৬৬ ও ৯০-৯৫।
('অজয়-ভবন' সংরক্ষণশালার সৌজন্যে)



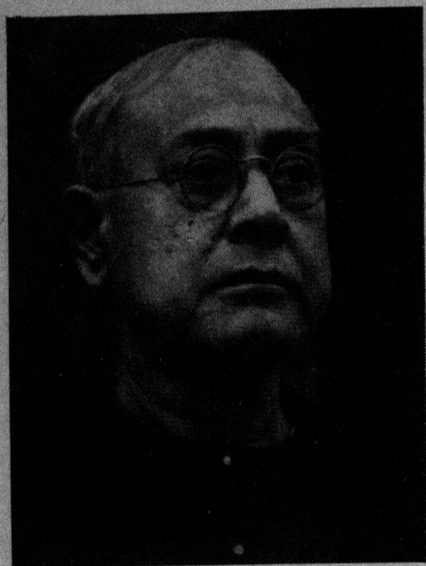
(মাঝে) অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী মৌলানা বরকতুল্লাহ্। দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ৯৫-১০০।



(বামে) অস্থায়ী সরকারের প্রশাসন বিভাগের শীলমোহর।

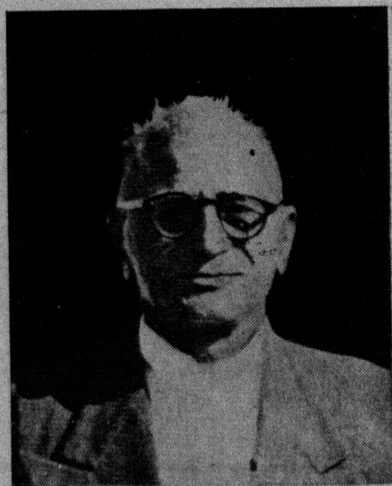


(নিচে) অস্থায়ী সরকারের প্রশাসন মন্ত্রী, মৌলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী। দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ১০৫-'০৯।
('অজয়-ভবন' সংরক্ষণশালার সৌজন্যে)



(উপরে) ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত।

(শ্রীরণজিৎ সাহার সৌজন্যে)



(মাঝে) ডাঃ পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে।

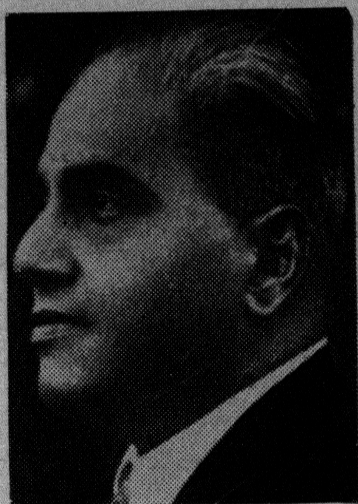
দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ২১৯-'২৩।



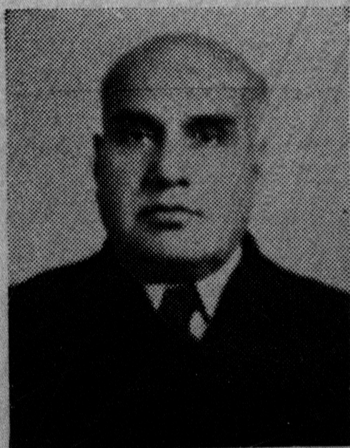
(নিচে) সুরেন্দ্রনাথ কর।

দ্রষ্টব্য ॥ ২৩১-'৩২।

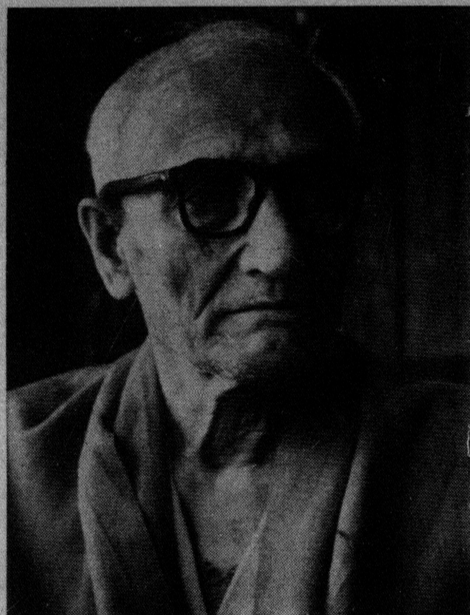
(মহাজাতি সদন প্রকাশিত 'মৃত্যুঞ্জয়ী' থেকে।)



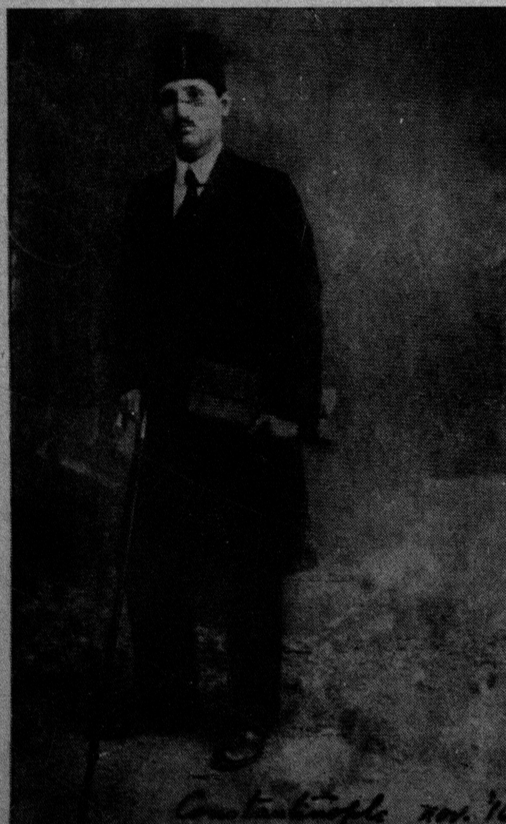
প্রমথনাথ ('দাউদ আলি') দত্ত—১৯২১ সালে সোভিয়েত দেশে পৌঁছবার সময়ে। দ্রষ্টব্য॥ পৃঃ ৩২৪-'২৬। (শ্রীইগর দাউদোভিচ্ দত্তের সৌজন্যে)



প্রমথনাথ ('দাউদ আলি') দত্ত—মৃত্যুর কিছুদিন আগে। (শ্রীইগর দাউদোভিচ্ দত্তের সৌজন্যে)



(উপরে) শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (৮৪ বছর বয়সে) দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ৩১৮-'২১। (শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সৌজন্যে)



(নিচে) শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (২৮ বছর বয়সে—'মির্জা আলি হাইদারের' ছদ্মবেশে)। (শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সৌজন্যে)

পাঠায় সারা পশ্চিম এশিয়ার বিপ্লবী কাজকর্ম চালানোর প্রকৃষ্ট পন্থা অনুসন্ধানের জন্য—বিশেষ করে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে-সব সিপাহী সেনাবাহিনী ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন বা তুর্কীদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন তাঁদের নিয়ে একটি বিপ্লবী বাহিনী গড়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে। ডঃ মনসুরের নেতৃত্বে যে বাগদাদ মিশন পাঠানো হয় তারা ঐরকম একটি বাহিনী গড়েও তোলে শ'খানেক সিপাহীর। ১৯১৬ সালে কুতালমারার পতনের খবর পেয়ে বীরেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ ইস্তাম্বুল যান এবং সেখান থেকে বীরেন্দ্রনাথ দাশ-গুপ্তের (ইনি এখনো জীবিত—বয়স ৮৫ চলছে) সঙ্গে এস্কিশের ও কেনিয়া সামরিক শিবিরে বন্দী ভারতীয় সিপাহী ও অফিসারদের সঙ্গে দেখা করেন—তাঁদের নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সুভাষচন্দ্রের 'আজাদ হিন্দ ফৌজে'র মতো একটি জাতীয় মুক্তিবাহিনী গড়ার উদ্দেশ্যে। এই-সব প্রচেষ্টা কিন্তু তেমন সার্থক হতে পারে নি শেষ অবধি।

সুয়েজ খাল অঞ্চলে যে মিশনটি যায় তার মধ্যে ছিলেন প্রতিবাদী আচার্য, তারকনাথ দাশ, বীরেন দাশগুপ্ত প্রভৃতি বিপ্লবী। তাঁরা সেখানে ইংরেজ-অধিকৃত অঞ্চলে নাশকতামূলক কাজকর্ম চালান এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন বিভিন্ন আরব শেখদের।

পারস্য মিশনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত মারাঠি বিপ্লবী পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে, প্রমথনাথ (দাউদ আলি) দত্ত, আগাশে (বা 'মহম্মদ আলি') কেরকাম্প, হৃষিকেশ লাট্টা, সুফী অম্বাপ্রসাদ প্রমুখ বহু খ্যাতনামা বিপ্লবী। মনে রাখতে হবে ঐ সময়ে পারস্যের বহু অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ছিল। ফলে এঁদের প্রতি পদে লড়াই করতে হয়েছিল এবং খান-খোজে ও দাউদ আলি দত্ত, আগাশে ও হৃষিকেশ লাট্টা ছাড়া অন্য অনেক বিপ্লবীরাই সেদিন ইংরেজের হাতে ধরা পড়ে প্রাণ হারান শেষ পর্যন্ত।

আফগানিস্তানে যে ভারত-জার্মান-তুর্ক মিশন পাঠানো হয়েছিল তার নেতা ছিলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ। বরকতুল্লা, জার্মান প্রতিনিধি ফন হেণ্টিজ, তুর্কি প্রতি-নিধি কাসিম বে প্রভৃতির সঙ্গে এই মিশন কনস্ট্যাণ্টিনোপল হয়ে কাবুলে পৌঁছয় ১৯১৫ সালের ২ অক্টোবর তারিখে। এঁদের সঙ্গে কাবুলে যোগাযোগ ঘটে বিখ্যাত বিপ্লবী মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীর। এইখানেই ১৯১৫ সালের ১ ডিসেম্বর স্থাপিত হয় অস্থায়ী এক স্বাধীন ভারত সরকার (তার সভাপতি

মহেন্দ্রপ্রতাপ, প্রধানমন্ত্রী মৌলানা বরকতুল্লাহ্, স্বরাষ্ট্রসচিব ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, পররাষ্ট্রসচিব চম্পকরমণ পিল্লাই, সমরসচিব মৌলানা মহম্মদ বশির ইত্যাদি। শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২২ সালে কাবুলে অধ্যাপনা করতেন। তিনি আমাকে বলেছেন যে তিনিও নাকি হয়েছিলেন ঐ সরকারের একজন দপ্তরহীন মন্ত্রী।) বৃটিশ সরকারের প্রতি আফগান সরকারের মনোভাবের তারতম্য অনুসারে ঐ অস্থায়ী সরকার ও ভারত-জার্মান মিশন কাজ করতে পেরেছিল অনিয়মিতভাবে ও কমবেশি পরিমাণে। ১৯১৮ সালের ২৩ মার্চ ঐ মিশন কাবুল থেকে ফিরে আসে বার্লিনে। মহেন্দ্রপ্রতাপ সেখানে কাইজারের কাছে এক রিপোর্ট দাখিল করেন ঐ কাবুল মিশনের। (দ্র. পরিশিষ্ট ৬)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডন ও প্যারিসের বদলে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়ে ওঠে বার্লিন। 'গদর' দল অবশ্য এর বেশ কিছু আগে থেকেই ঘাঁটি গেড়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ক্রমে ল্যাটিন আমেরিকারও কোনো কোনো দেশে। যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গে তাদের তৎপরতা আরো ব্যাপক হয়ে ওঠে। 'বার্লিন কমিটি' যেমন একদিকে সুয়েজ খাল এলাকায়, বাগদাদে, পারস্যে ও আফগানিস্তানে 'মিশন' পাঠাতে থাকে, 'গদর' দলও তেমনি তখন ভারতবর্ষে প্রায় হাজার খানেক কর্মী পাঠায় এবং দূর ও দক্ষিণ-পূর্ব প্রাচ্যের দেশ— জাপান, চীন, হংকং, যবদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশে যোগাযোগ স্থাপনের কাজেও উদ্যোগী হয়। অবশ্য এই জায়গা-গুলিতে বাংলা দেশের বিপ্লবীরা সরাসরি লোক পাঠিয়েও ঘাঁটি গাড়ার চেষ্টা করেন কিছুটা। আর 'বার্লিন কমিটি' যে যুদ্ধের সময়ে 'গদর' দলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে এবং উভয় দলের মিলিত পরিচালন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিল তা তো আগেই দেখা গেছে।

দেশের মধ্যেও ঐ সময়ে বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে একযোগে কাজ করার প্রবণতা কিছুটা দেখা যায়, তবে পুরো ঐক্য স্থাপিত হয় নি শেষ পর্যন্ত।

দেশের ও প্রবাসের ভারতীয় বিপ্লবীদের ঐ ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের পিছনে ছিল যুদ্ধের ফলে বৃটেনের সংকটগ্রস্থ অবস্থার সুযোগ গ্রহণের ইচ্ছা আর এই ব্যাপারে জার্মানির মতো প্রবল শক্তির সহায়তা পাওয়ার ভরসা। ঐ সাহায্যের খবর এমন-কি, আর্থিক সাহায্য নিয়ে বার্লিন কমিটি ও 'গদর' দল উভয়েই ভারতবর্ষে তাদের প্রতিনিধি পাঠায় বিপ্লবী দলগুলির কাছে তো বটেই, কিছুটা কংগ্রেসের

চরমপন্থী নেতাদের কাছেও। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে' (পৃঃ ১৭২) লিখেছেন :

"মহামতি বালগঙ্গাধর তিলকের নিকট বার্লিন কমিটি যে অর্থ ও বৈপ্লবিক সংবাদ পাঠাইয়াছিল তাহা সঠিকভাবেই উপনীত হইয়াছিল। ১৯২৫-২৬ খৃস্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের গৌহাটি অধিবেশনে পুনার চিত্রশালা প্রেসের স্বত্বাধিকারী 'বাসু কাকা' লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপরোক্ত সংবাদ দেন।"

এ ছাড়া বিভিন্ন দফায় দেশে বিপ্লবীদের কাছে যে টাকা পাঠানো হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। তবে জাহাজ-ভর্তি অস্ত্র পাঠানোর প্রতিশ্রুতি যে ব্যর্থ হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত, সে কথা সকলেই জানেন।

দেশে ও বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের ঐ মিলিত প্রচেষ্টা যুদ্ধের মাঝামাঝি সময় অবধি বেশ প্রবলভাবেই চলেছিল। এমন-কি, 'ম্যাভেরিক' 'লারসেন' ও 'হেনরী এস' জাহাজের অস্ত্র প্রেরণের চেষ্টার ব্যর্থতা ও তারই সূত্রে (আসল নাম 'জ্যোতীন্দ্র' হলেও যতীন্দ্র নামেই সুপরিচিত —গ্রন্থকার) 'বাঘা যতীন' ও তাঁর সঙ্গীদের শহীদত্ব-বরণ আর অন্যদিকে ১৯১৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহ-প্রচেষ্টার নিষ্ফলতা ও সেই সূত্রে রাসবিহারীর দেশত্যাগ ও জাপান-যাত্রার পরেও ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনকে পুরোপুরি পরাস্ত করতে পারেন নি সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচণ্ড পীড়ন নীতি। জার্মানির হাতে ঐ সময়ে মিত্রবাহিনীর নাজেহাল হওয়ার খবর বিপ্লবীদের উৎসাহ কিছুটা প্রজ্বলিত রেখেছিল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও।

কিন্তু ১৯১৭ সালের গোড়ায় টের পাওয়া গেল যে জার্মানির পক্ষে জয়লাভ সহজ হবে না মোটেই। বিশেষ করে যুদ্ধে আমেরিকার মিত্রপক্ষে যোগদানের পর বার্লিনস্থ প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের মনে হয়তো জার্মানির পরাজয়ের সম্ভাবনার কথাও উঁকিঝুঁকি দিয়ে থাকবে আর সেইসঙ্গে সে-ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থা কী দাঁড়াবে, তার সম্পর্কে কিছুটা দুশ্চিন্তাও।

অন্যদিকে জার্মান সরকারের তরফ থেকে যে রাজপুরুষেরা বার্লিনে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন তাঁদের কারো কারো ব্যক্তিগত আচরণে এবং জার্মানদের আরোপিত কিছু কিছু বিধিনিষেধেও বিপ্লবীরা সেদিন সম্ভবত অস্বাচ্ছন্দ্য, এমন-কি, বিক্ষুব্ধও বোধ করছিলেন কিছুটা। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা হয়তো পরিষ্কার হবে।

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে' (পাদটীকা, ৭) লিখেছেন :

"চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থলেখককে (অর্থাৎ বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে —গ্রন্থকার) বলিয়াছিলেন, পররাষ্ট্র বিভাগের সহকারী সচিবের মন ভারত বিষয়ে খৃস্টান মিশনারীদের পুস্তক পড়িয়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। রাজনীতির খাতিরে তিনি কার্যারম্ভ করিতে (অর্থাৎ ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ করতে —গ্রন্থকার) ব্যবস্থা করেন। ১৯১৭ খৃস্টাব্দে ইঁহার সঙ্গে লেখকের আলাপ হয়, তিনি বলেন, ভারত কখনও স্বাধীন হইতে পারিবে না।"

আর-একটি দৃষ্টান্ত। ১৯১৫ সালের ১০ এপ্রিল রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের নেতৃত্বে 'বার্লিন কমিটি'র একটি মিশন বার্লিন ছেড়ে রওনা হয় কাবুলের উদ্দেশ্যে। ঐ মিশনে জার্মান প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন ডাঃ ফন হেণ্টিজ। মহেন্দ্রপ্রতাপ কাবুল থেকে বার্লিনে ফিরে ডাঃ হেণ্টিজ সম্পর্কে জার্মান সরকারের কাছে নালিশ জানান যে সরকারের কতকগুলি জরুরি চিঠি হেণ্টিজ মাঝপথে পারস্যে ফেলে আসায় ভারতীয় মিশনের কাজ খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অস্থায়ী ভারত সরকারের প্রধান মন্ত্রী, মৌলানা বরকতুল্লাহ্ ও হেণ্টিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান এইভাবে :

"দুর্ভাগ্যক্রমে হের অটো ফন হেনটিজ্‌কে পাঠানো হয়েছিল আমাদের মিশনের সঙ্গে। আমাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে, এমন-কি, কুমার সাহেব (অর্থাৎ মহেন্দ্রপ্রতাপ —গ্রন্থকার) ও আমার মতের বিরুদ্ধে তিনি যে ভ্রান্ত নীতি চালান তার ফলেই শুধু আফগানিস্তানের নয়, পারস্যেও তেমন ফল লাভ পাওয়া সম্ভব হয় নি। আমাদের তিনজনের (অর্থাৎ মহেন্দ্রপ্রসাদ, বরকতুল্লাহ্ ও হেনটিজ্ —গ্রন্থকার) এক কার্মাটর হাতে না দিয়ে ফন হেনটিজের মতো এক ব্যক্তির হাতে টাকাকড়ির সমস্ত ভার দেওয়া ভুল হয়েছে"—(কাইজার সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের ফন ভেসেন্‌ডেঙ্কের কাছে ১৯১৬ সালের ২১ মে তারিখে নেতা মৌলানা বরকতুল্লাহ্‌র চিঠি, জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত দপ্তরের প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন ভারত-জার্মান-বৃটিশবিরোধী কার্যকলাপ সংক্রান্ত ৩৯৯ সংখ্যক মাইক্রোফিল্ম)।

এই-সব কারণেই জার্মান গবেষক, ডাঃ হর্স্ট ক্রুগার ঐ সময়কার অবস্থা

সম্পর্কে তাঁর "Socialist Ideas and Indian Revolutionaries Abroad" প্রবন্ধে লিখেছেন :

"জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে গিয়ে কোনো কোনো ভারতীয় বিপ্লবী জার্মানির তরফ থেকে ভারতীয় প্রশ্নকে যেভাবে দেখা হচ্ছে, তার সম্পর্কে সমালোচনামূলক ও উত্তরোত্তর মোহভঙ্গের মনোভাব গ্রহণ করতে থাকেন। শুধু তাই নয়, ভারতীয় বিপ্লবীরা প্রুশীয় রাজ-পুরুষদের উদ্ধত ব্যবহারেও বিশেষ ক্ষুব্ধ বোধ করছিলেন। তবে ঐ-সবেরই পিছনে ছিল জার্মানির প্রাচ্যনীতির মূল তত্ত্বগুলি।

"সেই সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারটিও প্রকট হয়ে ওঠে যে বার্লিন থেকে পরি-চালিত ভারতীয় প্রচার যে বিড়ম্বিত ও স্বল্পফলপ্রসূ হচ্ছিল তার কারণ তার ঘাড়ে চাপানো ছিল জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বোঝা। 'বার্লিন কমিটি' তাই জার্মানির সহায়তায় একটি শাখা-দপ্তর খোলে নিরপেক্ষ সুইডেনের স্টকহল্‌মে শহরে।"

পরে অবশ্য ভারতীয় বিপ্লবীদের ঐভাবে স্টকহল্‌মে কেন্দ্র গাড়তে অনুমতি ও সাহায্য দেওয়ার জন্য জার্মানদের যে আফসোস করতে হয়েছিল তা একটু পরেই দেখা যাবে।

প্রসঙ্গত প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে বীরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সুভাষচন্দ্র বা আউঙ্গ সানের মতো বিপ্লবী জননেতার অভিজ্ঞতা ও মানসিকতার হয়তো তুলনা চলে কিছুটা (দ্র. পরিশিষ্ট ৭)।

ওদিকে ১৯১৬ সালের মে মাসেই কিন্তু লেনিন লিখেছিলেন :

"...জার্মান পত্রিকাগুলি প্রচণ্ড দাপটে বিদ্বেষভরা উল্লাস, ফুর্তি ও উদ্দীপনায় লিখে চলেছে ভারতবর্ষের মুক্তি-আন্দোলনের কথা।

"জার্মান বুর্জোয়ারা কেন যে বিদ্বেষপূর্ণ উল্লাসে ডগমগ, তার কারণ সহজেই ধরা যায় : ভারতে অসন্তোষ ও বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন প্ররোচিত ক'রে তারা ভরসা করে তাদের সামরিক অবস্থানের উন্নতিসাধনের।...

"জার্মান উগ্র জাতীয়তাবাদীদের মিথ্যাচারের জড় নিহিত রয়েছে বৃটেন-কর্তৃক অত্যাচারিত জাতিগুলির স্বাধীনতা সম্পর্কে তাদের সাড়ম্বর সহানুভূতি ঘোষণায় আর অমায়িক ভাবে, কখনো কখনো বড়ই অমায়িক

ভাবে তাদের নিজ জাতি-কর্তৃক অত্যাচারিত জাতিদের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে মৌন অবলম্বনে।"—*Collected Works*, খণ্ড ২২, পৃ. ১৮২-৮৩।

রুশ-বিপ্লবের মতো বিপুল ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা সেদিন বীরেন্দ্রনাথের মতো ভারতীয় বিপ্লবীর মনকে ঠিক ঐ আশাভঙ্গের মুহূর্তেই আকৃষ্ট করেছিল প্রবলভাবে। সে প্রসঙ্গে আসার আগে তার ভাবনাগত পৃষ্ঠপটটা একটু বিশদ করে বলা দরকার এখানে।

১৯৩৪ সালের ১৮ মার্চ লেনিনগ্রাডের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সভায় বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের যে বক্তৃতার উল্লেখ ইতিমধ্যেই করা হয়েছে তার থেকে জানা যায় যে ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টির সদস্য হন। সেখানেই তিনি প্রথম লেনিনের কথা শোনেন শ্রীমতী কামার কাছে। কিন্তু তবু তাঁর ভাষায় "আমরা কেউই তখন বুঝি নি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মধ্যেকার বিভেদ (আসন্ন বিশ্বযুদ্ধ, উপনিবেশ প্রভৃতির প্রশ্নে মনোভাব এবং ধনতন্ত্র ক্রমশ যে রূপ ধারণ করছে তার চরিত্র অনুধাবন ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পদ্ধতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক বিপ্লবী ও সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে ব্যবধান ও সংঘাত —গ্রন্থকার) আর লেনিনের ভূমিকার বিপুল তাৎপর্য।"

ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টির খাতায় নাম লেখালেও আসলে কিন্তু তিনি তাই 'তখন ও তার পরেও বহু বছর ধরেই ছিলেন জাতীয় বিপ্লবী'। তাই যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুর শত্রুকে মিত্রজ্ঞান করে তিনি (ও অবিনাশ ভট্টাচার্য) সেদিন অনায়াসে চুক্তি করেছিলেন কাইজার সরকারের সঙ্গে। সে চুক্তিতে জার্মানি ভারতবর্ষে বিদ্রোহ ঘটানোর জন্য বিপ্লবীদের আর্থিক ও সামরিক সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি জানাল। ১৫ দফার সেই চুক্তিপত্রের ১০ম ধারাটি ছিল এই :

"আমাদের বিপ্লব সফল হইলে ভারতে সাম্যবাদী (জানি না মূল বয়ানে 'Communist' বা 'Socialist' কোন্ শব্দের এটি তর্জমা—গ্রন্থকার) প্রজাতন্ত্রশাসন প্রবর্তন করা আমাদের অভিপ্রেত হইবে, তখন অস্ট্রো-জার্মান শক্তি তাহাতে বাধা দিতে পারিবেন না।"—ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা', পৃ. ১৪৬।

সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সঙ্গে পরিচয়ের ছাপ এই ধারাতে কিছুটা পরিস্ফুট

যদিও সাম্রাজ্যবাদী জার্মানির সহায়তায় ভারতবর্ষে 'সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার কল্পনা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অবাস্তব।

১১-সংখ্যক ধারাটিতেও কিছুটা প্রগতিশীল ভাবনার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সেটি এই রকম :

"ভারতে বহু শক্তিশালী নৃপতি আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোনো নৃপতি সমগ্র ভারতে কিংবা তাঁহার রাজ্যমধ্যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগী হইলে অস্ট্রো-জার্মান শক্তি তাঁহাদিগকে সাহায্য না করিয়া আমাদের পরিকল্পিত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠারই সাহায্য করিবেন" (পৃ. ১৪৬)।

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বদেশী আমলে বিপ্লবীদের সংশ্লিষ্ট ধারণা সম্পর্কে তাঁর বইয়ে যে কথা একদা উল্লেখ করেছিলেন এটি নিশ্চয়ই তার চাইতে চিন্তার দিক দিক থেকে অগ্রগতির পরিচায়ক। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

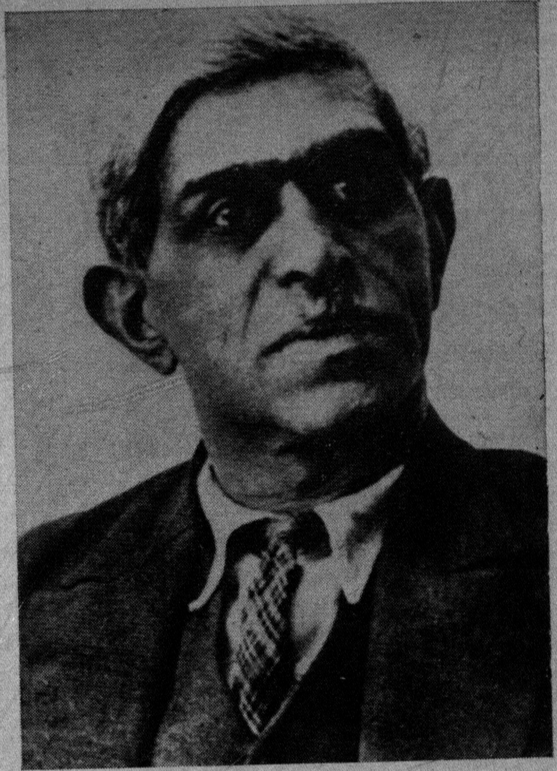
"শাসন-প্রণালী বিষয়ে এই মন্তব্য শুনিয়াছিলাম, ভারতবর্ষ একটি নিয়মতন্ত্রানুযায়ী (Constitutional) সাম্রাজ্য হইবে ; কিন্তু আমাদের দলের অনেকেরই এ বিধান পছন্দ হয় নাই। আমরা বলিতাম বাংলায় আমরা রাজা ফাজা মানি না,— বাংলা সম্বন্ধে কি বিধান হইয়াছে ? ইহার উত্তর পাইতাম— বাঙালীর জন্য সাধারণতন্ত্রের ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা বলিতাম, সমস্ত ভারতের জন্য এই বিধান হইল না কেন ? ইহার এই উত্তর পাইতাম যে, দাক্ষিণাত্য, রাজপুতানা প্রভৃতি প্রদেশ ঘোর রাজতন্ত্রবাদী! তবে স্বাধীন ভারতের শাসনপ্রণালী আমেরিকায় যুক্ত সাম্রাজ্য ও জার্মানির শাসনপ্রণালীর মাঝামাঝি একটি প্রণালী, এক প্রকারের Bundestatt হইবে। একদিন দেবব্রত বসুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অরবিন্দ ঘোষের কি মত ? তিনি বলিলেন 'ঘোষ মহাশয় দক্ষিণাপথ হইতে আসিতেছেন— তিনি রাজতন্ত্রবাদী'। আসল কথা, এই বিধানে আমরা কেহ কেহ সন্তুষ্ট হই নাই। ইহাতে দেবব্রত বসু বলিতেন, আমাদের এ বিষয়ে ভাবিবার বা মাথা ঘামাবার দরকার নাই ; নেতারা···প্রকাণ্ড মস্তিষ্কশালী ব্যক্তি ; তাঁহারা এ বিষয়ে সব ভাবিয়া চিন্তিয়া শাসনপ্রণালী ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।"
—'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম', পৃ. ৩০-৩১।

সে যাই হোক, এ-সব ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার সংগে অল্পবিস্তর পরিচয় ঘটলেও বীরেন্দ্রনাথ বা ভূপেন্দ্রনাথের মতো

ভারতীয়েরা তখনো আসলে ছিলেন, বীরেন্দ্রনাথের ভাষায়, নিছক 'জাতীয় বিপ্লবী'। কথাটা ভূপেন্দ্রনাথও পরে স্বীকার করে গেছেন এইভাবে :

" ...ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা জার্মান বাদসাহী গভর্নমেন্টের সহিত কাজ করিয়াছে বা তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া অনেক ইউরোপীয় কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টরা তাঁহাদের প্রতি ঘৃণায় অঙ্গুলি নির্দেশ করেন, কিন্তু ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা বুর্জোয়া ন্যাশানালিস্ট। ব্যক্তিগত-ভাবে কেহ কেহ অন্য কিছু হইতে পারেন। তাঁহারা 'সমাজ বৈপ্লবিক' নহেন, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের শত্রুর সহিত মিত্রতা স্থাপন করা তাঁহারা রাজনীতিসংগত ও সমীচীন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাহাতে বিপ্লববাদের পবিত্রতার হানি হয় নাই বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।"
—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', পৃ. ১৪।

ডাঃ দত্ত অনেক যুক্তির পর শেষ পর্যন্ত এই ভাবে তাঁদের প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধকালীন কাজকর্মের একটা সমর্থন দাঁড় করিয়েছিলেন। মনে হয় জাতীয়তা-বাদী দেশপ্রেমিকের পক্ষে তখন অমন ধরনের চিন্তা হয়তো স্বাভাবিক ছিল একান্তই। তবে তিনি যে তারপর বহুদূর এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন তাঁর চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মে তার প্রমাণ তাঁর দেশে ফিরে মার্কসবাদ প্রচার এবং কৃষক ও মজুর আন্দোলন গড়ার কাজে নামাই শুধু নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তাঁর 'সোভিয়েত সুহৃদ সংঘে'র নায়কত্ব-গ্রহণও।



(উপরে) বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ২৩৮-'৪৩। (শ্রীমতী করুনোভ্‌স্কাইয়া-র সৌজন্যে)



(নিচে) বীরেন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী, লিডিয় এ ডো য়া র্ডো ভ্‌ ন করুনোভ্‌স্কাইয়া। দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ২৩৮-'৪৩ (শ্রীমতী করুনোভ্‌স্কাইয়া-র সৌজন্যে

ীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-
ংক্রান্ত তিনটি দলিল ঃ—
উপরে) ১৯৩৩ সালে
কমিণ্টার্নে'র দপ্তর থেকে
ভারতবর্ষে বৃটিশ ঔপ-
নিবেশিক নীতি বিষয়ে
মালমশলা সংগ্রহের জন্য
বী রে ন্দ্র না থে র কাছে
বিজ্ঞান একাডেমির চিঠি।

АКАДЕМИЯ НАУК СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
МУЗЕЙ АНТРОПОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

17 апреля 1933 г. №59/52

УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Институт Антропологии и Этнографии Академии Наук СССР удостоверяет, что научный сотрудник I-го разряда ЧАТОПАДА Вирендранат командируется в г.Москву для получения из Коминтерна материалов по колониальной политике в Индии.

Срок командировки - с 19-го по 24-ое апреля 1933г.

Директор Института /МАТОРИН/

Ученый Секретарь /ВИННИКОВ/

(মাঝে) সর্বোচ্চ সোভিয়েত
সামরিক আদালত কর্তৃক
বীরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে
অভিযোগগুলি পুন-
বিচারে ভুল প্রতিপন্ন
হওয়ার ও তার ফলে
তাঁকে পূর্ব-মর্যাদায়
পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করার
দলিল (১৯৫৮)।



РСФСР

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ

НОБ № 059875

Причина смерти [illegible]

Место смерти: город, селение [illegible] область, край, район [illegible]

Место регистрации [illegible]

Дата выдачи [illegible] 1958

(নিচে) বীরেন্দ্রনাথের
মৃত্যুর তারিখ ৬ই
এপ্রিল, ১৯৪৩ কিন্তু
কারণ অজ্ঞাত--এই মর্মে
সরকারী ঘোষণার দলিল
(১৯৫৮)।
দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ২৩৮-'৪৩।
(শ্রী ম তী লি ডি য়া
এ ডো য়া র্ডো ভ্ না
ক রু নো ভ্ স্কা ই য়া- র

Военная Коллегия
Верховного Суда
Союза ССР

15 сентября 1958 г.

Форма № 30

СПРАВКА

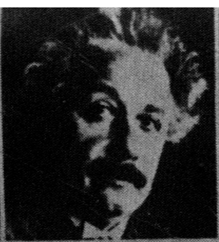
Дело по обвинению ЧАТОПАДАЯ Вирендраната Агорнатовича пересмотрено Военной Коллегией Верховного Суда СССР [illegible] апреля 1956 года.

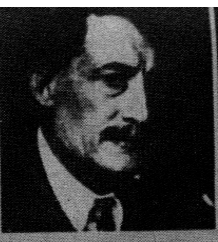
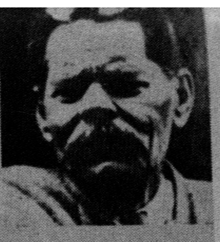
Приговор Военной Коллегии от 2 сентября 1937 года в отношении ЧАТОПАДАЯ В.А. по вновь открывшимся обстоятельствам отменен и дело о нем производством прекращено за отсутствием состава преступления.

ЧАТОПАДАЯ В.А. реабилитирован посмертно.

НАЧАЛЬНИК СЕКРЕТАРИАТА ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ
ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ
/[illegible]/
























'League against Imperialism'-এর নেতৃবর্গ (১ম সারি, বাম থেকে দক্ষিণে—শ্রীমতী সুন ইয়াট্-সেন, আইনষ্টাইন, আপটন সিন্‌ক্লেয়ার, আঁরি বারবুস, গর্কি। ৩য় সারি, বাম থেকে দক্ষিণে, প্রথম—বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ৪র্থ সারি, বাম থেকে দক্ষিণে,



ব্রাসেলস সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মেলন, দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ২৩৯-'৪১।
অন্যান্যদের সঙ্গে ভারতীয় প্রতিনিধিদল। মাঝে জওহরলাল ও কমলা নেহরু, তাঁদের পিছনে বীরেন্দ্রনাথ এবং ডানদিকে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে বাকের আলি মির্জা ও মৌলানা বরকতুল্লাহ্।



ব্রাসেলস সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলী

প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী : স্টকহল্মে

১৯১৭ সালের ১৭ মে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বার্লিন কমিটির শাখা প্রতিষ্ঠাকল্পে স্টকহল্ম পেঁছিন (প্রতিবাদী আচার্যও ঐ সময়ে তাঁর সঙ্গী হন স্টকহল্মে)। তাঁর যে বক্তৃতার উল্লেখ এর আগেই করা হয়েছে তাতে আছে :

"সেখানে আমি বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মানুষের ভীড় দেখতে পাই। আমি খোঁজ করি লেনিন তখনো ওখানে আছেন কি না। লেনিনের সাক্ষাৎ না পাওয়ায় আমি খুবই হতাশ হই।"

লেনিন সম্পর্কে বীরেন্দ্রনাথের এই নব-উদ্দীপিত আগ্রহের কারণ নিঃসন্দেহেই ইতিমধ্যে রাশিয়ায় ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবের সাফল্য। যুদ্ধের আগে ১৯১০ সাল তিনি যে শ্রীমতী কামার কাছে প্রথম লেনিনের নাম শোনেন তা আমরা আগে দেখেছি। তিনি ঐ সময়ে যোগও দিয়েছিলেন ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টিতে তবে সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের মধ্যে প্রকৃত বিপ্লবী ও সুবিধাবাদী ঝোঁকের বিভেদের ব্যাপারে মাথা ঘামান নি তেমন। আসলে তিনি যে মূলত জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীই থেকে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথ অনুসরণ। লেনিন-অনুসৃত জিমারভাল্ড আন্দোলন বা জার্মানিতে যে বিপ্লবী সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটেরা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলছিলেন (অর্থাৎ পরবর্তী দিনে যাঁরা প্রথমে 'স্পার্টাকুস লীগ' ও পরে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন) তাঁদের সঙ্গে যোগ না দিয়ে তিনি তখন কাইজার সরকারের সঙ্গে চুক্তি করলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের আশায়। তবে তিনি যে চোখ-কান একেবারে বন্ধ রাখেন নি এবং ঘটনাপ্রবাহে তাঁর মনের গতি ক্রমশ কোন্‌দিকে ফিরছিল, তা বোঝা যায় তাঁর এই কথায় :

"বছরের পর বছর কাটতে লাগল। আমি যুদ্ধের বছরগুলিতে খবর শুনলাম লেনিনের সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থানের আর জার্মানির বুকের উপর দিয়ে তাঁর সেই বিখ্যাত 'বন্ধ ট্রেনে' যাত্রার।"

ঐ ঐতিহাসিক বন্ধ ট্রেনে যাত্রার ঠিক আগেই কিন্তু ফেব্রুয়ারি-বিপ্লব

ঘটে গিয়েছিল রাশিয়ায় আর তার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বীরেন্দ্রনাথ পেঁছিলেন স্টকহল্‌মে। সেখানে লেনিনের সাক্ষাৎ তিনি পান নি কারণ লেনিন একদিন মাত্র স্টকহল্‌মে থেকে ১৩ এপ্রিল (পুরোনো পাঁজি অনুসারে ৩১ মার্চ) রওনা হয়ে গিয়েছিলেন পেট্রোগ্রাডের (অর্থাৎ আধুনিক লেনিনগ্রাডের) পথে।

ইতিমধ্যে বীরেন্দ্রনাথের মন যে অন্য দিকে ধাবিত হয়েছিল তার প্রমাণ শুধু তাঁর ঐ বক্তৃতা নয়, আমাদের জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত সুইডেনের বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের বৃটিশ সরকারের কাছে প্রেরিত গোপন এই খবরেও ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে :

"সম্প্রতি খবরের কাগজে (গোপনীয় ১৫৯৫ নং) বার্লিন থেকে ভি. চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এখানে কয়েকজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর আগমন সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। চট্টোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন তিনি শান্তি প্রচার নিয়ে ভাবিত নন— তিনি কাজ করছেন ভারতের বৃটিশ-নিয়ন্ত্রণ-বর্জিত স্বাধিকারের জন্যই।

"আমি কাল খবর পেয়েছি যে ফিনিশ ও বিভিন্ন রুশ জাতি উপজাতিদের প্রতিনিধিবর্গের প্ররোচনায় শীঘ্রই একটি 'জাতীয়তা সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হবে আর তা'তে যোগ দেবেন ঐ ভারতীয়রা।

"সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে এর পিছনে আছে জার্মানরা এবং এর উদ্দেশ্য হল লেনিন অথবা অন্য কোন ইংরেজ-বিরোধী চরমপন্থীকে দিয়ে রাশিয়ায় ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে কাজ করানো" (*Home Pol. Depcsit, Proceedings*, July, 1917, No. 41)।

অর্থাৎ বীরেন্দ্রনাথ সেদিন লেনিনের সাক্ষাৎ না পেলেও তাঁদের লেনিনের সংগে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য গোপন থাকেনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছেও। তাঁরা অবশ্য তখনো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের সমর্থন খুঁজেছিলেন বিচিত্র ধরনের মানুষের কাছ থেকে। একদিকে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্‌রো উইলসনের কাছেও যেমন তিনি চিঠি লিখেছেন (দ্রষ্টব্য উমা মুখোপাধ্যায়, *Two Great Indian Revolutionaries*, পৃ. ২৪৩) তেমনি আবার স্টকহল্‌মে তিনি ও প্রতিবাদী আচার্য ঐ উদ্দেশ্যেই যোগাযোগ করেছিলেন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের দক্ষিণপন্থী নেতাদের সংগেও। কিন্তু

সেখানে যে সুবিধা হয় নি শেষ অবধি তার প্রমাণ বার্লিন-কমিটির কাছে লেখা বীরেন্দ্রনাথের ৩০ মে ১৯১৭-র চিঠি :

"আমাদের সকলেরই মনোভাব এই যে পদানত জাতিগুলির প্রশ্নকে সমাজতন্ত্রীরা সচেতনভাবে উপেক্ষা করছে অথবা ঠেকিয়ে রাখছে।" (অধ্যাপক ক্রুগারের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ)।

অনেক ঠেকে ঠেকে শেষ পর্যন্ত

"...১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি যোগাযোগ করি পেট্রোগ্রাডের সঙ্গে। তারপর এল অক্টোবর-বিপ্লব— সে বিপ্লব আমার পরবর্তী জীবনের চূড়ান্ত নিয়ামক শক্তি। ১৯১৮ সালে কমরেড রেনস্কি (Wrenski) আমায় একটা টেলিগ্রাম পাঠান যাতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল পেট্রোগ্রাড যাওয়ার। নানা কারণে—এখানে তার সবিস্তার বিবরণে অনেক সময় লাগবে—আমি কিন্তু মস্কো পৌঁছতে পারি নি ১৯২০ সালের নভেম্বরের আগে"। —বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত বক্তৃতার রিপোর্ট।

কী কারণে বীরেন্দ্রনাথ তখন সোভিয়েত ইউনিয়নে যেতে পারেন নি তা বোঝা যায় অধ্যাপক ক্রুগারের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধের এই অংশ থেকে :

"জার্মান সরকার সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে এই-সব যোগাযোগ এ যাবৎ কিছুটা উদারভাবে সহ্য করে আসছিল, দপ্তর মনে করেছিল যে রাশিয়ার সহযোগিতায় ভারতীয়দের ইংরেজ-বিরোধী প্রচার পোষকতা করবে জার্মান সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের। কিছুদিন পরেই শুধু জার্মান কর্মচারীরা উপলব্ধি করলেন যে বলশেভিকদের সঙ্গে যোগাযোগ ভারতীয় বিপ্লবীদের সাধারণ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিকেই জোরালো করেছে। ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের মধ্যে বেশ-কিছু মানুষ জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সম্ভাব্য বিকল্প-শক্তি হিসাবে সোভিয়েত রাশিয়াকে দেখতে শুরু করেছেন, এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্তিত হয়ে গেলে ভারতীয়দের প্রতি জার্মান মনোভাব।

"১৯১৮ সালের গোড়ায় চট্টোপাধ্যায় সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রণা দপ্তরের কাছ থেকে এক আমন্ত্রণ পান পেট্রোগ্রাড সফরের। গোড়ার দিকে জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের এতে অনুকূল মনোভাবই দেখা যায়। কিন্তু ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঐ দপ্তর সিদ্ধান্ত জানায় সে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। জার্মান সরকারের এই আকস্মিক মত-পরিবর্তনে চট্টোপাধ্যায় তাঁর বার্লিনস্থ

কমরেডদের লেখেন : '…আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি এটা হচ্ছে এমন এক ক্ষেত্র যেখানে জার্মানির খেলায় আমাদের ধরা হচ্ছে দাবার ঘুঁটি হিসাবে, যাকে ব্যবহার করা চলে তাদের প্রয়োজন মতো। এটা ঠিক যে ট্রইয়ানোস্কি (চট্টোপাধ্যায়ের সংগে স্টকহল্মে যোগাযোগ ঘটেছিল এমন এক রুশ বলশেভিক —গ্রন্থকার) অন্য যে-কোনো সাম্রাজ্যবাদের মতোই জার্মান-সাম্রাজ্যবাদেরও বিরোধী। কিন্তু এটা প্রকৃতপক্ষে কোনো কারণ হতে পারে না ভারতীয় লক্ষ্যসাধনের জন্য—আর সেভাবেই ইংলণ্ডের বিরুদ্ধেও —আমাদের কাজ করতে না পারার। আমরা নিজেরাও কি যে-কোনো ধরনের সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী নই ?…ব্যাপার যা দাঁড়াচ্ছে তাতে জার্মান সরকার সাধারণভাবে জাতিসমূহের ও বিশেষ করে ভারতীয় জাতির প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, তাদের আফ্রিকাস্থিত উপ-নিবেশগুলির কথা তাদের মুখের উপর ছুঁড়ে মারার পরেও। প্রকৃতপক্ষে এখানে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে জার্মান সরকার আমাদের সত্যকার দেশপ্রেমিক মনে করেন, না শুধু যন্ত্র বা দাবার ঘুঁটি বা ভাড়াটে দালাল ভাবেন…?

"ভারতীয় বিপ্লবীদের এই নতুন দিকে নজর ফেরানোর ব্যাপারটা জার্মান সরকারের দৃষ্টি এড়ায় নি। ১৯১৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি পররাষ্ট্র দপ্তরে এক গোপন দলিলে দেখা যায় এই কথাগুলি : 'সাধারণ বিশ্বাসের দিক থেকে চট্টোপাধ্যায়ের স্থান প্রায় 'ম্যাক্সিমালিস্টদের' (অর্থাৎ বলশেভিকদের) কাছাকাছি। জার্মানির সংগে তিনি হাত মেলাবেন ততদিন যতদিন, তাঁর বিবেচনায়, সে সহযোগিতা ভারতবর্ষের পক্ষে সুবিধাজনক।"

এখানে চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লিখিত হলেও এই মোহমুক্তির প্রক্রিয়াটি যে ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে তখন কিছুটা ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রমাণও দাখিল করেছেন অধ্যাপক ক্রুগার। আমরা জানি 'বার্লিন কমিটি' ১৯১৫ সালে আফগানিস্তানে যে 'মিশন' পাঠায় তার নেতা ছিলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ। তিনি ১৯১৮ সালে বার্লিনে ফিরে এসে তাঁর মিশনের রিপোর্টও দাখিল করেছিলেন কাইজারের আছে। সেই মহেন্দ্রপ্রতাপ রুশ-বিপ্লবের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হন এবং ১৯১৯ সালের ৭ মে সাক্ষাৎ করেন লেনিনের সংগেও। জার্মান ভারত-তাত্ত্বিক, এইচ. ভি. গ্লাসেন্যাপ যুদ্ধের সময়ে জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করছিলেন। তিনি ১৯১৯ সালের বসন্তকালে রিপোর্ট করেন যে

মহেন্দ্রপ্রতাপ নাকি এক পুস্তিকা প্রকাশ করতে যাচ্ছেন যাতে তিনি জার্মানদের আহ্বান জানাবেন, 'স্পার্টাকুসপন্থীদের সঙ্গে যোগ দিতে ও সহযোগিতা করতে রুশ বলশেভিকদের সঙ্গে।' জার্মানির তদানীন্তন সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক সরকার মহেন্দ্রপ্রতাপের ঐ অভিমতকে 'জার্মানির আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ' বিবেচনা করে এবং তাঁকে 'ট্রটস্কির স্তুতিকার' বলে নিন্দা করে নাকি বন্ধ করে দেয় ঐ পুস্তিকা প্রকাশ।

অবশ্য ডাঃ গঙ্গাধর অধিকারী যখন গত ২৫ এপ্রিল ১৯৭০ তারিখে মহেন্দ্র-প্রতাপের সঙ্গে দেখা করেন তখন মহেন্দ্রপ্রতাপ এই ঘটনাটি ঠিক মনে করতে পারেন নি— শুধু জানিয়েছিলেন যে তিনি বহু পুস্তিকা লিখেছেন, হয়তো এটিও লিখে থাকবেন। তবে, এতে তিনি আশ্চর্যের কিছু দেখেন নি, কারণ তাঁর মতে ১৯১৮ সাল জার্মান-বিপ্লবের আগে অবধি জার্মান সরকার তো বল-শেভিকদের কিছুটা সহযোগিতাই করছিল, এমন-কি, লেনিনকেও দেশে ফিরতে দিয়েছিল জার্মানির ভিতর দিয়ে। ডাঃ অধিকারী এ-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে সোভিয়েতের সঙ্গে সহযোগিতার ব্যাপারটা বোঝা যায় কিন্তু 'স্পার্টাকুস-পন্থীরা' যে তখন কাইজারকেই হটাতে চাইছিল এবং কাইজারের পরে যে সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তারা তো জার্মানির নভেম্বর-বিপ্লবের (১৯১৮) পরে নৃশংসভাবে দমন করেছিল স্পার্টাকুসপন্থীদের।

সে যাই হোক, ভারতীয় বিপ্লবীদের এই নব চেতনার উদ্রেকে সেদিন বিশেষ বিচলিত বোধ করেছিলেন জার্মান রাজপুরুষেরা। ১৯১৮ সালের বসন্তকালে এক গোপন দলিলে তাঁরা ভারতীয় বিপ্লবীদের অভিহিত করছিলেন নৈরাজ্য-বাদী বা অত্যুগ্র সমাজতন্ত্রী ব'লে। তাঁরা এমন আশঙ্কাও করেছিলেন যে, ভারতীয় দেশপ্রেমিকেরা হয়তো এই সিদ্ধান্তেও পৌঁছতে পারেন যে ভারতবর্ষ জার্মানির কাছে যা পেতে পারে তার চাইতেইও বেশি প্রত্যাশা করতে পারে ইংলণ্ড-সমেত সারা পৃথিবীতে বলশেভিকদের বিপ্লবী আদর্শ সিদ্ধির ফলে।

অধ্যাপক ক্রুগার-সংগৃহীত এই-সব তথ্য থেকে হদিশ পাওয়া যায় যুদ্ধের শেষ পর্বে বার্লিনের ভারতীয় বিপ্লবীদের ক্রমিক মোহমুক্তির। এরই জন্য তিনি এমনও অনুমান করেছেন যে বার্লিন কমিটির স্টকহল্‌মে শাখা-দপ্তর খোলার উদ্দেশ্যে গোড়ার থেকেই হয়তো ছিল লেনিন ও বলশেভিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন।

প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছে রুশবিপ্লবের আকর্ষণ যে উত্তরোত্তর দুর্নিবার হয়ে উঠল তার কারণ সব রকমের সাম্রাজ্যবাদী নীতি তো বটেই, সেইসঙ্গে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সমস্ত দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব কর্তৃক অনুসৃত নীতির সঙ্গেও বলশেভিকদের আকাশ-পাতাল ব্যবধান— বিশেষ করে পরাধীন ও উপনিবেশের দেশগুলির প্রতি মনোভাবের দিক থেকে। প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার ভাবনায় সুপ্রতিষ্ঠ বলশেভিক নীতির পাকা বনেদের উপরে তাই গড়ে উঠতে লাগল সোভিয়েত ইউনিয়ন, ধনতান্ত্রিক দেশের শ্রমিক আন্দোলন এবং পরাধীন ও উপনিবেশের দেশগুলির জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের অচ্ছেদ্য মৈত্রীর বিশাল ইমারত। সাম্রাজ্যবাদের পদানত দেশগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে শুধু সাড়ম্বর ঘোষণাই নয়, কার্যক্ষেত্রেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘটাতে লাগল একটার পর একটা অভিনব কাণ্ড। প্রথমেই প্রকাশ করে দেওয়া হল জারতন্ত্রী রাশিয়ার সঙ্গে বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের সমস্ত গোপন চুক্তি—যুদ্ধের পর পরাস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অধীনে উপনিবেশের ভাগবাঁটোয়ারা সম্পর্কে। তারপর ভারতীয় বিপ্লবীরা শুনলেন পারস্য আফগানিস্তান, তুর্কি ও চীনের প্রতি সোভিয়েত রাষ্ট্রের আশ্চর্য সুসভ্য সমকক্ষশোভন আচরণের কথা, দেখলেন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ফলিয়ে কিভাবে ছোটো ফিনল্যাণ্ডকে সোভিয়েত জাতিসংঘের বাইরে চলে যেতেও দেওয়া হল অকাতরে, তাঁরা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করলেন সমস্ত পরাধীন দেশের নিপীড়িত মানুষের প্রতি সোভিয়েত রাষ্ট্রের আন্তরিক দরদ ও সহমর্মিতা।

'বার্লিন কমিটি'র সদস্যদের সকলকে সেদিন যে বিশেষ করেই নাড়া দিয়েছেল সোভিয়েত নীতির এই দিকটা, তার কারণ তাঁরা সকলেই ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে উদ্ভূত জাতীয় বিপ্লবী। আর মধ্য ও দূর প্রাচ্যের অগণিত দুস্থ মানুষকে, এমন-কি ইংরেজের ভারতীয় বাহিনীর সিপাহী-দের অনেককেও রুশ-বিপ্লব ঐ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বাণী ছাড়াও সেদিন আকৃষ্ট করেছিল সম্ভবত ভূমিহীনকে চাষের জমি জোগানোর প্রতিশ্রুতির টান। কারণ শত শত বছরের কোটি কোটি ভূমি-বুভুক্ষু কৃষকের কাছে এর চাইতে বড়ো আকর্ষণ আর কী হতে পারে আর সিপাহীরা তো আসলে উর্দীপরা কৃষকই।

সে যাই হোক, বার্লিন ও স্টকহল্‌ম কেন্দ্রের ভারতীয় বিপ্লবীরা সেদিন

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ব্যাপারেই উৎসাহী হয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন সোভিয়েতের সংগে যোগাযোগ স্থাপনে। যেমন, ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবের পর অথচ অক্টোবর-বিপ্লবের আগে 'স্টকহল্মের ভারতীয় জাতীয় সমিতি' (Indian National Committee of Stockholm) এই তার পাঠায় পিটার্সবুর্গ সোভিয়েতের কাছে :

"বিপ্লবী রাশিয়া স্থায়ী শান্তির জন্য চেষ্টা করছে সমস্ত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণে অধিকারের ভিত্তিতে। কিন্তু প্যারিসে প্রেরিত মিঃ স্কোবোলেভকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার সংগে ঐ প্রচেষ্টার সংগতি নেই কারণ ঐ নির্দেশ ভারতবর্ষ ইজিপ্ট ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মৌলিক প্রশ্নের আদৌ কোনো স্থান নেই। ভারতীয়, ইজিপ্সিয়ান ও আইরিশরা পরিপূর্ণ মাত্রায় এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত যে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণে তাদের অনপনেয় (স্বাভাবিক) অধিকার রয়েছে। ঐ-সব জাতির ভিতরে মুক্তি-আন্দোলন এত প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছে যে তাদের সমস্যার সরাসরি সমাধান ছাড়া স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। রুশ-বিপ্লবের আদর্শের প্রতি আনুগত্যের নামে এবং রাশিয়ার তথ্য সমগ্র দুনিয়ার পক্ষে ভারতবর্ষের মুক্তি অর্জনের বিপুল তাৎপর্য বিচার করে আমরা প্যারিস-সম্মেলনেও শান্তি-আলোচনা চালানোর সময়ে ইংলণ্ডের নির্লজ্জ ও নৃশংস সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নির্ভীক সংগ্রাম চালানোর জন্য শ্রমিক ও সৈনিক সোভিয়েতদের কাছে অনুরোধ জানাই"
—*Der Neue Orient* নামের জার্মান পত্রিকায় দ্বিতীয় খণ্ড ১৯১৭, ১০৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।

মনে রাখতে হবে ঐ সময়ে সোভিয়েতগুলিতে প্রাধান্য ছিল মেনশেভিকদের ও তারই জন্য সমবেত প্রতিনিধির কাছে সংশ্লিষ্ট নির্দেশ পাঠানোর ব্যাপারে ঐ দুর্বলতা।

জার্মানি ও সোভিয়েত রাশিয়ার ব্রেস্ট-লিটভস্ক শান্তি-আলোচনাকালেও স্টকহল্ম-কমিটি সোভিয়েত প্রতিনিধিমণ্ডলীর কাছে একটি তার পাঠিয়েছিল, সেখানে ভারতীয় প্রশ্নটিকে তুলবার জন্য। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এ প্রসংগে লিখেছেন :

"ট্রটস্কি রুশ প্রতিনিধিদের নেতা ছিলেন। তিনি আয়ার্ল্যাণ্ড, ইজিপ্ট এবং ভারতের অধীনস্থ জাতিদের এই আত্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য দাবি করেন। তিনি বলেন, 'মধ্য-শক্তিরা তাহাদের অধিকার প্রদান করুক ;

মিত্রশক্তি অর্থাৎ রুশ, ফ্রান্স ও ইংলণ্ড সেই নীতি গ্রহণ করুক, আমরাও (রুশেরা) আমাদের অধীনস্থ জাতিদের প্রতি এই নীতি প্রয়োগ করিব।' ইহার ফলে ক্রুদ্ধ হইয়া জার্মান সেনাপতি হফমান বলেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ বলুন, আপনারা আমাদের ভূমি দখল করিয়া আছেন বা আমরা আপনাদের ভূমি দখল করিয়া আছি।' এই বক্তৃতা জার্মান সংবাদপত্রে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয় নাই…। ইহার পরই লেখক (অর্থাৎ ডাঃ দত্ত—গ্রন্থকার) শ্রীবীরেন্দ্রনাথের পত্র পান, 'ট্রটস্কি সুন্দরভাবে (splendidly) ভারতের পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন।' কিন্তু জার্মান সংবাদপত্রে তাহা চাপা দেওয়া হইয়াছিল। কয়েকদিন পরে সন্ধ্যাবেলায় কমিটির বাহিরের ঘরে লেখক দেখিলেন, একটি বৃহৎ কাগজে কোনো-এক অজ্ঞাত ছাপাখানায় মুদ্রিত ট্রটস্কির বক্তৃতাটি টেবিলে পড়িয়া আছে। লেখক আশ্চর্যান্বিত হইলেন, বে-আইনীভাবে মুদ্রিত এই কাগজ কোথা হইতে আসিল; বোধহয় বাড়ির চাকরাণী বা আর-কেহ অজ্ঞাতভাবে রাখিয়া গিয়াছে। এতদ্দ্বারা উপলব্ধি হয় যে ঐ সময় হইতেই জার্মানিতে অন্তঃসলিলারূপে কি প্রবাহিত হইতেছিল"—'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', পৃ ২৪৩-৪৪।

অর্থাৎ সদ্য-প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত রাষ্ট্রের মতো জার্মানির অন্তঃসলিলা স্পার্টাকুস আন্দোলনও সেদিন সমর্থন জানিয়েছিল ভারতবর্ষের জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে।

আর-একটি ঘটনারও উল্লেখ করা যেতে পারে এ-প্রসঙ্গে। প্রধানত সুইডিশ ও ওলন্দাজ (এঁরা ছিলেন নিরপেক্ষ দেশের লোক) সমাজতন্ত্রীদের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে আর কেরেনস্কি ও মেনশেভিকদের পরোক্ষ সহায়তায় ১৯১৭ সালের মাঝামাঝি একটি শান্তি-সম্মেলন আহূত হয়েছিল স্টকহল্মে। বীরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভারতীয় বিপ্লবীরাও যোগ দিয়েছিলেন ঐ সম্মেলনে। সেখানে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে সুবিধাবাদী সমাজতন্ত্রী প্রতিনিধিদের মনোভাবে তাঁরা আদৌ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। বরঞ্চ তাঁরা 'রাশিয়ার মুসলমানদের কেন্দ্রীয় সারা-রুশ কমিটি'র কাছে এই বাণীটি পাঠিয়েছিলেন সেদিন :

"নতুন ও পুরোনো দুনিয়ার চোখের সামনে বৃটিশদের নিষ্ঠুর দাসত্ব-নিগড়ে আবদ্ধ, নৃশংসভাবে নিপীড়িত এবং তাদের বাণিজ্যিক ও বৈষয়িক স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তাদের দ্বারা পশুর ন্যায় শোষিত ভারতবর্ষের সাড়ে

একত্রিশ কোটি মানুষ আজ উপলব্ধি করে যে তারা পৃথিবীর সব থেকে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী স্তম্ভটিকে চূর্ণ করতে পারবে—তাদের স্বাধীনতা অর্জন ও সংহত করে, তাদের সমস্ত চেষ্টা ও মানসিক শক্তিকে জাতীয় স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেই।

"সাধারণভাবে সমস্ত প্রাচ্য জাতির ঐক্য আর জারতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করেছে যে মুক্ত রাশিয়া বিশেষ করে তার সমর্থন ত্বরান্বিত করবে প্রাচ্য দেশগুলির রাজনৈতিক সাফল্য ও অগ্রগতিকে।

"আমরা ভারতীয়রা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই রাশিযার মুসলমানদের যাঁরা কদম বাড়িয়েছেন আমাদের লক্ষ্যসিদ্ধির পথে।"

এ বাণীটি পরে প্রকাশিত হয়েছিল বাকু শহরের 'কাস্পি' পত্রিকায় (১৯১৭ সালের ১৪-২৭ সেপ্টেম্বর সংখ্যায়)। ভারত-সরকারের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালকের ১৯১৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি তারিখের সাপ্তাহিক রিপোর্টে প্রদত্ত এই খবর পাওয়া যায় দিল্লীর পিপলস্ পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত *Lenin in Contemporary Indian Press* গ্রন্থে কমরেড পূরণচাঁদ যোশীর প্রবন্ধের ৫৮ পৃষ্ঠায়।

শুধু বার্লিন বা স্টকহল্মের ভারতীয় বিপ্লবীরাই নন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তখন যে-সব বিপ্লবীরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কয়েকজনও এই আবেদন পাঠান 'পররাষ্ট্র কমিশার লিয়ন ট্রট্স্কি মারফৎ রাশিয়ার শ্রমিক ও সিপাহীদের সোভিয়েতে'র কাছে :

"বিপ্লবী ভারতবর্ষ জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত, জনগণের নিজস্ব শাসন-ব্যবস্থার ধ্রুব আদর্শে অনুপ্রাণিত মুক্ত রাশিয়ার অভ্যুত্থানে উল্লাস জানায়। আমরা বিশেষভাবেই এ ব্যাপারটি উপলব্ধি করি যে সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম প্রয়াস জনগণের কল্যাণব্রতী শাসন প্রতিষ্ঠার। বিপ্লবী রাশিয়ার লক্ষ্যসিদ্ধির বিপক্ষে চক্রান্তকারী স্বৈরতন্ত্র ও সাম্রাজ্যতন্ত্রের জোট সভ্যতা ও মানবতার সাধনায় রাশিয়ার অবদানের বিশালত্বে আজ হতচকিত।...বিপ্লবী রাশিয়াকে তার আপন নীতির স্বার্থেই ভারতবর্ষের সংগ্রামকে তার নিজস্ব সাধনার অংগীভূত করে নিতে হবে। বিপ্লবী রাশিয়াকে দাবি তুলতে হবে—ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক, ভারত-বাসীকে সুযোগ দেওয়া হোক আত্মনিয়ন্ত্রণের।"

এ খবরেরও উৎস কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালকের ১৯১৮ সালের ২২ জুন তারিখের সাপ্তাহিক রিপোর্ট (পূর্বোক্ত গ্রন্থে কমরেড পূরণচাঁদ যোশীর প্রবন্ধ, পৃ. ৫৪-৫৫)। সেখানে এ খবরও দেওয়া হয়েছে যে, ঐ আবেদন পাঠানোর অপরাধে মার্কিন দেশে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তারকনাথ দাশ, শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীকে আর ঐ আবেদন নাকি ১৯১৭ সালের ১২ ডিসেম্বর প্রেরিত হয়েছিল Indian Nationalist Party র তরফে, 'টেগোর কাস্‌ল, কলিকাতা' এই ঠিকানা থেকে। এই ঠিকানার রহস্য অবশ্য এখনো অনুদ্‌ঘাটিত।

স্টকহল্‌মে 'বার্লিন কমিটি'র শাখা দেড় বছর ধরে যে কাজ চালায় তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায় প্রতিবাদী আচার্যের একটি রিপোর্টে। (দ্র. পরিশিষ্ট ৮)

ভারতীয় বিপ্লবী : পেট্রোগ্রাড ও মস্কোয়

প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা সেদিন শুধু দূর থেকে আবেদন পাঠিয়েই ক্ষান্ত হন নি। নানা দেশ থেকে তাঁরা একা একা বা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েছিলেন বিপ্লবতীর্থের উদ্দেশ্যে। এতদিন শুধু কেতাবেই যে বিপ্লবের কথা পড়া যেত তার বাস্তব চেহারার ও সে সার্থক বিপ্লবের অদ্বিতীয় নেতা, লেনিনের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয়ের অধীর আগ্রহে তাঁরা ছুটেছিলেন মস্কোর দিকে। অনেক রকম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দুর্গম পথে সেদিন যাঁরা অবশেষে পেঁছিছিলেন সোভিয়েত ভূমিতে, তাঁদের সকলের খবর এখনো জানা যায় নি, কোনোদিন সব জানা যাবে কিনা তাও অনিশ্চিত। তবু তাঁদের একটা কালানুক্রমিক তালিকা ও পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে এখানে।

'বার্লিন কমিটি'র নির্দেশে আফগানিস্তানে যে মিশন পাঠানো হয়েছিল তার প্রসঙ্গে মহেন্দ্রপ্রতাপ আফগানিস্তান থেকে জারতন্ত্রী রাশিয়ার সঙ্গে দুবার যোগাযোগের চেষ্টা করেন স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাহায্যলাভের আশায়। বলা বাহুল্য তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নি। বরং বৃটিশ সরকারের মিত্রশক্তি হিসেবে জার সরকার তাঁর দূতদের তো একবার তুলে দেয় বৃটিশের হাতে আর তারাও সঙ্গে সঙ্গে তাদের একজনকে গুলি করে মারে। ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবের পর মহেন্দ্রপ্রতাপ আর-একবার নতুন সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁকে রাশিয়ার ভিতর দিয়ে জার্মানি ফিরে যাবার অনুমতির জন্য। সে আবেদনও প্রত্যাখ্যান করে কেরেন্স্কি সরকার।

নভেম্বর-বিপ্লবের পর সদ্য-প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত সরকার কিন্তু মহেন্দ্রপ্রতাপকে অনুমতি দেয় রাশিয়ার ভিতর দিয়ে যাতায়াতের, এমন-কি, তাসখন্দ থেকে তাঁর পেট্রোগ্রাড পেঁছোনোর ব্যবস্থা হয় স্পেশাল ট্রেনে। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে মহেন্দ্রপ্রতাপ তাঁর ব্যক্তিগত পরিচারক, মুজিব আলিকে নিয়ে পেঁছন সোভিয়েত দেশে। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয় ট্রট্স্কি, জোফে প্রমুখ নেতাদের। তাঁরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন খোলাখুলি। ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের পরিচালকের সাপ্তাহিক রিপোর্টে জানা যায় যে, তিনি ১২ মার্চ (নতুন পাঁজি অনুসারে)

পেট্রোগ্রাডে এক বিশাল জনসভায় যোগ দিয়েছিলেন ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবের প্রথম বার্ষিক পালন উপলক্ষে।

মহেন্দ্রপ্রতাপের সেবার দেখা হয় নি লেনিনের সঙ্গে। তিনি সোভিয়েত দেশে ছিলেনও অল্পদিন। আসলে রাশিয়া হয়ে তিনি তখন পাড়ি দিচ্ছিলেন বার্লিনের পথে।

যে দুজন ভারতীয় সর্বপ্রথম লেনিনের সঙ্গে দেখা করেন বলে এখনো পর্যন্ত জানা গেছে তাঁরা হলেন আবদুল জাব্বার খৈরী ও আব্দুল সাত্তার খৈরী নামে দুই ভাই। বৃটিশ গুপ্তচরের হাত থেকে নিরাপত্তার জন্যই বোধ হয় তাঁরা সেখানে অধ্যাপক মহম্মদ হাদি ও অধ্যাপক আহ্মদ হাদি এই দুই ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন তবে এর মধ্যে কোন্ নামটি কার তা জানা যায় না। এঁরা ছিলেন দিল্লীর বনেদী বাসিন্দা। কিন্তু তাঁরা শুধু দুজনেই এসেছিলেন, না তাঁদের আরো সঙ্গী ছিলেন— কোন্ পথেই বা তাঁরা সোভিয়েত দেশে পেঁাছেছিলেন, তাই নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা রয়েছে এখনো অবধি। যেমন জাফর ইমাম তাঁর *Colonialism in East-West Relations* গ্রন্থের ১১৭-১৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি যে কয়েকজন ভারতীয় আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত দেশে পেঁাছন তাঁদেরই দুজন প্রতিনিধি নাকি ঐ সময় নাগাদ দেখা করেন লেনিনের সঙ্গে। তিনি সেখানে মহম্মদ হাদি ছাড়া অবশ্য অন্য কারো নাম উল্লেখ করেন নি। সোভিয়েত লেখক এ. ভ্যাসিলিয়েভ কিন্তু তাঁর "সোভিয়েত রাশিয়ায় ভারতীয় বিপ্লবী" প্রবন্ধে লিখেছেন যে, সাত্তার ও জাব্বার ১৯১৮ সালে এসেছিলেন সুইডেন থেকে। তিনি এঁদের কোনো সঙ্গী ছিলেন এমন ইঙ্গিত করেন নি। 'সোভিয়েত দেশ' পত্রিকার (সংখ্যা ৭, এপ্রিল ১৯৬৯) প্রবন্ধেও ঐ কথাই আছে। মস্কোর ইন্স্টিটিউট অফ মার্কসিজম-লেনিনিজম' সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত কেন্দ্রীয় পার্টি মহাফেজখানার সহকারী সংরক্ষক শ্রীযুক্ত আর. ল্যাভ্রভও আমায় জানান যে, খৈরী ভ্রাতৃদ্বয় এসেছিলেন স্টকহল্ম থেকে এবং তাঁরা নাকি সেখানে কাজ করতেন দোভাষীর।

জাব্বার ও সাত্তার খৈরীর সঙ্গে সে যাত্রায় আরো কোনো ভারতীয় ছিলেন কি না তা জোর করে বলা না গেলেও মনে হয় তাঁরা আফগানিস্তান নয়, এসেছিলেন সুইডেন থেকেই। তার কারণ যুদ্ধের সময়ে তাঁরা প্রধানত ছিলেন

তুর্কিতে তারপর জার্মানিতে এবং মস্কো-ফেরতা আবার জার্মানিতেই। জার্মানি থেকে সোভিয়েত দেশে পেঁছিতে হলে সুইডেনের পথই অপেক্ষাকৃত সুগম ছিল। মহেন্দ্রপ্রতাপ তাঁদের চিনতেন কিন্তু আফগানিস্তানে তাঁদের দেখেছেন; এমন কথা বলেন নি। অন্যদিকে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে' (পৃ. ৪৪ ও ১৮০) তাঁদের তুর্কি ও বার্লিনে উপস্থিতির কথা লিখেছেন।

সে যাই হোক, খৈরী ভ্রাতৃদ্বয় যে ১৯১৮ সালের ২৩ নভেম্বর লেনিনের সঙ্গে দেখা করেন, এটা সুনিশ্চিত। লেনিনের *Collected Works*-এও (খণ্ড ২৮, পৃ. ৫৪৩) লেখা হয়েছে '২৩ নভেম্বর লেনিন ভারতীয় জন-প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানান। তাঁরাও ভারতবাসীর পক্ষ থেকে অভিনন্দিত করেন সোভিয়েত সরকারকে। এখানে প্রতিনিধিদের নাম বা সংখ্যার উল্লেখ না থাকলেও পরের দিনের অর্থাৎ ২৪ নভেম্বর 'ইজ্‌ভেস্তিয়া' পত্রিকায় এঁদের উল্লেখ আছে যদিও সেখানেও সাক্ষাৎকারের কোনো বিস্তারিত বিবরণ মেলে না —শুধু বলা আছে যে তাঁরা লেনিনকে অবহিত করেন ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে।

এই ভারতীয় প্রতিনিধিরা এর আগেই ভারতীয় জনগণের পক্ষ থেকে একটি বাণী পেশ করেছিলেন সোভিয়েত পররাষ্ট্র দপ্তরের কাছে যাতে ছিল এই কথা :

"পৃথিবীব্যাপী গণতন্ত্রের স্বার্থে ভারতবর্ষ আপনাদের জয়লাভে অভিনন্দন জানায়। আপনারা যখন ক্ষমতা হাতে নিলেন তখন যে-সব মহৎ ও মানবিক নীতি আপনারা ঘোষণা করেন ভারতবর্ষ তাতে অভিভূত বোধ করছে। ঈশ্বরের কাছে ভারত প্রার্থনা জানায় ঐ মহৎ নীতিতে অবিচল থাকার মতো শক্তি তিনি আপনাদের দিন।" বাণীর পূর্ণ পাঠটি প্রকাশিত হয়েছে '*Velikii oktiabri narody vostoka*, Sboinik, Moscow, 1957-এর ২৬ পৃষ্ঠায় (জাফর ইমামের পূর্বোক্ত গ্রন্থের ১১৭ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

এই বাণী সম্পর্কে আর-একটি কথা। মস্কোর প্রগ্রেস পাবলিশার্স প্রকাশিত *History of the October Revolution* (*1966*)-এ (পৃ. ৪১৯) লেখা হয়েছে :

"...দিল্লীতে 'ভারতীয় মুসলিম জাতীয় লীগ' ভারতবাসীর পক্ষ থেকে

সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি একটি বাণী প্রস্তাবাকারে গ্রহণ করে। ঐ মর্মস্পর্শী দলিলটি ১৯১৮ সালে জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়েছিল বে-আইনী ভারতীয় পত্রিকায় এবং ঐ বছরের নভেম্বর মাসের আগে পৌঁছতে পারে নি মস্কোয়।"

খৈরী ভায়েরাই মনে হয়, সে বাণী সেদিন বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন সোভিয়েত দেশে। তবে 'ভারতীয় মুসলিম জাতীয় লীগ' নামক কোনো সংস্থার বা বে-আইনীভাবে তার বাণী প্রকাশের খবর আমাদের জানা নেই এ দেশে।

এই বাণী ছাড়াও ভারতীয় প্রতিনিধিরা লেনিনের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন একটি চন্দনকাঠের ছড়ি (তার হাতল ও ডগাটা হাতির দাঁতের)। ছড়িটি এখনো সযত্নে রক্ষিত আছে 'কেন্দ্রীয় লেনিন মিউজিয়ামে'।

লেনিনের সংগে সাক্ষাতের দুদিন পরে (অর্থাৎ ২৫ নভেম্বর, ১৯১৮ তারিখে) খৈরী ভায়েদের একজন 'সোভিয়েতের সারা-রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্য-নির্বাহক কমিটির এক অধিবেশনে বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতার পর ঐ কমিটির পক্ষ থেকে ইয়াকভ স্ভার্দলভ প্রস্তাব করেন যে ভারতবর্ষের জনগণের উদ্দেশ্যে একটি বাণী পাঠানো হোক' (দ্র. *History of the October Revolution*, পৃ. ৪১৯)। বাণীটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত পাঠানো হয়েছিল কিনা জানা যায় না। ভারতীয় প্রতিনিধিরা তারপর স্ভার্দলভের সংগে দেখা করে তাঁর হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। তার শুরুতেই আছে এ-ধরনের কথা:

"রুশ-বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ, আমাদের কমরেড ও ভাইসব! সাত কোটি মুসলমানের পক্ষ থেকে আপনাদের অভিনন্দন জানাতে আমরা সম্মানিত বোধ করছি।"

তারপর ভারতে বৃটিশ অত্যাচার ও শোষণের বিবরণ দিয়ে তাঁরা স্মারকলিপি শেষ করেছেন এই বলে:

"...আমরা রাশিয়ার কাছে প্রার্থনা জানাই তাঁরা যেন আমরা যাতে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারি তার জন্য সহায়তার হস্ত প্রসারিত করেন। সারা পৃথিবীকে মুক্তি ও অধিকার অর্জন করতে সাহায্য করা রাশিয়ার কর্তব্য। মানচিত্রে তাকিয়ে দেখুন কোটি কোটি ভারতীয় আজ অন্যের পদানত। আপনাদের সাহায্য আমাদের দাসত্বশৃংখল থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব করবে— এই আমাদের বিশ্বাস।"

১৯১৯ সালে জানুয়ারি মাসে মস্কো থেকে তাসখন্দে বেতার বার্তা পাঠানোর সময়ে তুর্কিস্তানের এক বৃটিশ গোয়েন্দা খবরটি ধরে পাঠিয়ে দেয় বৃটিশ সরকারের কাছে। আমাদের মহাফেজখানায় সংরক্ষিত সেই গোয়েন্দা রিপোর্টে স্মারকলিপিটি দেওয়া হয়েছে। ১৯১৮ সালের ২৬ নভেম্বর 'ইজ-ভেস্তিয়া'য়ও ওটি প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯১৮ সালে ৫ ডিসেম্বর মস্কোর 'হল অফ কলামসে' অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের এক সভায় আহ্মদ হাদি বক্তৃতা করেন। তার রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছিল ৭ ডিসেম্বরের 'ইজ্‌ভেস্তিয়া'য় সভায় নাকি সভাপতি ছিলেন গর্কি আর হাদির বক্তৃতা নাকি তর্জমা করেছিলেন কমিন্টানের প্রথম সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী বালাবানোভা (দ্র. ১৬ জুন ১৯৬৮ *Link* পত্রিকায় প্রকাশিত পূরণচাঁদ যোশীর প্রবন্ধ।)

খুব সম্ভব রুশ কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে (১৯১৯ সালে মার্চ মাস) জিনোভিয়েভ ঐ খৈরীদের ইঙ্গিত করেই দুজন ভারতীয়ের সাম্প্রতিক সফর এবং মস্কো পেট্রোগ্রাডে তাঁদের বক্তৃতার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে ভারতবর্ষের আন্দোলন 'বিশুদ্ধ কমিউনিস্ট আন্দোলন নয়, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—তাতে শুধু এখানে ওখানে একটু রঙ লেগেছে কমিউনিজমের' (E. H. Carr, *The Bolshevik Revolution, 1917-23*, Vol. 3. Penguin, ২৮৩ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

খৈরী ভায়েরা কে ছিলেন? আগেই বলা হয়েছে তাঁরা ছিলেন দিল্লীর বনেদী বাসিন্দা। তবে তাঁদের পরিবারে ওয়াহাবী বা অন্য কোনো বিপ্লবী মতের প্রভাব ছিল কি না জানি না। আসলে এ দেশে তাঁদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের কোনো খবরই আমার জানা নেই। তবে উপরে যা লেখা হল তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বৃটিশের বিরোধী হলেও তাঁদের সে-বিরোধ প্রধানত ছিল ধর্মের দিক থেকেই। তাঁদের নামের সঙ্গে যে সংস্থাটি জড়িত বলে এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে সেই 'ভারতীয় মুসলিম জাতীয় লীগ' নিশ্চয়ই মুসলমানের প্রতিষ্ঠান। স্মারকলিপিতেও দেখা যায় তাঁরা আবেদন জানাচ্ছেন 'সাত কোটি মুসলমানের তরফ থেকে। এই-সব লক্ষণ থেকে মনে হয় ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে' যে এঁদের প্যান্-ইসলামীয়ভাবে অনুপ্রাণিত' (পৃ. ১৮০) বলেছেন তা ঠিক। ভূপেন্দ্র-নাথ লিখেছেন :

"ইঁহারা প্যান্-ইসলামীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সিরিয়ায় বেইরুট নামক নগরে একটি স্কুল করেন। তথায় সেই স্কুলটি পাকাপাকি রূপে স্থাপনের জন্য চারিদিক হইতে অর্থ সংগ্রহ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে স্তাম্বুলে আসেন।...ইঁহারা দুই ভ্রাতা মিলিয়া স্তাম্বুলে 'ভারতীয় মোসলেম কমিটি' নামে একটি সমিতি স্থাপিত করেন" (পৃ: ১৮০-৮১)।

যুদ্ধের সময়ে তুর্কি জার্মানির পক্ষভুক্ত ছিল বলে স্বভাবতই এঁরা জার্মানির দিকে ঝোঁকেন। কাইজার যখন ঐ সময়ে স্তাম্বুল সফরে যান তখন সম্ভবত খৈরী ভায়েদের প্রতিষ্ঠিত ঐ ভারতীয় মোসলেম কমিটি'র পক্ষ থেকে তাঁর কাছে এ ধরনের এক বাণী পাঠানো হয় :

"...জার্মানিতে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের প্রতি...মহামহিম সম্রাট, আপনার উদার আতিথেয়তা, তাদের নমাজের সুবিধার জন্য মসজিদ স্থাপন ভারতবর্ষের ৮ কোটি মুসলমানের অন্তরে মহামহিম সম্রাটের প্রতি অনুরাগ নিশ্চিতভাবেই গভীরতর করে তুলেছে" ইত্যাদি—*Neue Orient* নামে জার্মান পত্রিকার প্রথম খণ্ড, ১৯১৭-১৮ ।

খৈরীরা যুদ্ধের সময়ে জার্মানি এসেছিলেন এবং তখন 'বার্লিন কমিটি'র সংস্পর্শে এসে কমিটিতে যোগদানও করেন। কিন্তু তার ফলে তাঁদের প্যান্-ইসলামিস্ট দৃষ্টিভঙ্গী যে পরিবর্তিত হয় নি তার প্রমাণ ডাঃ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে'র ৪৪-৪৫ পৃষ্ঠায় অনেকগুলি দাখিল করা হয়েছে। আবদুল জাব্বার খৈরী সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত লেখা হয়েছে 'শেষে কমিটির (অর্থাৎ 'বার্লিন কমিটি' —গ্রন্থকার) বিরুদ্ধে ক্রমাগত কর্ম করায় ও কমিটির অন্যান্য মুসলমান সভ্যদের প্রস্তাবে কমিটির সভ্যশ্রেণীর তালিকা হইতে তাঁহার নাম বাতিল করা হয়'।

মহেন্দ্রপ্রতাপও এক সাক্ষাৎকারে ডাঃ গঙ্গাধর অধিকারীকে জানিয়েছেন যে, খৈরীরা ছিলেন 'পাক্কা প্যান্-ইসলামিস্ট'।

এঁদের পরিণতি সম্বন্ধে যা জানা যায় তা এই—ডাঃ দত্ত তাঁর গ্রন্থের ১৮০ পৃষ্ঠায় লিখেছিলেন :

"...ডাঃ সাত্তার (সম্ভবত ইনি ছোটো-ভাই —গ্রন্থকার) দেশে ফিরিয়া আলিগড়ে অধ্যাপকের কর্মে নিযুক্ত হন। তিনি এক্ষণে গতায়ু হইয়াছেন (সম্ভবত ১৯৫৬ সালে —গ্রন্থকার); শ্রীজাব্বার ফকিরের ন্যায় একটি

দরগায় কাল যাপন করিতেছেন" (সম্ভবত ইনি আগেই মারা যান— গ্রন্থকার)।

অধ্যাপক ক্রুগার তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন :

"প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা সকলেই নীতিনিষ্ঠ সোশ্যালিস্ট হন নি। তাঁদের কেউ কেউ অল্প কিছুদিনের জন্য মাত্র ঝুঁকেছিলেন ঐ দিকে; আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন ও সোভিয়েত রাশিয়া যে নতুন সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছিল তাঁরা তার সুযোগ নিয়েছিলেন কিন্তু সরেও গিয়েছিলেন অল্প দিনের মধ্যেই। যেমন এই ব্যাপারই ঘটেছিল খৈরী ভায়েদের ক্ষেত্রে। তাঁরা ১৯১৮ সালের শেষে সোভিয়েত রাশিয়া গিয়েছিলেন আর সাক্ষাৎ করেছিলেন লেনিনের সঙ্গেও। তবু কয়েক বছর পরেই তাঁরা সে পথ থেকে সরে যান ও রফা করেন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে। এমন-কি, পরে সাত্তার খৈরী নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন ফ্যাসিস্টপন্থী হিসেবে।"

শোনা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি নাকি গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন ঐ কারণেই।

জাফর ইমাম তাঁর পূর্বোল্লিখিত বইয়ে (পৃ. ১১৮) লিখেছেন যে,

"১৯১৯ সালের গোড়ায় আর-এক দল ভারতীয় আফগানিস্তান থেকে সীমান্ত পেরিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় যান এবং কয়েক মাস পরে পৌঁছন মস্কোয়। এঁরা সকলেই মুসলমান ছিলেন আর ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের প্রতি তাঁদের বিরুদ্ধতা ছিল প্রধানত ধর্মীয় কারণেই।"

ভারতবর্ষ থেকে হিজরৎ (আত্মনির্বাসন) করে যে তরুণ মুসলমান মুহাজিররা ১৯২০ সালে দলে দলে আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন তাঁদের প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু জাফর ইমাম বর্ণিত ঐ ১৯১৯ সালের গোড়ায় সোভিয়েত সফরকারীরা কারা— কতজনই বা ছিলেন সেই দলে ?

জাফর ইমামের বইয়ে এ প্রশ্নের জবাব নেই। তবে তিনি দুজনের শুধু নাম উল্লেখ করেছেন ঐ সূত্রে— মৌলানা বরকতুল্লাহ্ ও মহম্মদ আবদুল্লা আনসারী। কিন্তু বরকতুল্লাহ্‌কে নিশ্চয়ই নিছক ধর্মান্ধ মুসলমান বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত না হলেও তিনি নিঃসন্দেহেই ছিলেন বিপ্লবী। তাঁর প্রসঙ্গে পরে আসব। মহম্মদ আবদুল্লা আনসারীকে জাফর

ইমাম বর্ণনা করেছেন ঐ দলের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলে। তিনি তুর্কিস্তান ও ককেসাস ঘুরে নাকি মস্কো পেঁছেছিলেন আর 'ইজভেস্তিয়া' (৬ মে, ১৯১৯) পত্রিকায় লিখেছিলেন : "রুশ প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে প্রাচ্যদেশের মৈত্রী যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিপুল শক্তি জোগাবে—এ কথা আর গোপন নেই। আমাদের পক্ষে, আমাদের অধিকার রক্ষা ও ন্যায্য দাবি অর্জনের পক্ষে ওটি একটি মস্ত নৈতিক শক্তি" (জাফর ইমামের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১১৯)।

মহম্মদ আবদুল্লা আনসারী সম্পর্কে আর-কোনো খবর আমাদের জানা নেই।

১৯১৯ সালের গোড়ায় আফগানিস্তান থেকে রুশ-বিপ্লবের আকর্ষণে যে ভারতীয় দলটি সোভিয়েত দেশে পেঁছয় তার মধ্যে মৌলানা বরকতুল্লাহ্ ছিলেন —সে কথা আগেই বলেছি। ইংরেজ গোয়েন্দাপ্রবর কর্নেল বেলি তাঁর *Mission to Tashkent* বইয়ে তাঁকেই ঐ দলের নেতা বলে বর্ণনাও করেছেন। কর্নেল বেলি ঐ সময়ে তাসখন্দে ছিলেন। তবু মনে হয় কথাটা ঠিক নয়। ডাঃ দেবেন্দ্র কৌশিক ঐ সময়কার সোভিয়েত নথিপত্র ঘেঁটে দেখিয়েছেন যে ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে যে দলটি তাসখন্দে পেঁছেছিল তার নেতা আসলে ছিলেন আবদুর রব পেশোয়ারী ("Indian Revolutionaries in Soviet Asia" প্রবন্ধ, *Link* পত্রিকা, ২৬ জানুয়ারি ১৯৬৬ সংখ্যা)। আবদুর রব প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা পরে বলা যাবে।

মৌলানা বরকতুল্লাহ্-র মস্কো পেঁছোনোর এক সপ্তাহ পরে মহেন্দ্রপ্রতাপ দ্বিতীয়বার আসেন সোভিয়েত দেশে। এর আগে, ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে তিনি যে আফগানিস্তান থেকে জার্মানি গিয়েছিলেন রাশিয়া হয়ে, তা আমরা আগেই দেখেছি। লিওনিড মিত্রোখিন নামে সোভিয়েত সাংবাদিকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে (*Soviet Land* পত্রিকা, সংখ্যা ৮, ১৯৬৮-তে প্রকাশিত) মহেন্দ্রপ্রতাপ বলেছেন যে সেবার জার্মানিতে পেঁছোনোর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি খবর পান বৃটেনের সঙ্গে আফগানিস্তানের তৃতীয় আফগান যুদ্ধের। খবর পেয়েই তিনি ব্যস্ত হয়ে ওঠেন— এই সুযোগে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার ব্যবস্থার জন্য। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন রাশিয়া হয়ে ফের আফগানিস্তান পেঁছোনো। অথচ জার্মানি থেকে সোভিয়েত দেশে

যাওয়া তখন সহজ ছিল না আদৌ। এক দিকে প্রায় দেশজোড়া গৃহযুদ্ধ, অন্যদিকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের ফলে ও-দেশের অবস্থা তখন চরম জটিল হয়ে উঠেছিল— বন্ধ ছিল তার পশ্চিমের প্রায় গোটা সীমান্তই।

অবশেষে বৃটিশ গোয়েন্দাদের অবিশ্রাম খবরদারী এড়িয়ে, বহু বাধা-বিপত্তির পর মহেন্দ্রপ্রতাপ পৌঁছলেন সোভিয়েত ভূমিতে। এক জার্মান প্লেন থেকে তাঁকে নামিয়ে দেওয়া হল এমন-এক জায়গায় যার অদূরেই তখন লড়াই চলছিল লালফৌজের সঙ্গে প্রতিবিপ্লবীদের। আরো দুই ভারতীয় বিপ্লবী, দলীপ সিং গিল ও প্রতিবাদী আচার্য‘ও কিছু পরে এসে সেখানে পৌঁছন— সম্ভবত ঐ একই উপায়ে।

১৯১৯ সালে ৭ মে মহেন্দ্রপ্রতাপের নেতৃত্বে এবার ভারতীয় বিপ্লবীদের দ্বিতীয় দল ক্রেমলিনে গিয়ে সাক্ষাৎ করে লেনিনের সঙ্গে। এই দলে ছিলেন মৌলানা বরকতুল্লাহ্, প্রতিবাদী আচার্য, আবদুর রব পেশোয়ারী, দলীপ সিং গিল ও ইব্রাহিম।

এই সাক্ষাৎকারের কোনো সরকারী বিবরণ সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এতাবৎ পাওয়া যায় নি। লেনিনের *Collected Works*-এর ২৯ খণ্ডে সংশ্লিষ্ট সময়ে লেনিনের কাজকর্মের যে রোজনামচা দেওয়া হয়েছে তাতেও ৭ মে তারিখের কোনো উল্লেখ নেই। ঐ প্রতিনিধি দলের অন্য কোনো সদস্য এ-ব্যাপারে কিছু ব’লে বা লিখে গেছেন বলেও জানি না। একমাত্র দলের নেতা, মহেন্দ্রপ্রতাপ সোভিয়েত ও ভারতীয় সাক্ষাৎকারীদের কাছে ইদানীং কয়েকবার কিছু খবর জানিয়েছেন এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে (যেমন *Soviet Land*, সংখ্যা ৮, ১৯৬৭-তে প্রকাশিত মিত্রোখিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, *New Times*, সংখ্যা ১০ ও ১৯৬৮-তে প্রকাশিত আই. এনড্রোনভের “Awakening East” প্রবন্ধ ইত্যাদি) আর তার উল্লেখ মাত্র করেছেন তাঁর আত্মজীবনী *My Life Story of Fifty-five Years*-এ। এ ছাড়া ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও এ সম্পর্কে একটি নতুন খবর জানিয়েছেন তাঁর *Dialectics of Land Economics of India* গ্রন্থে।

সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত ঐ সাক্ষাৎকার সম্পর্কে যা জানা গেছে তা সংক্ষেপে এই রকম : সাক্ষাৎকারের আগের দিন, অর্থাৎ ৬ মে (১৯১৯) সোভিয়েত পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে এক রাজকর্মচারী মহেন্দ্রপ্রতাপের কাছে এসে তাঁর লেখা

প্রত্যেকটি পুস্তক-পুস্তিকা দু কপি করে চেয়ে নেন। পররাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপক ভজ্‌নেসেন্‌স্কি প্রতিনিধি দলকে ক্রেমলিনে নিয়ে যান। লেনিন মস্ত একটি হল-ঘরে এঁদের সঙ্গে দেখা করেন। মহেন্দ্রপ্রতাপ বসেন লেনিনের পাশে। লেনিন প্রথমেই জানতে চান ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী অথবা রুশ কোন্‌ ভাষায় আলাপ চলবে। মহেন্দ্রপ্রতাপ বলেন 'আপনি এত ভালো ইংরেজী বলেন তাই ইংরেজীতেই হোক'। মহেন্দ্রপ্রতাপ তাঁর বই ***Religion of Love*** লেনিনকে উপহার দেন। লেনিন জানান, তিনি ঐ বই পড়েছেন—'ও হল তলস্তয়বাদ'। মহেন্দ্রপ্রতাপ তখন বুঝতে পারলেন যে আগের দিন যে বই তাঁর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল তারই একটি কপি লেনিন সেই রাত্রেই পড়ে ফেলেছেন। মহেন্দ্রপ্রতাপ বলেন, 'শ্রমিকদের সেবায় কল্যাণকর্ম পরিচালনার বাহন হিসেবে প্রকৃতি আপনাকে ব্যবহার করছে।' লেনিন বলেন, 'এটা আপনার ধারণা।' মহেন্দ্রপ্রতাপ তারপর লেনিনের কাছে তাঁর পণ্যমুদ্রা পরিকল্পনা পেশ করেন—অর্থাৎ গম, চাল, মাখন, কয়লা প্রভৃতিকে মুদ্রা হিসেবে চালাতে হবে সোনা-রুপার বদলে। লেনিন জানান, তিনি ব্যাপারটা বিবেচনা করে দেখবেন। লেনিন তারপর প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যদের পরিচয় জানতে চান। অধ্যাপক ভজ্‌নেসেন্‌স্কি রুশ ভাষায় তাঁকে কিছু বলেন। লেনিন তখন প্রত্যেক সদস্যকে একটি দুটি প্রশ্ন করেন।

সে প্রশ্নগুলি কী, তার জবাবে কে কী বলেছিলেন তার বিশদ কোনো খবর মহেন্দ্রপ্রতাপের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় নি। শুধু এনড্রোনভ তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে লিখেছেন যে ১৯১৯ সালের মে মাসে (তারিখের উল্লেখ নেই) 'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছোটো খবরে জানা গিয়েছিল যে সাক্ষাৎকারের সময়ে মৌলানা বরকতুল্লাহ্‌ নাকি লেনিনের কাছে আফগান সরকারের এক বে-সরকারী অনুরোধ পেশ করেছিলেন— বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের সাহায্য করার জন্য।

মহেন্দ্রপ্রতাপ বলেছেন, 'আমরা বিশ মিনিট মতো সময় কাটিয়েছিলাম কমরেড লেনিনের সঙ্গে। তিনি আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে হাত মেলালেন তারপর আমরা চলে এলাম।' মিত্রোখিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মহেন্দ্রপ্রতাপ এ ছাড়া আর যে খবরটি দিয়েছেন সেটি এই: লেনিন তাঁকে অনুরোধ করেন আফগানিস্তানের নব-নিযুক্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত, ইয়াকভ সুরিৎসের

সংগে আফগানিস্তানে যেতে। মহেন্দ্রপ্রতাপ সে অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন সানন্দে।

ডাঃ দত্ত এই সাক্ষাৎকার প্রসংগে যে নতুন চিত্তাকর্ষক খবর দিয়েছেন সেটি এই : প্রতিনিধিদলের সকলে আসন গ্রহণ করার কিছুক্ষণ পর হঠাৎ লেনিনের নজরে পড়ে একজন ভারতীয় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ইনি হলেন মৌলানা বরকতুল্লাহ্‌র পরিচারক, ইব্রাহিম— প্রভুর সামনে তিনি কী করে আসন গ্রহণ করেন! লেনিন তখনই তাঁকে ডেকে তাঁর পাশের এক চেয়ারে বসান। লেনিন অন্য সব সদস্যের মতো যখন তাঁকেও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন ইব্রাহিম তখন লেনিনকে উত্তর দেন ভাঙা ভাঙা রুশে। লেনিন তাতে অত্যন্ত খুশি হয়ে জানতে চান তিনি কে। ইব্রাহিম জানান তিনি পাঞ্জাবের এক কৃষক সন্তান। লেনিন তখনই দোভাষী ডাকিয়ে ইব্রাহিমের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করেন ভারতবর্ষের কৃষকদের অবস্থা ও তাদের উপরকার শোষণের রূপ সম্পর্কে। লেনিন এইভাবে বেশ কিছুটা সময় কাটান ইব্রাহিমের সংগে আলাপে।

ইব্রাহিম এখনো জীবিত আছেন কি না, তিনি দেশে ফিরেছিলেন কি না— কোনো খবরই আমাদের জানা নেই— মহেন্দ্রপ্রতাপও সঠিক বলতে পারলেন না। তবে শেষোক্তের কাছে শুনলাম যে ইব্রাহিম নাকি ছিলেন বৃটিশদের ভারতীয় বাহিনী থেকে পলাতক সিপাহী। ঐ প্রতিনিধি দলের নেতা বাদে কোনো সদস্যই আজ হয়তো আর জীবিত নেই। মহেন্দ্রপ্রতাপেরও বয়স এখন ৮৬ চলছে।

মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর *Memoirs*-এ (পৃ. ২৯০) এই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে যা লিখেছেন তারও উল্লেখ করা যেতে পারে এখানে। মানবেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> "১৯১৯ সালে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ কাবুল ছেড়ে বার্লিনের পথে পাড়ি দেন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে সেখানকার কেন্দ্রীয় বিপ্লবী কমিটির সংগে পরামর্শের জন্য। তিনি গেলেন রাশিয়ার মধ্যে দিয়ে। লেনিন তাঁকে অভ্যর্থনা জানান মস্কোয়। ঐ সাক্ষাৎকার খুবই মজার হয়েছিল। আমি তার এক সরাসরি বিবরণ পেয়েছিলাম খোদ লেনিনের কাছ থেকেই। মহেন্দ্রপ্রতাপ নাকি তাঁর যুবাবয়স থেকেই এই বিশ্বাসে আবিষ্ট ছিলেন যে তিনি একজন পয়গম্বর। কাবুলে থাকতে তিনি একটি ধর্ম-পুস্তিকা লিখেছিলেন

'প্রেমধর্ম'' নামে। তিনি তার এক কপি লেনিনকে দেন এই মন্তব্যসমেত যে তিনি যদি রাশিয়ায় নতুন শাসনব্যবস্থাকে ঐ বইয়ে উপস্থাপিত নীতির দ্বারা পরিচালিত না করেন তা হলে ব্যর্থ হবে বিপ্লব। লেনিন প্রতিশ্রুতি দেন ঐ বই পড়ে দেখার এবং সে সম্পর্কে তাঁর মত জানানোর জন্য গ্রন্থ-কারের সংগে আবার দেখা করার। দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারে তিনি প্রেমধর্মের প্রবক্তাকে পরামর্শ দেন ইংল্যাণ্ডে গিয়ে ঐ ধর্মপ্রচারের। তা ছাড়া তিনি এমন মন্তব্যও করেন যে বলশেভিকদের তো ঈশ্বরে মতি নেই, তারা তাই পয়গম্বরের হুঁশিয়ারিতে কান দেবে তখনই যখন তারা তাদের দেশে যা সম্পন্ন করেছে পয়গম্বর তাঁর দেশে তা সমাধা করেন।"

রসিকতা হিসেবে কাহিনীটি নিশ্চয়ই উপভোগ্য তবে ঘটনা হিসেবে কতটা বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। কারণ ঐটুকু লেখার মধ্যে সংশ্লিষ্ট অনেকগুলি খবরই তথ্য হিসেবে ভুল। যেমন মহেন্দ্রপ্রতাপের সংগে লেনিনের দুবার নয়, একবারই দেখা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত কাবুল ছেড়ে মহেন্দ্রপ্রতাপ রাশিয়ার ভিতর দিয়ে বার্লিনের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন ১৯১৯ সালে নয়, ১৯১৮ সালের মার্চ মাসে; তৃতীয়ত, সে-যাত্রা তাঁর আদৌ দেখা হয় নি লেনিনের সংগে। চতুর্থত, যেবার দেখা হয় সেবার তিনি কাবুল থেকে রাশিয়া হয়ে জার্মানি যাচ্ছিলেন না, জার্মানি থেকে রাশিয়া হয়ে ফিরছিলেন আফগানিস্তানে। এ-সব থেকে কেউ যদি অনুমান করেন যে আসলে মানবেন্দ্রনাথ এখানে লোভ সামলাতে পারেন নি একটা উপভোগ্য কাহিনী বলার, তা হলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। তবে কৌতুকটা নিরীহ প্রকৃতির হলে কাহিনী নিশ্চয়ই আরো উপভোগ করা যেত। আসলে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে প্রতিপক্ষকে হেয় করার বা সূক্ষ্ম চরিত্রহননের কৌশলে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নিপুণতার নমুনা তাঁর স্মৃতিকথায় শুধু এই একটাই নেই।

লেনিনের সংগে সাক্ষাৎকারী এই দ্বিতীয় ভারতীয় বিপ্লবীদলের সদস্যদের পরিচয় কিছুটা দেওয়া যেতে পারে এখানে। মহেন্দ্রপ্রতাপের কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি এখন দেরাদুনের বাসিন্দা— ৮৬ বছর বয়সেও মোটের উপর সক্রিয়। মাঝে কিছুদিন সদস্য ছিলেন লোকসভার। তাঁর বিচিত্র জীবনের অনেক কথা পাওয়া যায় তাঁর আত্মজীবনীতে। সব মিলিয়ে তাঁর সম্পর্কে জওহরলাল নেহরুর এই অভিমতের যাথার্থ্য অস্বীকার করা কঠিন :

"মধ্যযুগীয় রোমান্সের একটি চরিত্র বলে তাঁকে বোধ হল, কি করে জানি বিশ শতকে ছিটকে এসে পড়েছেন এমন এক ডন কুইক্সোট। তবে তিনি পরিপূর্ণ মাত্রায় সৎ ও নিঃসন্দেহেই আন্তরিক—" *An Autobiography*, পৃ. ১৫১।

ভারতীয় প্রতিনিধি দলের আর-এক বিশিষ্ট সদস্য মৌলানা বরকতুল্লাহ্ ভূপালের মানুষ। উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতে গিয়ে তিনি সংস্পর্শে আসেন শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার। ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তারকনাথ দাশ প্রমুখ ভারতীয় বিপ্লবী ও মার্কিন ভারতবন্ধু, মাইরন ফেল্পস, আইরিশ-আমেরিকান জাতীয়তাবাদীদের পত্রিকা 'গেলিক আমেরিকান'-এর সহকারী সম্পাদক, জর্জ ফ্রীম্যান প্রভৃতির তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৯ সালে তিনি আমেরিকা থেকে জাপানে যান এবং হিন্দুস্থানী ভাষায় অধ্যাপনা শুরু করেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে *Islamic Fraternity* নামে একটি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু কিছুদিন পর বৃটিশ সরকারের চাপে জাপানি সরকার ঐ পত্রিকা বন্ধ করে দেয় এবং তাঁকে অপসারিত করে অধ্যাপক পদ থেকে। অতঃপর ১৯১৪ সালের ২২ মে তিনি আবার ফিরে আসেন আমেরিকায় এবং অনতিবিলম্বে অন্যতম বিশিষ্ট নেতা হয়ে দাঁড়ান 'গদর' পার্টির। যুদ্ধ বাধার পর তিনি জার্মানিতে এসে যোগ দেন 'বার্লিন কমিটি'তে এবং ঐ কমিটির নির্দেশেই মহেন্দ্রপ্রতাপের কাবুল-মিশনের সদস্য হিসেবে ১৯১৫ সালে পৌঁছন আফগানিস্তানে।

১৯১৯ সালের গোড়ার দিকে বরকতুল্লাহ্ যে সোভিয়েত দেশে পৌঁছন, তা আমরা আগেই দেখেছি। তাঁর ঐ সময়কার বৃত্তান্ত জানা যায় 'পেট্রোগ্রাড প্রাভ্দা'য় [১৯১৯, ১০০ (৮ জুলাই) সংখ্যা] প্রকাশিত একটি সাক্ষাৎকার থেকে (লেনিনগ্রাডে 'সাল্টিকভ-শেড্রিন লাইব্রেরি থেকে গ্রন্থকার কর্তৃক সংগৃহীত) সেই সাক্ষাৎকারের থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া গেল :

"অধ্যাপক বরকতুল্লাহ্ আমাদের জানালেন, 'আমি কমিউনিস্ট নই, সোশ্যালিস্টও নই। বর্তমানে আমার রাজনৈতিক কর্মসূচী হচ্ছে এশিয়া থেকে ইংরেজ বিতাড়নের। এশিয়ায় ইউরোপীয় ধনতন্ত্র যার প্রধান প্রতিনিধি হল ইংরেজ—আমি তার ঘোরতর শত্রু। এইখানেই আমার মিল কমিউনিস্টদের সঙ্গে এবং এই দিক থেকে আমরা আন্তরিক বন্ধু।...

"১৯১৯ সালের মার্চ মাসে হবিবুল্লার হত্যাকাণ্ডের পর ইংরেজবিরোধী আমানুল্লা যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন নতুন আমীরের অন্যতম বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে আমাকে দূত রূপে মস্কোয় পাঠানো হয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে। এর ফলে নতুন আমীর ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিপত্র নাকচ করে দিলেন— যার শর্ত ছিল এই যে আফগানিস্তান আর-কারো সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না ইংলণ্ড ছাড়া।"

মনে হয় এরই সূত্রে বরকতুল্লাহ্ লেনিনের কাছে সেদিন তুলেছিলেন আফগানিস্তানকে সাহায্য করার প্রস্তাব আর লেনিনের অনুরোধে মহেন্দ্রপ্রতাপ আফগানিস্তানের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত, সুরিৎসের সঙ্গে গিয়ে সাহায্য করেছিলেন সোভিয়েত-আফগান মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে।

'পেট্রোগ্রাড প্রাভ্দা'য় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে বরকতুল্লাহ্ এর পরে বলেছেন: "ভবিষ্যতে ঘটনাপ্রবাহ কোন্ দিকে যাবে এখনই তা বলা কঠিন। তবে একটা জিনিস আমি জানি— সমস্ত জাতির কাছে রাশিয়ার সোভিয়েত সরকারের পুঁজিপতিবিরোধী (আর আমাদের কাছে 'পুঁজিপতি' কথাটি 'বিদেশী', আরো নিখুঁতভাবে বলতে হলে বলা যায় 'ইংরেজে'র সমার্থক) সংগ্রাম চালানোর আবেদন প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে আমাদের উপরে। তার চাইতেও বড়ো ছাপ ফেলেছে রাশিয়া কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সমস্ত গোপন চুক্তির অস্বীকৃতি এবং যত ছোটোই হোক জাতিমাত্রেরই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণা।

"ঐ কাজটি সোভিয়েত রাশিয়ার চারিদিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে এশিয়ার সমস্ত শোষিত জাতি ও পার্টিগুলিকে, এমন-কি, সে-সব পার্টিকেও, যারা রয়েছে সমাজতন্ত্র থেকে বহুদূরে। ঐ কাজ সুনির্ধারিত ও নিকটতর করেছে এশিয়ার বিপ্লব!...

"বলশেভিকদের ভাবনা যাকে আমরা নাম দিয়েছি 'ইশ্ত্রাকিয়াৎ'— তা আজ ছড়িয়ে পড়ছে ভারতীয় জনসাধারণের ভিতরে।...ইতিমধ্যেই বছর-খানেক ধরে অর্থনৈতিক ধর্মঘট ও প্রকাশ্য অভ্যুত্থান চলছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায়। বাংলাদেশই হল সব থেকে বিপ্লবী অর্থাৎ বলতে গেলে

বাংলা হল বিপ্লবের মনন-কেন্দ্র, আর সব থেকে কর্মচঞ্চল ভারতীয় প্রদেশ হল পাঞ্জাব যার অবস্থান আফগানিস্তানের সীমানায়।"

মৌলানা বরকতুল্লাহ্‌র আর-একটি প্রবন্ধ ঐ বছর তাসখন্দ থেকে প্রকাশিত তাঁর পুস্তিকা 'বলশেভিকবাদ ও ইসলামিক রাজনীতিক্ষেত্রে'র অন্তর্ভুক্ত। আমাদের কেন্দ্রীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত তার ইংরেজী তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে ডাঃ দেবেন্দ্র কৌশিক ও লিওনিদ মিত্রোখিন -সম্পাদিত এবং পিপ্‌লস পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত *Lenin—his Image in India* সংকলনে (পৃ. ৪০)। প্রবন্ধটির নাম "লেনিন ভাইয়ের ডাকে সাড়া দাও"। তাতে আছে এ-ধরনের কথা :

"...সারা পৃথিবীর ও এশীয় জাতিগুলির অন্তর্ভুক্ত মুসলমানদের রুশ-সমাজবাদের মহৎ নীতি হৃদয়ংগম করার এবং গভীরভাবে ও সোৎসাহে তা গ্রহণের আজ সময় এসেছে। এই নতুন ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত গুণগুলিকে অনুধাবন ও ফলপ্রসূ করে তুলতে হবে আর প্রকৃত স্বাধীনতারক্ষাকল্পে পররাজ্যগ্রাসী ও অত্যাচারী বৃটিশদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যোগ দিতে হবে বলশেভিক বাহিনীতে। মুসলমান ভাইস্ব! বিধাতার এই আহ্বান কান পেতে শোনো, লেনিন ভাই ও রাশিয়ার সোভিয়েত সরকার মুক্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের যে বাণী তোমাদের কাছে এনেছেন তাতে সাড়া দাও।"

একটা কথা মনে হয় এখানে। মুসলমানদের কাছে সাম্যবাদের বাণী পৌঁছনোর কিছুটা স্বতন্ত্র ও বিশেষ চেষ্টার কথা তখন সোভিয়েত নেতারা ভেবেছিলেন। ঐ সময়ে তার বাস্তব ভিত্তিও ছিল যথেষ্ট। আফগানিস্তানের আমীর থেকে মধ্যপ্রাচ্যের ভূমিহীন মুসলমান কৃষক পর্যন্ত অনেকেই ঐ সময়ে বিভিন্ন কারণে কম-বেশি মাত্রায়, সাময়িক বা কিছুটা স্থায়ীভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছিলেন অবস্থাগতিকে। অন্যদিকে সোভিয়েতকে তখন লড়তে হচ্ছিল ঘরের ও বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধে। এ-হেন অবস্থায় নানা দুর্বলতা জটিলতা সত্ত্বেও বিচিত্র ধরনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির সমাবেশ ঘটানোর চেষ্টা শুধু স্বাভাবিকই নয়, ঠিকও ছিল সোভিয়েতের পক্ষে। তবে কার্যক্ষেত্রে তার ফলে সেদিন প্যান্‌-ইসলামবাদ প্রশ্রয় পেয়েছিল কিনা কিছুটা, আজ তা বলা কঠিন। এটাই শুধু বলা যায়

যে তখনো মুসলমানদের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্রাজ্যবাদের দালালের অভাব ছিল না আর তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কোনোদিনই বন্ধ রাখা হয় নি ইসলামিক সৌভ্রাত্রের খাতিরে। বরং তুর্কিস্তান বা উজবেকিস্তানের মতো জায়গায় তখন প্রচণ্ড লড়াই চালানো হয়েছিল আমীর-মোল্লা আধিপত্যের আর তাদেরই অনুচর 'বাস্‌মাচি' দস্যুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

বরকতুল্লাহ্‌-র মতো প্রবীণ নেতার উপরে ধর্মীয় সংস্কারের প্রভাব নিশ্চিত-ভাবেই ছিল। তবু তার দরুন তাঁর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকার কথা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না কোনোক্রমেই। যে মহেন্দ্রপ্রতাপের অস্থায়ী স্বাধীন ভারত-সরকারের বরকতুল্লাহ্‌ ছিলেন প্রধান মন্ত্রী এবং যে বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'মির্জা আলি হায়দার' ছদ্মনামে এক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে বরক-তুল্লাহ্‌র একান্ত সচিবের কাজ করেছিলেন— তাঁরা দুজনেই গ্রন্থকারকে বলেছেন যে বরকতুল্লাহ্‌র ভূমিকা মূলত ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। সেদিক থেকে মনে হয় ডাঃ দেবেন্দ্র কৌশিক তাঁর প্রতি ঠিক সুবিচার করেন নি তাঁর *Central Asia in Modern Times* বইয়ের ১১১-১২ পৃষ্ঠার উক্তিতে।

আর-একটি কথা। লেনিনের *Collected Works*-এর ৪৪ খণ্ডে চিচেরিনকে লেখা লেনিনের একটি চিঠির শুরুতেই দেখা যায় (পৃ. ২৪৪) এই কথা :

"কমরেড চিচেরিন,

(১) এই ভারতীয়কে সাহায্য করার কী ব্যবস্থা আপনি করেছেন

—তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যাপারে ?

—অন্যান্য ব্যাপারে ?"

ঐ খণ্ডের শেষে ঐ চিঠি সংশ্লিষ্ট যে ২৩৮ নং নোটটি আছে (পৃ. ৫১২) তার থেকে জানা যায় যে চিঠিতে উল্লিখিত ঐ ভারতীয় হলেন মৌলানা বরকতুল্লাহ্‌ যিনি 'ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের কথা লিখে-ছিলেন আর চেয়েছিলেন যে বলশেভিকবাদ-বিষয়ক তাঁর প্রবন্ধটি প্রকাশ করা হোক যাতে বলশেভিকবাদের অনুকূলে মুসলমানদের অন্তরকে জয় করা যায় !'

লেনিনের এই চিঠির সঠিক তারিখ দেওয়া নেই— শুধু বলা হয়েছে ১৯১৯ সালের ৩ জুনের পরের কোনো-এক দিন। উপরে বরকতুল্লাহ্‌র যে লেখাটির কিছুটা উদ্ধৃত করা হয়েছে তার প্রকাশকাল ১৯১৯ সাল বলে জানা গেছে।

এটিই কি তবে লেনিনের চিঠিতে উল্লিখিত সেই প্রবন্ধ? তারিখ ও প্রবন্ধের বিষয় মেলালে অমন অনুমান অসমীচীন বোধ হয় না। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে সোভিয়েত নেতৃবর্গের মধ্যে চিচেরিনের সংগেই সব থেকে বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল বরকতুল্লাহ্‌র।

কাবুলে যে অস্থায়ী ভারত সরকার ১৯১৫ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মহেন্দ্রপ্রতাপ ও বরকতুল্লাহ্‌ যে তার যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এ ছাড়া মৌলানা ওবায়দুল্লাহ্‌ সিন্ধি ছিলেন ঐ সরকারের স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, চম্পকরমন পিল্লাই পররাষ্ট্র সচিব ও মহম্মদ বশীর যুদ্ধমন্ত্রী। শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি *Modern Review* পত্রিকায় "Smriti and Bismriti" নামে যে ধারাবাহিক স্মৃতিকথা প্রকাশ করেছেন তার ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের দফা (পৃ. ৪৪৭) থেকে জানা যায় যে তিনিও ছিলেন ঐ সরকারের দপ্তরহীন মন্ত্রী। আর কারো কথা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায় যে লাহোরের বিভিন্ন কলেজ থেকে যে মুসলমান ছাত্রেরা ১৯১৫ সালে আফগানিস্তানে পালিয়ে যান বা ১৯২০ সাল থেকে যে মুহাজিরীন তরুণেরা ঐ দেশে আশ্রয় খোঁজেন তাঁদের মধ্যে থেকেও কেউ কেউ মন্ত্রী হয়েছিলেন ঐ সরকারের। এ প্রসংগে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় (পৃ. ৪১১) বিশেষ করেই উল্লেখ করেছেন মহম্মদ আলি ও রহমত আলি জাকারিয়ার নাম। তাঁদের কথা পরে কিছুটা বলা যাবে।

যাই হোক, মৌলানা বরকতুল্লাহ্‌ সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সম্ভবত আফগানিস্তানে ফিরে যান। তারপর ১৯২২ সালে তিনি বার্লিনে গিয়ে চেষ্টা করেন একটি 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পার্টি' গড়ে তুলতে (সেখানে তাঁর সংগে চিচেরিনের আবার সাক্ষাৎ হয়)। রাশিয়ার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য বার্লিনে 'ইণ্ডিয়ান কমিটি ফর রাশিয়ান ফেমিন রিলিফ' প্রতিষ্ঠানটিও গড়ে ওঠে তাঁরই উদ্যোগে। তিনি ছিলেন ঐ সংস্থার সভাপতি আর ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তার সম্পাদক। বলা যেতে পারে ঐ সংস্থার ছাপানো কাগজে ঐ দুজনের স্বাক্ষরিত অভিজ্ঞানপত্র নিয়েই অবনী মুখার্জি গোপনে ভারতবর্ষে আসেন ১৯২২ সালের শেষে। ১৯২৭ সালের ১০-১৫ ফেব্রুয়ারি ব্রাসেলসে যে, 'ঔপনিবেশিক অত্যাচার ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় সেখানে বরকতুল্লাহ্‌ যোগ দেন

সানফ্রান্সিস্কোর 'হিন্দুস্তান গদর পার্টি'র প্রতিনিধি হিসেবে। সেখানে ও তার আগে বার্লিনেও তাঁর সঙ্গে দেখা হয় জওহরলাল নেহরুর। নেহরুও ঐ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' ও 'হিন্দুস্তান সেবা-দলে'র প্রতিনিধি হিসেবে। বরকতুল্লাহ্ সম্পর্কে নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন :

"···চমৎকার এক বৃদ্ধ মানুষ তিনি। কিছুটা সরল প্রকৃতির লোক, মনন-শক্তির দিক থেকে হয়তো খুব বড়ো মাপের নন, তবু নতুন চিন্তা গ্রহণের ও বর্তমান দুনিয়াকে বোঝার চেষ্টায় তখনো নিরলস। আমরা যখন সুইজারল্যাণ্ডে ছিলাম তখন ১৯২৭ সালে তিনি মারা যান সানফ্রান্সিস্কোয়। আমি দুঃখিত হলাম তাঁর মৃত্যুসংবাদে"—*An Autobiography*, পৃ. ১৫১।

মৌলানা বরকতুল্লাহ্ ১৯২৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর সানফ্রান্সিস্কোয় মারা যান। তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে উপস্থিত ছিলেন তাঁর বিপ্লবী সহকর্মী মহেন্দ্রপ্রতাপ।

লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারী দ্বিতীয় ভারতীয় দলের আর-এক সদস্য দলীপ সিং গিল সম্পর্কে আমাদের জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত দুটি সরকারী গোয়েন্দা বিভাগীয় দলিলে এই খবর পাওয়া যায় :

"দলীপ সিং পাতিয়ালা রাজ্যের এক কৃষক সন্তান। বিপ্লবী হিসেবে তাঁর ভাইকে ফাঁসি দেওয়া হয় (কোন্ মামলায়, কী তার নাম, তার কোনো উল্লেখ নেই সেখানে —গ্রন্থকার)। যুদ্ধের সময়ে তিনি আমেরিকা থেকে সুইজারল্যাণ্ড হয়ে জার্মানি পৌঁছন ও কারারুদ্ধ হন (স্পষ্টতই, 'বার্লিন কামিটি'র সঙ্গে তাঁর ঐ সময়ে অন্তত সম্পর্ক ভালো ছিল না— গ্রন্থকার)। জার্মানিতে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় বিখ্যাত বিপ্লবী জার্মান কমিউনিস্ট নেতা কার্ল লিবক্নেখ্‌টের সঙ্গে। বিপ্লবের পর (সম্ভবত এখানে জার্মানির বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে —গ্রন্থকার) লিবক্নেখ্‌টের সাহায্যে তিনি মুক্তি পান এবং তাঁরই সাহায্যে ঘনিষ্ঠ হন জার্মান ও রুশ কমিউনিস্টদের সঙ্গে (কার্ল লিবক্নেখ্‌টের সঙ্গে দলীপ সিং গিলের যোগাযোগের ব্যাপারটা কিন্তু সংশয়াতীত নয় — গ্রন্থকার)। একদা বার্লিন-কমিটির সভাপতি, ডাঃ মনসুরের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ হয়। ১৯১৯ সালে শীতকালে তিনি

এরোপ্লেনে রাশিয়া যান (সেবারেই দ্বিতীয় ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে তিনি দেখা করেন লেনিনের সঙ্গে —গ্রন্থকার)। সেখান থেকে ফেরার পথে পোলিশ শ্বেতরক্ষীরা তাঁর উপরে গুলি চালায়। তিনি কোনোমতে বেঁচে যান ও বার্লিনে ফিরে আবার শুরু করেন বিপ্লবী কাজকর্ম" (*Home/Pol/FN-71*, সেপ্টেম্বর ১৯২০, পৃ. ১৯-২০)।

মহাফেজখানায় সংরক্ষিত আর-এক ফাইলের খবর এই :

"প্রায় ছমাস আগে ভারতবর্ষে বলশেভিজম প্রচারের জন্য 'ইন্দো-জার্মান বলশেভিক সোসাইটি'র পত্তন করেন ডাঃ মনসুর, ভার্মা (তিনি কে ছিলেন জানা নেই —গ্রন্থকার) ও দলীপ সিং। শোনা যাচ্ছে এ সংস্থা খুব জোর চলছে। দলীপ সিং-এর মতে এর সদস্য রয়েছেন সুইডেন, রাশিয়া অস্ট্রিয়া, ইজিপ্ট, তুর্কি ও আমেরিকায়। বার্লিনের স্থানীয় পার্টি একে প্রভূতভাবে সাহায্য করে…" (*Home Pol/-FN52-Proceedings*, ফেব্রুয়ারি ১৯২২, পৃ. ৩২)।

এই দলিল দুটি আমি পেয়েছি শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে।

'ইন্দো-জার্মান বলশেভিক সোসাইটি' নামে কোনো সংস্থার কথা আর কোথাও উল্লিখিত হতে দেখি নি। সন্দেহ হয় সত্যই অমন অদ্ভুত নামের কোনো সমিতি ছিল কি না আদৌ।

লাজপৎ রায়ের আত্মজীবনীমূলক লেখাতেও দলীপ সিং গিলের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধার অব্যবহিত পরে লাজপৎ যখন আমেরিকায় যান তখন সেখানে দলীপ সিং-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দলীপ সিং সম্পর্কে তাঁর মত ভালো ছিল বোধ হয় না (দ্রষ্টব্য লাজপৎ রায়, *Autobiographical Writings*, পৃ. ১৯৮-৯৯)।

মহেন্দ্রপ্রতাপের নেতৃত্বে ভারতীয় বিপ্লবীদের যে দল লেনিনের সঙ্গে দেখা করে তার মধ্যে আবদুর রব পেশোয়ারী ও প্রতিবাদী আচার্যের সম্পর্কে আরো কিছু কথা উঠবে প্রসঙ্গান্তরে।

এরপর ঐ ১৯১৯ সালেরই জুন মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে ভারতীয় বিপ্লবীর উপস্থিতির কথা জানা যায় তিনি হলেন রহমত করিম এলাহি জাকারিয়া। জাকারিয়া বা রহমত আলি নামেই তিনি সমধিক পরিচিত।

আবার ভারত সরকারের কাগজপত্রে তাঁর উল্লেখ দেখা যায় রহমত আলি জাকারিয়া নামেও।

জাকারিয়ার জন্ম ১৮৯৪ সালে। তিনি পাঞ্জাবের লোক। ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোর থেকে যে ১৫ জন মুসলমান ছাত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আশায় দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পেরিয়ে আফগানিস্তানে পালিয়ে যান জাকারিয়া তাঁদেরই একজন। ঐ সময়ে বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী, মৌলানা ওবায়েদুল্লাহ্ সিন্ধিও আফগানিস্তানে আশ্রয় নেন এবং ঐ 'মুজাহিদ' (অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের সিপাহী —গ্রন্থকার) ছাত্ররা সম্ভবত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁরই বিপ্লবী আদর্শে। (দ্র. পরিশিষ্ট ৯)

কাবুলে পৌঁছোনো মাত্র ওবায়দুল্লাহ্ ও ঐ মুজাহিদ ছাত্রেরা কিন্তু বন্দী হয়ে যান— তার মধ্যে ওবায়দুল্লাহ্ কারাগারে বন্দী নয়, নজরবন্দী (মুজফ্ফর আহ্মদ লিখিত পুস্তক, পৃ. ১৮৭-৮৮)। তাঁর ঐ নজরবন্দী অবস্থার কথা ভূপেন্দ্রনাথও লিখেছেন 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে'। আসলে আফগানিস্তানের তদানীন্তন আমীর হাবিবুল্লাহ্ তখন ইংরেজকে চটাতে চান নি এঁদের প্রশ্রয় দিয়ে। কিন্তু এর কিছুদিনের মধ্যেই (১৯১৫ সালের ২ অক্টোবর) মহেন্দ্রপ্রতাপের নেতৃত্বে কাবুল মিশন যখন বার্লিন থেকে অবশেষে পৌঁছল কাবুলে তখন আর আমীর তাঁকে খাতির না করে পারলেন না কারণ ঐ মিশন ছিল শুধু ভারতীয় নয়, ভারত, তুর্কি ও জার্মানির মিলিত মিশন। আর সে মিশন তাঁর কাছে বহন করে এনেছিল স্বয়ং কাইজার এবং মুসলিম জগতের ধর্মগুরু ও তুর্কির সুলতানের মৈত্রীর আহ্বান। মহেন্দ্রপ্রতাপ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, আমীরের সঙ্গে আলাপের সময়ে তিনি কথাপ্রসঙ্গে ঐ ভারতীয় বন্দীদের কথা তোলার ফলেই তাঁরা তৎক্ষণাৎ শুধু যে মুক্তি পান তাই নয়, রাজঅতিথিও নাকি হয়ে যান সঙ্গে সঙ্গে! এঁরা ছাড়া দুজন শিখ বিপ্লবী দেশ থেকে পালিয়ে যাঁরা আটক ছিলেন কাবুল জেলে, তাঁরাও মুক্তি পান ঐ সময়ে। সম্ভবত তাঁদেরই একজন —সর্দার হরনাম সিং-এর কথা শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি লিখেছেন তাঁর পূর্বোল্লিখিত ধারাবাহিক প্রবন্ধে ("Smriti and Bismriti", *Modern Review*, সেপ্টেম্বর ১৯৭০, পৃ. ২১১-১২)। কোমাগাটা মারুর ঘটনার সঙ্গে জড়িত হরনাম সিং-এর সঙ্গে শিবনাথবাবুর ১৯২২ সালে পরিচয়

হয় কাবুলে। হরনাম সিং তখন সেখানে শিক্ষকতা করছিলেন এক প্রাইমারি স্কুলে।

যাই হোক, কাবুলে ঐ ১৯১৫ সালের ১ ডিসেম্বর যে অস্থায়ী ভারত-সরকার গঠিত হয়েছিল, জাকারিয়া ছিলেন তার অন্যতম সদস্য (M. N. Roy—*Memoirs*, পৃ. ৪১১) সম্ভবত প্রচারমন্ত্রী। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতিদের মধ্যে সে সময়ে বৃটিশ-বিরোধী প্রচারে তিনি বিশেষ তৎপর ছিলেন। তিনি নাকি ছিলেন ওবায়দুল্লাহ্‌র 'Army of God' নামে পরিচিত বাহিনীর 'লেফ্‌টনান্ট-কর্নেল'; তারপর রুশ-বিপ্লবের পর তিনি আকৃষ্ট হন কমিউনিজমের দিকে এবং নিজেকে ঘোষণা করেন কমিউনিস্ট ব'লে।

একটা কথা মনে হয় এ প্রসঙ্গে। জাকারিয়া প্রমুখ ১৯১৫ সালের মুজাহিদ ছাত্রেরা রাজনৈতিক চেতনার দিক থেকে সাধারণভাবে বেশ কিছুটা অগ্রসর ছিলেন আরো পাঁচ বছর পরের 'মুহাজির'দের (অর্থাৎ বিধর্মীর অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য যারা 'হিজরৎ' বা আত্মনির্বাসনে ব্রতী হন —গ্রন্থকার) চাইতে। এর একটা কারণ তাঁরা সকলেই ছিলেন কলেজে-পড়া তরুণ ছাত্র আর মুহাজিরেরা ছিলেন মুসলিম সমাজের বিভিন্ন স্তরের ও নানা বয়সের ধর্মীয় মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ সাধারণ মানুষ। এর দ্বিতীয় কারণ সম্ভবত এই ছিল যে ঐ ছাত্রদের উপরে এর আগের থেকেই প্রভাব পড়েছিল ওবায়দুল্লাহ্‌র মতো বিপ্লবীর।

জাকারিয়া তাঁর নবলব্ধ মতাদর্শের টানে কী করে ও ঠিক কবে সোভিয়েত ইউনিয়নে পৌঁছেছিলেন, তা জানা যায় নি এখনো। তবে ডাঃ দেবেন্দ্র কৌশিক তাঁর "Indian Revolutionaries in Soviet Asia" (*Link*, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৬৬) প্রবন্ধে লিখেছেন যে জাকারিয়া ১৯১৯ সালে ৯ জুন তাসখন্দে তুর্কিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে বক্তৃতা করেছিলেন আর বক্তৃতার শেষে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ তাঁকে অভিনন্দিত করেছিল 'ভারত দীর্ঘজীবী হোক' ধ্বনি তুলে। এর থেকে মনে হয় যে তিনি খুব সম্ভবত পাকাপাকিভাবে কমিউনিস্ট হয়ে গিয়েছিলেন ইতিমধ্যেই। নইলে পার্টি কংগ্রেসে শুধু উপস্থিতি নয়, বক্তৃতাদান হয়তো ঐ সময়ে সম্ভব হত না তাঁর পক্ষে। পরের বছর (১৭ অক্টোবর, ১৯২০) যখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পত্তন হয় তাসখন্দে তখন নবগঠিত পার্টির সদস্য-তালিকায় তাঁর নাম দেখা যায় না, তাঁর কাবুলের সংগী মুহম্মদ আলির মতো। সম্ভবত এর কারণ তিনি তাসখন্দে

উপস্থিত ছিলেন না ঐ সময়। কিন্তু মস্কোর প্রগতি প্রকাশন থেকে ১৯৬৯ সালে প্রথম প্রকাশিত *Lenin through the Eyes of the World* সংকলনে প্রকাশিত তাঁর একটি লেনিন-বিষয়ক রচনার পাদটীকা থেকে জানা যায় যে ১৯২০ সালেই তিনি যোগ দিয়েছিলেন ঐ কমিউনিস্ট দলে। তারপর থেকে কমিউনিস্ট পার্টির কাজে তিনি ইরাণ প্রভৃতি নানা দেশে ঘুরেছেন, আবার সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাচ্যবিদ্যা-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অধীনে শিক্ষকতাও করেছেন কিছুদিন। উর্দুভাষায় ভারতবর্ষের কৃষকদের সম্পর্কে তাঁর বহু লেখাও নাকি প্রকাশিত হয়েছিল ঐ সময়ে। লেনিনের সম্পর্কে তাঁর যে লেখাটির উল্লেখ করা হল তাতে ছিল এ-ধরনের কথা :

"বলা চলে ভারতের সদ্যোজাত কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছিল কমরেড লেনিনের শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাবে। ঐ পার্টির নেতারা বৃটিশ উপনিবেশে বিপ্লবী আন্দোলন সম্পর্কে প্রায়ই আলাপ-আলোচনা করতেন ব্যক্তিগত-ভাবে লেনিনের সঙ্গে। আর ঐভাবে তাঁরা রসদ সংগ্রহ করতেন বিপ্লবী চিন্তার সমৃদ্ধতম ভাণ্ডার থেকে।...

"ভারতবর্ষের অগণিত জনসাধারণের লেনিন-সম্পর্কিত মনোভাব ঐ বিষয়ে একদিন যাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এমন কয়েকজন ভারতীয়ের ভাষায় আমি সব থেকে ভালোভাবে প্রকাশ করতে পারি। তাঁদের মনে লেনিনের যে চেহারাটি আঁকা ছিল তাঁরা সেটির বর্ণনা দিয়েছিলেন এইভাবে : 'লেনিন গরিব মানুষের পক্ষে। লেনিন চান সকলেই সুখী হোক'"—*Lenin through the Eyes of the World*, পৃ. ২৬০।

১৯২৪ সালে এ লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল মস্কোর 'লেনিন প্রসঙ্গে প্রাচ্য প্রতীচ্যের রাজনীতিবিদ ও লেখকবৃন্দ' নামক সংকলনে।

জাকারিয়া সম্ভবত ১৯২৪ সালের শেষ দিক নাগাদ বার্লিন যান। কারণ ভারত সরকার ঐ সময়ে জার্মানির যে-সব ভারতীয় বিপ্লবীদের বহিষ্কারের প্রশ্ন নিয়ে জার্মান সরকারের সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখি করেছিলেন তাঁদের তালিকায় বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়, চম্পকরমন পিল্লাই, প্রতিবাদী আচার্য ও মুহম্মদ আলির নামের সঙ্গে দেখা যায় তাঁরও নাম। পরের চিঠিপত্রে তাঁর নামের আর উল্লেখ না থাকায় অনুমান করা চলে যে তিনি হয়তো পরে বার্লিন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন অন্যত্র।

বার্লিনে যাবার আগে জাকারিয়ার সংগে কমরেড গোপেন চক্রবর্তীর দেখা হয়েছিল সোভিয়েত দেশে। তাঁর কাছে জেনেছি যে বিখ্যাত 'ইন্টারন্যাশনাল' গানের উর্দু তর্জমা নাকি জাকারিয়ার যার শেষ ক'লাইন হচ্ছে :

ইয়ে জংগ হমারি আখরি,
ইস পর হ্যায় ফয়সলা !
সারে জাঁহা কি মজলুমোঁ
উঠো কি বক্ত আয়া ॥

মুজফ্ফর আহমদ সাহেব তাঁর পূর্বোল্লিখিত বইয়ে লিখেছেন যে জাকারিয়া নাকি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পান মার্কসীয় দৃষ্টিতে ভারতের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা বিষয়ে নিবন্ধ পেশ করে।

জাকারিয়া এখন জীবিত আছেন কি না জানি না। ১৯৪৬ সালে প্যারিসে তাঁর সংগে একবার দেখা হয়েছিল শ্রীপাদ অমৃত ডাংগের। তখন তাঁর খুবই দুঃস্থ অবস্থা। মুজফ্ফর সাহেব লিখছেন 'ফ্যাসিস্ট অধিকৃত ফরাসী দেশে ডক্টর রহমত আলি কি করছিলেন, কোথায় ছিলেন তার কোন খবর আমরা জানিনে। তিনি ফরাসী দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন কি না তাও আমরা জানিনে' ('আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট-পার্টি', পৃ. ১৯৫)।

ডাঃ দেবেন্দ্র কৌশিকের *Central Asia in Modern Times* গ্রন্থের ১১২ পৃষ্ঠার পাদটীকা থেকে জানা যায় যে ১৯৬৭ সালেও জাকারিয়া জীবিত ছিলেন এবং বাস করতেন প্যারিসে।

এর পর ঐ ১৯১৯ সালের অক্টোবর মাসে মস্কোয় যাঁর উপস্থিতির কথা জানা যায় তিনি হলেন স্বনামধন্য বিপ্লবী মৌলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধি। মহেন্দ্র-প্রতাপের সংগে কাবুলে ১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে যোগাযোগের ফলে যে অস্থায়ী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি যে তার স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হয়েছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। ঐ কাবুল থেকেই তিনি তার পরে মৌলানা মাহ্মুদ-উল-হাসান ও মহম্মদ মিঞা আনসারীর সহযোগিতায় মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলিতে যে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করেন তারই সূত্রে রচিত ও প্রচারিত হয় সুপরিচিত 'গালিবনামা' (এটি হল বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সারা পৃথিবীর মুসলমানদের কাছে এক আহ্বান। হেজ্জাজ শহরে তুর্কির সামরিক শাসনকর্তা ও মুসলিম জগতের প্রতিনিধি হিসেবে

গালিব পাশা এটিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। তারই জন্য এই নাম) আর ভারতবর্ষে শুরু হয় বিখ্যাত 'রেশমি রুমাল ষড়যন্ত্রে'র মামলা (কাবুলে ইন্দো-জার্মান মিশনের উপস্থিতি, অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন, লাহোরের ছাত্রদের উপস্থিতি, 'গালিবনামা'র ব্যাপক প্রচার, জেহাদের জন্য 'ঈশ্বরের সৈন্য বাহিনী' গঠন প্রভৃতির খবর দিয়ে এবং তুর্কি'র সহায়তায় ভারত-অভিযানের প্রস্তাব করে ওবায়দুল্লাহ্ রেশমি রুমালের উপরে লিখিত একটি গোপন চিঠি পাঠাচ্ছিলেন মক্কায় মাহ্মুদ-উল্-হাসানের কাছে। চিঠিটি মাঝপথে ধরা পড়ে আর তারই সূত্রে শুরু হয় ঐ মামলা। মাহ্মুদ-উল্-হাসান পরে গ্রেপ্তার হয়ে যুদ্ধের বছরগুলিতে অন্তরীণ থাকেন মাল্টা দ্বীপে)।

অন্যদিকে ওবায়দুল্লাহ্ ছিলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কাবুল কমিটির সভাপতি ও সম্ভবত প্রতিষ্ঠাতাও। ভারতের বাইরে তখন আর কোথাও অমন কংগ্রেস কমিটি ছিল কি না, তার সঙ্গে ভারতবর্ষের কংগ্রেসের যোগাযোগই বা কতটা ছিল তা জানি না। তবে জওহরলালের আত্মজীবনী থেকে জানা যায় যে কাবুল কংগ্রেস কমিটির অনুমোদনের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন স্বয়ং দেশবন্ধু, আর জওহরলাল নিজেও সহায়তা করেছিলেন সেই অনুমোদন লাভের ব্যাপারে। এমন-কি, এই সূত্রে লাজপৎ রায় পরে কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে তাঁরা নাকি ষড়যন্ত্র চালাচ্ছেন ভারতবর্ষের বাইরের লোকজনের সঙ্গে। লাজপৎ রায়ের ঐ অভিযোগের পিছনে ছিল ওবায়দুল্লাহ্-র স্তাম্বুলের কাজকর্ম সম্পর্কে তিনি ওবায়দুল্লা-র কাছ থেকেই যা শুনেছিলেন সেই-সব ব্যাপার (দ্র. জওহরলাল নেহরু, *An Autobiography*, পৃ. ১৫৯ ও ১৬১।)

শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোলিখিত প্রবন্ধ থেকেও জানা যায় যে কাবুল কংগ্রেস কমিটির (অস্থায়ী ভারত সরকারেরও) দপ্তর ছিল ওবায়দুল্লাহ্-র বাড়িতে আর সেখানে মাঝে মাঝে সভা বসত ঐ কমিটির। শিবনাথবাবু লিখেছেন : 'তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান কংগ্রেসী। তিনি খদ্দর পরতেন আমার চাইতে অনেক বেশি নিষ্ঠার সঙ্গে'—*Modern Review*, ডিসেম্বর ১৯৭০, পৃ. ৪৪৬-৪৭।

ওবায়দুল্লাহ্ স্বভাবতই উৎসুক হয়ে ওঠেন রুশ-বিপ্লবের ফলাফল নিজের চোখে দেখার জন্য। জাফর ইমাম লিখেছেন যে, 'জিজ্ন নাৎসিওনাল নোস্তেই' নামে এক সোভিয়েত পত্রিকায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এক বিবরণী নাকি

প্রকাশিত হয়েছিল যখন তিনি ১৯১৯ সালে মস্কোয় যান প্রথমবার। ঐ সাক্ষাৎকারে ওবায়দুল্লাহ্ তাঁর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন কিন্তু সেইসঙ্গেই মুসলমানের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে উদার সহায়তার জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ার আর তার সাহায্য কামনা করেছিলেন ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ বিতাড়নের কাজে (জাফর ইমাম, *Colonialism in East-West Relations*, পৃ. ৮২, ৪নং পাদটীকা)।

সোভিয়েত সাংবাদিক এ. ভ্যাসিলিয়েভও তাঁর "Indian Revolutionaries in Soviet Russia" প্রবন্ধে ওবায়দুল্লাহ্-র ১৯১৯ সালে সোভিয়েত দেশে যাওয়ার কথা লিখেছেন। এ দুটি ছাড়া অবশ্য আর-কোনো উল্লেখ বা বিবরণ পাই নি ১৯১৯ সালের তাঁর ঐ সফরের। দ্বিতীয়বার ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে আরো ন' জনের সঙ্গে (তার মধ্যে শিবনাথবাবুও ছিলেন) তিনি যখন তাসখন্দ পৌঁছন তখন তার খবর বরঞ্চ কিছু পাওয়া যায়, বিশেষ করে শিবনাথবাবুর সাম্প্রতিক ধারাবাহিক প্রবন্ধ থেকে। কিন্তু সে কথায় আসব যথা সময়ে।

ওবায়দুল্লাহ্ তারপর সোভিয়েত দেশ থেকে তুর্কিতে গিয়ে বেশ কয়েক বছর কাটান। সেখানে স্তাম্বুল থেকে তিনি স্বাধীন ভারতের একটি খসড়া গঠনতন্ত্রের ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯২৬ সালে। ৫৬ পৃষ্ঠার এক পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত সেই গঠনতন্ত্রের নাম *The Constitution of the Federated Republics of India* (লাইপজিগের ডিমিট্রভ মিউজিয়ামে সুরক্ষিত বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাগজপত্রের মধ্যে ঐ দলিলটির সন্ধান পাওয়া যায়—গ্রন্থকার)। পুস্তিকার শেষে ওবায়দুল্লাহ্ ও জাফর হাসানের (সম্ভবত ইনি ছিলেন লাহোর থেকে পলাতক ১৫জন ছাত্রের একজন) স্বাক্ষর আছে যথাক্রমে কাবুল কংগ্রেস (সর্বরাজ্য) কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক হিসেবে। এর তারিখ দেওয়া আছে 'হিন্দুস্থান মঞ্জিল', স্তাম্বুল, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪— বোধ হয় মূল সংস্করণের তারিখ।

ঐ পুস্তিকার গোড়ায় ওবায়দুল্লাহ্ লিখেছিলেন যে ১৯১৫ সালে কয়েকজন বিপ্লবী কাবুলে পৌঁছান। তাঁদের কেউ এসেছিলেন বালুচিস্তানের ভিতর দিয়ে, কেউ-বা ইয়োরোপ থেকে পারস্য হয়ে। এঁদের কাজকর্ম সম্পর্কে রাশিয়ার জার খবর জানিয়ে দেয় বৃটিশ সরকারকে। তার ফলে কিছু চিঠিপত্র

ধরা পড়ে, ভারতবর্ষে কিছু লোক গ্রেপ্তার এবং মাহ্‌মুদ-উল্‌-হাসান অন্তরীণ হয়ে যান মাল্টায়।

মনে হয় উল্লেখটি রেশমি রুমাল ষড়যন্ত্রের ঘটনার।

পুস্তিকার ৮ পৃষ্ঠায় আছে : 'মস্কোয় আমরা সুযোগ পাই নিজের চোখে রুশ-বিপ্লবকে প্রত্যক্ষ করার। বিপ্লবকে পূর্ণমাত্রায় অনুধাবনের জন্য আমাদের কমিটির সদস্যরা রুশ ভাষা আয়ত্ত করেন।'

উল্লেখযোগ্য এই যে সোভিয়েত সাংবাদিক এ. ভ্যাসিলিয়েভ তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে ঠিক এই কথাগুলি উদ্ধৃত করেছেন কাবুল কংগ্রেস কমিটির বক্তব্য হিসেবে (মনে রাখতে হবে কাবুল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ছিলেন ওবায়দুল্লাহ্‌ সিন্ধি)। সেখানে অবশ্য এরপর এই কয়েকটি লাইন আছে :

"বড়ো বড়ো রুশ-নেতাদের সঙ্গে আলাপ করার আমরা সুযোগ পাই। আমাদের কমিটির সদস্যেরা কেউ কেউ অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশেও যান সেখানে রুশ-বিপ্লবের ফলাফল অনুধাবনের জন্য।···ভারতবর্ষ ফরাসী-বিপ্লব থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করে নি আর তার ফলে খর্ব করে তার গুরুত্ব। আমরা চাই না যে আমাদের দেশ অন্ধ থাকে জগদ্‌ব্যাপী গুরুত্বের ঐ ঘটনার অর্থাৎ রুশ-বিপ্লবের প্রতি আর তার দ্বারা স্বাক্ষর করে আপন মৃত্যু-পরোয়ানায়।"

এই পুস্তিকার মূল অংশটির নাম 'মহাভারত সর্বরাজ্য পার্টি' ও তার কর্মসূচী'। এখানে 'মহাভারত' শব্দে স্বাধীন ভারতের গঠনতন্ত্রের যুক্ত-রাষ্ট্রীয় (federated) চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে। আর 'সর্বরাজ্য' শব্দটি সচেতনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে 'স্বরাজ্য' শব্দের বদলে— শুধু ভারতবর্ষ ভারতবাসীর এইমাত্র নয়, সমস্ত ভারতবাসীর— এ কথা বোঝাবার জন্যই। এমন-কি, ঐ কথাটা ওবায়দুল্লাহ্‌ শুধু গণতন্ত্রের সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি কর্মনীতির একটি ধারায় লিখেছেন : 'আমরা তাই ভারত-বর্ষের মাটি থেকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে আমাদের দেশে এমন ব্যবস্থার পত্তন করব যাতে সমাজের শ্রমজীবী শ্রেণীগুলির অর্থাৎ সমাজের অধিকাংশেরই কল্যাণ সুরক্ষিত হয় এবং যে ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় সেই শ্রেণীগুলির দ্বারাই'।

সম্ভবত তাঁর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার চরিত্রের জন্যই তিনি ভরসা করে এ কথা বলেছিলেন :

"আমি কখনো কমিউনিস্ট বিপ্লবকে আমার মৌল বিশ্বাস হিসাবে গ্রহণ করি নি, আমার মতো মানুষের পক্ষে ভবিষ্যতেও তা অসম্ভব···কিন্তু এমন কর্মনীতি আমি তৈরি করেছি সমাজতন্ত্রী বা কমিউনিস্ট কেউই যাতে আপত্তি করবেন না।" —Moin Shakir, *Khilafat to Partition*, পৃ. ৫৫, ১৭৭ নং 'নোট'।

১৯২৪ সালে ওবায়দুল্লাহ্-র ঐ 'শ্রমজীবীদের যুক্তরাষ্ট্র' পরিকল্পনা নিশ্চয়ই অসাধারণ ঘটনা এবং তার মধ্যে রুশ-বিপ্লবের প্রভাবও প্রত্যক্ষ। জওহরলালকেও এ-ব্যাপারে মানতে হয়েছে :

···"তিনি একটা যুক্তরাষ্ট্রের বা 'ভারতবর্ষের যুক্ত প্রজাতন্ত্রের' পরিকল্পনা করেন যেটি সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের বেশ একটি নিপুণ প্রয়াস" —*An Autobiography*, পৃ. ১৫৯।

১৯২৬ সালে ইটালিতে ওবায়দুল্লাহ্-র সঙ্গে সাক্ষাতের পর ঐ কথা লিখেছিলেন জওহরলাল।

মৌলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধি বহু বছর বিদেশে কাটিয়ে স্বাধীনতালাভের পর অবশেষে ফিরে আসেন দেশে। পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে তাঁর মৃত্যু হয় করাচীতে।

১৯১৯ সালের একেবারে শেষ দিকে যে ভারতীয় বিপ্লবীরা সোভিয়েত দেশে পৌঁছন তাঁরা হলেন মুহম্মদ আলি, মুহম্মদ শফীক ও কোহাটের আবদুল মজিদ (লাহোরের মীর আবদুল মজিদ নন —গ্রন্থকার)। এর মধ্যে মুহম্মদ আলি ও আবদুল মজিদ ছিলেন লাহোর থেকে ১৯১৫ সালে পলাতক ১৫ জন ছাত্রদের দলভুক্ত আর মুহম্মদ শফীক কাবুল পৌঁছেছিলেন ১৯১৯ সালের মে মাসে। সুতরাং এরা কেউই ১৯২০ সালের মুহাজিরীন দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। মহেন্দ্রপ্রতাপের দল ১৯১৯ সালের মে মাসে লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর কাবুলে ফিরে এলে ঐ দলের আবদুল রব ও প্রতিবাদী আচার্যের কাছে এঁরা শোনেন যে সোভিয়েত সরকার ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ইতিমধ্যেই তাঁরা সম্ভবত কিছুটা ঝুঁকেছিলেন কমিউনিজমের দিকে। কাজেই এ কথা শোনার পর তাঁরা কালক্ষেপ না করে রওনা হন সোভিয়েত দেশের উদ্দেশে ও তাসখন্দে পৌঁছন সম্ভবত ১৯১৯-এর একেবারে শেষ দিকে ('মুজফ্ফর আহমদ, 'আমার জীবন ও ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি', পৃ. ৮২-৮৩)।

এই তিন জন বিপ্লবীর মধ্যে কোহাটের আবদুল মজিদ সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছু জানা নেই এই খবর ছাড়া যে তিনি ছিলেন ১৯১৫ সালে লাহোর থেকে কাবুলে পলাতক ১৫ জন ভারতীয় ছাত্রদের অন্যতম। বাকী দুজনের কিছুটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করব এখানে।

মুহম্মদ আলির আসল নাম সম্ভবত খুশী মুহম্মদ। তবে বিপ্লবী মহলে তিনি সাধারণত পরিচিত ছিলেন মুহম্মদ আলি অথবা 'সিপাসসি' নামে। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের লোক—১৯১৫ সালে কাবুলে এসেছিলেন লাহোর থেকে পলাতক ছাত্রদলের সঙ্গে। মহেন্দ্রপ্রতাপের চিঠি নিয়ে তিনি সেখান থেকে তাসখন্দ গিয়েছিলেন ১৯১৬ সালে (অর্থাৎ রুশ-বিপ্লবের আগে —গ্রন্থকার) ভারতীয় বিপ্লবীদের কাজে জার সরকারের সমর্থন জোগাড়ের আশায়। সেখান থেকে তিনি সেবার প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছিলেন কিন্তু তাঁর সঙ্গী, ডাঃ মথুরা সিং দ্বিতীয়বার ঐ চেষ্টা করতে গেলে জার সরকার তাঁকে তুলে দেয় ইংরেজের হাতে আর তারা তাঁকে গুলি করে মারে নির্দ্বিধায়। ১৯১৯ সালে তৃতীয় আফগান যুদ্ধের সময়ে তিনি ভারত সীমান্তের উপজাতি এলাকায় বৃটিশ-বিরোধী কাজকর্ম চালাতেন, এমন-কি, ওবায়দুল্লাহ্‌র 'ঈশ্বরের বাহিনীতে'ও তিনি হয়েছিলেন একজন মেজর জেনারেল।

জাকারিয়ার মতো মুহম্মদ আলি কমিউনিজমের দিকে আকৃষ্ট হন রুশ-বিপ্লবের পরেই আর তাঁরই মতো তিনিও নিজেকে কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেন অনতিবিলম্বে। আবার জাকারিয়ার মতোই তিনিও সম্ভবত ছিলেন অস্থায়ী ভারত সরকারের সদস্য তবে ১৯২০ সালে ১৭ অক্টোবর তাসখন্দে সাত জন সদস্য নিয়ে যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পত্তন হয় তিনি ছিলেন তাঁদেরও একজন (জাকারিয়া যে তখন সভ্য ছিলেন না তা আমরা আগেই দেখেছি)। পরে তিনি তাসখন্দ থেকে নিশ্চয়ই আবার কাবুলে ফিরে গিয়েছিলেন কারণ শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে ১৯২২ সালে ওবায়দুল্লাহ্‌র সঙ্গে ন'জনের যে দল কাবুল থেকে তাসখন্দে গিয়েছিল তার মধ্যে তিনিও ছিলেন শিবনাথবাবুর মতোই।

মুহম্মদ আলি কমিউনিস্ট পার্টি ও 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকে'র কাজে নানা দেশে ঘুরেছেন। ১৯২৪ সালে তিনি দেশে ফেরার চেষ্টা করেন পণ্ডিচেরি হয়ে। কিন্তু ফরাসী পুলিস তাঁকে পরের জাহাজেই ফেরত পাঠিয়ে দেয়

ইউরোপে। তাসখন্দে অবস্থিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র 'বৈদেশিক ব্যুরো'র তিন'জন সদস্যের তিনি ছিলেন অন্যতম (অন্য দুজন হলেন মানবেন্দ্রনাথ ও রজনী পাম দত্তের বড়ো ভাই, ক্লেমেন্স দত্ত)। মুহম্মদ আলির বেশ কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয় 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকে'র মুখপত্র 'ইণ্টারন্যাশনাল প্রেস করেস্পণ্ডেস' বা সংক্ষেপে 'ইনপ্রেকর' পত্রিকায়। যেমন 'ভারতে বাউড়িয়া জুটমিলে লক-আউট' (৩.১.১৯২৯), 'মিরাট মামলা' (১০.৫. ১৯২৯), 'পাঞ্জাবে শ্রমিক কৃষক সম্মেলন' (১৩.২. ১৯৩০) ও 'ভারতীয় রেল শ্রমিকদের সংগ্রাম' (২৭.৩.১৯৩০)।

মুহম্মদ আলি 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকে'র পঞ্চম কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে। ষষ্ঠ কংগ্রেসেও তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের প্রতিনিধি।

মুহম্মদ আলি প্রধানত কাজ করতেন কমিউনিস্ট পার্টি'র 'বৈদেশিক ব্যুরো'য়। ঐ 'ব্যুরো'র প্রধান দপ্তর ছিল প্যারিসে আর যেহেতু তার তিন জন সদস্যের মধ্যে তিনিই সেখানে থাকতেন স্থায়ীভাবে তাই তিনিই ছিলেন তার মুখ্য পরিচালক।

১৯৪০ সালের জুন মাসে হিটলার বাহিনী যখন প্যারিস দখল করে তখন মুহম্মদ আলি 'গেস্তাপো'র হাতে ধরা পড়েন আর হিটলারের জল্লাদদের গুলিতে প্রাণ দেন কমিউনিস্ট নিষ্ঠায় অবিচল থেকে। কমিউনিস্ট পার্টি'র তথা ভারতবর্ষের অমর শহীদের তালিকায় তাঁর স্থান খুবই উঁচুতে।

মুহম্মদ শফীকের বাড়ি পেশোয়ার জেলায়। তিনি সরকারি চাকুরে ছিলেন কিন্তু ১৯১৯ সালে ভারতবর্ষে রাওলাট কানুন -বিরোধী আন্দোলন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর কাবুলে চলে যান কাউকে কোনো খবর না দিয়ে। সেখানে অনতিবিলম্বে তাঁর যোগাযোগ হয় সদ্য সোভিয়েত-ফেরত, আবদুর রব ও প্রতিবাদী আচার্যের সঙ্গে। এরই জন্য ১৯২৪ সালে ভারত সরকারের দায়রা জজ তাঁকে পরে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত করবার সময়ে তাঁর রায়ে ইঙ্গিত করেন যে শফীক গোড়ার থেকে ঐ উদ্দেশ্য নিয়েই নাকি রওনা হয়েছিলেন কাবুলের পথে (মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'', পৃ. ৮২)। ১৯১৯ সালের শেষাশেষি মহম্মদ আলি ও কোহাটের আবদুল মজিদের সঙ্গে তিনি পেঁছন

তাসখন্দে। সেখানে অন্যান্য কাজকর্মের মধ্যে তাঁরা ভারতীয় কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন 'জমীনদার' নামে (পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 'জমীনদার' শব্দের অর্থ কৃষক)। এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালের মে দিবসে। এটি ছিল উর্দু ও ফরাসী দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক পত্রিকা। এর পরিচালক ছিলেন আবদুল মজিদ (অর্থাৎ কোহাটের আবদুল মজিদ কারণ লাহোরের আবদুল মজিদ—ফিরোজুদ্দিন মনসুর, শওকত উসমানি, রফীক আহমদ প্রভৃতির সঙ্গে মুহম্মদ আকবর খানের নেতৃত্বে তাসখন্দে পৌঁছেছিলেন ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে) এর মূল সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি লিখেছিলেন মুহম্মদ শফীক হিন্দুস্তানী (এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যার কিছু খবর ও তার প্রথম পৃষ্ঠার ফোটো-কপি প্রকাশিত হয়েছে ইংরেজী সাপ্তাহিক *New Age* পত্রিকার ৫ নভেম্বর, ১৯৬৭ সংখ্যায় —গ্রন্থকার)। এ ধরনের আর-একটি উর্দু পত্রিকা—'আজাদ হিন্দুস্তান আখবার' প্রকাশিত হয় বাকু থেকে।

১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর তাসখন্দে যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় তার সাধারণ সম্মাদক নির্বাচিত হন মুহম্মদ শফীক্। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা যাবে যথাস্থানে।

১৯২০ সালের ১৯ জুলাই থেকে ৭ অগস্ট অবধি 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকে'র যে দ্বিতীয় কংগ্রেসের অনুষ্ঠান হয় মস্কোয় সেখানেও শফীক উপস্থিত ছিলেন দর্শক হিসেবে। পরে ভারতবর্ষে তাঁর বিচারের সময়ে শফীক এ কথা বলেছিলেন তাঁর জবানবন্দীতে। কিন্তু ঐ কংগ্রেসের কাগজপত্রে কোথাও তাঁর নাম দেখি নি— ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসেবে সেখানে পাওয়া যায় অবনী মুখার্জি ও প্রতিবাদী আচার্যের নাম আর মানবেন্দ্রনাথ রায় ঐ কংগ্রেসে উপস্থিত হয়েছিলেন মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে।

১৯২২ সালে দেশে ফেরার সময়ে শফীককে গ্রেপ্তার করা হয় সীমান্ত অঞ্চলে। এরপর পেশোয়ারে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলে কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রের। ১৯২৪ সালে তিনি দণ্ডিত হন তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে। ঐ বিচারের সময়ে তাঁর অনেক দুর্বলতার কথা প্রকাশ করেছেন মুজফ্ফর আহমদ সাহেব তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে (পৃ. ৮২-৮৬)। ১৯২৮ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে কিন্তু দেখা যায় যে তিনি সেখানে প্রতিনিধি (ভোটের ক্ষমতাহীন) হিসেবে



মানবেন্দ্রনাথ রায়

(উপরে) ‘কমিন্টার্নে’-র তৃতীয় কংগ্রেসে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে পিছনের সারিতে বাম থেকে চতুর্থ—মানবেন্দ্রনাথ এবং সামনের সারিতে বাম থেকে প্রথম—হো চি-মিন ও তৃতীয়—সেন কাটায়ামা-কে দেখা যাচ্ছে।

(মানবেন্দ্রনাথের ‘Memoirs’ থেকে)’

(মাঝে) অবনীনাথের সহযোগিতায় মানবেন্দ্র-নাথ কর্তৃক লিখিত ‘India in Transition’ গ্রন্থের প্রচ্ছদপট।

(নিচে) মানবেন্দ্রনাথ রায় (শ্রীশ্যামল সেনের সৌজন্যে) দ্রষ্টব্য॥ পৃঃ ১১৩-’১৬ ১২৪-’২৭।

INDIA
IN
TRANSITION

By
MANABENDRA NATH ROY
With Collaboration
of Abani Mukherji

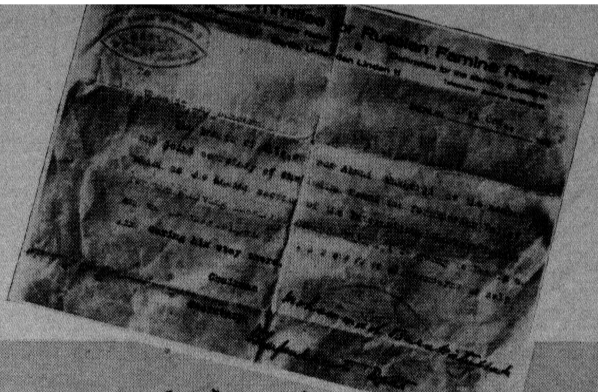
GENEVE
Edition de la Librairie J. B. Target
1922





(উপরে) অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়। দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ১৭০-'৯৭। (লেনিনগ্রাড ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউটের সৌজন্যে)

(নিচে) ছাত্রদের মধ্যে অবনীনাথ।

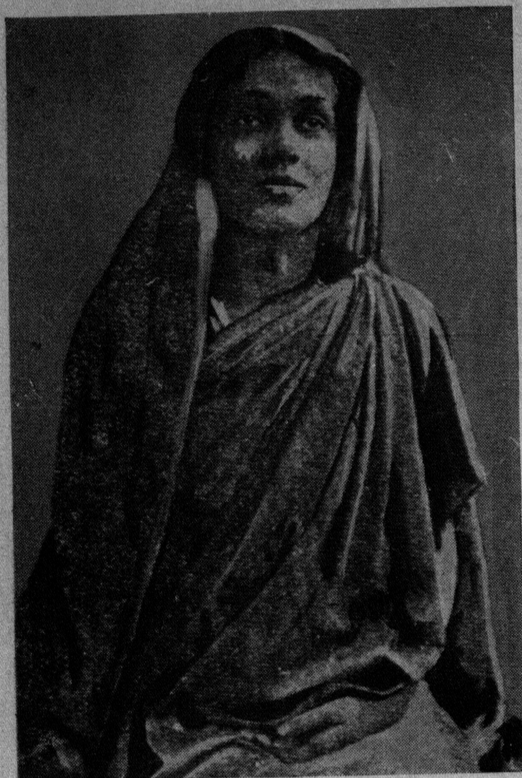


В дирекцию И.А.О.Н.
Зав. зал. Инд. каб. А. Мукарджи
Заявление
Прошу заключить со мной договор на библиографическую работу по Индии в сокращенной машинописи размером в 10 листов (3500 карточек, из них 40% отпечатано)
А. Мухарджи
22 IV
21 IV/32

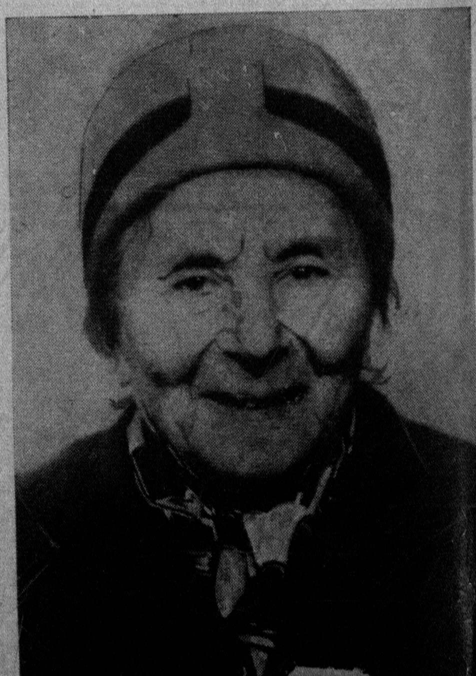
152
3
423



(উপরে) অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়কে প্রতিনিধি ক'রে 'ইণ্ডিয়ান কমিটি ফর রাশিয়ান রিলিফে'র চিঠি। দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ১৯৬। (শ্রীতপতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে)
(মাঝে) ভারতবর্ষ সম্পর্কে বই লেখার অনুমতি চেয়ে অবনীনাথের চিঠি। দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ১৮২। (লেনিনগ্রাড ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের সৌজন্যে)।
(নিচে) অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়ের পাসপোর্ট। দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ১৭১।



(উপরে) আগনেস স্মেডলি।
দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ২০৮-'১৩।
('Modern Review'
পত্রিকার সৌজন্যে)



(নিচে) শ্রীমতী রোজা ফিটিংহফ
দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ১৮২।

যোগ দিয়েছিলেন 'মাহমুদ' ছদ্মনামে— শওকৎ ওসমানি (ভারতীয় প্রতিনিধি-দলের নেতা ঐ কংগ্রেসে ইনি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন 'সেকেন্দার সুর'), সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (এঁর ছদ্মনাম ছিল 'নারায়ণ'), ক্লেমেন্স দত্ত, হাবিব আহমদ নসীম (ইনিই সম্ভবত 'মাজুৎ' নামে পরিচয় দিয়েছিলেন), গুলাম আম্বিয়া খান লুহানী ও মুহম্মদ আলির সংগে।

ষষ্ঠ কংগ্রেসের পরে শফীক দেশে ফিরে এসেছিলেন। তারপর তাঁর খবর আর জানা নেই। এটা ঠিক যে তিনি এর পর আর কোনো যোগ রাখেন নি এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি'র সংগে।

১৯২০ সালে বহু ভারতীয় বিপ্লবী পেঁছিলেন সোভিয়েত দেশে। দুটি ঘটনা নজর করা দরকার এ প্রসংগে। এ-যাবৎ এঁরা সবাই আসছিলেন স্টকহল্ম (বা বার্লিন) ও কাবুল কেন্দ্র থেকে। কিন্তু এবার ঐ দুই কেন্দ্র ছাড়াও আরো দূর থেকে এলেন কেউ কেউ। তাঁরা 'বার্লিন কমিটি' বা কাবুল-স্থিত অস্থায়ী ভারতসরকারের সংগে ঘনিষ্ঠ ছিলেন না এর আগে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মতো, যদিও যুদ্ধের বছরগুলিতে তাঁরা সকলেই জড়িত ছিলেন একই ইংরেজ-বিরোধী কর্মোদ্যমে। দ্বিতীয়ত এ পর্যন্ত ভারতীযেরা সোভিয়েত দেশে এসেছিলেন ছোটো ছোটো দলে। আর এবার অনেকেই এলেন মস্ত বড়ো দল বেঁধে। আবার কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় বিপ্লবী এই সময়ে সোভিয়েত দেশে পেঁছিন একা একা, যদিও তাঁদের পিছনেও নিশ্চয়ই ছিল বহু মানুষের উৎসাহ ও সাহায্য।

যতদূর জানি ১৯২০ সালে প্রথম সোভিয়েত দেশে পেঁছিন ঐ রকম এক বিপ্লবী— মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪)। ১৯১৫ সালে জার্মান অর্থ ও অস্ত্র -সাহায্যের ভরসায় বাংলা দেশের 'যুগান্তর' বিপ্লবী দলের (আসলে গোড়ায় ওটি ঠিক একটি দল ছিল না ; ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা অনুশীলন সমিতির সংগে যুক্ত কতগুলি গোষ্ঠী যাদের কোনো কোনো নেতা ও কর্মী 'যুগান্তর' পত্রিকার সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তারা পরে ঐ নামে পরিচয়লাভ করে সাধারণভাবে —গ্রন্থকার) বিশিষ্ট কর্মী, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পাড়ি দেন বাটাভিয়ায়। সেখানে জার্মানদের সংগে যোগাযোগ করে তিনি দেশে কিছু টাকাকড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করেন বিপ্লবী কাজকর্মের জন্য। কিন্তু জাহাজে বা স্থলপথে সেখানে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁকে শেষ পর্যন্ত

পালাতে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানেই আত্মগোপনের সুবিধার জন্য 'নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যে'র রাতারাতি রূপান্তর হয় 'মানবেন্দ্রনাথ রায়'-এ।

মানবেন্দ্রনাথ সমাজতান্ত্রিক ভাবনার সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হন ঐ আমেরিকাতেই। ১৯১৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবশেষে যুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগ দিলে বহু ভারতীয়ের সঙ্গে তিনিও গ্রেপ্তার হন। তবে জামিনে খালাস পেয়েই তিনি সীমান্ত পেরিয়ে পালিয়ে যান মেক্সিকোয়। সেখানে রুশ কমিউনিস্ট নেতা বোরোডিনের প্রভাবে তিনি কমিউনিস্ট হন। ইতিমধ্যে তিনি মেক্সিকোর সমাজতন্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবার তিনি উদ্যোগী হলেন ঐ দলকে কমিউনিস্ট পার্টিতে রূপান্তরিত করার ও তাকে, 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকে'র দ্বারা অনুমোদিত করানোর ব্যাপারে।

মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসাবেই মানবেন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হন 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকে'র দ্বিতীয় কংগ্রেসে। তারই জন্য তিনি ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে রওনা হন ইয়োরোপের পথে এবং স্পেন হয়ে সেই বছরেরই শেষাশেষি পৌঁছন বার্লিনে। কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল ১৯২০ জুলাই মাসে। ঠিক হয়েছিল ১৯২০ সালের গোড়ার দিকে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা বার্লিনে এসে জড়ো হবেন ও সেখানেই অপেক্ষা করবেন যতদিন না তাঁদের মস্কো পাঠানোর ব্যবস্থা করা যায় নানা গোপন পথে (M. N. Roy, *Memoirs*, পৃ. ২১৬)। মনে রাখতে হবে ঐ সময়ে এবার্ট, শাইডেমান, নোস্কে প্রভৃতি তথাকথিত সমাজতন্ত্রীদের নেতৃত্বে প্রতিবিপ্লব জয়ী হয়েছিল জার্মানিতে আর তার জল্লাদদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছিলেন রোজা লুক্সেমবুর্গ ও কার্ল লিবক্নেখ্‌টের মতো বিপ্লবী শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

বার্লিনে মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ হয় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ 'বার্লিন কমিটি'র কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে এবং কিছুদিন পরে সেখানেই তাঁর প্রথম পরিচয় আর-এক ভারতীয় বিপ্লবী, অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও। শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায় ১২ ডিসেম্বর, ১৯৭০ তারিখের *Mainstream* পত্রিকায় (পৃ. ৩৭-৩৮) "ভারতীয় কমিউনিস্ট ইস্তাহার" নামে মানবেন্দ্র রায়, অবনী মুখোপাধ্যায় ও শান্তি দেবী (মানবেন্দ্রনাথের প্রথমা স্ত্রী, এভেলিন রায়ের ছদ্মনাম —গ্রন্থকার) -স্বাক্ষরিত যে প্রথম ভারতীয় কমিউনিস্ট ইস্তাহারের উল্লেখ করেছেন খুব সম্ভব সেটি ঐ পরিচয়েরই ফল কারণ শ্রীচট্টোপাধ্যায়

জানাচ্ছেন যে ঐ ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২০ সালের জুন মাসের *Glasgow Socialist* পত্রিকায়। সুতরাং সেটি নিশ্চয়ই রচিত ও প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়েছিল তার আগেই। ১৯২০ সালের জুন মাসের আগে মানবেন্দ্রনাথ নিশ্চিতভাবে আর অবনীনাথ সম্ভবত পেঁৗছে গিয়েছিলেন মস্কোয়।

আর-একটি কথা। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ঐ সময়ে বার্লিনে তাঁর সংগে মানবেন্দ্রনাথের যোগাযোগ প্রসংগে 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে' লিখেছেন :

'রায় (অর্থাৎ মানবেন্দ্রনাথ রায়) একদিন সান্ধ্য ভোজনের পর লেখককে (অর্থাৎ ডাঃ দত্তকে —গ্রন্থকার) তাঁহার কাছে আসিতে বলেন। লেখক তথায় যাইলে তিনি তাঁহার রচিত একটি বিজ্ঞপ্তি (manifesto) লেখককে পড়িয়া শুনান। ইহাতে তাঁহার নাম ব্যতীত আলি হায়দারের নাম স্বাক্ষরিত দৃষ্ট হইল। তিনি এই বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করিয়া মস্কোয় চলিয়া যাইতে চান। এতদ্দ্বারা মস্কো যাইবার অগ্রেই তিনি কমিউনিস্টদের জানাইতে চান যে, তাঁহারা ভারতীয় শোষিত শ্রমিকদের তরফদারী দল। শুনা যায়, তিনি বলশেভিকদের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি ভারতীয় বিপ্লব-আন্দোলনের মোড় ফিরাইবেন। লেখকের সহিত বিতর্ক হয়, লেখক ঐ বিজ্ঞপ্তিতে সহি করেন নাই। অবশ্য তাঁহাকে অনুরোধ করাও হয় নাই। কিন্তু আমন্ত্রণের ও তর্কের অর্থই ইহা" (পৃ. ২৫২)।

বোধ হয় ডাঃ দত্তের এই বিজ্ঞপ্তিই সেই প্রথম ভারতীয় কমিউনিস্ট ইস্তাহার। তবে ডাঃ দত্তের ঐ লেখার মধ্যে অবনীনাথ ও শান্তি দেবীর স্বাক্ষরের কোনো উল্লেখ নেই, আছে আলি হায়দারের নাম স্বাক্ষরকারী হিসাবে। 'আলি হায়দার' বা 'মির্জা আলি হায়দার' 'বার্লিন কমিটি'র সদস্য, বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের ছদ্মনাম। বীরেন্দ্রনাথের বয়স এখন ৮৫ বছর চলছে। তাঁর কাছে খোঁজ করলে তিনিও ঐ বিজ্ঞপ্তির কথা বললেন. তবে তাতে কী ছিল এতদিন পরে তা আর তাঁর মনে নেই বলে জানালেন।

তবে ইস্তাহারটি সম্পর্কে শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায় সঠিকভাবেই লিখেছেন যে ঐ দলিলে স্বাক্ষরকারীদের কমিউনিস্ট মতাদর্শে অবিচল বিশ্বাস যেমন প্রতিফলিত, তেমনই আবার তার মধ্যে তাঁদের যান্ত্রিক, সংকীর্ণ ও গোষ্ঠীগত মনোভাবও বেশ প্রকট। আসলে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকে'র আসন্ন দ্বিতীয়

কংগ্রেসে মানবেন্দ্রনাথ আর কয়েকমাসের মধ্যেই জাতীয় ও উপনিবেশবাদের প্রশ্নে সাধারণ ভাবে যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, এখানে পাওয়া যায় ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ক্ষেত্রে তারই পূর্বাভাস। ঐ কংগ্রেসের সামনে তিনি ঐ বিষয়ে যে পরিপূরক নিবন্ধ পেশ করেছিলেন তার আলোচনাকালে পরে এ-ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। তবে আর-একটা কথা বলে রাখা যায় এই জায়গায় : মানবেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় অবনী মুখার্জীকে যত্রতত্র গালাগালি করেছেন, এমন-কি, একটা গোটা অধ্যায়—"An Embarrasing Associate" (পৃ. ২৯৫-৩০১) লিখে ফেলেছেন অবনীনাথের বিরুদ্ধে অথচ ঘূণাক্ষরেও এ-কথাটি প্রকাশ করেন নি যে বার্লিনে, মাত্র কয়েকদিনের আলাপের পর তিনি অবনীনাথেরই সঙ্গে একযোগে প্রকাশ করেছিলেন এক 'ভারতীয় কমিউনিস্ট ইস্তাহার'!

প্রায় ছ মাস অপেক্ষার পর অবশেষে ১৯২০ সালের মে মাসের মাঝামাঝি বার্লিনে মানবেন্দ্রনাথের কাছে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে'র তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদিকা, এঞ্জেলিকা বালাবানোভার জরুরি নির্দেশ এল— অবিলম্বে মস্কো রওনা হওয়ার (M. N. Roy, *Memoirs*, পৃ. ৩০৪-০৫)। আবার ঐ *Memoirs*-এরই ৩৫০ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, যে ১৯২০ সালের মে দিবসে তিনি উপস্থিত ছিলেন সোভিয়েত দেশে। আসলে রায়ের লেখায় সন-তারিখের বালাই তেমন নেই। যাই হোক, ১০ জুলাই 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকে'র দ্বিতীয় কংগ্রেসের উদ্বোধনের কিছু আগে অবনী মুখার্জিও মস্কো পেঁছন ভারতবর্ষের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে (অবনী মুখার্জির স্ত্রী, শ্রীমতী রোজা ফিটিংহফের কাছে জেনেছি যে অবনীবাবু মস্কো পেঁাছেছিলেন জুন মাসে —গ্রন্থকার)। ঐ 'দ্বিতীয় কংগ্রেসে'র বৃত্তান্ত পরে বলা যাবে— এখানে শুধু এটা উল্লেখ করে রাখি যে মস্কো পেঁাছনোর কয়েকদিনের মধ্যে মানবেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয় লেনিনের সঙ্গে এবং কংগ্রেসের প্রস্তুতির কাজে ও অধিবেশনের সময়েও তাঁর বারবার আলোচনা হয় লেনিনের সঙ্গে। সে-সবের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় নি এখনো পর্যন্ত— শুধু মানবেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় পাওয়া যায় কিছু টুকরো টুকরো খবর।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় অবনী মুখার্জির সঙ্গে লেনিনের দেখা হয়েছিল কি না জানা যায় না। তবে তাঁর স্ত্রী, রোজা ফিটিংহফের কাছে

শুনেছি যে ১৯২২ সালে নাকি তাঁর সংগে লেনিনের দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল ভারতবর্ষ সম্পর্কে। তারও কোনো বিবরণ পাওয়া যায় নি এখনো অবধি।

১৯২০ সালের মে মাসে বড় জোর জুন মাসের গোড়াতেই আবদুর রব ও প্রতিবাদী আচার্যও তাসখন্দ পেঁছে গিয়েছিলেন কাবুল থেকে। আচার্য জুলাই-অগাস্ট মাসে 'দ্বিতীয় কংগ্রেসে' যোগও দিয়েছিলেন ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে।

আবদুর রব পেশোয়ারীর কথা কিছুটা বলা যেতে পারে এখানে। আমরা দেখেছি তাসখন্দে তিনি এর আগের বছরও এসেছিলেন এবং মহেন্দ্রপ্রতাপের দলের সদস্য হিসাবে তখন দেখাও করেছিলেন লেনিনের সংগে। এবার তাসখন্দে আসার ঠিক আগে প্রধানত তিনিই রফিক আহমদের মতো কাবুলে আগত প্রথম দলের ভারতীয় হিজরতীদের মধ্যে কারো কারো দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন সোভিয়েতের দিকে (মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পৃ. ৬৫-৬৬)। ডাঃ দেবেন্দ্র কৌশিক বলেছেন যে ১৯১৯-২০ সালে তাসখন্দে আবদুর রবের বক্তৃতা 'ইজভেস্তিয়া তুর্কৎসিক'ার মতো রুশ পত্রিকায় ও 'ইস্ত্রাকিউনে'র মতো উজবেক পত্রিকায় প্রায়ই প্রকাশিত হত এবং তার উপরে লেখা হত সপ্রশংস মন্তব্যও। যেমন তাসখন্দের এক মসজিদে অনুষ্ঠিত অভ্যর্থনা-সভায় তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার বিস্তৃত বিবরণ তখন প্রকাশিত হয়েছিল ৪ জুলাই ১৯২০ তারিখের 'ইজভেস্তিয়া তুর্কৎসিকা' পত্রিকায়। তাতে আবদুর রব এক জায়গায় বলেছিলেন যে 'যদিও আমরা বৃটিশ সরকারকে ঘৃণা করি ও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাই, তবু আমরা বৃটিশ জনসাধারণকে ঘৃণা করি না কারণ আমরা জানি যে বৃটিশ সরকার যেমন আমাদের উপরে অত্যাচার ও শোষণ চালায় তেমনি চালায় বৃটিশ শ্রমিক শ্রেণীর উপরেও'। এই বক্তব্যের উপরে ঐ পত্রিকা মন্তব্য করেছিল এই রকম :

"এর থেকে দেখা যায় যে ভারতীয় বিপ্লবীরা ইতিমধ্যেই সারা দুনিয়ার প্রলেটারিয়েতের ঐক্য ও তার সংগ্রামী সংহতি সম্পর্কে বেশ পরিপক্ক চেতনা লাভ করেছিলেন।"

আবদুর রবের তাসখন্দের এ সভায় উপস্থিত ছিলেন মার্শাল ফ্রুঞ্জ, কুই-বিশেভের মতো বিশিষ্ট সোভিয়েত নেতৃবর্গ (**Devendra Kaushik,** ***Central Asia in Modern Times***, পৃ. ১১০-১১)।

ভারতীয় বিপ্লবী : কাবুল ও মধ্য-এশিয়ায়

১৯১৯ সাল থেকে মধ্য-এশিয়ার যে ভূখণ্ডটি আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সেখানে ভারতীয় বিপ্লবীদের আনাগোনা প্রসঙ্গে ভারত-মধ্য-এশিয়ার সম্পর্কের সামান্য একটু পৃষ্ঠপট জানানো দরকার এখানে। সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পেয়েছি প্রধানত মস্কোর প্রগতি প্রকাশন কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত ডঃ দেবেন্দ্র কৌশিকের পূর্বোল্লিখিত *Central Asia in Modern Times* বইটি থেকেই।

উনিশ শতকে জারতন্ত্রী রাশিয়া মধ্য-এশিয়ার দেশগুলিতে আধিপত্য বিস্তার শুরু করে এবং ঐ শতকের শেষ দশকে প্রায় গোটা ভূখণ্ডেরই মালিক হয়ে দাঁড়ায়। এমন-কি, বুখারার আমীরতন্ত্র বা খিভার খানতন্ত্র নামে স্বাধীন হলেও আসলে তারই বশম্বদ রাজ্যে পর্যবসিত হয়।

মধ্য-এশিয়ায় জারতন্ত্রী রাশিয়ার এই অভিযানের প্রভাব ভারতবর্ষের মতো বৃটিশ-শাসিত দেশগুলির উপরে পড়ে দুদিক থেকে। একদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা 'রুশ জুজু'র রব তুলে তাদের ভারত সীমান্ত অঞ্চলের 'আগুয়ান নীতি'কে (Forward Policy) আড়াল রাখার চেষ্টা করে। অন্য দিকে ভারতবর্ষের ক্রমপ্রসারী জাতীয় আন্দোলনের উপরে তার যে প্রভাব পড়ে তা এঙ্গেলসের ভাষায় এই রকম :

> "...একটি প্রথমশ্রেণীর ইউরোপীয় সামরিক শক্তি যখন তুর্কিস্তানে তার শক্তি জাহির ক'রে নরম গরম পন্থার সমন্বয়ে পারস্য ও আফগানিস্তানকে তার প্রভাবাধীন রাজ্যে পরিণত করতে সচেষ্ট হয় আর ধীর অথচ অবিচল গতিতে অগ্রসর হতে থাকে হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতমালার দিকে, তখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের এক অবস্থার উদ্ভব হয়। বৃটিশ আধিপত্য তখন আর অনিবার্য বিধিলিপি থাকে না এবং দেশের মানুষের কাছে উন্মোচিত হয় এক নবদিগন্ত : জবরদস্তি খাটিয়ে একদিন যা গড়া হয়েছিল জবরদস্তির সাহায্যেই তা ভাঙাও চলতে পারে তা হলে..." (মার্কস ও এঙ্গেলসের রুশ-সংস্করণ রচনা-সংগ্রহ, খণ্ড ২২, পৃ. ৪৫ থেকে ডঃ কৌশিকের পূর্বোক্ত বইয়ের ১৩০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত ইংরেজী অনুবাদের তর্জমা)।

মধ্য-এশিয়ায় জারতন্ত্রী রাশিয়ার সাম্রাজ্যবিস্তার ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম যাদের মনে আশার উদ্রেক করে তাঁরা কিন্তু হলেন দেশীয় রাজ্যের কোনো কোনো রাজা মহারাজা। ইংরেজের হাতে সদ্য তাঁদের আধিপত্য খর্ব হওয়ায় তাঁরা ঐ সময়ে বিশেষ বিরূপ ছিলেন তাদের প্রতি। সুতরাং জারের মতো প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাটের সাহায্যে লুপ্ত গরিমা পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। এর জন্য জার সরকারের সঙ্গে শুধু চিঠি লেখালেখিই নয়, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কাশ্মীর, ইন্দোর প্রভৃতি রাজ্যের মহারাজারা একাধিক মিশনও পাঠিয়েছিলেন তাসখন্দে ঐ উদ্দেশ্যেই। আবার উল্টো দিকে মধ্য-এশিয়ার কোকন্দের খান ও বুখারার আমীরের কাছ থেকেও তেমনি তিনটি মিশন এসেছিল ভারত সরকারের কাছে— রুশ সম্রাটের বিরুদ্ধে বৃটিশ-সহায়তা প্রার্থনা ক'রে।

তবে শুধু রাজারাজড়ারাই নয়, অন্য ধরনের কিছু লোকও ঐ সময়ে মধ্য-এশিয়ার দেশগুলিতে গিয়েছিলেন ভারতবর্ষ থেকে। যেমন ডঃ দেবেন্দ্র কৌশিকের বই থেকে, জানা যায় যে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর বহু বিদ্রোহী সিপাহীও নাকি পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন বোখারা ও কোকন্দে (ঐ, পৃ. ১০৩)। ডঃ কৌশিক অবশ্য তাঁর এই তথ্যের উৎস সম্পর্কে কিছু জানান নি।

১৮৭৯ সালে পাঞ্জাবের নামধারী শিখদের 'কুকা আন্দোলন' নামে পরিচিত বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের তরফ থেকে গুরুচরণ সিং নামে ৭৫-বছরের এক বৃদ্ধ তাসখন্দে পেঁৗছেছিলেন, ঐ আন্দোলনের নেতা গুরুরাম সিং-এর এক চিঠি নিয়ে। গুরুরাম সিং ঐ চিঠিতে গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দ সিং-এর এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর উল্লেখ করেছিলেন যে পাঞ্জাব নাকি মুক্তিলাভ করবে রুশদের সহায়তায় (দ্রষ্টব্য : M. M. Ahluwalia, *Kukas, the freedom fighters of the Punjab* গ্রন্থের "Namdharis and the Russians in Central Asia"-শীর্ষক অধ্যায়, পৃ. ১১৬-২৭)। বলা বাহুল্য, এ-সব আবেদনের কোনো সাড়া মেলে নি জারতন্ত্রীদের দিক থেকে।

মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত না হলেও প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা চলে যে ১৯০৫ সালের জানুয়ারি মাসে বাল গঙ্গাধর তিলক বোম্বাইয়ের রুশ কন্সাল, ক্লেমের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে দুজন ভারতীয়ের সামরিক শিক্ষালাভে সহায়তা

করার অনুরোধ জানান আর ঐ ক্লেমের সুপারিশেই মাধব রাও নামে এক মারাঠী তরুণ শেষ পর্যন্ত সুযোগ পেয়েছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশ করার।

মধ্য-এশিয়ার জারতন্ত্রী রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের এই ধরনের শেষ চেষ্টা মহেন্দ্রপ্রতাপের। তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে এবং এ-ও দেখানো হয়েছে যে ঐ চেষ্টা শুধু যে সফল হয় নি তাই নয়. দ্বিতীয়বার জারতন্ত্রীরা তাঁর দূতকে তুলে দেয় ইংরেজের হাতে আর ইংরেজরা তাঁকে গুলি করে মারে এক বিচারের প্রহসনের পর।

রাশিয়ার ফেব্রুয়ারি-বিপ্লবের পরেও মহেন্দ্রপ্রতাপ আর-একবার চেষ্টা করেন কেরেন্‌স্কি সরকারের সহানুভূতি অর্জনের। বলা বাহুল্য, ব্যর্থ হয় সে-চেষ্টাও।

নভেম্বর-বিপ্লবের পর মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লাহ্‌, আবদুর রব প্রভৃতি ভারতীয় বিপ্লবীরা কিভাবে সোভিয়েত মধ্য-এশিয়ায় পৌঁছেছিলেন তার বৃত্তান্ত আমরা আগেই পেয়েছি। এঁরা ছাড়া আর যাঁরা ঐ সময়ে (অর্থাৎ ১৯১৯-২০ সালে —গ্রন্থকার) সেখানে এসেছিলেন তাঁদের কথা এবার বলা যেতে পারে কিছুটা। একটা কথা কিন্তু গোড়াতেই বলে রাখা দরকার : সোভিয়েত এশিয়ায় ঐ সময়ে প্রায় ৮০০০ ভারতীয় বাস করতেন— তাসখন্দ, সমরকন্দ, বুখারা, আন্দিজান, এমন-কি, সুদূর বাকু ও আস্ত্রাখানেও। এঁদের অধিকাংশই এসেছিলেন সিন্ধু ও পাঞ্জাব থেকে। তাঁদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ সবাই ছিলেন। এঁরা ছিলেন প্রধানত ব্যবসায়ী, কেউ কেউ তেজারতিও করতেন। আবার কৃষক ও কারিগরও ছিলেন কেউ কেউ।

ভারতবর্ষের এত কাছে মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয়দের এই বসতিগুলি থাকার দরুন বৃটিশবিরোধী তৎপরতা চালানোর খুবই সুবিধা হয়। ফলে নভেম্বর-বিপ্লবের পর বহু ভারতীয় বিপ্লবী আশ্রয় খোঁজেন মধ্য-এশিয়ার এই দেশ-গুলিতে। তার মধ্যে কয়েকজনের কথা এখানে বলা যেতে পারে।

সোভিয়েত সাংবাদিক, এ. ভ্যাসিলিয়েভ তাঁর "Indian Revolutionaries in Soviet Russia" প্রবন্ধে লিখেছেন যে তাসখন্দে কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবী তুর্কিস্তানের ট্রেড ইউনিয়নের দ্বিতীয় কংগ্রেস ও তাসখন্দ শহরের কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় যোগ দেন। বুখারা সরকারের পররাষ্ট্রবিভাগে ও অন্যান্য সরকারী দপ্তরেও নাকি ভারতীয়েরা কাজ করতেন দোভাষী ও অনুবাদকের।

ভ্যাসিলিয়েভের লেখায় অবশ্য এ-সব ঘটনার তারিখ বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম পাওয়া যায় না।

ভ্যাসিলিয়েভ জানিয়েছেন যে তাসখন্দে ১৯১৯ সালে তুর্কিস্তান কমিউনিস্ট-দের সহায়তায় যে 'প্রাচ্যদেশ মুক্তি সাধন লীগ' (League for the Liberation of the East) প্রতিষ্ঠিত হয় তাতেও ভারতীয়েরা সক্রিয় ছিলেন। তা ছাড়া তাসখন্দে যে আন্তর্জাতিক প্রচার সংসদের (Council for International Propaganda) কাজকর্মের কথা শোনা যায় তার চীনা, ইরানী ও তুর্কি বিভাগের পাশাপাশি একটি ভারতীয় বিভাগও ছিল আর ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে বাকুতে যে 'প্রাচ্য বাসী সম্মেলন' হয়েছিল তারাই নাকি সেখানে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল ১৪ জন।

ভ্যাসিলিয়েভ লিখছেন যে, ভারতীয়রা ১৯১৯ সালে ডিসেম্বর মাসে আবদুর রবের নেতৃত্বে একটি 'ভারতীয় বিপ্লবী সংঘ' (Indian Revolutionary Association) গড়ে তোলেন— যে সংঘের কাছেই ১৯২০ সালে বাণী পাঠিয়েছিলেন লেনিন। ঐ সংঘের পাশাপাশি বাকুতে একটি অস্থায়ী ভারতীয় বিপ্লবী কমিটিও গঠিত হয় যার নেতা ছিলেন গুলাম মুহম্মদ, গুলাম রুব্বাহি ও ফইজুল্লা মাহমুদ।

ভ্যাসিলিয়েভ স্পষ্ট করে না বললেও সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ থেকে বোধ হয় যে ঐ সংঘ ১৯১৯ সালে ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাসখন্দে। ঐ সংঘের কাছে ১৯২০ সালে লেনিন 'ভারতীয় বিপ্লবী সংঘের প্রতি' শিরোনামায় যে বাণী পাঠিয়েছিলেন তার পূর্ণ বয়ানটি এই রকম :

"এ খবর শুনে আমি বিশেষ আনন্দিত যে 'শ্রমিক ও কৃষকের প্রজাতন্ত্র' কর্তৃক ঘোষিত দেশী-বিদেশী শোষকদের শোষণ থেকে নিপীড়িত জাতি-গুলির মুক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি, যে-সব প্রগতিশীল ভারতবাসী স্বাধীনতাকল্পে নির্ভীক সংগ্রাম চালাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে এ-ধরনের ত্বরিত সাড়া জাগিয়েছে। রাশিয়ার মেহনতী জনসাধারণ ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকদের জাগরণের দিকে নজর রাখছে নিরলস মনোযোগ দিয়ে। মেহনতী মানুষের সংগঠন ও শৃঙ্খলা এবং অধ্যবসায় আর দুনিয়ার শ্রমজীবী সাধারণের সঙ্গে সংহতি তাদের চূড়ান্ত জয়লাভের প্রতিশ্রুতি বহন করে। মুসলমান ও অ-মুসলমানদের ঘনিষ্ঠ মৈত্রীকে আমরা অভিনন্দন জানাই।

ঐ মৈত্রী প্রাচ্যের সমস্ত মেহনতী মানুষের দিকে প্রসারিত হোক— এই আমাদের আন্তরিক কামনা। ভারতীয়, চীনা, কোরীয়, জাপানী, পারসিক ও তুর্কী শ্রমিক ও কৃষকেরা যখন হাত মেলাবে এবং মুক্তির সাধারণ ব্রত উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে একসঙ্গে যাত্রা করবে— একমাত্র তখনই শুধু নিশ্চিত হবে শোষকদের উপরে চূড়ান্ত জয়লাভ। মুক্ত এশিয়া দীর্ঘজীবী হোক" (*Collected Works*, খণ্ড ৩১, পৃ. ১৩৮)।

এই ছোট্ট বাণীতে লেনিন ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি সেদিন ভারতীয় বিপ্লবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, যেমন পৃথিবীর মেহনতী জনগণের সঙ্গে সংহতি, হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী এবং সমস্ত পরাধীন দেশের মেহনতী মানুষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন।

এরই সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নোটটি (*Collected Works*, ৩১ খণ্ড, পৃ. ৫৫৪) থেকে জানা যায় যে লেনিনের ঐ বাণী সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে ১৯২০ সালের ১০ মে বেতারে প্রচারিত হয়েছিল, ঐ বছরের ১৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত এক 'ভারতীয় বিপ্লবী সম্মেলনের' প্রস্তাবের জবাবে। লেনিনের কাছে প্রেরিত সেই প্রস্তাবটি এই:

"সোভিয়েত রাশিয়া সমস্ত নিপীড়িত শ্রেণী ও জাতির এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষের মুক্তির উদ্দেশ্যে যে মহৎ সংগ্রাম চালাচ্ছে, ভারতীয় বিপ্লবীগণ তার জন্য তাঁদের গভীর কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জানাচ্ছেন। সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে নিপীড়িত সাড়ে একত্রিশ কোটি মানুষের আর্তনাদে কর্ণপাত করার জন্য সোভিয়েত রাশিয়াকে অশেষ ধন্যবাদ! নিপীড়িত ভারতের প্রতি তাদের বন্ধুত্ব ও সহায়তার প্রসারিত হাত এই জনসভা সানন্দে গ্রহণ করছে।"

এই প্রস্তাবটিও লেনিনের বাণীর পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রাভদা'র ১৯২০ সালে ২০ মে তারিখের ১০৮ সংখ্যায়।

কাবুলে অনুষ্ঠিত 'ভারতীয় বিপ্লবী সম্মেলন' আর 'ভারতীয় বিপ্লবী সংঘ' যে পরস্পর সম্পর্কিত ছিল তা স্পষ্টই বোঝা যায় লেনিনের বাণীর 'ভারতীয় বিপ্লবী সংঘের প্রতি' এই শিরোনামা থেকে। হয়তো ঐ সংঘই ঐ সম্মেলন আহ্বানের পিছনে ছিল। আবার ভ্যাসিলিয়েভের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে ঐ সংঘ ১৯১৯ সালে ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আবদুর রবের নেতৃত্বে,

সম্ভবত তাসখন্দেই। আসলে ১৯১৯ সালের শেষ থেকে ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর অবধি ভারতীয় বিপ্লবীরা ক্রমাগত যাতায়াত করেছেন কাবুল ও তাসখন্দের মধ্যে। তাসখন্দ থেকে তাঁরা তাঁদের পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন ঐ সময়ে।

কাবুল থেকে যে ভারতীয়েরা তাসখন্দে পেঁছিন তাঁদের মধ্যে জনকয়েক হিন্দু বিপ্লবী ছিলেন— ডঃ দেবেন্দ্র কৌশিকের এই খবর থেকে বোঝা যায় না তিনি ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ হিজরতিদের যে দল দুটি তাসখন্দ পেঁছিয় তাদের কথাই বলছেন কি না। তিনি লিখেছেন যে ১৯২০ সালের ২২ জুলাইয়ের 'ইজভেস্তিয়া তুর্কৎসিকা' পত্রিকায় নাকি প্যাটেল নামে এক ভারতীয় বিপ্লবীর উল্লেখ আছে যিনি তাসখন্দে এক মহিলা-সম্মেলনে উজবেক নারীদের পর্দা বর্জন করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন (ঐ, পৃ. ১১২)। প্যাটেলের কোনো পরিচয় আমাদের জানা নেই।

ডঃ কৌশিক লিখেছেন যে ঐ সময়কার সোভিয়েত পত্রিকায় (তিনি পত্রিকার নাম, সংখ্যা বা তারিখ উল্লেখ করেন নি) বুখারার ভারতীয় বাসিন্দাদের এক সভার উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে 'ভারতীয় বিপ্লবী সংঘে'র একটি স্থানীয় শাখা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। আর সেই সভায় নাকি উপস্থিত ছিলেন কয়েকজন বাঙালী (ঐ, পৃ. ১১২)। তাঁদের পরিচয়ও আমাদের এখনো অজানা।

সমরখন্দ ও বাকুতেও ঐ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ভারতীয় বিপ্লবী সংঘে'র শাখা। বাকু থেকে প্রকাশিত 'আজাদ হিন্দুস্তান আখ্‌বার' নামে এক পাক্ষিক পত্রিকাতেও ঐ শাখার খবর প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ পত্রিকার ২২ অগাস্ট সংখ্যায় বৃটিশ সরকারের ভারতীয় সেনাবাহিনীর সিপাহীদের আহ্বান জানানো হয়েছিল তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করার।

'ভারতীয় বিপ্লবী সংঘ' এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে পলাতক সিপাহীদের প্রসঙ্গে একটু পরে আলোচনা করা যাবে।

১৯২০ সালের যে সময়ের কথা বলছি তখন মস্কোতে জোর তোড়জোড় চলেছে 'কমিণ্টার্নে'র (কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের সংক্ষিপ্ত নাম) দ্বিতীয় কংগ্রেসের। এর আগের বছর ১৯১৯ সালের ২ থেকে ৬ মার্চ অবধি অনুষ্ঠিত ঐ সংস্থার প্রথম কংগ্রেসে কোনো ভারতীয় উপস্থিত ছিলেন না। এবার দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রতিবাদী আচার্য। মানবেন্দ্রনাথ মেক্সিকোর পার্টির নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেসে

ভোটাধিকারী ছিলেন আর অবনীনাথ ও আচার্য ভারতবর্ষের তরফ থেকে যোগ দিলেন ভোটের অধিকার ছাড়া। মস্কোর 'ইন্‌স্টিটিউট অফ মার্কসিজ্‌ম-লেনিনিজ্‌মে'র দপ্তরে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রে দেখলাম অবনীনাথের নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে 'Leftwing Socialist' আর আচার্যের নামের পর I. R. P. এই তিনটি হরফ লেখা রয়েছে। ডাঃ গঙ্গাধর অধিকারী তাঁর "The Comintern Congresses and the C. P. I." প্রবন্ধে (*Marxist Miscellany* সংকলনের সংখ্যা ২, পৃ. ৩) অনুমান করেছেন যে ঐ তিনটি হরফে 'Indian Revolutionaries Party' বোঝানো হয়েছে। আমরা একটু আগে দেখলাম যে ঐ সংস্থাটিকে অন্যত্র 'Indian Revolutionary Association' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। তবু মনে হয় ডাঃ অধিকারীর অনুমান সঠিক কারণ মুহম্মদ শফীক গ্রেপ্তার হওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যে বিবৃতি দেন তাতে তিনি বলেছিলেন যে আচার্য কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন আবদুর রবের 'ভারতীয় বিপ্লবী সমিতি'র পক্ষ থেকে। ঐ সমিতি সম্পর্কে ইতিমধ্যে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে এর আগেই।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব তাঁর 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' বইয়ে লিখেছেন যে শফীকও নাকি দ্বিতীয় কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন দর্শক হিসেবে। শফীকের যে বিবৃতির কথা এখনই উল্লেখ করা হল তাতে নাকি আছে ঐ কথা। মস্কোর 'ইন্‌স্টিটিউট অফ মার্কসিজ্‌ম-লেনিনিজ্‌মে'র দপ্তরে সংশ্লিষ্ট যে কাগজপত্রের কথা একটু আগে উল্লেখ করেছি তাতে কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ, অবনীনাথ ও প্রতিবাদী আচার্য ছাড়া আর কারো নাম নেই।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলেছিল ১৯২০ সালে জুলাই থেকে ৭ অগাস্ট পর্যন্ত। মানবেন্দ্রনাথ এর কিছুটা আগেই মস্কো পৌঁছেছিলেন বার্লিন থেকে। এর পরের বৃত্তান্ত মানবেন্দ্রনাথ সবিস্তারে লিখে গেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়: পৌঁছোনোর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই লেনিন, জিনোভিয়েভ প্রভৃতি নেতাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ, দ্বিতীয় কংগ্রেসের জন্য লেনিন জাতীয় উপনিবেশিক প্রশ্ন সম্পর্কে যে নিবন্ধের প্রাথমিক খসড়া তৈরি করেছিলেন তার সম্পর্কে লেনিনের তাঁর মতামত জানতে চাওয়া, সে বিষয়ে লেনিনের সঙ্গে তাঁর আলোচনা ও তার ফলে নিজের নিবন্ধ সম্পর্কে লেনিনের সংশয় এবং তারই জন্য মানবেন্দ্রনাথকে ঐ বিষয়ে আর-একটি পরিপূরক নিবন্ধ লিখতে লেনিনের

অনুরোধ, তাঁর সেই পরিপূরক নিবন্ধের খসড়া লেনিনকে দেখানো এবং তাঁর তরফে ঐ নিবন্ধ সম্পর্কে লেনিনের 'সামান্য কিছু ভাষাগত পরিবর্তনের প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ' (পৃ. ৩৮১) ইত্যাদি।

ডা: অধিকারী তাঁর "Lenin on Roy's Supplementary Colonial Theses" প্রবন্ধে(*Marxist Miscellany* সংকলনের সংখ্যা ১, পৃ.২) দেখিয়েছেন যে এতাবৎ লেনিন-মানবেন্দ্রনাথের উপরোক্ত মতানৈক্য বিষয়ে দুই মার্কিন গ্রন্থকার, এভারস্ট্রীট ও উইণ্ডমিলার তাঁদের *Communism in India* গ্রন্থে (পৃ.২৬-৩৩) আর সুপরিচিত ইংরেজ ঐতিহাসিক ই.এইচ.কার্ তাঁর *Bolshevik Revolution* গ্রন্থে (খণ্ড ৩, পৃ. ২৫১-৫৯) যে আলোচনা করেছেন তার ভিত্তি ছিল দ্বিতীয় কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট (১৯৩৪ সালের রুশ সংস্করণ) আর মানবেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা। কিন্তু সোভিয়েত গবেষক এ. রেজ্নিকভ ঐখানেই না থেমে তত্ত্বতল্লাসী চালিয়ে সন্ধান পেয়েছেন একেবারে মূলের কিছু মাল-মশলার, যেমন মানবেন্দ্রনাথের পরিপূরক নিবন্ধের প্রাথমিক খসড়ার (যে সংশোধিত ও পরিমার্জিত রূপে সেটি দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল তার থেকে এটির বিস্তর তফাত —গ্রন্থকার), ঐ খসড়ার যে কপিটির উপর লেনিন ইংরেজীতে কাটাকুটি ও সংশোধন করেছিলেন সেই কপিটির আর 'ইন্স্টিটিউট অফ মার্কসিজ্ম লেনিনিজ্মে' কেন্দ্রীয় পার্টি মহাফেজখানায় সংরক্ষিত দ্বিতীয় কংগ্রেসের ঔপনিবেশিক কমিশনের আলোচনার বিস্তারিত রিপোর্টের।

ঐ দলিলগুলির সাহায্যে রেজ্নিকভ দেখিয়েছেন, যে 'সামান্য ভাষাগত পরিবর্তনের পর' মানবেন্দ্রনাথের ঐ পরিপূরক নিবন্ধ লেনিন-কর্তৃক গৃহীত হওয়ার যে কথা মানবেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন তা আদৌ সত্য নয়। আসলে লেনিন মানবেন্দ্রনাথের নিবন্ধের 'সামান্য ভাষাগত পরিবর্তন' নয়, একেবারে মৌলিক রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন— বহু মারাত্মক অংশ একেবারে কেটে বাদ দিয়ে এবং বহু জায়গায় মূলগত সব সংশোধনীর সহায়তায়। রেজ্নিকভের দুটি রচনায় আর তারই উপরে ভিত্তি করে লেখা ডা: অধিকারীর উপরোক্ত প্রবন্ধে এই সিদ্ধান্ত খুবই বিশদভাবে প্রমাণ করা হয়েছে। এখানে তাই আর ঐ তিনটি লেখায় অনুসৃত যুক্তি-পরম্পরার পুনরাবৃত্তি করব না, শুধু এই কথা বলব যে, পরাধীন দেশের প্রায় সর্বব্যাপী জাতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলন এবং সেখানকার একান্ত প্রপীড়িত শ্রমিক, কৃষকের অর্থনৈতিক দাবি

আদায়ের আন্দোলনকে একেবারে পৃথক, নিঃসম্পর্কিত, এমন-কি, পরস্পর-বিরোধী করে দেখার যে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী সেদিন মানবেন্দ্রনাথের প্রাথমিক খসড়ায় প্রতিফলিত হয়েছিল, লেনিনের সতর্ক বাণী সত্ত্বেও তার ভূত বহুদিন আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছিল। আজও কি আমরা তাকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতে পেরেছি ঘাড় থেকে ?

মানবেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে দ্বিতীয় কংগ্রেসে যে কার্যনির্বাহক সমিতি (ECCI) নির্বাচিত হয় তাতে পারস্যের সুলতান জাদের সংগে তাঁর নামও নাকি প্রস্তাব করেছিল কংগ্রেসের সেক্রেটারিয়েট, তিনি রাজী হন নি—তাঁর জায়গায় তাঁরই প্রস্তাব অনুসারে গৃহীত হয়েছিল কোরীয় প্রতিনিধি পাকের নাম (*Memoirs*, পৃ. ৩৮৭)। তবে কার্যনির্বাহক সমিতির 'স্মল ব্যুরো' নামে পরিচিত, প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী যে ছোটো সংস্থাটি গঠিত হয় তাতে কো-অপ্ট করা হয় মানবেন্দ্রনাথকে। 'স্মল ব্যুরো' সিদ্ধান্ত করে অবিলম্বে বাকুতে নির্যাতিত প্রাচ্যদেশবাসীদের এক সম্মেলন আহ্বানের এবং তাসখন্দে কমিন্টার্নের একটি 'মধ্য-এশিয়া ব্যুরো' গঠনের। ঐ 'মধ্য-এশীয় ব্যুরো'রও সদস্য নির্বাচিত হলেন মানবেন্দ্রনাথ।

বাকুতে 'প্রাচ্যবাসী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় ১৯২০ সালের ১ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর। এতে তুর্কী, ইরানী, চীনা, কুর্দ, আরব, আর্মানী, জর্জীয়, ভারতীয় প্রভৃতি ৩২টি জাতির মোট ১৮৯১ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১২৭৩ জন ছিলেন কমিউনিস্ট, কেউ কেউ ছিলেন বুর্জোয়া জাতীয়তা-বাদী দলের সংগে যুক্ত, আবার অনেকে কোনো দলেরই সদস্য ছিলেন না। তাঁদের কাছে সম্মেলনের তরফ থেকে যে আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছিল তাতে ছিল এই কথা :

"নিকট প্রাচ্যের শ্রমিক ও কৃষকগণ ! আপনারা যদি সংঘবদ্ধ হন, আমাদের নিজস্ব শ্রমিক ও কৃষক শক্তি সংগঠিত করেন, আপনারা নিজেরা যদি রুশ শ্রমিক ও কৃষক বাহিনীতে যোগ দেন তবে আপনারা বৃটিশ ফরাসী ও মার্কিন পুঁজিপতিদের পরাস্ত করতে পারবেন। আপনারা মুক্তি অর্জন করুন শ্রমজীবীদের মুক্ত প্রজাতন্ত্রে। আমরা আপনাদের সংগে এই-সব প্রসংগে কথা বলতে চাই এই সম্মেলনে" (জাফর ইমাম, *Colonialism in East-West Relations*, পৃ. ২১, ২নং পাদটীকা)।

'কমিন্টার্নে'র নেতাদের মধ্যে বাকু সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জিনোভিয়েভ—তিনি হলেন সভাপতি—রাডেক ও বেলা কুন। আর ছিলেন 'দুনিয়া কাঁপানো দশ দিনে'-র বিখ্যাত লেখক, জন রীড ও ইংরেজ কমিউনিস্ট, টম কোয়েলশ।

মানবেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে তিনি বাকু সম্মেলন অনুষ্ঠানের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং জিনোভিয়েভ, চিচেরিন, রাডেক প্রমুখ নেতাদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তাই যোগ দেন নি— তাঁর ভাষায়—ঐ 'জিনোভিয়েভের সার্কাসে'। কারণ নিছক কিছুটা প্রচার ছাড়া এতে আর-কিছু হবে না এই ছিল তাঁর মত (*Memoirs*, পৃ. ৩৯১-৯২)।

বাকুতে না গিয়ে তিনি ঠিক সেই সময়েই সাঁজোয়া ট্রেনে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রওনা হয়েছিলেন তাসখন্দের দিকে। সেই অভিযানের উদ্দেশ্যে ছিল আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে ভারত-উদ্ধারের জন্য এক সশস্ত্র ভারতীয় মুক্তি-বাহিনী পাঠানো। তাঁর সেই অভিযানের কথা তিনি নিজেই তাঁর স্মৃতিকথায় সবিস্তারে লিখে গেছেন (পৃ. ৪১৯-২৬)। অথচ সে পরিকল্পনা যে সম্পূর্ণ অবাস্তব ও উদ্ভট ছিল, ইতিহাসই তা প্রমাণ করেছে নিঃসংশয়ে।

মানবেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে তিনি বাকুতে না গিয়ে সেখানে পাঠিয়েছিলেন অবনী মুখার্জিকে (পৃ. ৩৯২)। জাফর ইমাম তাঁর পূর্বোল্লিখিত বইয়ে (পৃ. ২২) লিখেছেন যে একজন ভারতীয় প্রতিনিধি নাকি বাকু সম্মেলনে বলে-ছিলেন : "বহুদিন যাবৎ আমরা এই সম্মেলনের জন্য অপেক্ষা করে আসছি এই আশায়, যে প্রাচ্য দেশের সমস্ত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হবে ও আমাদের মুক্ত করবে বিশ্ব ধনতন্ত্রের কবল থেকে।" সে প্রতিনিধি কি তবে অবনী মুখার্জি ?

ডেভিড এন. ড্রুহে কিন্তু তাঁর ***Soviet Russia and Indian Communism***-এ বেশ স্পষ্ট করেই লিখেছেন যে বাকু সম্মেলনে ১৪ জনের যে ভারতীয় প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিল (২৩৫ জন তুর্ক, ১৯২ জন ইরানী ও ১৫৭ জন আর্মেনিয়ান প্রতিনিধির তুলনায় এই সংখ্যা খুবই নগণ্য —গ্রন্থকার) তার নেতা ছিলেন অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়। ড্রুহে বলেছেন ভারতীয় প্রতিনিধিদের অধিকাংশই ছিলেন ইরানের খোরাসান অঞ্চলে অবস্থিত বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান সৈন্য-বাহিনী থেকে পলাতক সিপাহী। বাকু সম্মেলনে অবনীনাথের বক্তৃতার মূল কথাগুলিও পাওয়া যায় ড্রুহের লেখায় (পৃ. ২৮-২৯)।

ই. এইচ. কারের রুশ-বিপ্লবের ইতিহাসে বাকু সম্মেলনে কোনো ভারতীয়

প্রতিনিধির উপস্থিতির কথা নেই। কিন্তু তাঁর বইয়ের তৃতীয় খণ্ডের ২৫৬ পৃষ্ঠার ১ নং পাদটীকায় আছে এই খবর :

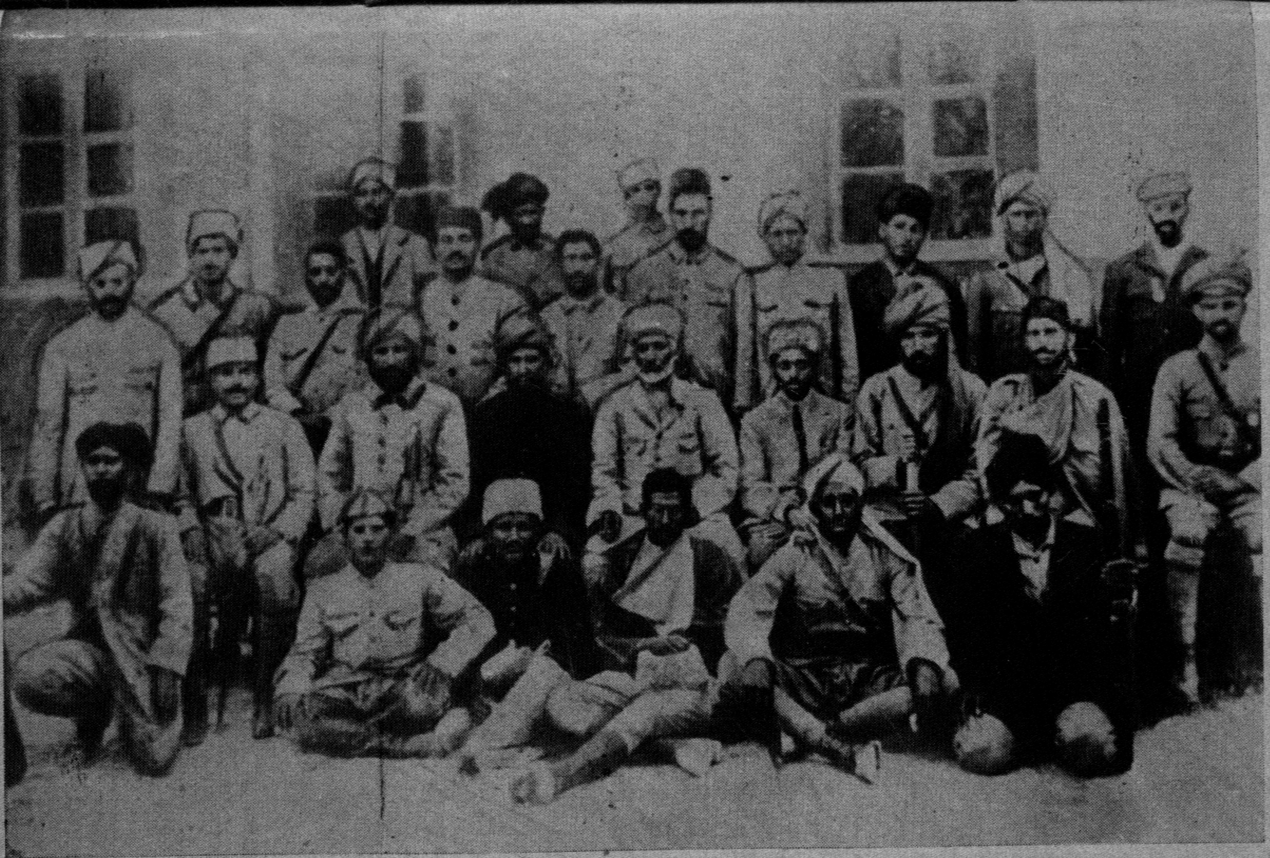
"'তাসখন্দের ভারতীয় বিপ্লবী সমিতি' নামে আত্মপরিচয় দিয়ে একটি সংস্থা তাসখন্দ থেকে সম্মেলনের কাছে 'ভারতবর্ষের সাড়ে একত্রিশ কোটি নিপীড়িত মানুষকে সাহায্য দানের' এক আবেদন পাঠায় কিন্তু সেইসঙ্গে এ কথাও জানায় যে 'ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে যারা মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে তাদের পারিবারিক ও ধর্মীয় জীবনে কোনো হস্তক্ষেপ না করেই ঐ সাহায্য দেওয়া দরকার।'"

কার-এর মতে ঐ প্রসঙ্গে কোনো আলোচনা হয় নি বাকু সম্মেলনে।

তাসখন্দের 'ভারতীয় বিপ্লবী সমিতি' থেকে কোনো প্রতিনিধি বাকু সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কিনা জানি না, তবে ঐ সমিতির বাকু শাখা থেকে যে ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ডঃ দেবেন্দ্র কৌশিক লিখেছেন যে বাকু থেকে ভারতীয় বিপ্লবীদের তরফ থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'আজাদ হিন্দুস্থান আখবর' পত্রিকার ১ অক্টোবর (১৯২০) সংখ্যা থেকে জানা যায় যে সাত জন ভারতীয় বাকু সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ ছিলেন সীমান্ত-প্রদেশ থেকে আগত পাঞ্জাবী। ঐ পত্রিকার ১৫ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় তাঁদের মধ্যে তিন জনের ছবিও ছাপা হয় এই পরিচয় সমেত— 'ভারতীয় বিপ্লবী সমিতি'র বাকু শাখার মহম্মদ ফরিক খাজাঞ্চি (কোষাধ্যক্ষ), ফজিল অল কাদির (সম্পাদক) এবং গুলাম ফরিক। ছবি থেকে মনে হয় তাঁরা সম্ভবত এসেছিলেন বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে। ভারতীয় সীমান্ত বাহিনীর সৈন্যদের মতো তাঁদের মুখের চেহারা আর মস্ত পাগড়ি ও দীর্ঘ ছুঁচোলো সিপাহী-শোভন গোঁফ (*Central Asia in Modern Times*, পৃ. ১১৩)।

বাকুতে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবাসী সম্মেলনে যে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সৈন্যবাহিনী থেকে পলাতক কয়েকজন ভারতীয় সিপাহী যোগ দিয়েছিলেন, মানবেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথাতেও সে ঘটনার উল্লেখ আছে (*Memoirs*, পৃ. ৪৩৬)।

এবার পলাতক ভারতীয় সিপাহীদের লালফৌজে যোগদানের কথা কিছুটা বলা যেতে পারে। পরে ১৯২০ সালে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিক থেকে ভারতীয় হিজরতীরা যে কয়েক দফায় তাসখন্দে পৌঁছতে থাকেন, তাঁদের মধ্যেও বেশ-কিছু তরুণ মুহাজিরীন তাসখন্দের মিলিটারি স্কুলে ট্রেনিং নেন। তাঁদের



১৯১৯ সালে কাগান শহরে লালফৌজে যোগদানকারী বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান বাহিনী থেকে পলাতক সিপাহী দল। দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ১২৮-'৩২।
('Soviet-land' পত্রিকার সৌজন্যে)

LIST OF BOOKS ABOUT INDIAN MOVEMENT.

Sixmmm

Smiles of Congress by Surya Narayan Guntur
Amritsar and our Duty to India by B.G.Horniman
Life and Speeches of Gandhi
Life and Speeches of B.G.Tilak
Life and Services of Mohamed Ali
Speeches of Sarajini Naidu
Indian National Congress by ~~A.S.Ranmjam~~ A.S.Ranjam
Indian Home Rule by Gandhi
India for the Indians by C.R.Das
Non-Cooperation by Gandhi
Rights of Citizen by Satyamurti
Agony of the Punjab by Lajpat Rai
Political Future of India by Lajpat Rai
Young India " " "
England's Debt to India " " "
Ethics of Passive Resistence
Indian Constitution by P.Mukherji
Present Crisis in Hindu Society
Indian Nation Builders (3 vols)
Economic Menace to India
Responsible Government by B.C.Pal
The World Situation by " "
Nationality and Empire " "
Non-Cooperation " "
Ideal of Human Unity by Arabinda Ghose
(Other Political Works of " ").
Presidential Addresses of The Indian National Congress.
Speeches of Surendra Nath Banerji.
Evolution Of Indian Nationalism by Ambika Charan Mazumdar.
Life ~~xx~~ of Ranade by B.G.Tilak.
Madras Speeches of B.C.Pal.
Trade-Unionism in India by B.P.Wadia.
History of the Indian National Congress
Report of the Sedetion Committee (Rowlatt Report)
Hunter Report (on the Punjab Disturbances)
Report of the Congress Committee on the Punjab Atrácities of 1919.
Cult of Nationalism by Tagore.

Very few of these books will be available in England. It is necessary to order them from Kar, Mazumdar & Co. P.O.Box 60. Cornwallis Buildings, Calcutta.

লেনিনের জন্য আবদুর রব পেশোয়ারী কর্তৃক সংকলিত ভারতের জাতীয় আন্দোলন-বিষয়ক বইয়ের তালিকা। দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ১৯৯-২০১।

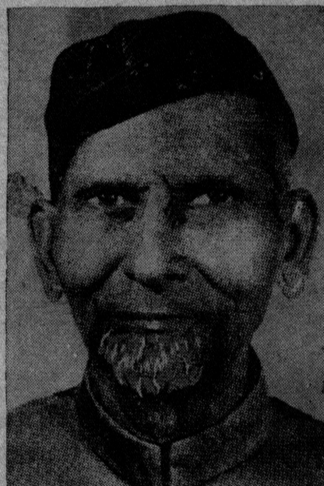
(মস্কোর 'ইনস্টিটিউট অফ মার্কসিজম-লেনিনিজমে'র সৌজন্যে)



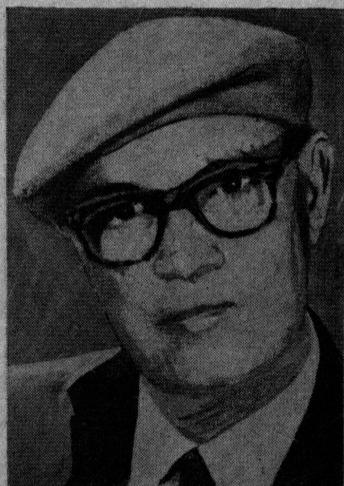
আবদুল মজিদ
(এস, এম, মেহ্‌দির সৌজন্যে)



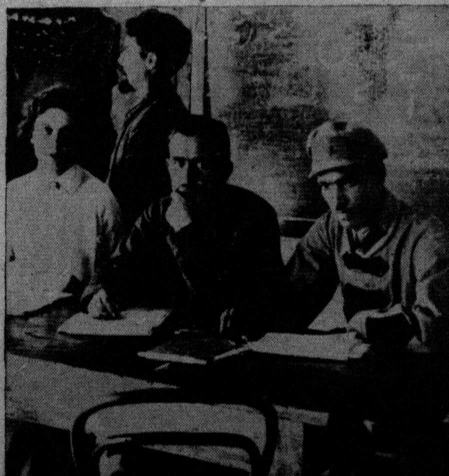
বাম থেকে দক্ষিণে—জাফর হাসান, মহম্ম আলি ও নুর মহম্মদ। ('বরকতুল্লা হ্‌ ভূপালী'র লেখক এম, ইরফানির সৌজন্যে



(মাঝে)— রফিক আহ্‌মদ (এস, এম, মেহ্‌দির সৌজন্যে)→



সওকৎ উসমানি
(এস. এম. মেহ্‌দির সৌজন্যে)



(ডাইনে)—ছবির একেবারে ডাইনে হবীব ওয়াফা (Soviet-land পত্রিকার

সোভিয়েত দেশে ভারতীয় বৈমানিক। দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ১৫৫-'৬১।



(উপরে) নাজির সিদ্দিকি।



(নিচে) আবদুল করিম।
(Soviet-land পত্রিকার সৌজন্যে)

شمارۂ اول — سال اول

ملل مظلومۂ شرق، نجات شما باتحاد عمل موقوف است:

مظلوم ملل مشرق! اتحاد عمل تمہاری نجات ہی!

حق کے آتے ہی ہوا کینہ سے رخصت باطل — چند دن اور ہیں دہلی میں بتان دہلی

ادارہ جمعیت احرار ہند

رئیس:

مولوی عبد الرب (?)

زمیندار

در ہفتہ یک بار نشر میشود

ایڈیٹر (مسئول محرری)

عبد المجید

ایوانوف — تاشکند

تاشکند — مؤرخہ — مئی سنہ ۱۹۲۰ء — مطابق — رمضان سنہ ۱۳۳۸ھ

فارسی

معرفی

درزمان حاضر اخبارات جزء اعظم قوۂ یک قوم ہستند، در ممالکیکہ مطبع ہا آزاد اند، مسلک حکومت آن ممالک تا یک مقیاس بزرگ بدست اخبارات می باشد، ملکہائیکہ بہ شومئ قسمت زیر فشار حکومت اغیار افتادہ اند، و برای نجات خود کم و بیش جنبش میکنند، در آن جاہا ہم جریدہ ہائی یک قوۂ بزرگ اند. مالک اند عموم مردم کہ زیر فشار این اشتار بی حس شدہ اند، یا احتمال دارد کہ بی حس شوند، بیدار کردنشان وظیفۂ واحد جریدہ ہائی آن ملک می باشد - الغرض در ہر صورت جرائد زبان مردم می باشند، خواہ در ہوائی آزاد این زبان معجزہ ہائی قوما خود را نشان بدہد، یا در ممالک محکوم مدام از دست جبر و ظلم بریدہ شود.

در ہندوستان ہزار ہا جرائد وظیفۂ خود را بجا می آرند جریدہ ہائی خوب کہ مستحق خطاب "زبان خلق" اند اکثر شکار فرعونیت مستبدین انگلیسی شدہ خاموش می شوند. لیکن مجددا در صورت دیگر وظیفۂ خود را دوام میدارند.

در بیرون ہندوستان ہم بسیار جریدہ ہا از طرف جمعیت ہائی انقلابیون ہندی نشر می شوند، از ان جملہ اخبار "زمیندار" است این جریدۂ اولین قسم خود است.

از انقلاب روسیہ یک آفتاب نو آزادی در یست طلوع شدہ است کہ از ضیائی آن بسیار اقوام بہ ذکاوفہم خود!

اردو

تعارف

موجودہ زمانہ مین اخبارات کسی قوم کے طاقت کا ایک جزو اعظم ہین، جن ملکون مین اخبارات آزاد ہیں، وہان کی حکومت کا مسلک ایک بڑی حد تک انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جو ملک بد قسمتی سے اغیار کی حکومت کے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی ہین، اور اپنی نجات کیلئے کچھ جنبش کر رہے ہین، وہاں بھی اخبارات ایک بڑی طاقت رکھتی ہیں۔ عام لوگون کو جو اس بوجھ کے نیچے پڑی پڑی بی حس ہو گئی ہیں، یا ان کی بی حس ہونیکا اندیشہ ہوتا ہے، انکا بیدار کرنا اخبارات کا ہے کام ہے۔

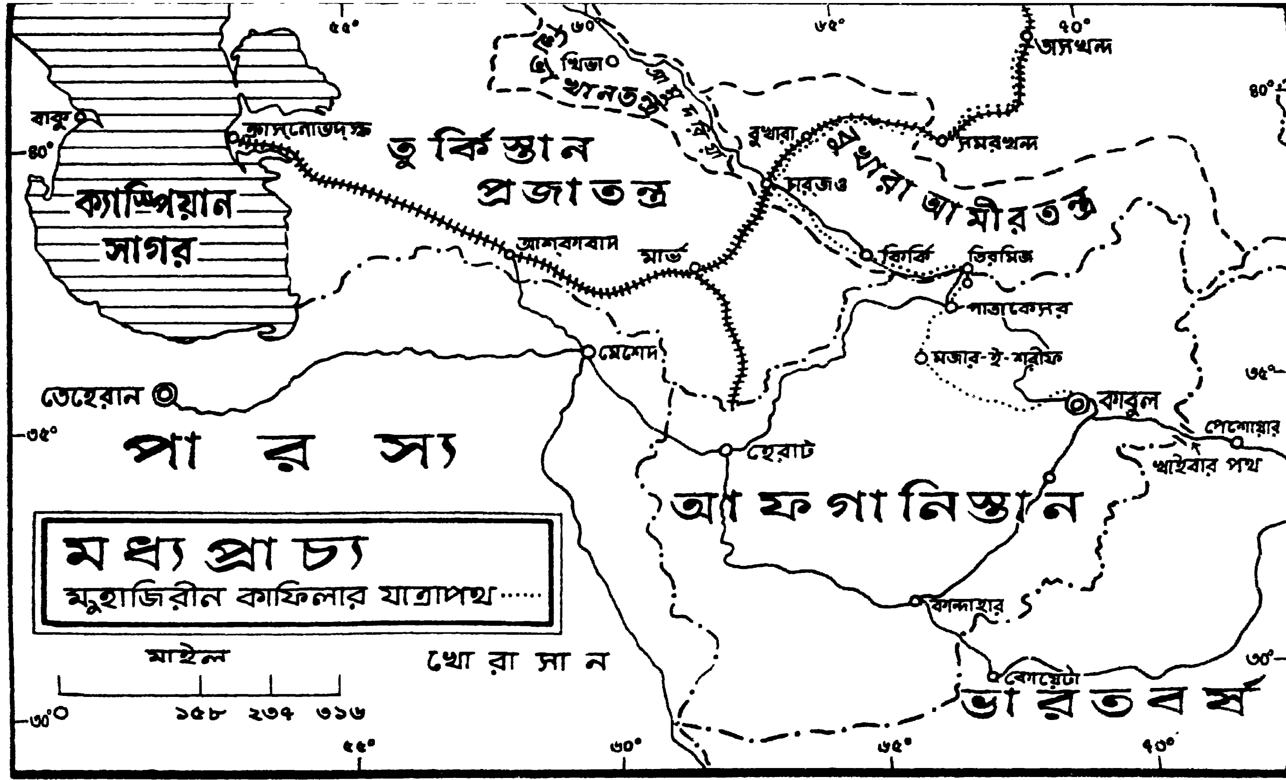
غرضیکہ ہر صورت مین وہ اخبارات لوگوں کی زبان ہوتی ہیں خواہ آزاد ہو یکسو وہ زبان اپنی طاقت کا معجزہ کرکے دکھاتی رہے یا محکوم ممالک میں جبر و ظلم کے ہاتھوں کٹتی رہے۔

ہندوستان میں ہزارون اخبارات آپنا کام کر رہے ہیں اچھی اخبارات جو لوگوں کی زبان کہلائی جانیکی مستحق ہین اکثر مستبد انگریزون کی فرعونیت کا شکار ہو کر خاموش ہو جاتی ہین لیکن، پھر کسی نہ کسی رنگ میں ظاہر ہوتی رہتی ہین اور اپنی جد و جہد کو جاری رکھتی ہیں۔

ہندوستان کے باہر بہت سی جمعیتین ہندوستانی انقلاب کو ترقی دینی کیلئی اخبارات نکال رہے ہین، "زمیندار" بھی اسی طرح کا اخبار ہوگا، یہ آپنی قسم کا پہلا اخبار ہی۔

১৯২০ সালের মে দিবসে তাসখন্দ থেকে প্রথম প্রকাশিত ভারতীয় বিপ্লবীদের উর্দু ও ফারসী দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক পত্রিকা—'জমীনদারে-র' একটি পৃষ্ঠা। দ্রষ্টব্য॥ পৃঃ ১১২।

('অজয়-ভবন' সংরক্ষণশালার সৌজন্যে)



মধ্যপ্রাচ্য—মুহাজিরীন কাফিলার যাত্রাপথ, দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ১৪২ ।

কেউ কেউ বিমানবাহিনীর পাইলটও হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত। তাঁদের কথায় পরে আসব। এখানে বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান সৈন্যবাহিনী থেকে পলাতক ভারতীয় সিপাহীদের কথাই বিশেষ করে বলছি।

ঐ সময়কার পরিস্থিতি সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন এই রকম (পৃ. ৪৩৪-৩৭): নভেম্বর বিপ্লবের পর সোভিয়েত সরকার বুখারায় আমীরতন্ত্র ও খিভার খানতন্ত্রকে স্বাধীনতা দেয়। ঐ দুই রাজ্য আরল হ্রদ থেকে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নব-প্রতিষ্ঠিত তুর্কিস্তান প্রজাতন্ত্রকে আড়াল করে রেখেছিল দক্ষিণের ট্রান্স-ক্যাস্পিয়ান মালভূমি ও পারস্য থেকে, যেখানে যুদ্ধের সময় থেকেই বহু ঘাঁটি গেড়েছিল বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান সৈন্যবাহিনী। এমন-কি, তারা দখল করে রেখেছিল পারস্যের পূর্ব সীমান্তবর্তী খোরাসান প্রদেশটিকেও। ঐ অঞ্চলে বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান সৈন্যবাহিনীর সব থেকে আগুয়ান ঘাঁটি ছিল মেশেদ শহরে। ফলে বেশ কয়েক শো মাইল ধরে পারস্যের সীমান্ত বরাবর রাশিয়ার যে ট্রান্স-ক্যাস্পিয়ান রেলপথ গিয়েছিল সেটি বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং তুর্কিস্তান প্রজাতন্ত্রে পেট্রোল ও কয়লা সরবরাহের পথও রুদ্ধ হয়ে পড়ার উপক্রম হয়। এমন-কি, সীমান্তবর্তী সুদূর আশ্কাবাদ শহরে যে ছোটো ঘাঁটিটি ছিল তাতে লোকজন বা রসদ পাঠানোও কঠিন হয়ে পড়ে।

ব্যাপারটা আরো কঠিন হয়ে ওঠে এই কারণে যে বুখারা বা খিভার শাসকেরা তাঁদের হাতে স্বাধীনতা তুলে দেওয়ার জন্য সোভিয়েত সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ বা বন্ধুভাবাপন্ন তো হনই নি, বরঞ্চ কিছুদিন পরেই টের পাওয়া গেল যে তাঁরা ও পাশের বৃটিশ দখলকারীদের বেশ কিছুটা প্রশ্রয় দিচ্ছেন তাঁদের এলাকায়, এমন-কি, তাদের সঙ্গে চক্রান্তও করছেন সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে।

এ রকম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে সোভিয়েতের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন হল মেশেদ্-কোয়েটা সড়কটিকে বৃটিশ কবল থেকে মুক্ত করার। তারই জন্য তাঁরা বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বৃটিশ-বিরোধী প্রচার চালাবার চেষ্টা শুরু করলেন। মানবেন্দ্রনাথ লিখেছেন তিনি প্রথমে চেষ্টা করেছিলেন তাসখন্দ ও বুখারার ভারতীয় বাসিন্দাদের এই কাজে লাগানোর। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ব্যবসায়ী। তাঁদের কাছ থেকে তাই তেমন সাড়া পাওয়া গেল না (ডঃ দেবেন্দ্র কৌশিকের বইয়ের ১১৩ পৃষ্ঠায় অবশ্য এ ধরনের একটি

ঘটনার উল্লেখ আছে : ১৯২১ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে মহম্মদ ইব্রাহিম হিন্দী, আবদুল্লা, আবদুল আজিজ ও গুলাম হাইদার নামে চার জন ভারতীয় বিপ্লবী তুর্কিস্তানের ভারতীয় বাসিন্দাদের প্রগতিশীল মহলের তরফ থেকে নাকি বুখারা কমিউনিস্টদের প্রথম কংগ্রেসে একটি অভিনন্দন বাণী পাঠিয়েছিলেন। তাতে তাঁরা লিখেছিলেন : 'আমাদের মাতৃভূমি থেকে বহু দূরে, নবীন বুখারা প্রজাতন্ত্রে আমরা আমাদের জীবন উৎসর্গ করেছি বিপ্লবকে জয়যুক্ত করার কাজে। অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিদারদের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম চালাব বুখারার বিপ্লবীদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে'—গ্রন্থকার)। কিন্তু ঐ কাজে যখন তিনি ঐ সময়ে গোপনে সীমান্তবর্তী আশ্কাবাদ ঘাঁটিতে গিয়েছিলেন তখন সীমান্ত এলাকায় তিনি বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান সৈন্যবাহিনী থেকে পলাতক ভারতীয় সিপাহীদের বেশ কয়েকটি ছোটো ছোটো দলের সাক্ষাৎ পান। এঁরা অধিকাংশই ছিলেন পাঠান—খিলাফতের জন্য আনাটোলিয়ায় গিয়ে তাঁরা তখন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য।

মানবেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে তিনি প্রস্তাব করেন ঐ সিপাহীদের নিয়ে একটা সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা হোক যার কাজ হবে ক্রাস্‌নোভোদ্‌স্ক থেকে মার্ভ্ পর্যন্ত ট্রান্স-ক্যাস্পিয়ান রেলপথ পাহারা দেওয়া আর পরে বৃটিশ দখলদারীদের ঐ এলাকা থেকে হটানোর কাজে লালফৌজকে সাহায্য করা। ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী বৃটিশবাহিনী থেকে পলাতক ঐ ভারতীয় সিপাহী, ইরানী বিপ্লবী ও রুশ কমিউনিস্টদের নিয়ে লালফৌজের একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী গড়া হয়। মানবেন্দ্রনাথ লিখেছেন (পৃ. ৪৩৬-৩৭):

"এই প্রয়াসটি বেশ সার্থক হয়— মরুভূমির দেশে লড়াই চালাবার ব্যাপারে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও তাঁদের স্বাভাবিক কষ্টসহিষ্ণুতার দরুন পাঠানেরা বড়ো ধরনের ও উঁচু দরের অস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষায় খুবই পাকা হয়ে ওঠেন— যে অস্ত্র বৃটিশ বাহিনীতে তাঁদের হাতে ভরসা করে দেওয়াই হত না কখনো। রাইফেল ব্যবহারে তাঁরা ছিলেন দুর্ধর্ষ, এবার তাঁরা চটপট আয়ত্ত করে ফেললেন মেশিন গান ও বড়ো কামান চালানোও। মেশিন গানে সজ্জিত তাঁদের ছোটো ছোটো দলগুলি মেশেদ্-আশ্কাবাদ সড়কের উপর বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান বাহিনীর উপর এত ঘন ঘন তড়িৎ আক্রমণ চালাতে লাগল যে অনতিবিলম্বে শত্রুপক্ষ বাধ্য হল পারস্য সীমান্তের ঘাঁটিগুলি ছাড়তে।

আন্তর্জাতিক বাহিনীর ইরানী দলগুলিও নানা ছদ্মবেশে তাঁদের দেশের মধ্যে বহুদূর পর্যন্ত ঢুকে যেতে লাগল এবং মেশেদ্-এর দক্ষিণের সড়কে বৃটিশ বাহিনীকে বিপর্যস্ত করতে থাকল পাশ থেকে।"

মানবেন্দ্রনাথ আবার লিখেছেন (পৃ. ৪৩৭):

"গোড়ায় গোড়ায় ঐ ভারতীয় বাহিনীগুলিকে পরিচালনা করতেন সেই রুশেরা যাঁরা গৃহযুদ্ধের সময় গেরিলা লড়াইয়ে বহুদিন ধরে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। অতি শীঘ্রই কিন্তু ভারতীয়দের উন্নীত করা হল অফিসার পর্যায়ে। এই ঘটনার নীতিগত ফলাফল দাঁড়াল অপরিমেয়। এর ফলে ইস্পাত-কঠিন ভারতীয় সিপাহীরা যেন নতুন মানুষ হয়ে উঠলেন— তাঁরা হয়ে দাঁড়ালেন সুদক্ষ ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অফিসার। তাঁদের এই অভিজ্ঞতার খবর তাঁদের যে কমরেডরা তখনো পর্যন্ত বৃটিশ সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন তাঁদের কাছ থেকেও চেপে রাখা গেল না— আর তার ফল দাঁড়াল মারাত্মক। ঐ সৈন্যবাহিনী থেকে পলাতকের সংখ্যা রোজই বাড়তে থাকল এবং আন্তর্জাতিক বাহিনী অনতিবিলম্বে একটি খুবই কার্যকর অংগ হয়ে দাঁড়াল লালফৌজের। শুধু যে ক্রাস্নোভোদ্স্ক-মার্ভ্ রেলপথটি নিরাপদ হল তাই নয় (যার দরুন ককেশাসের পেট্রোল অবাধে চালান দেওয়া সম্ভব হল মধ্য-এশিয়ায়) ক্রমে সংগীন হয়ে উঠল বৃটিশ ঘাঁটি, মেশেদ্-এর অবস্থাও। চারিদিক থেকে তার উপরে অবিশ্রাম হানা দিতে লাগল গেরিলা দলগুলি। আর ইরানীদের বিপ্লবী প্রচার আশেপাশের বেসামরিক মানুষদেরও বিদেশী অভিযানকারীদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন করে তুলল। চড়া দরেও শেষোক্তরা স্থানীয়ভাবে রসদ জোগাড়ে ব্যর্থ হতে লাগল। ফলে সুদীর্ঘ কোয়েটা-মেশেদ্ সড়কে মাল চলাচল সারা পথ ধরেই বিপর্যস্ত হতে লাগল গেরিলা দলগুলির হাতে, যাদের পিছনে ছিল স্থানীয় বেসামরিক জনগণ। বছর না ঘুরতেই বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান সৈন্যবাহিনী মেশেদ্ ছাড়তে বাধ্য হল আর পারস্যের গোটা খোরাসান প্রদেশটি মুক্ত হল বৃটিশ প্রভাব থেকে।"

মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব 'প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন' (পৃ. ২৫) ও তাঁর সাম্প্রতিক 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি" বইয়ে (পৃ. ২০২-০৩) প্রথম হিজরতী কাফিলার কয়েকজন মুহাজিরীন তরুণের কিৰ্কি দুর্গ রক্ষার সংগ্রামে যোগদানের সম্পর্কে লিখেছেন : '...আমাদের

দেশের মুহাজিররা যে লালফৌজের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন সেটা ইতিহাসে আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় হয়ে থাকবে'। কথাটা নিশ্চয়ই ঠিক। কিন্তু ঐ মুহাজিরীন তরুণদের কিছুমাত্র গৌরবহানি না করেও বলা যায় যে সারা মধ্য-এশিয়ায় সোভিয়েত শক্তি সুপ্রতিষ্ঠ করার ব্যাপারে সামরিক দিক থেকে আন্তর্জাতিক বাহিনীর ভারতীয় সিপাহীদের উপরে উল্লিখিত তৎপরতার গুরুত্ব তার চাইতে বেশি।

শওকৎ উসমানীও তাঁর *Peshawar to Moscow* বইয়ে (পৃ. ৪৭-৪৯) তুর্কিস্তান ও ট্রান্স-ক্যাস্পিয়ান এলাকায় লালফৌজে যোগদানকারী পলাতক ভারতীয় সিপাহীদের উল্লেখ করেছেন আর জাফর ইসলাম তাঁর *Colonialism in East-West Relations* গ্রন্থে (পৃ. ৮৩, ২ নং পাদটীকা) লিখেছেন যে একজন সোভিয়েত লেখক তিফলিসের 'ভলনা' পত্রিকা উদ্ধৃত করে নাকি দেখিয়েছেন যে গোরিতে (জর্জিয়া) ভারতীয় সিপাহীরা তাঁদের অফিসারদের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন ও পালিয়ে গিয়ে যোগ দেন লালফৌজে।

মস্কোর 'ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজেস পাবলিশিং হাউস' থেকে ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত *In Common They Fought* সংকলনেও (পৃ. ৭৫) আছে ঐ ধরনের ঘটনা :

> "দক্ষিণ রাশিয়ায় যুদ্ধরত লালফৌজের আন্তর্জাতিক বাহিনীগুলিতে ভারতীয়রাও ছিলেন।
>
> "ইরান থেকে তাঁরা বৃটিশ দখলদারীবাহিনীর সঙ্গে এসেছিলেন ট্রান্স-ককেশাসে। 'লাল ধ্যানধারণার সংক্রমণের' ভয়ে সন্ত্রস্ত বৃটিশ অফিসারেরা তাঁদের উপর সতর্ক নজর রাখতেন এবং তাঁদের যোগাযোগ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন স্থানীয় মানুষের সঙ্গে।
>
> "তবু তাঁদের এত সতর্কতাতেও কাজ হল না। মোটা দেয়াল ভেদ করে পেঁছিল বিপ্লবী চিন্তা। ভারতীয় বাহিনীতে দেখা দিল চাঞ্চল্য এবং কিছু কিছু সৈন্য তাঁদের বেয়নেট ঘুরিয়ে ধরলেন বৃটিশের বিরুদ্ধে ও যোগ দিলেন লালফৌজে।
>
> "দাঘেস্তান ও কাবার্দার পাহাড়ী অঞ্চলে নিকোলাই গিকালোর যে বাহিনীটি সক্রিয় ছিল তাতে ভারতীযদের উপস্থিতির ঘটনা জানা যায়। ঐ বাহিনীর এক ভারতীয় অফিসার, মুর্তুজা আলিকে অনেকেই বেশ মনে রেখেছেন

তাঁর বীরত্বের জন্য। শ্বেত কসাকদের কাছে তিনি ছিলেন বিভীষিকা-স্বরূপ। তাঁর সাহস, নির্ভীকতা ও উপস্থিত-বুদ্ধি পরিণত হয়েছে রূপকথায়। পিয়াটিগোর্স্কে'র 'কমিউনিস্ট পথ' পত্রিকায় ১৯২২ সালে লেখা হয়েছিল যে গিকালোর বাহিনীতে শেষ অবধি যাঁরা বেঁচে ছিলেন মুর্তুজা আলি ছিলেন তাঁদেরই একজন। কুশলী পাহাড়ী যোদ্ধা, শ্বেত-বাহিনীর বিভীষিকা, মুর্তুজা শত্রুর উপরে চকিত আঘাত হানতেন বাজপাখির মতো।

"গৃহযুদ্ধের মহাবীরের ভগ্নী ভেরা ফিওডোরোভ্না গিকালোর অনেক কথা মনে আছে তাঁর ভাইয়ের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বিদেশীদের সম্পর্কে।

"তিনি বলেন, 'আজ যখন আমি সোভিয়েত ও ভারতবর্ষে'র দুই সুমহৎ জাতির সৌভ্রাত্রবন্ধনের কথা পড়ি তখন আমার মনে পড়ে যায় সেই নির্ভীক ও বিনয়ী আন্তর্জাতিকতাবাদী সিপাহীদের। তাঁরা হয়তো সংখ্যায় ছিলেন মুষ্টিমেয়— তবু অকুতোভয় মুর্তুজা আলির মতো তাঁরাও আত্মদান করতে দ্বিধা করেন নি সংগ্রামে।

"যুদ্ধে তাঁদের যে রক্ত ঝরেছে তার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত আমাদের মৈত্রী, আমাদের দুই জাতির মৈত্রী চিরজীবী হবেই।"

পাঞ্জাবী সাহিত্যের ইতিহাস-রচয়িতা, ভারততত্ত্ববিদ, আই সেরেব্রিয়াকভের কাছেও শুনেছি যে 'পিয়াটিগোর্স্কায়া প্রাভদা' পত্রিকায় ১৯২৩ সালে সোভিয়েত নেতা ওর্জোনিকিৎজের যে জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল তাতেও নাকি লাল-ফৌজের একজন ভারতীয় নায়কের উল্লেখ আছে।

ভারতীয় সিপাহীর বৃটিশ ফৌজে যোগদান প্রসঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের 'ব্যথার দান' গল্পটিরও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা' গ্রন্থে "রুশ বিপ্লবী, লালফৌজ ও কাজী নজরুল ইসলাম" শীর্ষক অধ্যায়ে (পৃ. ৯৫-১২৪) এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। তার থেকে জানা যায় যে এ গল্পটি ১৯২০ সালের ১৫ জানুয়ারির কাছাকাছি কোনো তারিখে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় এবং মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেবই গল্পের নায়ক ও প্রতিনায়ক উভয়েরই যেখানে লালফৌজে যোগদানের কথা ছিল সেখানে 'লাল-ফৌজ' কেটে 'মুক্তিসেবক সৈন্যদের দল' কথাগুলি বসিয়েছিলেন পুলিসের নজর এড়ানোর জন্য।

এখানে কয়েকটা কথা মনে রাখা দরকার। নজরুল গল্পটি লিখেছিলেন ১৯১৯ সালে, তখন তিনি করাচী সৈন্যনিবাসে ৪৯ নং বেঙ্গলি রেজিমেন্টের হাবিলদার। 'ব্যথার দান' গল্পে বালুচিস্তানের গুলিস্তান, বুস্তান, চমন প্রভৃতি যে-সব এলাকার উল্লেখ আছে সেগুলি নজরুলের পরিচিত আর পেশোয়ারের কাছে নৌশহরায় নজরুলের সামরিক ট্রেনিং-এর হাতেখড়ি। বালুচিস্তানের ঐ-সব জায়গা থেকে সোভিয়েত দেশে পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাব্যতার জন্যই নজরুল তাঁর কাহিনীর স্থান নির্বাচন করেছিলেন ঐখানে।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব নজরুলের পল্টনের বন্ধু জমাদার শম্ভু রায়ের চিঠির যে অংশটি উদ্ধৃত করেছেন (পৃ. ২০৫-০৬) তার থেকেও জানা যায় যে নজরুল ঐ সময়ে কর্তৃপক্ষের নজর এড়িয়ে করাচি সৈন্যাবাসে রুশ-বিপ্লব সংশ্লিষ্ট নিষিদ্ধ সাহিত্য কিছু কিছু আমদানী করতেন ও তাই নিয়ে সোৎসাহে আলোচনা চালাতেন জমাদার রায় ও আরও কোনো কোনো বিশ্বস্ত বন্ধুদের সঙ্গে।

সব মিলিয়ে অনুমান করা চলে যে বৃটিশ বাহিনী থেকে পালিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় সিপাহীর লাল ফৌজে যোগদানের কোনো বাস্তব ঘটনা হয়তো ঐ সময়ে নজরুলের কানে এসেছিল। নইলে গল্পের অমন একটা বিষয় তাঁর মাথায় হঠাৎ সেদিন এসেছিল কী করে?

১৯২০ সালে সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি ভারতীয় মুহাজিরীন তরুণদের প্রথম দল তাসখন্দে পৌঁছয়। এর অল্পদিনের মধ্যেই তাঁদের দ্বিতীয় একটি দলও যে সোভিয়েত দেশে পৌঁচেছিল, এ খবরও এখন নিশ্চিতভাবেই জানা গেছে। কেউ কেউ অনুমান করেন পরে ঐ রকম আরো দু-একটি দলও হয়তো সেখানে গিয়ে থাকতে পারে। সে বিষয়ে কোনো সঠিক তথ্য অবশ্য পাওয়া যায় নি এখনো পর্যন্ত।

এই মুহাজিরীন তরুণেরা কারা? কী তাঁদের পরিচয়? কী-ই বা ছিল তাঁদের লক্ষ্য? মানবেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

"১৯১৯ সালে ভারতীয় খিলাফৎ কমিটি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে একত্র সংগ্রামে ব্রতী হয়ে ভারতীয় মুসলিম তরুণদের কাছে আহ্বান জানায় দেশ ত্যাগ করে তুর্কিতে মুস্তাফা কেমাল পাশার সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার...'—*Memoirs*, পৃ. ৪৫৫।

ঘটনাটি কিন্তু আসলে ১৯১৯ সালে ঘটে নি, ঘটেছিল ১৯২০ সালে ১৮ এপ্রিল তারিখে। ঐদিন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক খিলাফৎ সম্মেলন থেকেই মুসলিম তরুণদের কাছে আহ্বান এসেছিল হিজরৎ আন্দোলনের। 'হিজরত' শব্দটির অর্থ অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ ও নির্বাসন-বরণ আর যাঁরা হিজরৎ করেন তাঁরা হলেন 'মুহাজির'—বহুবচনে 'মুহাজিরীন'। ঐ রকম দু'জন মুহাজির— রফিক আহমদ ও শওকৎ উসমানী —দুজনেই লিখে গেছেন ঐ সম্মেলনের কথা। রফিক আহমদ তো নিজেই উপস্থিত ছিলেন ঐ সম্মেলনে (মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেবের 'প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন'-এ প্রকাশিত রফিক আহমদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, পৃ. ১১ ; 'রুশবিপ্লব ও ভারতবর্ষ", ৬নং—শওকৎ উসমানী, 'কম্পাস' পত্রিকা, ১৩ মার্চ ১৯৭১, পৃ. ১৩৪)। ঐ সময় নাগাদ আবার আফগানিস্তানের বাদশাহ আমানুল্লাহ্ খান ঘোষণা জানিয়েছিলেন যে ভারতীয় মুহাজিরদের তিনি আশ্রয় দেবেন তাঁর দেশে। ফলে, হিজরতের আহ্বানে বেশ ভালো সাড়া পাওয়া গেল মুসলমান সমাজের কাছ থেকে।

দেখা যাচ্ছে, খিলাফৎ আন্দোলন থেকেই উদ্ভব ঐ হিজরৎ আন্দোলনের। ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম: যুদ্ধের সময়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের সাহায্যলাভের জন্য তাঁদের কাছে প্রতিশ্রুতি দেন যে তুর্কির সঙ্গে যুদ্ধ করলেও বৃটেন এশিয়া মাইনর বা থ্রেসের মতো তুর্ক-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি তার কাছ থেকে কেড়ে নেবে না। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই সাম্রাজ্যবাদীরা সেই প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে গিয়ে ঐ অঞ্চলগুলি গ্রাস করতে থাকে। ভারতীয় খিলাফৎ কমিটি তখন সে ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার জন্য মহম্মদ আলির নেতৃত্বে একটি ডেপুটেশন পাঠায় বিলাতে। ডেপুটেশন সাম্রাজ্যবাদীদের এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ থেকে নিরস্ত করতে পারে নি, এ খবর ভারতবর্ষে পেঁছনো মাত্র আরো উদ্দীপিত হয়ে উঠল খিলাফৎ আন্দোলন আর তারই সূত্রে সেদিন উদ্ভব হিজরৎ আন্দোলনের।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস-কারেরা— একমাত্র মার্কসবাদীরা বাদে— প্রায় সবাই খিলাফৎ আন্দোলনকে বেশ কিছুটা গুরুত্ব দিলেও এতাবৎ মোটের উপরে উপেক্ষা করে এসেছেন তার থেকেই উদ্ভূত এই হিজরৎ আন্দোলনটিকে। অথচ নিছক ব্যাপকতার বিচারেও এটি

মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। কারণ হিজরতের আহ্বান আসার সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও অন্য আরো কয়েকটি প্রদেশের হাজার হাজার মুসলমান জমিজমা, ঘরবাড়ি বেচে দিয়ে সেদিন রওনা হয়েছিলেন আফগানিস্তানের পথে। তাঁদের সংখ্যা সম্পর্কে নানা মত আছে। ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়া তাঁর কংগ্রেসের ইতিহাসে লিখেছেন ১৮০০০ (কংগ্রেসের ৫০তম বার্ষিক উপলক্ষে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত সংস্করণ, পৃ. ৩৩৫-৩৬)। সরকারী দলিলপত্র ঘেঁটে টয়েনবি বলেছেন যে শুধু অগাস্ট মাসেই (১৯২০) ঐ সংখ্যা নাকি দাঁড়িয়েছিল ১৮০০০-এ (*Survey of International Affairs*, প্রথম খণ্ড, ১৯২৫, পৃ. ৫৫৫) আর ব্রিগসের মতে 'মোট সংখ্যা হিসেব করা হয়েছে ৫ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষের মধ্যে' ("The Indian Hijrat of 1920", *Homeless World*, খণ্ড ২০, সংখ্যা ২, এপ্রিল ১৯৩০, পৃ. ১৬৫)। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঐ সংখ্যা নাকি ছিল ৫০০০০ থেকে ১ লক্ষের মধ্যে (*Memoirs*, পৃ. ৪৫৫)। আর শওকৎ উসমানী বলেছেন ১৯২০ এপ্রিল—জুনের মধ্যে কারো কারো মতে ঐ সংখ্যা ছিল ৩৬০০০ ও সরকারী হিসেবে ২০০০০-এর মতো ("রুশ-বিপ্লব ও ভারতবর্ষ", 'কম্পাস' পত্রিকা, সংখ্যা ২, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, পৃ. ৩৮)।

এই হিসেবগুলির মধ্যে বিস্তর তারতম্য থাকলেও এ কথা পরিষ্কার যে হিজরতের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অন্তত বিশ-ত্রিশ হাজার মুসলমান— কৃষক, কারিগর, ছাত্র, এমন-কি কিছু কিছু সম্পন্ন ব্যক্তিও সেদিন বেরিয়ে পড়েছিলেন আফগানিস্তানের পথে। তাঁদের মধ্যে একদিকে যেমন ছিল তীব্র বৃটিশ-বিরোধী চেতনা যার তাড়নায় সেদিন তাঁরা ঝাঁপ দিয়েছিলেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অতলে, তেমনই আবার তারই পাশাপাশি অন্যদিকে নিশ্চয়ই ছিল ইসলামের আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রের জোরালো আকর্ষণ। এর মধ্যে কোন্‌টা প্রধান, কোন্‌টা গৌণ, তার বিচারে না গিয়েও বলা চলে যে যারা হিজরৎ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যেও চেতনার তারতম্য ছিল যথেষ্ট। তবে খিলাফৎ আন্দোলন সম্পর্কে জওহরলাল নেহরুর এই কথা সাধারণভাবে হয়তো এখানেও প্রযোজ্য :

"...'খিলাফৎ' শব্দটির কিন্তু অদ্ভুত অর্থ দাঁড়িয়েছিল অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলে। লোকে মনে করত কথাটি বুঝি এসেছে 'খিলাফ' থেকে, যে

উদর্দু শব্দটির অর্থ হল 'বিরুদ্ধে' বা 'পরিপন্থী' আর তাই তারা 'খিলাফতে'র অর্থ ধরে নিয়েছিল 'সরকারের বিরোধী"—*An Autobiography*, পৃ. ৬৯।

সেই বৃটিশ-বিরোধী চেতনা তাঁদের মনে যে তীব্র বিক্ষোভের উদ্রেক করেছিল হয়তো অধিকাংশ মুহাজিরীনই তার অপেক্ষাকৃত সহজ নিরসন চেয়েছিলেন দেশত্যাগ করে আফগানিস্তানে বসবাসের মধ্যেই। আমানুল্লাহ্-র আশ্রয়দানের প্রতিশ্রুতি নিশ্চয়ই এ দিকে তাঁদের ভরসাও দিয়েছিল অনেকখানি। তরুণ মুহাজিরদের মধ্যে কিন্তু যে চিন্তা প্রবল ও প্রধান ছিল তা আফগানিস্তানে বসবাস নয়, তুর্কিতে পেঁছে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের। আর খুব অল্পসংখ্যক তরুণ হয়তো ভেবেছিলেন একবার দেশের বাইরে পেঁছতে পারলে সেখান থেকে তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রাম চালাবার সুযোগ পাবেন ইংরেজের বিরুদ্ধে আর সেদিক থেকে তাঁরা হয়তো কেউ কেউ সোভিয়েত দেশের কথাও ভেবেছিলেন মনে মনে। কিন্তু শওকৎ উসমানী যখন লেখেন,

'আমরা যদি এখানে বলি যে যাঁরা আফগানিস্তানে চলে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই দেশত্যাগের আগেই ভরসা স্থাপন করেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের উপরে— তা হলে আমরা মোটেই অত্যুক্তি করব না' ("Russian Revolution and India", সাপ্তাহিক *Mainstream*, ১ জুলাই ১৯৬৭, পৃ. ১৪)।

তখন তাঁর দাবি সত্ত্বেও কথাটা অতিরঞ্জন বলেই বোধ হয়। নইলে কয়েক হাজার মুহাজিরীনের মধ্যে সবশুদ্ধ বড় জোর শ'খানেক মাত্র কেন শেষ পর্যন্ত পেঁছলেন সোভিয়েত ইউনিয়নে? অবশ্য আফগানিস্তান সরকার প্রায় গোড়াব থেকেই মুহাজিরদের সোভিযেত যাত্রায় কিছুটা প্রতিবন্ধকতা করছিলেন। কিন্তু এমন খবরও এখনো পর্যন্ত জানা যায় নি যে বহু মুহাজিরীন তরুণের সোভিয়েত যাত্রা সেদিন বন্ধ হয়েছিল শুধু তারই ফলে।

আসলে ধর্মীয় মনোভাব অধিকাংশ মুহাজিরীনের বৃটিশ-বিরোধী চেতনাকে আরো অগ্রসর হতে না দিয়ে বরং তাকে কতকটা খর্বই করে রেখেছিল ঐ সময়ে। এমন-কি, স্বয়ং শওকৎ উসমানী সম্পর্কেও মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব লিখেছেন:

"উসমানীর প্রকৃত নাম মাওলা বখ্শ।··· মাওলা বখ্শের স্বকৃত দ্বিতীয়

নামকরণ হচ্ছে শওকৎ উসমানী। এর অর্থ উসমানীয় (Ottoman) মহিমা। তুর্কি সাম্রাজ্যকে উসমানীয় সাম্রাজ্যও বলা হত। নিজের নামের পরিবর্তন ইত্যাদি হতে বোঝা যায় যে খিলাফৎ আন্দোলনের দ্বারা উসমানী অতিমাত্রায় প্রভাবিত হয়েছিল" ('আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পৃ. ৩৬৭)।

আর সোভিয়েত দেশে পৌঁছবার পরের কথা আরো স্পষ্ট করে লিখেছেন মানবেন্দ্রনাথ এইভাবে :

"একজন ছিলেন শওকৎ উসমানী। তিনি কোনো ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক (মুজফ্ফর সাহেবের মতে কথাটা ঠিক নয়—ঐ, পৃ. ৩৬৭) ও বেশ বুদ্ধিমান ছিলেন। কিন্তু তিনিই ছিলেন সব চাইতে উৎকট ধর্মান্ধ ও প্রায় শেষ অবধি আঁকড়ে ছিলেন তাঁর মতাদর্শ।··· প্রবাসীদের মধ্যে তিনি পরিচিত ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে"—*Memoirs*, পৃ. ৪৬৬।

শওকৎ উসমানী অবশ্য তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে লিখেছেন :

"১৯১৭ সালে যখন অক্টোবর-মহাবিপ্লব ঘটল তখন আমি নবম ক্লাসের ছাত্র। আমি যা কিছু চাইছিলাম সবই পেয়ে গেলাম ঐ বিপ্লবের মধ্যে। ঐ সময়ে আমি নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে প্রার্থনা জানাতাম যেন আমি লাল-ফৌজে ঢুকে লড়াই করার সুযোগ পাই" (শ্রীমতী অমিতা রায়ের কাছে প্রেরিত শওকৎ উসমানীর টাইপ-করা জীবনী থেকে)।

শওকৎ উসমানীর ক্ষেত্রে ধর্মীয় মতাদর্শ ও লালফৌজে যোগদানের মধ্যে হয়তো কোনো আত্যন্তিক বিরোধ ছিল না, কিন্তু অধিকাংশ মুহাজিরীনের চেতনা সম্ভবত স্বতঃস্ফূর্ত বৃটিশ-বিরোধিতার স্তরেই আবদ্ধ ছিল— ধর্মীয় মতাদর্শ তাঁদের সোভিয়েত আদর্শের দিকে ঝুঁকবার পথে নিশ্চয়ই সহায়ক হয় নি সেদিন।

কিন্তু স্বাধীনতা-আন্দোলনের অনেক ইতিহাস-কার যখন উনিশ শতকের সুবিশাল ওয়াহাবী আন্দোলনের মতো এই হিজরৎ আন্দোলনকেও নিছক ধর্মীয় আন্দোলন বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন তখন তাঁদের সেই চেষ্টা অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীজাত বলেই বোধ হয়। আমাদের দেশে জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যেও এই ধরনের ধর্মীয় মতাদর্শের পিছুটান বহুদিন

পর্যন্ত লক্ষ করা গেছে। তবু তো তার মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নি আমাদের ঐতিহাসিকদের চোখে। হয় নি, তার কারণ সে আদর্শ বহুলাংশে ছিল হিন্দু-ধর্মীয়। জওহরলাল নেহরুর এই কথাটা তাই এখানে বিশেষভাবেই প্রযোজ্য :

"জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণা নিশ্চিতভাবেই দাঁড়িয়েছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদে। (মুসলমানদের ক্ষেত্রের মতো) এ ক্ষেত্রে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও প্রকৃত জাতীয়তাবাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদরেখা টানা সহজ ছিল না। ও দুটি মিলেমিশে গিয়েছিল কারণ ভারতবর্ষ হিন্দুদের একমাত্র বাসস্থান আর তারাই সেখানে সংখ্যাধিক। হিন্দুদের পক্ষে তাই নিজেদের পুরোদস্তুর জাতীয়তাবাদী প্রতিপন্ন করা সহজ ছিল মুসলমান-দের চাইতে, যদিও উভয়েই ছিলেন নিজস্ব বিশিষ্ট ধরনের জাতীয়তা-বাদেরই সমর্থক"—*Glimpses of World History*, পৃ. ৭২০।

মুহাজিরদের মধ্যে সর্বপ্রথম কাবুলে পৌঁছন ভূপালের রফিক আহ্‌মদ —১৯২০ মে মাসের এক সন্ধ্যায়। তার অল্পক্ষণের মধ্যেই পৌঁছন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুহম্মদ আকবর খান, গওহর রহমান খান, সুলতান মাহ্‌মুদ ও মিঞা মুহম্মদ আকবর শাহ্‌। এঁদের ক'জনের নির্বিঘ্নে কাবুল পৌঁছোনোর খবর ভারতবর্ষের কাগজে প্রকাশিত হওয়া মাত্র দেশ থেকে দলে দলে মুসলমান রওনা হন আফগানিস্তানের পথে।

এর ক'দিন পরেই কাবুলে রফিক আহ্‌মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় মৌলানা ওবায়দুল্লাহ্‌ সিন্ধি, আবদুর রব পেশোয়ারী, প্রতিবাদী আচার্য প্রভৃতি ভারতীয় বিপ্লবীদের। এর মধ্যে আবদুর রব ও আচার্য তখন তিন-চার মাস হল রাশিয়া থেকে ফিরেছেন। রফিক আহ্‌মদ লিখেছেন যে আবদুর রব তাঁদের সোভিয়েত দেশে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান, কারণ সে দেশে বিপ্লব ঘটে গেছে আর ক্ষমতা দখল করেছে শ্রমজীবী মানুষ। সেখানে গেলে অনেক কিছু দেখা ও শেখা যাবে। এবং বিপ্লবী সরকার তাঁদের সব রকম সাহায্য করবেন ও সুযোগ দেবেন। রফিক আহ্‌মদ লিখেছেন যে তাঁরা তখনই এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান। এত সহজে রাজী হয়ে যাওয়া থেকে মনে হয় যে তাঁদের মধ্যে ঐস্লামিক সৌভ্রাত্রবোধের চাইতে বৃটিশ-বিরোধী চেতনাই অপেক্ষাকৃত জোরালো ছিল।

আর-একটা ব্যাপার লক্ষ করা দরকার এখানে। এর আগের বছর ঐ

আবদুর রব ও প্রতিবাদী আচার্যই মুহম্মদ শফীককে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন সোভিয়েত দেশে যেতে। আসলে ভারতবর্ষ ছাড়ার আগে ততটা নয়, যতটা কাবুলে পৌঁছবার পরেই কিছু কিছু তরুণ মুহাজিরীনের দৃষ্টি পড়ে সোভিয়েত দেশের দিকে এবং এই দৃষ্টি-ফেরানোর ব্যাপারে তখন মস্ত ভূমিকা ছিল আবদুর রব ও আচার্যের।

অনেক বাধা-বিপত্তির পর শেষ পর্যন্ত ১৮০ জন মুহাজিরীনের দুটি কাফিলা বা যাত্রীদল কাবুলের নিকটবর্তী জবলুস সিরাজ থেকে রওনা হল একের পর এক। তাঁদের অধিকাংশেরই লক্ষ্য ছিল আনাটোলিয়া গিয়ে তুর্কিবাহিনীতে যোগদান ও ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম— তবে সেখানে পৌঁছবার জন্যই তাঁদের সবাইকেই যেতে হল সোভিয়েত ভূখণ্ডের মধ্যে দিয়ে।

একটা কথা মনে রাখা দরকার এখানে : এতাবৎ যা খবর পাওয়া গেছে তা ঐ প্রথম কাফিলা সম্পর্কেই। দ্বিতীয় কাফিলার খবর খুব অল্পই জানা গেছে, তাও পরোক্ষভাবে। আর প্রথম কাফিলা সম্পর্কে খবরের প্রধান উৎস হচ্ছে রফিক আহ্‌মদের কয়েকটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত (মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব ও ডাঃ গঙ্গাধর অধিকারী -সংগৃহীত), শওকৎ উসমানীর বিবরণ (*Mainstream* ও 'কম্পাস' পত্রিকায় প্রকাশিত এবং তাঁর আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ) আর ফজল ইলাহী কুরবানের সাক্ষাৎকার (মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের 'নয়ে ভারতকে নয়ে নেতা' পুস্তকে প্রকাশিত —গ্রন্থকার)। এঁরা তিন জনেই প্রথম কাফিলার যাত্রী ছিলেন যদিও ফজল ইলাহী কুরবান চারজুও থেকে অন্য দুজনের মতো বুখারা হয়ে তাসখন্দ না গিয়ে বাকুর পথে রওনা হয়েছিলেন তুর্কিবাহিনীতে যোগদানের উদ্দেশ্যে। বাকুতে তখন মুস্তাফা কেমালের সৈন্য-বাহিনীর জন্য সৈন্য 'রিক্রুট' করা হচ্ছিল। যাই হোক, ফজল ইলাহী কুরবান ও তাঁর সঙ্গীরা বাকুতে মাসের পর মাস অপেক্ষা করে যখন বুঝলেন যে ঐ বাহিনীতে তাঁদের স্থান হবে না তখন তিনি আরো কয়েকজনের সঙ্গে ফিরে আসেন তাসখন্দে।

রফিক আহ্‌মদ ও শওকৎ উসমানীর (এবং ফজল ইলাহী কুরবানেরও) ভ্রমণবৃত্তান্ত মূলত একই, সামান্য কিছু গরমিল যা আছে তা প্রধানত খুঁটি-নাটিতে। যেমন প্রথন কাফিলার যাত্রীসংখ্যা রফিক আহ্‌মদের মতে খুব নির্দিষ্টভাবে ৮০ আর শওকৎ উসমানীর হিসেবে ৮২ ; পথে তুর্কমেন প্রতি

বিপ্লবী 'বাস্‌মাচি' দস্যুদের হাতে বন্দীদশা ও কয়েকজন নিহত হওয়ার পর যাত্রীদের মধ্যে যাঁরা ফের জড়ো হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন কিকি' সোভিয়েত দুর্গে' তাঁদের সংখ্যা রফিক আহ্‌মদের মতে ৬০ আর শওকৎ উসমানীর হিসেবে শেষ পর্যন্ত ৭২ ; কিকি' দুর্গ' রক্ষায় যে মুহাজিরেরা সোভিয়েত বাহিনীকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা রফিক আহ্‌মদের বক্তব্য অনুসারে ২০ আর শওকৎ উসমানীর মতে ৩৬ ইত্যাদি। কিন্তু এ-সবের চাইতে যেটা কিছুটা বড়ো গরমিল সেটা হল তুর্কমেন বাস্‌মাচিদের মৃত্যুদণ্ড থেকে মুহাজিরদের রক্ষা পাওয়ার ঘটনার বিবরণে। যেমন রফিক আহ্‌মদ লিখেছেন :

"আমাদের গুলির মুখে মৃত্যুর হুকুম হয়েই গিয়েছিল, এমন সময়ে ঘোড়ায় চড়ে এক বৃদ্ধ সেখানে এল। বৃদ্ধ ঘোষণা করল : 'বন্দীদের নিকটে আফগান সরকারের কাগজপত্র পাওয়া গেছে। আমরা যদি এখন তাদের মেরে ফেলি তবে আফগান সরকার আমাদের ওপর হামলা করতে পারে আর এদিকে লাল ফৌজ তো আক্রমণ করবেই। ভালো হবে এই লোক-গুলিকে এখন বন্দী করে রাখো।' তুর্কমেনেরা এই নির্দেশ মেনে নিল।"

—রফিক আহ্‌মদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত তাঁর মুখে উর্দুতে কয়েকবার শুনে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব বাংলায় সেটি প্রকাশ করেন প্রথমে 'পরিচয়' পত্রিকায় ও পরে তাঁর 'প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন' পুস্তকে। ঐ বইয়ে আলোচ্য প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে ২১ পৃষ্ঠায়।

আর শওকৎ উসমানী লিখেছেন :

"মুসলমানদের প্রার্থনার ভঙ্গীতে আমাদের হাঁটু গেড়ে বসতে আদেশ করা হল। দুই সারিতে ভাগ হয়ে সৈন্যরা আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো।...উচ্চ-কণ্ঠের একটি আদেশ, বন্দুকে গুলি ভরার শব্দ। পরিষ্কার পার্শিতে তাঁরা চেঁচিয়ে উঠল—'এই প্রথম অর্ডার। গুলি করার আগে আরো দুবার অর্ডার করা হবে...।'...হঠাৎ বুম্‌। অনেক দূরে একটা রাইফেল গর্জে উঠল। এখনো কি তবে উদ্ধারের আশা আছে? না, না কোনো আশা নেই।...বুম্‌। একী— রাইফেলের আওয়াজ এবারে আরো কাছে এগিয়ে এসেছে। কয়েকটা কার্তুজ প্রহরীদের কাছাকাছি এসে ফেটে পড়ল। প্রচণ্ড আতঙ্কে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।...এক মুহূর্তে আমাদের মৃত্যুদণ্ড প্রত্যাহার করা হল। স্থির হল আমাদের ক্রীতদাস করে নেওয়া হবে।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পদস্থ কর্মচারীরা আমাদের ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিলেন। গাধার মতো আমাদের বিভিন্ন দিকে টেনে হেঁচড়ে নেওয়া শুরু হল"—"রুশ বিপ্লব ও ভারতবর্ষ : ২", 'কম্পাস' পত্রিকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, পৃ. ৪০।

এই গরমিল ছাড়া রফিক আহ্‌মদ ও শওকৎ উসমানীর প্রথম কাফিলার বিবরণ মূলত একই— যথা, মুহম্মদ আকবর খানের নেতৃত্বে জবলুস সিরাজ থেকে রওনা হয়ে মজার-ই-শরীফে পেঁছোনো; তারপর হিন্দুকুশ পেরিয়ে পাতাকেসরে আমুদরিয়া পার হয়ে ওপারে প্রথম সোভিয়েত লোকালয়— তিরমিজে পেঁছোনো ও সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বিপুল সংবর্ধনা লাভ; সেখানে কয়েকদিন বিশ্রামের পর সোভিয়েত স্টীমারের জন্য অপেক্ষা না করে নিজেরাই দুটি নৌকোয় কির্কি অভিমুখে যাত্রা; পথে প্রতিবিপ্লবী দস্যুদের হাতে বন্দীদশা; কোনোক্রমে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি ও লাল-ফৌজের আক্রমণে বিপর্যস্ত দস্যুদের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে কির্কি সোভিয়েত দুর্গে প্রবেশ; কির্কিতে বাস্‌মাচি আক্রমণের হাত থেকে সোভিয়েত দুর্গরক্ষায় বেশ কিছু মুহাজিরীনের যোগদান; তারপর সোভিয়েত স্টীমারে চার্‌জুও-যাত্রা ও সেখানেও সোভিয়েত অভিনন্দন লাভ; চার্‌জুও-তে প্রায় অর্ধেক মুহাজিরীনের আনাটোলিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত ও সোভিয়েত সরকার কর্তৃক তারই জন্য তাঁদের বাকু-প্রেরণ এবং বাকি মুহাজিরদের ট্রেনে বুখারা হয়ে তাসখন্দ-যাত্রা।

তাসখন্দে তাঁরা ঠিক কতজন পেঁছিলেন তা ঠিক জানা যায় না। রফিক আহ্‌মদ ১৯ জনের নামের পর 'প্রভৃতি' শব্দ জুড়ে দেওয়ায় বোঝা যাচ্ছে যে তাঁরা ছিলেন অন্তত কুড়ি জন (ঐ, পৃ. ২৬)। আর শওকৎ উসমানী ঐ সময়ে যাঁরা তুর্কিস্তানে ছিলেন ও বিপ্লবী সংগ্রামে (সম্ভবত উসমানী এখানে কির্কি দুর্গরক্ষায় ভারতীয় মুহাজিরদের যোগদানের উল্লেখ করছেন) যোগ দিয়েছিলেন বলে তাঁর মনে পড়ে, তাঁদের ৫২ জনের এক তালিকা দিয়েছেন। নিশ্চয়ই এঁরা সকলেই প্রথম কাফিলাভুক্ত ছিলেন না— কেউ কেউ হয়তো তুর্কিস্তানের বাসিন্দা ছিলেন, কেউ-বা এর আগেই বিপ্লবী কাজকর্মের সূত্রে পেঁচেছিলেন সেখানে আর কেউ কেউ হয়তো ছিলেন বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান সেনাবাহিনী থেকে পলাতক সৈনিক।

দ্বিতীয় কাফিলার বিবরণ তার অন্তর্ভুক্ত কোনো মুহাজির লিখেছেন বলে আমার জানা নেই। তবে রফিক আহ্‌মদ ও শওকৎ উসমানী দুজনেই লিখেছেন যে তার নেতা ছিলেন পেশোয়ারের মুহম্মদ আকবর জান, ও শেষ পর্যন্ত তাঁরা পৌঁচেছিলেন বুখারায় এবং তাঁদের কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত তাসখন্দেও। দ্বিতীয় কাফিলাভুক্ত যে-সব মুহাজিরীন পরে তাসখন্দ মিলিটারি স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন তার মধ্যে শওকৎ উসমানী— আকবর জান, হবীব আহ্‌মদ, মহম্মদ হবীব, আবদুল্লা শফদার ও আবদুর রহিমের নাম উল্লেখ করেছেন ("রুশবিপ্লব ও ভারতবর্ষ: ৫", 'কম্পাস' পত্রিকা, ৬ মার্চ ১৯৭১, পৃ. ১২)। আর রফিক আহ্‌মদ লিখেছেন :

"মুহম্মদ আকবর জানের এক ভাই বোখারায় আফগান কন্সালের আপিসে কাজ করতেন, সম্ভবত এই কারণেই সে (অর্থাৎ আকবর জান —গ্রন্থকার) কাফিলাকে বোখারা নিয়ে গিয়েছিল। এই কাফিলায় হবীব আহ্‌মেদ নসীম ছিলেন। তাঁর সংগে মুহম্মদ আকবর জানের মনোমালিন্য হওয়ায় তাঁকে আকবর জান গ্রেপ্তার করিয়ে দেয়। হবীবকে প্রথমে বোখারার জেলে পাঠানো হয়। এই খবর পাওয়ার পর আমরা এম. এন. রায়কে তা জানাই এবং তাঁর হস্তক্ষেপে হবীব জেল থেকে মুক্তি পান। মুহম্মদ আকবর জানের কাফিলার বেশির ভাগ লোক দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। আর যাঁরা দেশে ফেরেন নি তাঁরা আনোয়ার পাশার সংগে যোগ দিয়েছিলেন। আনোয়ার প্রথমে সোভিয়েত সরকারের আশ্রয়ে মস্কোতে ছিলেন। পরে মধ্য-এশিয়ায় গিয়ে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যুদ্ধে নিহত হন" —মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন', পৃ. ২৮)।

মুহাজিরীন কাফিলা প্রসংগে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের একটি বক্তব্য বেশ কিছুটা গোলমেলে। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

"বুখারায় পৌঁছোনোর অল্প কিছুদিন পরে একটি খবর পেলাম যে একদল ভারতীয় বিপ্লবী নাকি তুর্কমেন বিদ্রোহীর হাতে বন্দী হয়েছেন এবং তাঁদের ঐ অবস্থায় রাখা হয়েছে অক্সাস নদীর (অর্থাৎ আমুদরিয়া—গ্রন্থকার) উপরের দিকের কোনো এক স্থানে। খোঁজ নিয়ে এই খবর যে সঠিক তা যাচাই করা গেল আর এ'ও জানা গেল যে ভারতীয় বন্দীদের উপরে বিষম নির্যাতন

করা হচ্ছে ও খুব তাড়াতাড়ি তাঁদের উদ্ধার করা না গেলে বাস্তবিকই তাঁদের মৃত্যু অথবা অনশন ভোগের আশংকা রয়েছে···সৌভাগ্যক্রমে ফ্রুন্জে (বিখ্যাত সোভিয়েত সেনাপতি —গ্রন্থকার) তখনো বুখারায় ছিলেন। আমি তাঁর সংগে ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করলাম এবং স্থির হল যে তখনই একটি সশস্ত্র জাহাজে লালফৌজের একটি বাহিনীকে পাঠানো হবে অক্সাস নদীর উপরের দিকে"—*Memoirs*, পৃ. ৪৫৪-৫৫)।

ঐ বাহিনী যখন উক্ত ভারতীয়দের মুক্ত করে নিয়ে আসে তখনো নাকি মানবেন্দ্রনাথ বুখারায়। তাঁদের মুখেই তিনি শুনলেন হিজরৎ আন্দোলনের কথা। মুহাজিরদের অনেকে তুর্কি বাহিনীতে যোগ দিতে চাইলেন— তাঁদের পাঠানো হল বাকুতে। তারপর অন্যদের অনেক বুঝিয়ে ও সামরিক ট্রেনিং-এর লোভ দেখিয়ে তিনি তাঁর সংগে নিয়ে এলেন তাসখন্দে (ঐ, পৃ. ৪৫৭)।

তুর্কমেনদের হাতে বন্দীদশা ও লালফৌজ কর্তৃক উদ্ধারের বিবরণ থেকে মনে হয় মানবেন্দ্রনাথ এখানে প্রথম কাফিলার কথা বলছেন। কিন্তু প্রথম কাফিলার যারা তুর্কি বাহিনীতে যোগ দিতে চেয়েছিলেন তাঁরা তো চার্জুও থেকেই বাকু যাত্রা করেছিলেন সেই উদ্দেশ্যে। আর বাদ বাকী মুহাজির বুখারায় এসেছিলেন তো তাসখন্দ যাবার পথেই। তাঁদের তো বুঝিয়ে বা সামরিক ট্রেনিং-এর লোভ দেখিয়ে তাসখন্দে নিয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে না — তাঁরা তো চার্জুওতেই (হয়তো তারো আগে) মনস্থির করেছিলেন তাসখন্দ যাওয়ার ব্যাপারে।

দ্বিতীয়ত, রফিক আহ্মদ ও শওকৎ উসমানী দুজনেই বেশ জোর দিয়েই বলেছেন যে বুখারায় নয়, তাসখন্দেই তাঁদের প্রথম দেখা মানবেন্দ্রনাথের সংগে। তবে কি দ্বিতীয় কাফিলার অথবা তৃতীয় কোনো কাফিলার মুহাজিরদের কথাই এখানে মানবেন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন?—প্রশ্ন তুলেছেন মুজফ্ফর আহ্মদ তাঁর 'প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে'-র ৫৯ পৃষ্ঠায়।

তৃতীয় কোনো কাফিলার কথা এখনো পর্যন্ত আমরা জানি না। তবে শওকৎ উসমানী পরিষ্কার বলেছেন যে তাঁদের সংগে নয়, দ্বিতীয় কাফিলার মুহাজিরদের সংগেই মানবেন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল বুখারায় আর তাঁদের ক'জনকে নিয়েই তিনি ফিরে এসেছিলেন তাসখন্দে। তিনি লিখেছেন:

"···পরে তিনি (অর্থাৎ মানবেন্দ্রনাথ —গ্রন্থকার) বড়াই করেছিলেন যে

তিনিই নাকি মুহাজিরদের উদ্ধার করেছিলেন ও লালফৌজকে বলেছিলেন আমাদের উদ্ধার করতে, আর আমাদের সংগে তাঁর দেখা হয়েছিল বুখারায়। আমাদের কাফিলার কোনো লোকই তাঁর এই কথা সমর্থন করবেন না। তবে বিপ্লব বার্ষিকের দিন, ৭ নভেম্বরের কাছাকাছি সময়ে বুখারায় উপস্থিত ছিলেন এমন কয়েকজন দ্বিতীয় কাফিলার লোক তাঁর সংগে তাসখন্দে এসেছিলেন এবং রফিক আহ্‌মদের ভ্রমণকাহিনীতে উল্লিখিত জনৈক আকবর জানের সংগে তিনি আমাদের আলাপও করিয়ে দিয়েছিলেন। আকবর জান ছিলেন দ্বিতীয় কাফিলার নেতা আর তাঁর সংগে তাসখন্দে এসেছিলেন তাঁর কাফিলার কিছু সদস্যও"—শওকৎ উসমানী, "From Tirmiz to Tashkent", *Mainstream* পত্রিকা, ৮ জুলাই ১৯৬৭, পৃ. ১৮।

কিন্তু দ্বিতীয় কাফিলার কথাই যদি মানবেন্দ্রনাথ লিখে থাকেন তা হলে কি দুই কাফিলার মুহাজিরদেরই তুর্কমেন দস্যুদের হাতে বন্দীদশা ও লাল-ফৌজ কর্তৃক উদ্ধারের একই রকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল? হলে ব্যাপারটা খুব তাজ্জব বলতে হবে।

মনে হয়, মানবেন্দ্রনাথ দুই কাফিলার ঘটনাকে গুলিয়ে ফেলেছেন তাঁর স্মৃতিকথায়।

হিজরৎ আন্দোলনে যোগদানকারী মুহাজিরদের প্রসংগে একটি আশ্চর্য ঘটনার এখানে উল্লেখ করতে চাই। শওকৎ উসমানী লিখেছেন:

"১৯২০ সালের মে মাসে আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে যে দেশত্যাগীদের মিছিল শুরু হয়েছিল তা কেবলমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। অনেক হিন্দু তরুণও এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। মুসলমানের ছদ্মবেশে এই তরুণ বিপ্লবীরা আফগানিস্তান হয়ে সোভিয়েত দেশে পালিয়ে গেলেন" —"রুশবিপ্লব ও ভারতবর্ষ" ২ নং, 'কম্পাস' পত্রিকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, পৃ. ৩৮।

দুঃখের বিষয় এ-ধরনের 'হিন্দু মুহাজিরীন' ক'জন ছিলেন, কী তাঁদের নাম—এর কোনো উল্লেখই মেলে না উসমানীর প্রবন্ধে। তবে 'সুযোগের সদ্ব্যবহার' কথাটার ব্যবহারে ও ঠিক তার পরেই 'সোভিয়েতে পালিয়ে যাওয়ার' উল্লেখ থেকে মনে হয় উসমানী বলতে চেয়েছেন যে ঐ হিন্দু তরুণেরা গোড়ার

থেকেই হয়তো সোভিয়েত দেশে যাবার জন্যই সংগ নিয়েছিলেন মুহাজিরদের। ইসলামের আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্রের আকর্ষণ তাঁদের ছিল না— বিপদের ঝুঁকি নিয়ে অনিশ্চিত দুর্গম পথে তাঁদের পা-বাড়ানোর তাগিদ সম্ভবত ছিল একান্ত-ভাবেই রাজনৈতিক।

মানবেন্দ্রনাথও তাঁর স্মৃতিকথায় ঐ-রকম একজনের বৃত্তান্ত লিখেছেন। তাঁর মতে অমন ধরনের 'হিন্দু মুহাজির' ঐ দলের মধ্যে একজনই মাত্র ছিলেন। যাই হোক, কাহিনীটি যেমন আশ্চর্য তেমনি মর্মান্তিক। তিনি ছিলেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.। দলের মধ্যে তাঁর পরিচয় ছিল 'ডক্টর এক্স' নামে। তাঁর আসল নাম মানবেন্দ্রনাথ ভুলে গিয়েছিলেন স্মৃতি-কথা লেখার সময়ে। ('বিপ্লবী অবনী মুখার্জি'' নামে তাঁর দুষ্প্রাপ্য বইয়ের ১৫৪ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক রাখালচন্দ্র ঘোষ যে বেনারসের ডাঃ প্রিয়নারায়ণের উল্লেখ করেছেন তিনিই কি ইনি ?— গ্রন্থকার)। অন্য মুহাজিরেরা তাদের মধ্যে তাঁর মতো একজন হিন্দুর উপস্থিতিতে অবাক হতেন কিন্তু তাঁর নিরীহ ও অমায়িক চেহারা ও আচরণের দরুন তাঁকে কোনোদিন বিপদ্‌গ্রস্ত হতে হয় নি। কেন তিনি মুহাজিরীন তরুণদের সংগ নিয়েছিলেন—এ প্রশ্নের জবাব তিনি দিতে চাইতেন না, শুধু মানবন্দ্রেনাথকে বার বার বলতেন, তাঁকে মস্কো যেতে হবে সুপরিচিত একজন হিন্দু নেতার একটি জরুরি খবর লেনিনের কাছে পৌঁছবার জন্য। মানবেন্দ্রনাথ তাঁকে জানান যে খবরটা কী ধরনের না জানলে তিনি তাঁর মস্কো যাত্রার ব্যবস্থা করতে পারবেন না। অগত্যা তিনি তখন কিছুদিনের মতো তাসখন্দেই রয়ে গেলেন একদিন-না-একদিন মস্কো যাত্রার সুযোগ পাবেন এই আশায়।

ক্রমে যত দিন যেতে লাগল ততই অস্থির হয়ে উঠতে লাগলেন ডক্টর এক্স— বললেন, পায়ে হেঁটেই তিনি তা হলে মস্কো রওনা হবেন রেলপথ ধরে। মানবেন্দ্রনাথের ধারণা, তখন তাঁর মাথার গোলমাল শুরু হয়েছিল। যাই হোক, তাঁকে মস্কো পাঠানোর ব্যবস্থা হল শেষ পর্যন্ত। সেখানে কিছুদিন পরে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। শোনা গেল যে তুর্কিস্তান যাবার রেলপথের ধারে নাকি পাওয়া গিয়েছিল তাঁর মৃতদেহ। মানবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, হয়তো-বা তিনি আত্মহত্যাই করেছিলেন, শেষ অবধি লেনিনের সংগে দেখা না হওয়ায়। মস্কোতে তিনি এক বিখ্যাত ভারতীয় নেতার নাম মানবেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন যিনি

নাকি তাঁকে মস্কোয় পাঠিয়েছিলেন ভারতীয় বিপ্লবের জন্য সামরিক সাহায্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। তারই জন্য নাকি তিনি সঙ্গ নিয়েছিলেন মুহাজিরীন তরুণদের। মানবেন্দ্রনাথের বিশ্বাস যে ঐ সময়ে তাঁর পুরোপুরি মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিল কারণ, যে নেতার কথা তিনি বিশেষ করেই উল্লেখ করেছিলেন এ প্রসঙ্গে তিনি ছিলেন রাজনীতিতে একান্ত নরমপন্থী—সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে তাঁর কোনো সংস্রব একেবারেই অবিশ্বাস্য (*Memoirs*, পৃ. ৪৫৭ ৫৮)।

প্রসঙ্গত ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস' থেকেও জানা যায় যে ভারতের অমুসলমান বিপ্লবীরা প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে মধ্য-প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলিতে ঘুরবার সময়ে সচরাচর মুসলমানী ছদ্মনাম গ্রহণ করতেন— কিছুটা পাসপোর্টের সুবিধা, কিছুটা নিরাপত্তার কারণেও। ১৯১৫ সালে তাঁদের একটি দল যখন স্তাম্বুলে এনভার পাশার সঙ্গে দেখা করতে যান তখন তিনি সকলেরই মুসলমানী নাম শুনে প্রশ্ন করেন, 'আপনাদের মধ্যে হিন্দু কেউ নেই?' উত্তরে তাঁকে বলা হয় যে, একজন বাদে তাঁরা সবাই হিন্দু বা অমুসলমান— পাসপোর্টের সুবিধার জন্যই তাঁরা নাম নিয়েছেন মুসলমানের। পার্শী বিপ্লবী, দাদা চানজী কেরসাস্প যাঁকে এর কিছু পরেই ইংরেজরা গুলি করে মারে এবং আরো কয়েকজন বার্লিন কমিটির সদস্যের মতো, শ্রীবীরেন্দ্র-নাথ দাশগুপ্তও ঐ সময়ে 'মির্জা আলি হায়দার' নাম নিয়ে সুয়েজ খাল অঞ্চল, তুর্কি ইরাক, প্রভৃতি জায়গায় ঘোরেন বিপ্লবী কাজকর্মের সূত্রে। আর যুদ্ধের পর ১৯২২ সালে ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধি যখন কাবুল থেকে বিতাড়িত হয়ে আরো ন'জন ভারতীয়ের সঙ্গে সোভিয়েত দেশে গিয়েছিলন তখন সেই দলেও ছিলেন শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'আবদুল' নামের আড়ালে (দ্র. "Smriti and Bismriti", *Modern Riview*, জানুয়ারি ১৯৭১, পৃ. ৬৩)।

তাসখন্দে প্রথম কাফিলার মুহাজিরেরা পৌঁছানোর আগেই আবদুর রব ও প্রতিবাদী আচার্য সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন কাবুল থেকে। তিনিই তাঁদের নিয়ে তুললেন 'ইন্দুস্কি ডোম' বা 'ইণ্ডিয়া হাউস' নামে পরিচিত মস্ত এক বাড়িতে। কিছুক্ষণ পরে মানবেন্দ্র রায়, তাঁর স্ত্রী এভেলিন (ট্রেণ্ট) রায়, অবনীনাথ মুখার্জি, তাঁর স্ত্রী রোজা ফিটিংহফ ও মুহম্মদ শফিকও তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মুহাজিরীন তরুণেরা প্রায় সবাই তখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার ও যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করে ইংরেজের বিরুদ্ধে

লড়ার জন্য। তাঁদের সেই চাহিদা মেটানোর জন্য ঠিক হল ঐ তাসখন্দেই প্রতিষ্ঠা করা হবে একটি 'ইণ্ডিয়ান মিলিটারি স্কুল'।

ঐ স্কুল পত্তনের তোড়জোড় চলেছে— ইতিমধ্যে শওকৎ উসমানী ও রফিক আহ্মদকে মানবেন্দ্রনাথ পাঠালেন আন্দিজান ও ওস-এ। উদ্দেশ্য খান্-গড়ের বিপ্লবীদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন, সম্ভব হলে স্থানীয় ভারতীয় বাসিন্দাদের মধ্যে কয়েকজনকে অন্তত ঐ মিলিটারি স্কুলে নিয়ে আসা এবং ভারতবর্ষে পৌঁছোনোর পথ খুঁজে বার করা। অল্পদিনের মধ্যেই যথাসাধ্য ঐ কাজ সম্পন্ন করে তাঁরা তাসখন্দে ফিরে এসে যোগ দিলেন ইণ্ডিয়ান মিলিটারি স্কুলে। উসমানী স্পষ্ট করে লেখেন নি, স্থানীয় ভারতীয় বাসিন্দাদের মধ্যে কাউকে তিনি মিলিটারি স্কুলে আনতে পেরেছিলেন কি না বা পেরে থাকলে তাঁদের সংখ্যা কত। সদ্য-প্রতিষ্ঠিত ঐ স্কুলের পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলেন প্রায় সাত ফুট লম্বা 'জন' নামে এক সাহেব, জন্মসূত্রে রুশ হলেও যিনি আমেরিকা চলে গিয়েছিলেন প্রবাসী শ্রমিক হিসেবে। সেখানে তিনি যোগ দিয়েছিলেন চরমপন্থী নৈরাজ্যবাদী শ্রমিক সংস্থা, Industrial Workers' World বা সংক্ষেপে 'I. W. W'-তে। বিপ্লবের প্রায় সংগে সংগেই জন রাশিয়ায় ফিরে এসে অসীম সাহসিকতার সংগে গৃহযুদ্ধে লড়াই করেন সোভিয়েত রাষ্ট্র সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য। তাঁর সেই নির্ভীক ভূমিকার জন্য তাঁকে বহু গুরু-দায়িত্বের কাজ দেওয়া হত যদিও খাঁটি নৈরাজ্যবাদী হিসেবে তিনি যোগ দিতে রাজী হন নি কমিউনিস্ট পার্টিতে। বিমান-বাহিনীরও তিনি ছিলেন একজন দক্ষ যন্ত্রবিদ।

I. W. W.-র সদস্যদের আমেরিকায় কিছুটা হাল্কাভাবে বলা হয় Wobblies। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথাতেও এঁর উল্লেখ করেছেন 'John the American Wobbly, বলে (*Memoirs*, পৃ. ৪৬৭)। মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব তাঁর 'প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে' (পৃ. ৬৫) ও শওকৎ উসমানী তাঁর "From Tirmiz to Tashkent" প্রবন্ধে (*Mainstream* পত্রিকা, ৮ জুলাই ১৯৬৭ পৃ. ১৯)—দু-জনেই কিন্তু ভুল করে তাঁর নাম লিখেছেন 'ওব্লি জন'।

যাই হোক, ইণ্ডিয়ান মিলিটারি স্কুলে যোগ দিলেন প্রথম মুহাজিরীন কাফিলার প্রায় সবাই আর দ্বিতীয় কাফিলারও কয়েকজন। ছাত্রদের মোট সংখ্যা

অবশ্য এখনো পর্যন্ত সঠিক জানা যায় না। এঁদের মধ্যে কারো যে কিছুটা যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হয়েছিল কিকির্ দুর্গ রক্ষার ব্যাপারে তা আমরা আগেই জেনেছি। বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান সেনাবাহিনী থেকে পলাতক সিপাহীও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। অন্তত এই রকম একজনের কথা শওকৎ উসমানী লিখেছেন এইভাবে :

"···আমাদের মধ্যে আবদুল্লা খান নামে বৃটিশ-ইণ্ডিয়ান বাহিনীর একজন পলাতক সিপাহী দক্ষ গোলন্দাজ ছিলেন। কিকির্র উল্টোদিকে, নদীর অন্য পারে প্রতিবিপ্লবীদের ঘাঁটির উপরে ন পাউণ্ড ওজনের গোলা দেগে তাঁর সে ক্ষমতা তিনি প্রমাণ করেছিলেন লালফৌজের কাছে"—"From Tirmiz to Tashkent", *Mainstream* পত্রিকা, ৮ জুলাই ১৯৬৭ পৃ. ১৯)।

দুটি মুহাজিরীন কাফিলা আর সম্ভবত কিছু স্থানীয় ভারতীয় সিপাহী ছাড়া আরো কেউ কি ছিলেন মিলিটারি স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে? একটি কথা ওঠে এ প্রসঙ্গে। আবদুল কাদির খান (সেহ্‌রাই) খুব সম্ভব ঐ স্কুলের ও পরে নিশ্চিতভাবেই প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ের (University of the Toilers of the East) একজন ছাত্র ছিলেন। দেশে ফেরার পর অন্যান্যদের সঙ্গে তিনিও যখন পেশোয়ারে মস্কো ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন তখন পুলিশের কাছে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে তিনি জবলুস সিরাজ থেকে তাসখন্দ গিয়েছিলেন মুহম্মদ আকবর খানের নেতৃত্বে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব লিখেছেন :

···"এটা মিথ্যা কথা। লণ্ডনের 'টাইমস' পত্রিকায় আবদুল কাদির নিজেই লিখছে, সে অক্‌সাসের (আমুদরিয়ার) পথে যায় নি। (মুহম্মদ আকবর খান কিন্তু এই পথেই গিয়েছিলেন)।···আকবর খানের নেতৃত্বে যাওয়া লোকদের মধ্য হতেই বেশি লোক কমিউনিস্ট হয়েছিলেন। সেইজন্যে আকবর খানের সঙ্গে গিয়েছিলেন বললে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নিকটে তাঁর রিপোর্ট বেশি মূল্যবান বিবেচিত হবে, এই কথাই হয়তো আবদুল কাদির খান ভেবেছিল" ('আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি", পৃ. ২২৬)।

পরবর্তী ঘটনা থেকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আবদুল কাদির বিপ্লবী তো ছিলেনই না বরং হয়তো বেশ-কিছুটা গোলমেলে লোক ছিলেন গোড়ার থেকেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল যে তিনি মুহম্মদ

আকবর খানের নেতৃত্বে যে প্রথম কাফিলা গিয়েছিল তার মধ্যে ছিলেন কি না। মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব জোর দিয়ে বলছেন, ছিলেন না। অথচ তাঁরই লেখা 'প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন' বইতে তিনি রফিক আহ্মদের যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশ করেছেন তাতে জবলুস সিরাজ থেকে যে কাফিলা মুহম্মদ আকবর খানের নেতৃত্বে যাত্রা শুরু করল বলে বলা হয়েছে তার যাত্রীদের মধ্যে তিনি লিখেছেন আবদুল কাদিরের নাম (পৃ. ১৬)। আবার ২৬ পৃষ্ঠাতেও চার্‌জও থেকে ট্রেনে চড়ে প্রথম কাফিলার যাঁরা তাসখন্দের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন তাঁদের তালিকার ৭ নং নামও ঐ আবদুল কাদিরের। মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব কিন্তু কোথাও লেখেন নি যে রফিক আহমদের বৃত্তান্তের ঐ অংশটি ভুল।

আবদুল কাদির খান প্রথম মুহাজিরীন কাফিলার যাত্রী ছিলেন না, মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেবের এই মতের সমর্থন কিন্তু পাওয়া যায় শওকৎ উসমানীর লেখায়। 'কম্পাস' পত্রিকায় (২০ মার্চ ১৯৭১, পৃ. ১৬২) প্রকাশিত "রুশবিপ্লব ও ভারতবর্ষ" প্রবন্ধের ৭ নং দফায় তিনি এক জায়গায় লিখেছেন :

"...ডিসেম্বরের (অর্থাৎ ১৯২০ সালে ডিসেম্বরের —গ্রন্থকার) শেষ দিকে 'ইন্দুস্কি কুর্সের' (অর্থাৎ ভারতীয় মিলিটারি স্কুলের —গ্রন্থকার) বন্ধুরা বৈপ্লবিক মতবাদের সঙ্গে হাতে কলমে পরিচয়ের জন্য আমাকে ও আবদুল মজিদকে মস্কো পাঠানো স্থির করলেন। ইন্দুস্কি কুর্সের সকলেরই ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত রায়ের (অর্থাৎ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের —গ্রন্থকার) অনুগ্রহভাজন আর-একজন ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে যোগদান করলেন। তিনি আবদুল কাদির সেহ্‌রাই। আমাদের **প্রথম বা দ্বিতীয় কোনো দলেই তিনি ছিলেন না** (বড় হরফ গ্রন্থকারের)। ইকবাল সইদাইয়ের সঙ্গে তিনি তাসখন্দে এসেছিলেন।"

আবার ঐ প্রবন্ধেরই ৫ নং দফায় (৬ মার্চ ১৯৭১, পৃ. ১১৩) শওকৎ উসমানী লিখেছেন :

"ইকবাল সইদাই-এর সঙ্গে খিলাফত প্রতিনিধিদের দলের সম্পাদক হিসেবে আবদুল কাদির সেহ্‌রাই নামে যিনি এসেছিলেন তিনিও লণ্ডনের সংবাদপত্রে এবং বিশেষত *Times* পত্রিকায় সোভিয়েতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিষোদ্‌গার করেছিলেন।"

আরো স্পষ্ট করে শওকৎ উসমানী ঐ প্রবন্ধের ৮ম দফায় (২৭ মার্চ, ১৯৭১ পৃ. ১৮১) লিখেছেন :

"১৯২০ সালের অক্টোবরে (*Mainstream* পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধেরই মূল ইংরেজীতে আছে 'October November of 1920' —২২ জুলাই, পৃ. ১৯৬৭) যে খিলাফৎ প্রতিনিধি দল সোভিয়েতে এসে পৌঁছেছিলেন ইতিমধ্যে তাঁরা কাবুল রওনা হয়ে গিয়েছেন। অবশ্য প্রতিনিধিদলের সেক্রেটারি আবদুল কাদির সেহ্‌রাই তাসখন্দেই রয়ে গিয়েছেন…।"

প্রথম ও দ্বিতীয় কাফিলার মুহাজিরেরা ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি তাসখন্দ পৌঁছোনোর পর অক্টোবর-নভেম্বর মাসে একটি খিলাফৎ প্রতিনিধি দল পৌঁছেছিল সোভিয়েত দেশে আর সেই দলের সম্পাদক হিসেবে এসেছিলেন আবদুল কাদির সেহ্‌রাই—ইকবাল সইদাই-এর সংগে। শওকৎ উসমানীর এই কথা যদি ঠিক হয় তা হলে বুঝতে হবে দুই কাফিলার মুহাজিরীন তরুণেরা ছাড়াও একটি খিলাফৎ প্রতিনিধি দলেরও লোক যোগ দিয়েছিলেন তাসখন্দের মিলিটারি স্কুলে।

তাসখন্দ মিলিটারি স্কুলে যুদ্ধবিদ্যার পাশাপাশি রাজনৈতিক শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল যাতে ভারতীয় মুহাজিরেরা বেশ ভালো করে বুঝতে পারেন কেন তাঁদের এই সংগ্রাম, ইংরেজ শাসন অপসারণের পর কী ধরনের সমাজ ও রাষ্ট্রই বা তাঁরা পত্তন করবেন ভারতবর্ষে। বলা বাহুল্য, এ-সব কথাই তাঁদের কাছে তখন বলতে হত অত্যন্ত সহজ করে, তাঁদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার উপরে ভরসা করেই। মানবেন্দ্রনাথ ও প্রতিবাদী আচার্য এই কাজে বিশেষভাবেই উদ্যোগী ছিলেন। এ ছাড়া শওকৎ উসমানী শিক্ষকদের মধ্যে নাম করেছেন গোল্ডবার্গ, ট্যাম্বাকভ্ ও তেভিলের। ছাত্রদের সুবিধার জন্য তুর্কি পার্শি ও ইংরেজী ভাষার বহু পুস্তক-পুস্তিকা জোগানোরও ব্যবস্থা ছিল। স্কুলে মৌলনা বরকতুল্লাহ্‌র 'ইসলাম ও সমাজতন্ত্র' বইখানির পার্শি ও তুর্কি সংস্করণ বিশেষ প্রিয় ছিল মুহাজিরীন ছাত্রদের (দ্র. "রুশবিপ্লব ও ভারতবর্ষ" ৬নং সংখ্যা, 'কম্পাস' ১৩ মার্চ ১৯৭১, পৃ. ১৩৪ ও ৭নং সংখ্যা, কম্পাস, ২০ মার্চ ১৯৭১, পৃ. ১৬৯)।

আর রফিক আহ্‌মদ লিখেছেন :

"মিলিটারি শিক্ষাদানের সংগে সংগে মিলিটারি স্কুলে আমাদের রাজ-

নৈতিক শিক্ষাও দেওয়া হত। আমরা মেশিনগান চালানোর শিক্ষা পেয়েছিলাম। তোপ চালানোর শিক্ষাও আমাদের আংশিকভাবে হয়েছিল। একজন হাওয়াই জাহাজ চালানো শিখেছিলেন। ড্রিল ইত্যাদি তো হতই" ('প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' গঠন', পৃ. ২৯)।

মিলিটারি স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে মীর আবদুল মজীদ (পেশোয়ারের মস্কো ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯২৩ সালে ও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯৩৩ সালে দণ্ডিত), ফিরোজউদ্দীন মনসুর (পেশোয়ারের মস্কো ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত), শওকৎ উসমানী (১৯২৪ সালের কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় ও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত), ফজল ইলাহী কুরবান (১৯৪৫ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনের সভাপতি), গওহর রহমান খান, রফিক আহমদ, মিঞা আকবর শাহ্‌, আকবর খান প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন কাগজপত্রে কিছুটা লেখালেখি হয়েছে। এখানে স্বল্প-আলোচিত একজনের সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলা যেতে পারে।

এস. হবীব ওয়াফা ছিলেন প্রথম মুহাজিরীন কাফিলার যাত্রী যদিও রফিক আহ্‌মদ বা শওকৎ উসমানী কারো তালিকাতেই তাঁর নাম নেই। তাঁর সম্পর্কে জানা খবরের উৎস হল দুটি— *Soviet Land* পত্রিকার জুলাই, ১৯৭০ সালের ১৪নং সংখ্যায় প্রকাশিত ই-রুমিয়ানৎসেভের "The all-seeing heart of a poet" নামে একটি প্রবন্ধ এবং আমাদের বাংলা দেশের বিপ্লবী, দাউদ আলি দত্তের (তাঁর আসল নাম প্রমথনাথ দত্ত। তাঁর সম্পর্কে পরে আলোচনা করব —গ্রন্থকার) পুত্র ইগর দাউদোভিচ দত্তের সঙ্গে ১৫ মে, ১৯৭০ মস্কোতে আমার এক সাক্ষাৎকার।

ই-রুমিয়ানৎসেভ ও ইগর দত্ত দু-জনেরই মতে হবীব ওয়াফা সোভিয়েত দেশে পৌঁচেছিলেন ১৯২১ সালে। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ রুমিয়ানৎসেভের লেখায় দেখা যায় যে হবীব ওয়াফার পুত্র, আনিস ওয়াফা তাঁকে বলেছেন যে তাঁর পিতা এসেছিলেন শওকৎ উসমানীদের কাফিলায় এবং তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথম কাফিলার যাত্রীদের বাস্‌মাচীদের হাতে বন্দী হওয়া ও লালফৌজের হস্তক্ষেপে কোনোমতে জীবন রক্ষার বিবরণ দিয়েছেন শওকৎ উসমানীর ভাষায়। কিন্তু উসমানীরা সোভিয়েত দেশে পৌঁচেছিলেন ১৯২০ সালে, ১৯২১ সালে নয়।

হবীব ওয়াফা তাসখন্দ মিলিটারি স্কুল ও সম্ভবত মস্কোর প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার নারিমানভ ইনস্টিটিউটে শিক্ষকতা শুরু করেন। পরে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের একটি বিভাগীয় প্রধানের 'চেয়ারে' অধিষ্ঠিত হন। একটি হিন্দুস্থানী পাঠ্য-পুস্তক রচনা ও একটি হিন্দুস্থানী অভিধান সংকলনও তাঁর ঐ সময়ের কাজ। বালাবুশেভিচ, ব্রাগিনস্কির মতো প্রখ্যাত সোভিয়েত প্রাচ্যতত্ত্ববিদরা ছিলেন তাঁর ছাত্র। বেশ কয়েকটি নাটক (তার মধ্যে 'শৃঙ্খলাবদ্ধ ভারত' ও 'বোম্বাই' নামে দুটি নাটক অভিনীত হয় রঙ্গমঞ্চে), উপন্যাস ও প্রবন্ধ-গ্রন্থেরও রচয়িতা তিনি।

তবে হবীব ওয়াফার আসল খ্যাতির কারণ তাঁর কবিতা। এর সূত্রপাত কিন্তু এ-দেশের মাটিতেই। তাঁর পুত্র আনিসের কাছ থেকে রুমিয়ানৎসেভ জেনেছেন যে ১৯১৮ সালে হবীব এক কবিতায় লিখেছিলেন :

"আমার একটি মাত্র কামনা
যে আমার এই গান
শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করবে সংগ্রামে,
আর আমার কাব্যের ফলা
শত্রুর বুকে বিঁধবে শানানো
ছুরির মতো।"

এ কবিতা লেখার সময়ে কবির বয়স নাকি ছিল ১৮ বছর মাত্র। ১৯৪৪ সালে আমাদের সুকান্ত 'এ দেশের বুকে আঠারো নেমে আসা'র যে স্বপ্ন দেখেছিল, ভাবতে অবাক লাগে যে ১৯১৮ সালে এ-দেশেরই আঠারো বছরের আর-এক কবিও সেই স্বপ্নের তাড়নায় দু-বছরের মধ্যে পথ ধরেছিলেন সুদূরের পিয়াসী তরুণ মুহাজির হিসেবে। তা ছাড়া তরুণ কবির শ্রমিক-সচেতনতাও এখানে নজর করার মতো, বিশেষ করে এ কথা মনে রাখলে যে সে সচেতনতা অর্জিত হয়েছিল সোভিয়েত দেশে পেঁীছোনোর দু-বছর আগেই। রুমিয়ানৎসেভের এই মন্তব্য তাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে তার কবিতা আরো ভালো করে অনুধাবন করলে এ কথা অনুভব না করে পারা যায় না যে হবীবের ক্ষেত্রে ঘটনাচক্র যদি অন্য রকমের হত তা হলে হয়তো তিনি ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর কবি হয়ে উঠতে পারতেন। রুমিয়ানৎসেভ লিখেছেন যে ঐ ধরনের কবিতার জন্যই নাকি কবিকে কর্তৃপক্ষের কুনজরে পড়ে দেশছাড়া হতে হয়েছিল সেদিন।

ত্রিশের যুগে সোভিয়েত দেশে হবীব ওয়াফার কাব্যগ্রন্থ 'শত তারের আর্তি" ও একটি কবিতা সংকলন এবং ১৯৫৮ সালে কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়। এ সব কবিতার মধ্যে একদিকে ছিল এ-ধরনের সৃষ্টির উল্লাস :

"নিপুণতা, সাহস, সৌভ্রাত্র, জ্বলন্ত আবেগের
প্রাণদায়ক উৎসের সন্ধান পেয়েছি আমি।
আর জীবনে কখনো তা দেখিনি
যা আমি দেখলাম নবীন রাশিয়ায়—
দেখলাম নির্মাণকাণ্ড আর অকুণ্ঠ ভাই-বেরাদারি,
বিশাল পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ,
দেখলাম তিলে তিলে জয়লাভ
আর মহামানবের স্বাধিকার অর্জন—
—সৃষ্টি! জীবন্ত, স্পন্দমান সৃষ্টি দেখেছি আমি!"

আবার এক জায়গায় কবি লিখছেন :

"অনেক সময় লাগবে
দেশকে মুক্ত করতে শৃঙ্খল বন্ধন থেকে
বসন্তের প্রাণপ্রাচুর্যের মতো
ফুলেফলে বাড়বাড়ান্ত এই বছরগুলি।
সময়ের জোয়ারে ভেসে চলেছে
দুনিয়াজয়ী সার্থকতার তারকা।
চমৎকার এক বিধান দিয়েছেন ইলিচ—
নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা—অক্টোবর!"

এ-ধরনের কবিতা ছাড়া অন্য কবিতায়—অনেক সময়ে এ-ধরনের কবিতার মধ্যেও কিন্তু প্রায়শই ফুটে উঠত প্রবাসী বিপ্লবী কবির দেশের সঙ্গে বিচ্ছেদ-জনিত বেদনার সুর। কবির অন্তরে সর্বদাই জাগ্রত ছিল তাঁর ভারতবর্ষের কথা।

১৯৩২ সালে মস্কো লেখক ক্লাবে হবীব ওয়াফাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় তাঁর কবিতা পাঠের জন্য। তাঁর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি মুগ্ধ করে সমস্ত শ্রোতাদের যদিও সোভিয়েত কবিদের কেউই জানতেন না উর্দু ভাষা। নিজেদের কবিতা ছাড়াও ওয়াফা অনুবাদ মারফত বহু ভারতীয় লেখককে পরিচিত করেছিলেন সোভিয়েত পাঠকদের কাছে।

১৯৩৬ সালে হবীব ওয়াফার যক্ষারোগে মৃত্যু হয় সোভিয়েত দেশে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই ছাত্র, ব্রাগিনস্কি তাঁর জীবন ও কাব্য সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন 'প্রাচ্যতত্ত্বের সমস্যা' নামে প্রাচ্যতত্ত্ব সংস্থার পত্রিকায়। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত লেখক সংঘ রুশ ভাষায় প্রকাশ করে তাঁর কবিতার সংকলন। স্টানিৎস্কি তাঁর কাব্যের একটি ভূমিকা লিখেছেন 'সোভিয়েত এনসাইক্লোপিডিয়ার' (প্রথম সংস্করণ) ৬৪ খণ্ডে।

কবির স্ত্রী এবং দুই পুত্র ও এক কন্যা এখন রয়েছেন মস্কোয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র আনিস একজন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ এবং ইতিমধ্যেই বেশ কিছু নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন পত্র-পত্রিকায়। গান্ধীজী সম্পর্কে একটি পুস্তিকারও তিনি লেখক।

তাসখন্দের মিলিটারি স্কুল প্রসঙ্গে সোভিয়েত দেশে যে ভারতীয়রা বিমান চালনা শিখেছিলেন তাঁদের কথা কিছুটা বলা যেতে পারে এখানে। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে :

"...বিমানচালনা শেখার দিকেই অবশ্য ছিল সকলের ঝোঁক। ঐ সময়ে শুধু রাশিয়ায় নয়, সারা পৃথিবীতেই সামরিক বিমানচালনার খুব বেশি উন্নতি ঘটে নি। মস্কো থেকে আমি কয়েকটি প্লেন নিয়ে গিয়েছিলাম। সেগুলিকে জোড়াতালি দিয়ে কোনোমতে ওড়ার অবস্থায় দাঁড় করানো হল আর কয়েকজন ভারতীয়কে বাছাই করা হল ট্রেনিং-এর জন্য।...তাঁদের মধ্যে তিন-চার জন তাসখন্দে যে প্রাথমিক ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা ছিল, তার বেশ সদ্ব্যবহার করলেন। তারপর তাঁদের পাঠান হল খাস রাশিয়ার আরো সুব্যবস্থাসম্পন্ন ট্রেনিং কেন্দ্রগুলিতে। তাঁদের মধ্যে অন্তত দুজন খুব ভালো বিমানচালনা শেখেন। একজন তো স্বীকৃতি পেয়েছিলেন প্রথম সারির বৈমানিক হিসেবে। তিনি যুক্ত ছিলেন লালফৌজের লেনিনগ্রাড-স্থ বিমান ইউনিটের সঙ্গে। একা একা ওড়ার নানা কসরৎ করার সময়ে তাঁর প্লেনটি মাটিতে আছড়ে পড়ে ও তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে লালফৌজ। অন্য জনের বৈমানিক জীবন এত চমকপ্রদ না হলেও একই রকম কৃতিত্বপূর্ণ হয়েছিল। দক্ষিণ রুশিয়ার কোনো-এক স্থানে, আফগানিস্তান ও পারস্যের শিক্ষার্থীদের ট্রেনিং-এর এক স্কোয়াড্রনের পরিচালক হওয়ার মতো দক্ষতা তিনি অর্জন করেছিলেন। আমি জানি না তাঁর কী হল, কোথায়ই বা তিনি আছেন এখন"—*Memoirs*, পৃ. ৪০৭-৭১।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব তাঁর 'প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট প্যার্টি' গঠনে' (পৃ. ৭৮) মানবেন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের উপরে মন্তব্য করেছেন :

"...এই না জানাটা তাঁর দায়িত্বহীনতার পরিচয়। এই দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নামও তিনি ভুলে গেছেন। ১৯২২ সালের শেষ দিকে 'ভ্যানগার্ড অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' নামক কাগজে আবদুর রহীম নামক একজনের মৃত্যু খবর প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি হাওয়াই জাহাজের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এম. এন. রায় এই কাগজ চালাতেন। তিনি তাতে লিখেছেন যে আবদুর রহীম কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন, হয়তো তিনি রায়ের ওপরে উল্লেখ করা দুজনের একজন। রফিক আহ্‌মদ বলছেন, আবদুর রহীম তাঁদের সংগে তাসখন্দ পর্যন্ত এসেছিলেন। তিনি যুক্তপ্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশের) লোক ছিলেন। মীরাটে তিনি মিলিটারি শিক্ষা পেয়েছিলেন।"

আবদুল রহীম সম্পর্কে এখন কিছু খবর পাওয়া গেছে সোভিয়েত বিমান-বাহিনীর কর্নেল জেনারেল এ. নিকিতিনের (গত মহাযুদ্ধের সময়ে ইনি ছিলেন সোভিয়েত বিমান বাহিনীর সরকারী সর্বাধিনায়ক —গ্রন্থকার) একটি প্রবন্ধ থেকে ("A Page from My Life" নামে এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে অক্টোবর মাসে, *Soviet Land* পত্রিকার ২১ খণ্ড, ১৯২০ সংখ্যায়)। নিকিতিন ঐ প্রবন্ধে লিখেছেন যে তিনি তাঁর বৈমানিক জীবনের একেবারে গোড়ার দিকে পেট্রোগ্রাডের (এখন লেনিনগ্রাদের) এক বিমানচালনা ট্রেনিং স্কুলে ঐ ভারতীয় বন্ধুর সাক্ষাৎ পান। তাঁর সম্পর্কেই ঐ প্রবন্ধ।

নিকিতিন লিখেছেন ১৯২১ সালের শরৎকালে তাঁদের ট্রেনিং স্কুলে যে ভারতীয় শিক্ষার্থী যোগ দেন তাঁর নাম ছিল আবদুল (মুজফ্‌ফর সাহেব লিখেছেন 'আবদুর') আনোয়ারি (Anvari)। তখন তাঁর বয়স বাইশ কি তেইশ। মাঝারি উচ্চতা, একহারা ও কিছুটা দুর্বল চেহারা সত্ত্বেও বেশ সুশ্রী ছিলেন আর তাঁর চোখ জোড়া ছিল আশ্চর্য রকমের গভীর। নিকিতিনের যতদূর মনে পড়ে তিনি জন্মেছিলেন পাঞ্জাবে এবং গল্প করেছিলেন জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের। তাঁর লক্ষ্য ছিল বিমান চালনা শিখে দেশে ফিরে রয়্যাল এয়ার ফোর্সে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করা এবং ঢুকতে পারলে সেখানে গুপ্ত বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলা।

আবদুল রহিমের স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। রুশ দেশের শীতে তিনি খুবই কষ্ট পেতেন। অথচ তখনকার রাশিয়াতে খাদ্য, শীতবস্ত্র, জ্বালানি সব-কিছুরই অভাব ছিল যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও এবং রুশ ভাষা প্রায় না জানলেও তিনি প্রাণপাত চেষ্টা করতেন বিমানচালনার তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক— দুটি দিকই ভালোভাবে আয়ত্ত করার। তিনি কখনো মুখ ফুটে প্রকাশ করতে চাইতেন না কোনো অভাবের কথা। প্রতিকূল অবস্থায় ঐ ধরনের পরিশ্রম করতে করতে রহিম অসুস্থ হয়ে পড়েন।

তাঁকে তখন মস্কো পাঠানো হয়, কোনো উষ্ণতর অঞ্চলে পাঠিয়ে তাঁর ট্রেনিং শেষ করার উদ্দেশ্যে। মস্কোয় শেষ পর্যন্ত স্থির হল যে তাঁকে পাঠানো হবে সেবাস্তোপোলের কাছে, কোনো-এক বিমান চালনার স্কুলে।

দুঃখের বিষয় আবদুল রহিমের শারীরিক অবস্থা আরো খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইতিমধ্যে। আসলে তাঁর যা হয়েছিল তা হল খুবই গুরুতর ধরনের ক্ষয় রোগ। ঐ রোগের ভালো ওষুধ আবিষ্কার হয় নি তখনো পর্যন্ত। ১৯২২ সালে মে মাসে মস্কো লালফৌজের হাসপাতালে তাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন আবদুল রহিম আনোয়ারি। বেশ কয়েকবার বিমান নিয়ে আকাশে উড়লেও তাঁর বৈমানিক হওয়ার স্বপ্ন অনেকটাই অপূর্ণ রয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। সম্ভবত তাঁর মৃত্যুর পরে উপস্থিত ভারতীয় কমরেডরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন উর্দু ভাষায় সুবিখ্যাত 'আন্তর্জাতিক' গানটি গেয়ে (*The Vanguard*, খণ্ড ১, সংখ্যা ৪, ১ জুলাই ১৯২২)।

আবদুল রহিম সোভিয়েত দেশে এসেছিলেন প্রথম মুহাজিরীন কাফিলার সঙ্গে যদিও রফিক আহ্‌মদের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে আবদুর রহিম হিসেবে ('প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন', পৃ. ২৬)।

আর যে দুজন ভারতীয় সোভিয়েত দেশে ঐ সময় বিমান চালনা শিখে বৈমানিক হতে পেরেছিলেন, তাঁদের নাম নাজির সিদ্দিকি ও আবদুল করিম। এঁদের কথাও কিছুটা জানা গেছে ঐ নিকিতিনেরই আর-এক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটির নাম **"Nobody is Forgotten"**। এটি প্রকাশিত হয়েছিল *Soviet Land* পত্রিকার পর পর দুটি সংখ্যায় (১৯৬৯ সালে নভেম্বর মাসের ২১ ও ২২ নং সংখ্যায়)।

নিকিতিনের বিবরণ থেকে জানা যায় এঁরা দুজনেই তাসখন্দে পেঁছেছিলেন

১৯২১ সালে গোড়ায়। সোভিয়েত দেশে সম্ভবত কোনো সামরিক স্কুলে ঢুকবার সময়কার আবেদন পত্র থেকে নাজির সিদ্দিকির গোড়ার দিকের জীবনের যে খবর তিনি জোগাড় করেছেন তা এই : সিদ্দিকির জন্ম ১৮৯৭ সালে। তাঁর ছ' বছর বয়সের সময় তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি বোম্বাই শহরে যান ও নানাভাবে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করেন। ঐখানে তিনি কিছু বিপ্লবী ছাত্রের সংস্পর্শে আসেন ও যোগ দেন মুক্তি-আন্দোলনে। পুলিস তাঁকে এর জন্য বিনা বিচারে আটক করার মতলব করেছে এ-খবর জানতে পেরে তিনি আরো কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পালান আফগানিস্তানে। কিন্তু সেখানে বৃটিশদের চাপে তাঁকে ও আরো কয়েকজন প্রবাসী ভারতীয়কে বন্দী করা হয়। আমানুল্লাহ্ খান বাদশা হওয়ার পর অবশ্য তাঁরা মুক্তি পান এবং আফগানিস্তানের প্রথম সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত, ইয়াকভ সুরিৎসের আনুকূল্যে অবশেষে পৌঁছন সোভিয়েত ভূমিতে।

সিদ্দিকি ও তাঁর সঙ্গীরা কি ১৯২০ সালের মুহাজিরীন ছিলেন? সম্ভবত না। কারণ ঐ মুহাজিররা যখন ১৯২০ সালে মে মাসে কাবুলে পৌঁছন তখন তাঁদের বন্দী করা হয় নি আর আমানুল্লাহ্ খান তখন আফগানিস্তানের বাদশা হয়ে গেছেন ইতিমধ্যেই। তবে কি তাঁরা লাহোরের যে ১৫ জন ছাত্র ১৯১৫ সালে দেশ থেকে পালিয়ে আফগানিস্তান গিয়েছিলেন তাঁদের দলভুক্ত ছিলেন? তাঁদের বন্দীদশার ও আমানুল্লাহ্ খানের মসনদে বসার পর তাঁদের মুক্তিলাভের উল্লেখ থেকে মনে হয় এটা হয়তো সম্ভব। কিন্তু মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেবের 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'তে যাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে লাহোরের বিভিন্ন কলেজের ছাত্র বলে, তাঁদের ১৫ জনের মধ্যে ১০ জনের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে (পৃ. ১৮৮-৮৯)। তার মধ্যে সিদ্দিকির (বা আবদুল করিমের) নাম নেই। ব্যাপারটা তাই পরিষ্কার নয় এখনো পর্যন্ত।

তাসখন্দে সিদ্দিকি ও তাঁর সঙ্গীরা যোগ দেন মিলিটারি স্কুলে। তিনি ও সম্ভবত আবদুল করিম গোড়াতেই আবেদন জানিয়েছিলেন বিমান চালনা শিক্ষার সুযোগ পাওয়ার জন্য। ১৯২১ সালের জুন মাসে সোভিয়েত বিপ্লবী সামরিক পরিষদের সহ-সভাপতি, এ. এম. স্ক্লিয়ান্স্কির কাছ থেকে নির্দেশ আসে সিদ্দিকির মতো যাঁরা বৈমানিক হতে চান তাঁদের তাসখন্দেরই বিমান চালনা শিক্ষার স্কুলে পাঠানোর। নিকিতিন লিখেছেন 'ঐ নির্দেশ নিশ্চয়ই

পাঠানো হয়েছিল লেনিনের সম্মতি অনুসারে, কারণ ভারতীয়দের বিমান চালানো শিক্ষালাভের আবেদন ব্যাপারটির তাৎপর্য ছিল আন্তর্জাতিক ও তাই স্কুলিয়ানস্কি নিশ্চয়ই সেখানে কোনো সিদ্ধান্ত নেন নি লেনিনকে ব্যাপারটি না জানিয়ে'।

তাসখন্দে বিমান চালনা শিক্ষা স্কুলে সিদ্দিকি ও তার সংগীরা রুশভাষা শেখেন এবং বিমানের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব বিষয়ে কিছুটা শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু ১৯২২ সালের গোড়ায় বিমান ও সুদক্ষ শিক্ষকের অভাবে স্কুলটি বন্ধ করে দিতে হয়। তারপর ঐ বছরেরই দ্বিতীয়ার্ধে নাজির সিদ্দিকি ও আবদুল করিম পৌঁছলেন মস্কোয়। সেখানে সিদ্দিকি ভর্তি হলেন একটি বিমান-চালনা শেখার স্কুলে আর আবদুল করিমকে পাঠানো হল সেভাস্তোপোলের কাছে কাচ্ (Kach) নামে একটি গ্রামের ট্রেনিং স্কুলে।

আবদুল করিম, সিদ্দিকির মতো রুশভাষা অত ভালো আয়ত্ত করতে পারেন নি। শারীরিক দিক থেকেও তিনি সুস্থ, সবল ছিলেন না তাঁর বন্ধুর মতো। কিন্তু বিমান-চালনা শেখার জন্য তাঁর ছিল অদ্ভুত আগ্রহ। ভাষার অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি প্রাণপাত করে শিখতে লাগলেন বিমান চালনা। তিনি নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন ও নিয়মিত নামাজ করতেন। কাচ্-এর ঐ বিমান-চালনা স্কুলে তাঁর সংগী ছিলেন বুলগারীয়, স্প্যানিশ, ইটালীয় ও ইরানী শিক্ষার্থীরা।

বিমান-চালনা শেখার আগ্রহে আবদুল করিম একটি কথা তাঁর বন্ধু ও ডাক্তারদের কাছে গোপন রাখার চেষ্টা করতেন যার ফল শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় মারাত্মক। তাঁর পায়ে মাঝে মাঝে হঠাৎ এমন একটা অসহ্য যন্ত্রণা হত যে তিনি প্রায় অশক্ত হয়ে পড়তেন সাময়িকভাবে। তা সত্ত্বেও পরম ধৈর্য ও সাহসের সংগে তিনি প্রাণপাত চেষ্টা করতেন তাঁর ঐ দৈহিক ব্যথা অতিক্রম করার।

আবদুল করিম বৈমানিক হতে পেরেছিলেন শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ১৯২৫ সালে গোড়ার দিকে প্লেন চালাতে চালাতে এক দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। অনুসন্ধানের পর অনুমান করা হয় যে সম্ভবত বিমান চালানোর সময়ে হঠাৎ তাঁর সেই পায়ের যন্ত্রণা এত তীব্র হয়ে ওঠে যে প্লেনটির নিয়ন্ত্রণ তাঁর আয়ত্তাতীত হয়ে যায়। আর মাটির থেকে তাঁর প্লেনের উচ্চতা বেশি না হওয়ায় তিনি আর সুযোগ পান নি অবস্থার সামাল দেওয়ার। কাচ্ গ্রামের কাছে বিমানবাহিনীর

কবরখানায় পূর্ণ সামরিক মর্যাদাযোগে সমাধিস্থ রয়েছে এই ভারতীয় বিপ্লবীর দেহ।

ওদিকে ১৯২২ সালে ২২ সেপ্টেম্বর নাজির সিদ্দিকি যোগ দিয়েছিলেন মস্কোর সামরিক বৈমানিকদের স্কুলে। সেখানে সমসাময়িক ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই বিখ্যাত বৈমানিক হয়েছিলেন উত্তরকালে, যেমন ভালেরি চকালভ্ সর্বপ্রথম উত্তর মেরুর উপর দিয়ে বিমানে পাড়ি দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আর বিদেশী ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন দুই হাঙ্গেরীয়ান— টট্ ইস্ত্ভান ও ফেজের্ ডেরি যিনি গত বিশ্বযুদ্ধে চরম আত্মদান করেন সোভিয়েতভূমিকে রক্ষা করতে গিয়ে। আর ছিলেন দুই ইটালিয়ান— পোলোগ্নি ও প্রিমো গিবাল্লি— ১৯৩৬ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়ে যিনি ছিলেন প্রজাতন্ত্রী সরকারকে রক্ষা করার জন্য প্রথম বৈমানিক স্বেচ্ছাসৈনিকদের অন্যতম। বিমান যুদ্ধে ঐ বীরের অকালমৃত্যু ঘটে মাদ্রিদের আকাশে।

১৯২৩ সালে ১১ অক্টোবর সিদ্দিকিকে অনুমতি দেওয়া হয় একা একা আকাশে ওড়ার। এতদিনে সার্থক হয় তাঁর স্বপ্ন।

১৯২৪ সালে তিনি একটি বিমান দুর্ঘটনায় পড়েন কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পান। ১৯২৫ সালে মস্কোর বিমান চালনা শিক্ষার উচ্চতর স্কুলের ট্রেনিং সমাপ্ত করে সিদ্দিকি সার্টিফিকেট পান 'Red Military Flyer'-এর। তাঁকে অতঃপর বিমান চালনার শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় বোরিসোগ্লেব্স্কে। সেখানে তিনি বেশ-কিছু আফগান ছাত্রদের শিক্ষা দেন— পশ্তুভাষা ভালো জানা থাকায় তাঁর সুবিধা হয়েছিল শিক্ষাদানের সময়ে।

১৯২৮ সালে বিমান নিয়ে কসরৎ করার সময়ে আবার তিনি আহত হন গুরুতরভাবে। অনেক দিন হাসপাতালে কাটানোর পর আবার কিন্তু তিনি যোগ দেন কাজে। ঐ বছরই তাঁকে ভলগা তীরস্থ ভল্স্ক শহরে বৈমানিক ও যন্ত্রবিদদের যুক্ত সামরিক স্কুলের বিমান চালনার শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। সেখানে তিনি কাটান ১৯৩১ সাল পর্যন্ত।

উত্তর-ত্রিশের বছরগুলিতে বিমান চালনা শেখার ধুম পড়ে যায় সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে। জার্মানিতে নাৎসীদের কাণ্ড-কারখানার দরুন তার প্রয়োজনও অবশ্য ছিল যথেষ্টই। 'ওসোড়িয়াখিন সমিতি' নামে ঐ সময়ে একটি সংস্থা গড়ে ওঠে ব্যাপকভাবে বিমানচালনা শেখানোর জন্য। ঐ সমিতির

মস্কোর কেন্দ্রীয় ক্লাবে নাজির সিদ্দিকিকে প্রথমে শিক্ষক হিসাবে ও পরে একটি গোটা বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে স্বভাবতই তাঁর কাজ খুবই বেড়ে যায়, যদিও তাঁর শরীর তখন আর সুস্থ সবল ছিল না আগের মতো। ১৯৪১ সালের ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়নের উপরে নাৎসী জার্মানির তড়িৎ আক্রমণের অল্প কিছুদিন আগে মৃত্যু হয় ঐ বিপ্লবী ভারতীয় বৈমানিকের।

নাজির সিদ্দিকির রুশ স্ত্রী, গ্রাসকোভিয়া এখনো জীবিত। দুঃখের বিষয় তাঁর দুই ছেলে। মুনীর ও নুরি দুজনেই মারা গেছে অল্প বয়সে। ছোটো ছেলের মৃত্যু হয় নাজির সিদ্দিকির জীবদ্দশায়। আর বড়ো ছেলের মুনীর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার পর যোগ দিয়েছিল লালফৌজে। স্তালিনগ্রাডের পর নাৎসী বাহিনীকে সোভিয়েত দেশ থেকে হটিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়ে ১৯৪৩ সালে ৭ অগাস্ট তার মৃত্যু হয় শত্রুর কামানের গোলায়। তখন তার বয়স ১৮ বৎসর মাত্র।

মাসুদ আলি খান *New Age* পত্রিকার ১ অক্টোবর, ১৯৬৭ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, রুশ-বিপ্লবের ৫০-তম বার্ষিক উপলক্ষে সোভিয়েত সরকারের আমন্ত্রণে রফিক আহমদের সোভিয়েত দেশে ভ্রমণ এবং ৪৭ বছর আগে রফিক আহমদ যখন সেখানে প্রথম গিয়েছিলেন তখনকার ঘটনার সঙ্গে জড়িত কিছু মানুষের সঙ্গে তাঁর আলাপ প্রসঙ্গে। সেখানে তিনি জনৈকা মারিয়া আলেক্সান্ড্রোভনা ফর্টুসের কথা লিখেছেন যিনি রফিক আহমদের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন মস্কোর প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ে। আশ্চর্য জীবন সেই মহিলার। বহুদিনের পুরানো পার্টি সদস্যা, তিনি বিপ্লবে যখন যোগ দেন তখন বয়সে প্রায় কিশোরী। পরে স্পেনের গৃহযুদ্ধেও তিনি লড়াই করেন। তাঁর স্বামী ছিলেন একজন স্প্যানিশ কমিউনিস্ট যাঁকে ফ্যাসিস্টরা হত্যা করে গৃহযুদ্ধের সময়ে। তাঁর ১৯ বছরের বৈমানিক ছেলেও সেখানেই প্রাণ দেয় ১৯৩৭ সালে।

মারিয়া ফর্টুস রফিক আহম্মদ ও মাসুদ আলি খানকে একজন ভারতীয় বৈমানিকের কথা বলেন যিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে ১৯২২ সালে বিমানচালনা শিখে ছিলেন কাচ্ বিমান শিক্ষণ কেন্দ্রে। তারপর ১৯২২ সাল থেকে ১৯২৪ সালের গোড়া অবধি তাঁরা বিমান চালনা শিক্ষা করেন মস্কোয়। সেখানেও নাকি ঐ

ভারতীয় ছিলেন। মারিয়ার স্বামী প্রায়ই তাঁর গল্প করতেন আর মারিয়া নিজেও ঐ ভারতীয়কে দেখেছেন তাঁদের হস্টেলে।

মারিয়া ফর্টুস আরো জানান যে লর্ড কার্জন যখন সোভিয়েত ইউনিয়নকে এক Ultimatum বা চরমপত্র দেন তখন তার প্রতিবাদে সোভিয়েত দেশে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবাহিনী গড়া হয়। তার নাম দেওয়া হয়েছিল Ultimatum। তার প্রতীক ছিল একটি মুঠো করা হাত। ঐ বাহিনীতে নাকি ছিলেন দু'জন ইটালিয়ান, দু'জন জার্মান, দু'জন হাঙ্গেরীয়ান, একজন তুর্ক, একজন ল্যাটভিয়ান, একজন স্প্যানিশ ও একজন ভারতীয়। শ্রমিকরা চাঁদা তুলে গড়েছিল ঐ আন্তর্জাতিক বাহিনী। মারিয়া বলেন ইটালিয়ান বৈমানিক গিবাল্লির বিধবা স্ত্রী ও একজন হাঙ্গেরিয়ান বৈমানিকের স্ত্রী এখনো মস্কোয় আছেন। তাঁরা হয়তো খবর দিতে পারেন ঐ ভারতীয় বৈমানিকের সম্পর্কে।

মারিয়া ফর্টুসের বিবরণ থেকে মনে হয় ঐ বৈমানিক সম্ভবত নাজির সিদ্দিকি— যদিও কাচ্-এ বিমানচালনা শিখেছিলেন সিদ্দিকি নন, আবদুল করিম।

প্রসঙ্গক্রমে মাসুদ আলি খানের ঐ প্রবন্ধে রফিক আহমদ, শওকৎ উসমানীর মতো প্রথম মুহাজিরীন কাফিলার আর-এক যাত্রী, আবদুল কাইয়ুমের কথা কিছুটা লেখা হয়েছে। তাঁর রুশ স্ত্রী, লিউডমিলা মিখাখেলোভ্না এবং দুই মেয়ে, ভ্যালেন্টিনা ও লিলিয়ানা এখনো জীবিত এবং সোভিয়েত দেশের বাসিন্দা। আবদুল কাইয়ুম কিকি'র দুর্গরক্ষায় যোগ দিয়েছিলেন ও তারপর তাসখন্দের মিলিটারি স্কুল থেকে শিক্ষালাভের পর নাকি ৎভের (Tver) শহর এলাকায় লালফৌজের একটি বাহিনী পরিচালনাও করেছিলেন। ঐ শহরের ঐ সময়কার কাগজপত্রে নাকি প্রকাশিতও হয়েছিল তার বিবরণ।

গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আবদুল কাইয়ুম কমিউনিস্ট পার্টির আবেদনে সাড়া দিয়ে পরিবহন-ব্যবস্থা গড়ে তোলার ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে আত্ম নিয়োগ করেন। ১৯৩৫ সালের পর তাঁর খবর আর পাওয়া যায় না। সম্ভবত ঐ সময় থেকে স্তালিনের নির্দেশে সোভিয়েত দেশে যে কঠোর ও কিছুটা নির্বিচার দমননীতি ও অনাচার শুরু হয় তিনি তারই শিকার হয়েছিলেন। মাসুদ আলি লিখেছেন, তাঁর 'মেয়েদেরও নাকি তখন গোপন রাখতে হয়েছিল এই কথা যে তাদের পিতা একজন ভারতীয়' (দ্র. পরিশিষ্ট ১০)।

তাসখন্দে ভারতীয় কমিউনিস্টদের পার্টিগঠন

তাসখন্দের ভারতীয় মিলিটারি স্কুলে মুহাজিরীন তরুণদের রাজনৈতিক ও সামরিক শিক্ষা কয়েক মাস চলার পর ১৯২১ সালের গোড়ায় ঐ স্কুলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর একটি কারণ ছিল এই যে মানবেন্দ্রনাথের আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে ভারতে বিপ্লবী অভিযান চালানোর মতো অবাস্তব পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হওয়ার পর এটা ক্রমেই বেশি মাত্রায় অনুভূত হচ্ছিল যে মুহাজিরদের পক্ষে এই মুহূর্তে আসলে যা সব থেকে বেশি দরকার তা সামরিক শিক্ষা নয়, প্রকৃত রাজনৈতিক শিক্ষা। দ্বিতীয়ত, তাসখন্দের ভারতীয় মিলিটারি স্কুল প্রতিষ্ঠার সময়ে রুশেরা ঐ অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকলেও সেখানে যথেষ্ট হৈ-চৈ ও গরম গরম বক্তৃতা হয়েছিল আর তার খবর গুপ্তচর মারফত বৃটিশ পররাষ্ট্রসচিব লর্ড কার্জনের কানে পৌঁছে কেড়ে নিয়েছিল তাঁর রাতের ঘুম। ইংরেজের তরফ থেকে তাই ঘনঘন অভিযোগ পাঠানো হচ্ছিল যে সোভিয়েত সরকার ভারত সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় বিপ্লবীদের নিয়ে এই ধরনের চক্রান্ত বন্ধ না করলে তার সঙ্গে কোনো ক্রমেই বাণিজ্য চুক্তি করা সম্ভব নয়। অথচ বিদেশী হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের ফলে বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনের জন্য তখন সোভিয়েত সরকারের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন ছিল ঐ চুক্তির। তাই অযথা এই নিয়ে প্রস্তাবিত চুক্তির সম্ভাবনাকে বিপন্ন না করে তাঁরা ঐ স্কুল তুলে দেওয়াই সমীচীন বোধ করেছিলেন আর সেখানকার ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক দিক থেকে যাঁরা সব থেকে অগ্রসর প্রতিপন্ন হয়েছিলেন তাঁদের মস্কোয় পাঠিয়েছিলেন সদ্য-প্রতিষ্ঠিত (এপ্রিল, ১৯২১) প্রাচ্য শ্রমজীবীদের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে (KUTV) শিক্ষালাভের জন্য। সে কথায় আমরা পরে আসব— ইতিমধ্যে আর-একটি ঘটনার উল্লেখ করব যার সঙ্গেও পরে জড়িত করা হয়েছে ভারতীয় মুহাজিরদের নাম।

সোভিয়েত 'নিউ টাইমস' পত্রিকার প্রধানা সম্পাদিকা, শ্রীমতী এন. সের্গেইয়েভা শ্রীমতী অমিতা রায়কে একটি চিঠিতে (৯ জানুয়ারি, ১৯৬৯) লেখেন :

"...সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় প্রথম ভারতীয় কমিউনিস্ট সংস্থা-সংশ্লিষ্ট মালমশলা ও দলিলপত্রাদি প্রসঙ্গে আমি আপনার কাছে সুপারিশ করব

আই. এস. সোলোগিউবভের 'তুর্কিস্তানে বিদেশী কমিউনিস্ট' বইখানির নাম। তাসখন্দ থেকে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬১ সালে। দুঃখের বিষয় আমাদের দপ্তরের লাইব্রেরিতে ঐ বইয়ের কোনো কপি নেই, তবে কলকাতার সোভিয়েত কন্সালেটের বলতে পারা উচিত কেমন করে তা জোগাড় করা যেতে পারে।"

১৯৬৯ সালে ডিসেম্বর মাসে আমি শেষ পর্যন্ত বইখানির সন্ধান পাই মস্কোর লেনিন লাইব্রেরিতে। তার ৫৬ পৃষ্ঠায় আছে :

"১৯২০ সালে ১৭ অক্টোবর তাসখন্দে প্রতিষ্ঠা হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির। তুর্কিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে এক চিঠিতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তুর্কিস্তান ব্যুরো লেখে : 'সর্ব-সাধারণের অবগতির জন্য জানাই যে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নীতি অনুযায়ী এখানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কাজ করবে কমিন্টার্নের তুর্কিস্তান ব্যুরোর রাজনৈতিক নেতৃত্বাধীনে'।

"ভারতীয় কমিউনিস্টরা তাঁদের প্রথম সভায় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন যাতে বলা হয় যে যাঁরা পার্টিতে যোগ দিতে চাইবেন তাঁদের তিন মাসের মেয়াদে প্রার্থী সভ্য থাকতে হবে। সংস্থার সম্পাদক নির্বাচিত হন কমরেড শফীক।"

সোলোগিউবভ লিখেছেন যে তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি খুবই ছোটো ছিল। তার সভ্যসংখ্যা ছিল মাত্র ১০— এঁরা সবাই ছিলেন তাসখন্দেরই বাসিন্দা। আর এর সঙ্গে তিনি তুলনা করেছেন হাঙ্গেরিয়ান পার্টির—৮৮৪, জার্মান পার্টির—৬২২, পোলিশ পার্টির—২০০, চীনা পার্টির ৬৪৮ ও ইরানী পার্টির—৪৯৫ জন সভ্যের।

সোলোগিউবভ ভারতীয় পার্টির যে সদস্য সংখ্যার কথা এখানে উল্লেখ করেছেন সম্ভবত তা ঐ পার্টির তাসখন্দে থাকার সময়কার সংখ্যা। মস্কোতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর পার্টিতে কিছু নতুন সদস্য যোগ দেন। মোট সংখ্যা শেষ পর্যন্ত কত দাঁড়ায় তার সঠিক খবর এখনো জানা যায় নি।

যে দলিলগুলির ভিত্তিতে সোলোগিউবভ উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন ডঃ দেবেন্দ্র কৌশিক উজবেকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির

মহাফেজখানায় তার সন্ধান পান (F 60, ed No. 724. LI4)। সেগুলির থেকে এখন আরো কিছু খবর পাওয়া গেছে ঐ কমিউনিস্ট পার্টি'র। যেমন ড: কৌশিকের একটি দলিলে পাওয়া যায় এই খবর :

"১৯২০ সালে ১৭ অক্টোবর তাসখন্দে নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' গঠিত হল :

১। এম. এন. রায়

২। এভেলিন ট্রেণ্ট রায়

৩। এ. মুখার্জি

৪। রোজা ফিটিংগফ

৫। মুহম্মদ আলি (আহমেদ হাসান)

৬। মুহম্মদ শফীক সিদ্দিকি ও

৭। এম. প্রতিবাদী ভয়ংকর আচার্য

"প্রার্থী সভ্য থাকার মেয়াদ হবে তিন মাস।

"মুহম্মদ শফীক সম্পাদক নির্বাচিত হলেন।

"ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' তৃতীয় আন্তর্জাতিক কর্তৃক ঘোষিত নীতি গ্রহণ করছে এবং ভারতীয় অবস্থার সংগে সংগতিপূর্ণ একটি কর্মসূচী তৈরি করার প্রতিশ্রুতি জানাচ্ছে।

(স্বা:) সভাপতি : এম. আচার্য

(স্বা:) এম. এন. রায়, সম্পাদক।"

মানবেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন (পৃ. ৪৬৪-৬৫) যে রাজনৈতিক শিক্ষালাভের পর মুহাজিরীন তরুণেরা পীড়াপীড়ি করতে থাকেন তখনই সেখানে তাঁদের নিয়ে একটি কমিউনিস্ট পার্টি' গড়ার জন্য আর মানবেন্দ্রনাথ নাকি এ-ব্যাপারে তাড়াহুড়ো না করে তাঁদের ভারতবর্ষে ফিরে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করার পক্ষপাতী ছিলেন। ইতিমধ্যে আবদুর রব ও প্রতিবাদী আচার্য এসে মুহাজিরদের ঐ পার্টি' গড়ার উৎসাহে আরো ইন্ধন জোগান। তাঁদের প্ররোচনাতেই নাকি মুহাজিরীন তরুণরা তাঁদের পার্টি' গড়ার প্রস্তাব সমেত এক প্রতিনিধি দল পাঠান কমিন্টার্নের তুর্কিস্তান ব্যুরোর কাছে। অবিলম্বে পার্টি' গড়া না হলে ঐ তরুণেরা খুব মুষড়ে পড়ছেন দেখেই নাকি শেষ পর্যন্ত মানবেন্দ্রনাথ মত দেন কমিউনিস্ট পার্টি' প্রতিষ্ঠার পক্ষে।

অথচ এখানে লক্ষ করা দরকার যে, তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র প্রথম সাতজন সদস্যের মধ্যে একজনও মুহাজির নন। মানবেন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী এভেলিন, অবনী মুখার্জি ও তাঁর স্ত্রী রোজা ফিটিংগফ আর প্রতিবাদী আচার্যের তো প্রশ্নই ওঠে না, এমন-কি, মুহম্মদ আলি বা মুহম্মদ শফীক— কেউই ১৯২০ সালে হিজরৎ আন্দোলনের মুহাজির ছিলেন না। আমরা আগেই দেখেছি মুহম্মদ আলি ছিলেন লাহোর থেকে যে ১৫ জন মুসলমান ছাত্র ১৯১৫ সালে বিপ্লবী কাজকর্ম চালানোর সুবিধার জন্য আফগানিস্তানে পালিয়ে যান তাঁদেরই অন্যতম। আর শফীকও ঐ ধরনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই আফগানিস্তান হয়ে মুম্মদ আলির সঙ্গে তাসখন্দ পৌঁচেছিলেন ১৯১৯ সালে শেষের দিকে অর্থাৎ প্রথম মুহাজিরীন কাফিলা তাসখন্দ পৌঁছনোর অন্তত ন-দশ মাস আগে।

আবার যে দু জন পুরোনো বিপ্লবীর প্ররোচনায় মুহাজিরীন তরুণেরা অবিলম্বে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন বলে মানবেন্দ্রনাথ লিখেছেন তাঁদেরই একজন আবদুর রবের নাম নেই ঐ পার্টি'র সাতজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের তালিকায়।

আর সর্বশেষে যে সভায় পার্টি প্রতিষ্ঠা হল তার বিবরণীর শেষে মানবেন্দ্রন্যাথর স্বাক্ষর রয়েছে সম্পাদক হিসেবে— সভাপতি হিসাবে প্রতিবাদী আচার্যের স্বাক্ষরের নীচেই। সভায় পার্টি'র সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন মুহম্মদ শফীক। কাজেই ডঃ কৌশিক অনুমান করেছেন যে সভার বিবরণীর নীচে সম্পাদক হিসাবে মানবেন্দ্রনাথের স্বাক্ষর সম্ভবত এই কারণে যে তিনি ছিলেন ঐ সভার 'আহ্বায়ক সম্পাদক' (দ্র. ডঃ দেবেন্দ্র কৌশিক, "About the founding of the Communist Party of India at Tashkent" *New Age* মাসিক পত্রিকা, অক্টোবর ১৯৬৪)।

সে যাই হোক, এই-সবের পরে, তাসখন্দে ভারতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথের উপরোক্ত বক্তব্য পুরোপুরি মেনে নেওয়া চলে না। পার্টি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বরঞ্চ তাঁর বেশ কিছুটা উৎসাহেরই পরিচয় মেলে যখন আরএকটি দলিলে দেখা যায় তিনি তুর্কিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি'র কেন্দ্রীয় কমিটিকে জানাচ্ছেন: 'এইখানে জানিয়ে রাখি যে এখানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছে। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নীতি অনুসারে এবং কমিন্টার্নের

তুর্কিস্তান ব্যুরোর রাজনৈতিক পরিচালনায় ঐ পার্টি কাজ করছে'। এই দলিলটিতেও আছে মানবেন্দ্রনাথের স্বাক্ষর—'সংশ্লিষ্ট সম্পাদক' হিসেবে।

পার্টির প্রথম সভাতেই শফীক সম্পাদক নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও মানবেন্দ্রনাথের এইভাবে সম্পাদক হিসাবে স্বাক্ষরদানে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন ডঃ কৌশিক (উপরোক্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

তবে এ কথা ঠিক যে তৃতীয় একটি দলিলে দেখা যায় যে দু-মাস পরে—১৯২০ সালে ১৫ ডিসেম্বরের এক সভায় যে তিন জনকে প্রার্থী সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে মাসুদ আলি শাহ্ কাজী ও আকবর শাহ্ নিশ্চিতভাবেই প্রথম মুহাজিরীন কাফিলার যাত্রী ছিলেন আর আবদুল কাদির সেহ্রাই প্রথম বা দ্বিতীয় কাফিলার যাত্রী হোন বা না হোন (আমরা দেখেছি ও ব্যাপারে প্রথম কাফিলার দুই যাত্রী, শওকৎ উসমানী ও রফিক আহ্মদের মতভেদ রয়েছে) তিনিও মুহাজিরীন তরুণদের মতোই যোগ দিয়েছিলেন তাসখন্দের মিলিটারি স্কুলে ও পরে মস্কোর প্রাচ্য শ্রমজীবীদের কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কাজেই ভারতীয় মুহাজিরীন তরুণদের কেউ কেউ একেবারে প্রথম থেকেই না হলেও দু-মাসের মধ্যেই যোগ দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। আরো কয়েকজন মুহাজিরও পার্টিতে যোগ দেন আরো কয়েক মাস পরে, মস্কো পৌঁছোনোর পর।

১৫ ডিসেম্বরের ঐ সভায় মানবেন্দ্রনাথ, শফীক ও আচার্য—এই তিন জনকে নিয়ে একটি কার্যনির্বাহক কমিটিও নির্বাচিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির।

তাসখন্দে কাজের পদ্ধতি ও নেতৃত্ব নিয়ে মানবেন্দ্রনাথ ও প্রতিবাদী আচার্যের মধ্যে কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই প্রচণ্ড মতভেদ দেখা দেয়। মানবেন্দ্রনাথ আচার্যকে ভারতবর্ষে পাঠাতে চান গোপন কাজকর্ম সংগঠিত করার জন্য। আর আচার্য চান নেতৃত্ব থেকে মানবেন্দ্রনাথের অপসারণ কারণ, তাসখন্দে ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা নাকি বিশেষভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়েছিল ঐ সময়ে। শওকত উসমানীর মতে মানবেন্দ্রনাথ ও আচার্যের মধ্যে অ-বনিবনার সূত্রপাত নাকি হয়েছিল তাসখন্দে মুহাজিরীন তরুণেরা পৌঁছানোর আগেই। তিনি এও লিখেছেন যে বিতর্কে মানবেন্দ্রনাথের পক্ষে ছিলেন অবনী মুখার্জি, (এটা বিশেষ করেই লক্ষণীয় এই কারণে যে মানবেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা পড়লে মনে হয় যেন প্রথম আলাপের দিন থেকেই তিনি বিমুখ হয়েছিলেন অবনী মুখার্জির

প্রতি। অথচ তার পরেই দেখা যায় জার্মানি থেকে প্রথম 'ভারতীয় কমিউনিস্ট ইস্তেহার' প্রকাশিত হচ্ছে মানবেন্দ্রনাথ, অবনী মুখার্জি ও মানবেন্দ্রনাথের স্ত্রী এভেলিন ট্রেন্টের ছদ্মনাম, শান্তি দেবীর নামে। তারপর ১৯২১ সালে 'বার্লিন কমিটি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে বিতর্কের সময়েও মানবেন্দ্রনাথ ও অবনীনাথকে দেখা গেছে একত্রে কাজ করতে। *India in Transition* গ্রন্থটিও মানবেন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন অবনীনাথের সহায়তায়। আর ১৯২১ সালে আহমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে প্রতিনিধিদের মধ্যে কমিউনিস্টদের যে ইস্তেহারটি বিলি করা হয় তাতেও দেখা গেল ঐ দুটি নাম —গ্রন্থকার) মুহম্মদ আলি ও মুহম্মদ শফীক আর আচার্যকে সমর্থন জানিয়েছিলেন আবদুর রব পেশোয়ারী। যদিও আবদুর রব সভ্য হন নি তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির।

মানবেন্দ্রনাথ ও আচার্যের বিতর্ক শেষ পর্যন্ত বিবেচনার জন্য পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় কমিটি তুর্কিস্তান ব্যুরো ও তুর্কিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির কার্যনির্বাহক কমিটির দপ্তরে। তুর্কিস্তান ব্যুরো ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কার্যনির্বাহক কমিটির এক যুক্ত সভায় (১৯২০ সালে ৩১ ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত) এ বিষয়ে যে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয় তা জানা যায় ঐ সভার বিবরণীর (৩০নং) এই অংশটি থেকে :

"ভারতীয় শাখার ভিতরকার সংঘাত প্রসঙ্গে। তাসখন্দের প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে কাজের পদ্ধতির প্রশ্নে মতভেদ নিয়ে ভারতীয় বিপ্লবী সমিতির (Indian Revolutionary Committee) সদস্য, রায় ও আচার্যের মধ্যে এই সংঘাত দেখা দেয়। কমরেড রায় প্রস্তাব করছেন যে দেশের (সোভিয়েত ইউনিয়নের) বাইরেকার কাজকর্ম বিপ্লবী সমিতির হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক আর দেশের ভিতরকার প্রবাসী সংশ্লিষ্ট কাজকর্মের দায়িত্ব থাকুক কমিন্টার্নের তুর্ক ব্যুরোর হাতে। এইভাবে (ভারতীয়) বিপ্লবী কমিটিতে থেকে আচার্যকে ব্যাপকভাবে গোপন কাজকর্ম চালাতে হবে আর বিপ্লবী কমিটির সদস্যদের ভাগাভাগি করার প্রশ্ন তাই আর তখন থাকবে না।...বর্তমান সভায় যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে রায় তদনুযায়ী চলতে প্রস্তুত এবং তিনি প্রস্তাব করেন যে কমরেড আচার্য যেমন আছেন তেমনি থাকুন বিপ্লবী কমিটিতে।

"কমরেড আচার্য মনে করেন যে যেহেতু রায় ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন তাই তাঁকে অপসারিত করা হোক কমিন্টার্ন ব্যুরো ও ভারতীয় বিপ্লবী সমিতির কাজকর্ম থেকে।

"নতুন বিপ্লবী কমিটি গঠিত হওয়া উচিত দুজন ভারতীয় ও একজন রুশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি নিয়ে। ভারতীয়দের কাছে বুঝিয়ে বলা উচিত যে তাঁদের পার্টিতে যোগ দিতে বাধ্য করা হবে না। কমরেড রায়কে রাখা যেতে পারে শুধু প্রচার ও লেখালিখির কাজের জন্যই।

গৃহীত সিদ্ধান্ত

"১। ক) [মস্কোর] একটি সর্বভারতীয় কংগ্রেসের অনুষ্ঠানের আগে পর্যন্ত এবং কমিন্টার্নের কার্যনির্বাহক সমিতি যতদিন না মূলত সংঘাতের নিরসন না ঘটাচ্ছে ততদিন ভারতীয় বিপ্লবী সমিতির ভিতরকার অবস্থা ঠিক আগের মতোই রাখা হবে।

"খ) কোনো কমরেডই এই-সব বিরোধের কথা বলে বেড়াবেন না।

"গ) ভারতীয় প্রবাসীদের দায়িত্ব সাময়িকভাবে দেওয়া হচ্ছে কমিন্টার্নের তাসখন্দ ব্যুরোর হাতে।

"ঘ) বিপ্লবী সমিতির সদস্যগণ যতশীঘ্র সম্ভব মস্কো যাত্রা করবেন এই-সব সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে।"

তাসখন্দে ১৯২০ সালে ১৭ অক্টোবর যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় তার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে কিছুদিন যাবৎ একটা সোরগোল চলেছে। ১৯১৫ সালের মাসে বহু তথ্য ও ঠিকানা ভর্তি 'মারাত্মক নোটবুক' সমেত পেনাং-এ তাঁর গ্রেপ্তার, তারপরে সিঙ্গাপুরে ফোর্ট ক্যানিং-এ আটক থাকার সময়ে তাঁর পুলিসের কাছে দু-দফা বিবৃতিদান আর তারও পরে সেখান থেকে পালানোর ব্যাপার নিয়ে এক সময়ে বাংলা দেশের জাতীয় বিপ্লবীদের মধ্যেও কিছুটা কানাঘুসো ও লেখালিখি চলেছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতি প্রসন্ন অথবা বিমুখ সকলেই মোটের উপর একটা মনস্থিরও করেছিলেন ও-বিষয়ে।

হঠাৎ বহুদিন পরে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব জাতীয় বিপ্লবী মহলের সেই ধারণাকে নস্যাৎ করে নতুন আর-এক দফা ঠিক আলোচনা নয়, বিতণ্ডার সূত্রপাত করেছেন কিছুদিন থেকে। এমন-কি, তিনি এ কথাও লিখেছেন যে 'কোথা থেকে তাঁর (অর্থাৎ অবনীনাথের —গ্রন্থকার) যাত্রা শুরু হয়েছে, কিভাবে হয়েছে তা বাংলার সে-যুগের বিপ্লবীরা কিছুই জানেন না' ('আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পৃ. ৪৩)। কথাটার যাথার্থ্য পরে যাচাই করা যাবে এবং কী নতুন তথ্যের ভিত্তিতে এমন-সব কথা তিনি বলছেন তা'ও আমরা পরে পরখ করে দেখব। ইতিমধ্যে গোড়াতেই বলে রাখি যে এটা খুবই আপসোসের ব্যাপার যে এমন একটি বিষয়কে যথাসাধ্য বস্তুনিষ্ঠ ও বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্ততার দৃষ্টিতে না দেখে তিনি সমগ্র আলোচনায় এমন একটা একান্ত ব্যক্তিগত বিদ্বেষের সুর আমদানী করেছেন যার থেকে উত্তাপ যতটা পাওয়া যায় আলো মেলে না তার শতাংশও।

এ কথা নিশ্চয়ই ঠিক যে অবনীনাথের জীবনের বেশ কিছু অংশ এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে আবছায়া। শুধু সিঙ্গাপুরের পর্ব নয়, ঠিক তার পরের দুবছর তাঁর ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থানকালের ঘটনা আমরা প্রায় কিছুই জানি না। অথচ বোধ করি ঐ সময়েই ঐ জাতীয় বিপ্লবীর রূপান্তর ঘটেছিল কমিউনিস্ট বিপ্লবীতে এবং সেখানকার নবোদ্ভূত মার্কসবাদী সমাজতন্ত্রী মহলের তিনি এতটা আস্থা-

ভাজন হয়েছিলেন যে তাঁর পক্ষে যোগাযোগের পথ খুলে গিয়েছিল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিখ্যাত ওলন্দাজ নেতা, রুটগের্স-এর সংগে। এর সংগে তুলনীয় প্রায় ঐ সময়েই মেক্সিকোয় অবস্থানকালে মানবেন্দ্রনাথের অনুরূপ রূপান্তর ও বোরোডিনের সংগে যোগাযোগের ঘটনা। মানবেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ঐ রূপান্তর প্রক্রিয়ার বিবরণ অন্তত কিছুটা পাওয়া যায় তাঁরই স্মৃতি-কথায়। দুর্ভাগ্যক্রমে তেমন কোনো বিবরণ এখনো অবধি পাওয়া যায় নি অবনীনাথের ক্ষেত্রে। তাঁর জীবনের শেষ পর্ব সম্পর্কেও আমাদের এখনো অনেক তথ্যই অজানা।

সুতরাং সঠিক তথ্য সংগ্রহ ও তার ভিত্তিতে বস্তুনিষ্ঠ ও নির্মোহ আলোচনার বিস্তর অবকাশ অবশ্যই আছে অবনীনাথ প্রসংগে। এখানে তারই কিছুটা চেষ্টা করব প্রধানত মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্য-গুলি যাচাই করার মারফত। তবে অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিচিত্র জীবন ও কর্মকাণ্ডের পূর্ণাংগ মূল্যায়নের চেষ্টা যে এখানে করছি না, তা বলাই বাহুল্য।

গোড়াতেই মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেবের কয়েকটি খুচরো ভ্রান্তি নিরসন করে রাখি। অবনীনাথের জন্ম তারিখ ১৮৯২ সালের ১২ জুন নয় ('আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পৃ. ২৪৩), ১৮৯১ সালের ৩ জুন। তাঁর পিতার খেতাবের নাম 'রায় সাহেব' নয় (পৃ. ২৪৩ ও ৩৯১), 'রাও সাহেব'। তাঁর পাসপোর্টে অবনীনাথের নাম লেখা ছিল 'ডক্টর আর. শাহীর' নয় (পৃ. ২৬২ ২৬৬), শুধু 'আর. শাহীর' (R. Shahir)। আর অবনী মুখার্জি'র 'ছোটোভাই তপতীনাথ মুখোপাধ্যায় আমার এক বন্ধুকে বলেছেন' ব'লে মুজফ্ফর সাহেব যে-সব কথা লিখেছেন (পৃ. ২৪৩) শ্রীযুক্ত তপতীনাথ মুখোপাধ্যায় আমায় জানিয়েছেন যে অমন কথা তিনি কাউকে বলেন নি, তাঁর পক্ষে বলা সম্ভবও নয়।

মুজফ্ফর সাহেব লিখেছেন: 'অবনী মুখার্জি' অল্প বয়সেই বখে গিয়েছিল' (পৃ. ২৪২)। আর-এক জায়গায় লিখেছেন: 'অবনী মুখার্জি অবলীলাক্রমে মিথ্যা কথা বলে যেতেন। মিথ্যা তাঁর জিহ্বার ডগায় এমন স্বাভাবিকভাবে এসে যেত যে তিনি হয়তো বুঝতেই পারতেন না যে তিনি মিথ্যা বলছেন' (পৃ. ২৫৯)। আবার লিখেছেন: ...'তাঁর আর একটি বিশেষ গুণ ছিল এই যে তিনি ছিলেন একজন মিথ্যার সম্রাট' (পৃ. ৩১৫)।

অত নিশ্চিতভাবে যাঁর এই মাহাত্ম্যকীর্তন, অবাক লাগে যখন দেখি তাঁর সম্পর্কেই মুজফ্‌ফর সাহেবকে অম্লানবদনে লিখতে : 'অবনী মুখার্জিকে আমি কখন দেখি নি' ('প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন', পৃ. ১৩৮)। ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত না হয়ে, এমন-কি, তাঁকে চোখেও না দেখে অবনীনাথ সম্পর্কে ঐ ধরনের কথা 'অবলীলাক্রমে' বলতে বাধে নি মুজফ্‌ফর সাহেবের।

তবে চোখে না দেখলেও অবনীনাথের কিছু চিঠি নাকি পেয়েছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। তিনি লিখেছেন : '...আমি প্রতি ডাকেই (তখনকার দিনে সপ্তাহে একবার মাত্র বিদেশী ডাক আসত) কখনো বাঙলায় লেখা, কখনো বা ইংরেজীতে লেখা তাঁর পত্র পেতে লাগলাম। কিছু কিছু সাহিত্যও, এমন কি এনার্কো সিণ্ডিকালিস্টদের কাগজপত্র পর্যন্ত তিনি পাঠাতেন' ('আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পৃ. ২৭৫)। তবে কি মুজফ্‌ফর সাহেব ঐ-সব চিঠির ভিত্তিতেই অবনীনাথের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগগুলি প্রমাণ করেছেন? তাও তো নয়। একটি চিঠিও তো তিনি দাখিল করেন নি তাঁর কোনো একটি অভিযোগের সপক্ষে। এক জায়গায় অবশ্য লিখেছেন : '...৩৭ হ্যারিসন রোডের ঠিকানায় পেজেণ্টস অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টিকে তিনি (অর্থাৎ অবনীনাথ —গ্রন্থকার) একখানা চিঠি লিখেছিলেন' ('প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন', পৃ. ১৩৯)। কিন্তু সেখানেও সে চিঠি থেকে কোনো উদ্ধৃতি না দিয়ে শুধু লিখেছেন যে 'তাতে তিনি বলেছিলেন, তিনি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে কাজ করেছেন, (এমন কোনো খবর কিন্তু আমি অবনীনাথের স্ত্রীর কাছে পাই নি। ১৯২৬ সাল নাগাদ তিনি 'ইনস্টিটিউট অফ রেড প্রফেসার্সে' শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং সেখান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে বেরিয়েছিলেন ১৯২৮ সালে। তারপর ১৯৩০ থেকে ১৯৩৭ অবধি তিনি কাজ করেন 'ইনস্টিটিউট অফ ওরিয়েন্টোলজি'র লেনিনগ্রাড শাখায়। এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা যাবে —গ্রন্থকার) পার্টির সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই, তিনি বুখারিনের 'এ. বি. সি. অফ কমিউনিজম-এর বাংলায় তর্জমা করেছেন, আমরা ইচ্ছা করলে তা ছাপাতে পারি' ইত্যাদি (পৃ. ১৩৯)। মুজফ্‌ফর সাহেবের সাম্প্রতিক বইটিতে প্রায় ঐ ধরনের কটি লাইন উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে দেখে আশা হল হয়তো তিনি চিঠিটি খুঁজে পেয়েছেন অবশেষে। হতাশ হতে হল ঐ

ক'লাইনের পর বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে 'স্মৃতি হতে উদ্ধৃত' শব্দ তিনটি দেখে ('আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পৃ. ৩০০)।

এত বছর পরে স্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি দেওয়ার যে বিপদ আছে তারও প্রমাণ ঐখানেই পাওয়া যায়। প্রথম বইয়ের ১৩৯ পৃষ্ঠায় আছে 'পার্টি'র সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই' আর দ্বিতীয় বইয়ের ৩০০ পৃষ্ঠায় সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে 'পার্টি'র সঙ্গে অর্থাৎ রায়ের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।' এর মধ্যে কোন্ পাঠটি ঠিক এতদিন পরে কে তা বলবে?

আসলে মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব তাঁর স্মৃতিশক্তির উপরে একটু অতিরিক্ত মাত্রায় আস্থাশীল। তাই দেখা যায় যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জীবিত সেখানেও তাঁর কাছ থেকে তথ্য আর-একবার যাচাই করে নেওয়ার চেষ্টা না করে তিনি অনায়াসে লিখতে পারেন 'আমার যতটা মনে পড়ে ভূপতি মজুমদার আমায় একদিন বলেছিলেন যে চাবির গোছা ঘোরাতে ঘোরাতে একদিন অবনী এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন Excuse me…আপনি কি বাঙালী' (ঐ, পৃ. ২৫৪)?' অথবা 'পরের রাত্রে খান সাহেব (অর্থাৎ আবদুর রাজ্জাক খান —গ্রন্থকার) অবনী মুখার্জিকে জানিয়েছিলেন যে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব না। শোনা মাত্রই অবনী মুখার্জি ক্রোধ ও উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন, "আমি মুজফ্ফর আহমদকে দেখে নেব।" এটা অবশ্য আমার আবদুর রাজ্জাক খানের মুখে শোনা কথা' (ঐ, পৃ. ২৭৬)।

ভূপতিবাবু ও আবদুর রাজ্জাক খান দুজনেই এখনো জীবিত আর দুজনেরই সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে ইতিমধ্যে। অথচ মুজফ্ফর সাহেব তাঁদের কাছে আলোচ্য বিষয়টি যাচাই করায় প্রয়োজন বোধ করলেন না আর উল্লেখ তো করলেনই না তাঁদের বক্তব্যের। আর যাচাই করলেই বা কী হত? কারণ 'অনুশীলন সমিতি হতে আসা কমরেডরা আবদুর রাজ্জাক খানকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে মিটিং করছেন, এই খবর নীরেন সেন নামক ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজেন্টস পার্টি'র একজন সভ্য আমাকে…দিলেন। তিনি এখনও বেঁচে আছেন। তাঁকে এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "এতদিনের পুরানো কথা আমার কিছু মনে নেই।" তাঁর মনে না থাকতে পারে কিন্তু আমার ও আরও কোন কোন লোকের মনে আছে' (ঐ, পৃ. ৫৪৫)—

এমন আশ্চর্য রকম সাক্ষী মানা যাঁর পক্ষে সম্ভব তাঁর হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার যো কোথায় ?

নিজের স্মৃতিশক্তি ছাড়া মুজফ্‌ফর সাহেব প্রধানত আরো দুটি ভিত্তির উপরে নির্ভর করেছেন অবনীনাথের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ প্রমাণের জন্য। একটি হল মানবেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় উল্লিখিত অবনীনাথ-সংশ্লিষ্ট বক্তব্য। আর অন্যটি সিঙ্গাপুরে আটক থাকার সময়ে জেনারেল স্টাফের সঙ্গে যুক্ত স্পেশাল সার্ভিসেস অফিসার—এইচ. আর. কোঠাওয়ালার কাছে অবনী মুখোপাধ্যায়ের দুটি বিবৃতি (১৫ অক্টোবর, ১৯১৫তে প্রথম ও ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯১৬-তে দ্বিতীয় বিবৃতি)। ঐ ভিত্তি দুটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা সাধারণভাবে বলে রাখা দরকার গোড়াতেই।

প্রথম কথা, ঘটনার বিবরণ দানের ক্ষেত্রে মানবেন্দ্রনাথের সাক্ষ্য ঠিক কতটা নির্ভরযোগ্য বিশেষ করে সন, তারিখ, নামের ব্যাপারে আর আরো বিশেষ করে তিনি যাঁর প্রতি বিরূপ তাঁর সম্পর্কিত ব্যাপারে ? এ প্রশ্নের উত্তর আমার এ লেখার বিভিন্ন স্থানে বেশ কিছুটা ছড়ানো রয়েছে। আর স্বয়ং মুজফ্‌ফর সাহেবই বা কী মত পোষণ করেন এ-প্রসঙ্গে ? 'প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে' তিনি এ বিষয়ে বিভিন্ন জায়গায় যা লিখেছেন তা এই রকম :

'তাঁর (অর্থাৎ মানবেন্দ্রনাথের—গ্রন্থকার) লেখায় অনেক কথাই আছে কিন্তু সন তারিখের কোনো বালাই নেই। তাঁর লেখা পড়লে মনে হয় সন তারিখ ছাড়াই ঘটনা ঘটে।...আসলে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কথা বলে গেছেন শুধু নিজেকে তুলে ধরার জন্যে' (পৃ. ৫৬) : 'এম. এন. রায় সময় সম্বন্ধে অদ্ভুত রকমের তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন' (ঐ, পৃ. ৫৮), 'সময় সম্বন্ধে এম. এন. রায় উদাসীন। তা ছাড়া তিনি কোনো কোনো স্থলে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন' (ঐ, পৃ. ৬২।)

অবনীনাথের ব্যাপারেও যে মানবেন্দ্রনাথ ঘটনার পূর্বাপর গুলিয়ে ফেলেছেন তারও একটি দৃষ্টান্ত মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেবই দিয়েছেন তাঁর 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'তে। তিনি লিখেছেন (পৃ. ২৬৯-৭০) :

"মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মানুষের চেহারা মনে রাখার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ছিল। যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছেন তাঁরা এই কথা বলে

থাকেন। কিন্তু আমরা যারা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি, অথচ মেলামেশা করি নি, আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে ঘটনা ঘটার সময় তিনি মনে রাখতে পারতেন না। এই বিষয়ে পাটিগণিতের ওপরে তাঁর খুব অবজ্ঞা ছিল। তাঁর স্মৃতিকথার ৪৭৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন : "আমি শুনে স্তম্ভিত হলাম যে তৃতীয় বিশ্ব কংগ্রেসের (কমিন্টানের্র তৃতীয় কংগ্রেস—গ্রন্থকার) আগেই মুখার্জি মস্কো হতে চলে গেছেন, এবং তিনি ইচ্ছাপূর্বক সরে থাকতে রাজী হয়েছেন। মস্কো ফিরে আসা মাত্রই আমি এর কারণটা জেনেছিলাম।" এর পরে রায় বলতে চেয়েছেন যে জার্মানী হতে ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীরা এসে পড়াতেই অবনী মুখার্জি সরে পড়েছিলেন। রায় তাসখন্দ হতে মস্কো ফেরার আগে ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীরা মস্কো পেঁচৌছেছিলেন, এ কথা সত্য, কিন্তু অবনী মস্কো ফিরেছিলেন রায়ের পরে। ন্যাশনালিস্ট বিপ্লবীদের সঙ্গে অবনীর মস্কোতে দেখা হয়েছে'···

সুতরাং ঘটনার বিবরণ দেওয়ার সময়ে মানবেন্দ্রনাথ যে সব সময়ে যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য নন—দেখা যাচ্ছে মুজফ্ফর আহমদ সাহেবও এ বিষয়ে একমত। এ হেন ব্যক্তি যখন ঘটনার তিন দশক পরে স্মৃতিচারণ করেন তখন ব্যাপারটা কী দাঁড়ানোর সম্ভাবনা?

তা ছাড়া মানবেন্দ্রনাথ-চরিত্র সম্পর্কেও মুজফ্ফর সাহেব সাধারণভাবে অনেক কথা লিখেছেন এই বইতেই, যেমন :

"···ভারতের কাজের জন্য কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের নিকট হতে পাওয়া বহু টাকা এম, এন, রায় আত্মসাৎ করেছিলেন' (পৃ. ৬২০-২১); 'মেয়েদের সম্পর্কে এম, এন, রায়ের ব্যবহারটা আমি কখনও বুঝতে পারি নি' (পৃ. ৬১৯); 'কি ক্ষতিই না ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এম, এন, রায় করে গেছেন' (পৃ. ৬১৬) ইত্যাদি।"

এমন যাঁর চরিত্র হঠাৎ তাঁর সাক্ষ্যকে বেদবাক্য হিসেবে গ্রহণ করার কী যুক্তি থাকতে পারে বিশেষ করে সে সাক্ষ্য যখন পাওয়া যাচ্ছে ঘটনার তিন দশক পরে এবং আরো বিশেষ করে সে সাক্ষ্য যখন এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে যিনি একদা ছিলেন মানবেন্দ্রনাথের সমর্থক ও পরে যোগ দিয়েছিলেন তাঁর বিরুদ্ধপক্ষে? এর তাগিদ কি এসেছে এই যুক্তি থেকে যে শত্রুর বিরুদ্ধে যে-কোনো হাতিয়ারই গ্রহণযোগ্য যদি তাতে কার্যোদ্ধার হয়—অন্তত সাময়িক ভাবেও?

মুজফ্‌ফর সাহেবের অবনী-বিরোধী জেহাদের ব্রহ্মাস্ত্র কিন্তু মানবেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা নয়, কোঠাওয়ালার কাছে অবনীনাথের দুটি বিবৃতি। এ তো তাঁর নিজের বিবৃতি সুতরাং এর সব তথ্য নিশ্চয়ই সত্য, এই যুক্তিটি এখনই আমরা বিচার করে দেখব। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলা দরকার। ধরা পড়লে পুলিসের কাছে আদৌ কোনো বিবৃতি দেওয়া অনুচিত—দেশ-বিদেশের বহু বিপ্লবী এই চিন্তা থেকে বহু নির্যাতন এমন-কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করেছেন। তাঁরা অবশ্যই আমাদের নমস্য। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে বিবৃতিদান সব সময়েই দুর্বলতা বা বিশ্বাসঘাতকতা প্রসূত হয় নি। বহু বিপ্লবী তাঁদের বৈপ্লবিক চরিত্র ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেও কৌশলে এমন বিবৃতি দিতে পেরেছেন যা কোনো সত্যকার দরকারী গোপন খবর প্রকাশ না করেও তাঁদের পুলিসের চোখে নিরীহ, অন্তত কম বিপজ্জনক প্রতিপন্ন করতে পেরেছে। প্রথম পন্থার চাইতে এই পন্থার ঝুঁকি কম নয় কিন্তু সে ঝুঁকি অনেক বিপ্লবী বহন করতে পেরেছেন সার্থকভাবেই।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ নিশ্চয়ই আদৌ কোনো বিবৃতিদান অনুচিত—এই মতের পোষক নন কারণ তিনি নিজের কথাই লিখেছেন এই ভাবে (পৃ. ৪১৩):

"গিরফেতার হয়ে হাজতে থাকার সময়ে আমায় প্রায় প্রতিদিনই লালবাজার হতে ইলিশিয়াম রোতে নিয়ে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছিল। পুলিস কতটা কী জানে তা বুঝবার জন্যে আমি ক'দিন কিছুই বললাম না। তারপরে একদিন চিঠিপত্রের বাণ্ডিল খুলে আমায় দেখানো হল। তাতে দেখলাম আমাদের দু'পক্ষের পত্রের অনেক ফটো কপি। তখন ভাবলাম আমাকে কৌশল বদলাতে হবে। বললাম এম. এন. রায়কে আমি চিঠিপত্র লিখি, কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালকেও মানি" ইত্যাদি।

বিবৃতিতে তিনি আরো কী বলেছিলেন আর তার ফলই বা কী দাঁড়িয়েছিল সে কথায় পরে আসব। এখানে যেটা প্রাসঙ্গিক তা হল এই যে নীতিগতভাবে বিবৃতিদানের তিনি যে বিরোধী নন তাঁর আচরণই তার প্রমাণ।

অবনীনাথের বিবৃতি দু'টি পড়ে আমার মনে হয়েছে বহু তথ্য ও ঠিকানা লেখা 'মারাত্মক নোটবুক'-সমেত ধরা পড়ে চূড়ান্ত বেকায়দা অবস্থা থেকে বেরোনোর চেষ্টাই তার মধ্যে প্রকট। একদিকে নোটবুকে লেখা নাম ও ঠিকানার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের এমন একটা ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার যা কোঠাওয়ালার কাছে একেবারে অবিশ্বাস্য ঠেকবে না। আবার তা করতে গিয়ে

নিজেকেও খুব বেশি জড়িয়ে ফেলা চলবে না বিপ্লবী তৎপরতার জালে, চেষ্টা করতে হবে নিজেকে যতদূর সম্ভব নিরীহ প্রতিপন্ন করার।

এই অনুমান যদি ঠিক হয় তা হলে অবনীনাথের বিবৃতির সব কথাই কখনো সত্য হতে পারে না— অবান্তর খুঁটিনাটি ব্যাপারে সত্য ভাষণের পাশাপাশি সেখানে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে আসল ব্যাপারে সত্যগোপন, এমন-কি, মিথ্যা-ভাষণও। কারণ রাজনৈতিক কর্মীর পক্ষে পুলিশের কাছে 'সত্য বই মিথ্যা বলিব না' নীতি অনুসরণের বাধ্যবাধকতা কোথায়?

বরঞ্চ ঐ একই কৌশল অবলম্বন করতে গিয়ে মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব তাঁর উপরি-উক্ত বিবৃতিতে যে ধরনের সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন তাই আমাদের অবাক করে। কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁরই সঙ্গে অভিযুক্ত আসামী, নলিনী গুপ্ত সম্পর্কে মুজফ্ফর সাহেব ঐ বিবৃতিতে বলেছিলেন:

"...নলিনী গুপ্ত একবার আমার সঙ্গে একান্তে কথা বলে—তাতে সে জানায় যে যুদ্ধ (অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ —গ্রন্থকার) শেষ হওয়ার পর সে জার্মানি ও সেখান থেকে রাশিয়া যায়। তারপর সে জার্মানিতে ফিরে আসে এবং সেখান থেকেই সে এসেছে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক'র প্রতিনিধি হিসাবে একটি বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে। সে দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আমায় সে বলল যে 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে'র লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেকটি দেশে গণ-সরকার প্রতিষ্ঠা আর সেই গণসরকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তারা যে কোনো দেশকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে প্রস্তুত।—প্রস্তাবিত সাহায্যের রূপ কি রকম হবে, এটা জানতে চাইলে আমাকে বলা হল 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক' সে ব্যাপারে পরামর্শ ও আর্থিক সাহায্য দেবে এবং তার জন্য 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক টাকা পাচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য দেশ থেকে।...ভারতবর্ষে কি রকম কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে— এ সম্বন্ধে তার কাছ থেকে আমি জানতে পারলাম যে তার ধারণা পুরানো বিপ্লবী পন্থাতেই কাজ চালাতে হবে এবং লক্ষ্য-সিদ্ধির জন্য অবলম্বন করতে হবে সন্ত্রাসবাদ"—*Home Political File* No. 21. 1. 1924

মুজফ্ফর সাহেবের ঐ বিবৃতি প্রসঙ্গে শ্রীদ্বিজেন্দ্র নন্দী তাঁর *Document Relating to Early Indian Communists and Controversies around them* বইয়ের ৬৪-৬৯ পৃষ্ঠায় গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি ইনস্পেক্টর

জেনারেল জে. ই. আর্মস্ট্রং সাহেবের লেখা নলিনী গুপ্তের যে History sheet প্রকাশ করেছেন তার ৭নং ধারায় আছে এই কথা :

"নলিনী গুপ্ত যখন কলকাতায় ছিলেন তখন তাঁর বলশেভিজম-সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম সম্পর্কে সামান্য খবরই পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু তিনি চলে যাওয়ার পর এই বিভাগের জনৈক অত্যন্ত বিশ্বস্ত প্রতিনিধি মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সংগে যোগাযোগ করেন এবং তখন জানা যায় যে নলিনী গুপ্ত মুজফ্‌ফরকে রাজী করাতে পেরেছেন বাংলা দেশে রায়ের প্রতিনিধি হতে" ইত্যাদি (পৃ. ৬৮)।

আর মুজফ্‌ফর সাহেবের ঐ বিবৃতি যে সেদিন এখানকার জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের সংগে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের যোগাযোগ স্থাপনের যে প্রাথমিক চেষ্টা চলছিল তা সাময়িক ভাবে নষ্ট করে দেয়, তা জানা যায় আবদুর রাজ্জাক খান সাহেবের (২৯ মে, ১৯৭০) এই বিবৃতি থেকে :

"তাঁর বিবৃতিতে মুজফ্‌ফর নিজেকে নির্দোষ বলেছেন আর পুরোপুরি দোষ চাপিয়েছেন নলিনী গুপ্তের ঘাড়ে। সুভাষ বসুও তখন জেলে ছিলেন।—তাঁকে এই বিবৃতি দেখানো হয়। তিনি জেল থেকে বেরিয়েই প্রচণ্ড অভিযান শুরু করেন সাধারণভাবে কমিউনিস্টদের ও বিশেষ করে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের বিরুদ্ধে— মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তারা যে আদৌ-নির্ভরযোগ্য নয় এইভাবে তাদের চিত্রিত করে। আমি ও আরো কয়েকজন, যাদের দেশপ্রেমিক-বিশ্বস্ততা প্রশ্নাতীত ছিল, আমরা প্রাণপণে এর বিরুদ্ধে লড়াই চালালাম কিন্তু ঐ অভিযোগ আমাদের গায়ে আটকে রইল ও বেশ কয়েক বছর বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা বিচ্ছিন্ন হয়ে রইলেন অন্যান্য বিপ্লবীদের থেকে। বেশ সময় লেগেছিল তার ক্ষতিপূরণে" —গৌতম চট্টোপাধ্যায়, *Communism and Bengal's Freedom Movement*, পৃ. ১৫৬ ।

যাই হোক, নিজের স্মৃতিশক্তি, মানবেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা ও অবনীনাথের বিবৃতি— মোটের উপর এই তিনি ভিত্তির উপরে মুজফ্‌ফর সাহেব অবনীনাথের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি খাড়া করতে চেয়েছেন তার যাথার্থ্য এবার যাচাই করে দেখা যেতে পারে।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব লিখেছেন :

"অবনী মুখার্জি অল্প বয়সেই বখে গিয়েছিল। হাই স্কুলে ভর্তি হয়ে সে তখনকার দিনের ফোর্থ ক্লাসের বেশি পড়তে পারে নি। এই কথা অবনী মুখার্জি নিজেই তাঁর স্বীকারোক্তিতে স্বীকার করেছেন। কোনো একটি শিক্ষিত পরিবারে এই শতাব্দীর প্রথম দশকেও এই রকমটা ঘটতে খুব কমই দেখা গেছে"—'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি", পৃ. ২৪২-৪৩

প্রতিপক্ষের চরিত্রহননের উৎসাহে আর বিদ্বেষ ও আক্রোশের তোড়ে এখানে পর পর বাক্যগুলিতে ক্রিয়াবিভক্তি ও সর্বনামের কিঞ্চিৎ গণ্ডগোল ঘটেছে। কিন্তু আসল কথা…এ বক্তব্যটি কি ঠিক? ঠিক এই অবধি যে অবনীনাথ সত্যই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর বেশি পড়েন নি আর সে-কথা তিনি বলেছিলেন তাঁর উল্লিখিত বিবৃতিতে। কিন্তু বখে যাওয়ার'কথাটা? মুজফ্ফর সাহেব এমন অবলীলাক্রমে লিখেছেন যে মনে হয় ব্যাপারটা বুঝি এত সর্বজন-বিদিত যে তার জন্য প্রমাণ দাখিলও অনাবশ্যক অথবা অবনীনাথই বুঝি সে-কথা কবুল করেছেন তাঁর সেই বিবৃতিতে। বিবৃতির সংশ্লিষ্ট জায়গাটি কিন্তু এই—

"আমি চতুর্থ শ্রেণী অবধি পড়েছি। খুবই তাড়াতাড়ি, ১৯০৪ বা ১৯০৫ সালে আমি লেখাপড়া ছাড়ি। প্রায় বছরখানেক আর্ট স্কুলে ও তারপর ১৯০৬ সালে যোগ দিই বেঙ্গল টেকনিকাল ইন্স্টিটিউটে। ১৯০৭ সালে ইন্স্টিটিউট ছেড়ে আহমেদাবাদ যাই হাতে-কলমে ট্রেনিং-এর জন্যে" ইত্যাদি।

সুতরাং 'বখে যাওয়া'র কথাটা একেবারেই মুজফ্ফর সাহেবের মনগড়া। তাঁর যুক্তিটা বোধ হয় এই যে, বখে না গেলে শিক্ষিত পরিবারের ছেলে এত তাড়াতাড়ি লেখাপড়া ছাড়বে কেন? এ প্রশ্নের জবাব মেলে তখনকার দিনের বহু বিপ্লবীর জীবনের দিকে তাকালে। অবনীনাথের সমসাময়িক— তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষ অথচ যাঁর সঙ্গে তাঁর জীবনের বহু ঘটনার আশ্চর্য মিল— সেই মানবেন্দ্রনাথেরও লেখাপড়ার দৌড় তো এন্‌ট্র্যান্স অবধি পৌঁছয় নি। তিনিও কি তবে বখে গিয়েছিলেন? না, যেহেতু পরীক্ষা পাস করেন নি তাই ধরে নিতে হবে যে তাঁরও বিদ্যাবুদ্ধি কিছু কম ছিল?

আসলে বখে যাওয়ার চাইতে সুস্থতর কোনো বিকল্প কারণের কথা

মুজফ্‌ফর সাহেব কল্পনা করতে পারেন নি সেদিনকার কিশোরের অল্প বয়সে লেখাপড়া ছাড়ার।

পরীক্ষা পাস ছাড়াও মুজফ্‌ফর সাহেব এ-ক্ষেত্রে আর একটি মাপকাঠি ব্যবহার করেছেন বিদ্যাবুদ্ধি যাচাইয়ের। সেটি হল ইংরেজী ভাষাজ্ঞান। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে মহেন্দ্রপ্রতাপের 'সেক্রেটারির কাজ চালানোর মতো ইংরেজী ভাষাজ্ঞানও কি অবনী মুখাজী'র ছিল?' (ঐ পৃ. ২৪৭)। ছিল না যে তার প্রমাণ হিসেবে তিনি কয়েকটি নমুনাও দাখিল করেছেন— অবনী মুখার্জি নাকি 'Vested interests' না লিখে, লিখেছেন 'vested interested' (ঐ, পৃ.২৪৭); 'Succumbed'-এর জায়গায় লিখেছেন 'Scumbed' আর 'Clique এর বানান লেখেছেন 'Clik' (ঐ, পৃ. ২৭৩)! ইংরেজী ভাষাজ্ঞান নিয়ে বোধ করি আমাদের কিছু না বলাই ভালো। তবু নমুনাগুলি দেখার পর মহাফেজ-খানার বা সরকারী দপ্তরের নথিপত্রের কপিতে যে অসংখ্য মারাত্মক ধরনের টাইপের ভুল দেখা যায় ওগুলি যে তারই নমুনা নয়—এ বিষয়ে আমি কিন্তু নিশ্চিত নই মুজফ্‌ফর সাহেবের মতো। কারণ সংশ্লিষ্ট লেখাগুলি নিশ্চয়ই মুজফ্‌ফর সাহেব অবনীনাথের হাতের লেখায় পড়েন নি। তা ছাড়া স্কুল-কলেজে পড়া, পরীক্ষা পাস করা ও ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করা নিশ্চয়ই বিদ্যা-র্জনের চূড়ান্ত পরিচায়ক নয়। আসলে এ-ক্ষেত্রে যা প্রাসঙ্গিক তা হচ্ছে অবনীনাথ স্কুলে ফোর্থ ক্লাসের বেশি না পড়ে এবং ধরা যাক ইংরেজী ভাষায় তেমন দড় না হয়েও কি উত্তরজীবনে কিছুটা পড়াশুনো করেছিলেন, না বখামিই করেছিলেন সারা জীবন?

একটা কথা বলে রাখি এখানে। মুজফ্‌ফর সাহেব অবনীনাথের ইংরেজী ভাষাজ্ঞানের ঘাটতির দরুন তাঁর মহেন্দ্রপ্রতাপের সেক্রেটারি হওয়ার যোগ্যতা বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করলেও মহেন্দ্রপ্রতাপ কিন্তু মুজফ্‌ফর সাহেবের ঐ পরামর্শ সময়মতো না পাওয়ায় অবনীনাথকেই সেক্রেটারি নিযুক্ত করেছিলেন, অবনীনাথ সে কাজ করেও ছিলেন মাস ছয়েক ও তারপর সে কাজ ছেড়েছিলেন নিজে থেকেই। একথা মহেন্দ্রপ্রতাপই লিখেছেন তাঁর "*My Life Story of Fifty-five Years*-বইয়ে (পৃ. ৭১), অবনীনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী, শ্রীমতী অমিতা রায়কে লেখা তাঁর ৩১.৫.১৯৬৯ তারিখের আর স্বয়ং মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেবকে লেখা তাঁর ২৩.৯.১৯৬৭ তারিখের চিঠিতে।

শ্রীমতী রায়কে লেখা উল্লিখিত চিঠি থেকে এ-খবরও জানা যায় যে মহেন্দ্র-প্রতাপের সংগে ঐ সময়ে অবনীনাথের পরিচয় ঘটিয়েছিলেন অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার।

অধ্যাপক সরকার ছাড়া ঐ সময়ে অবনীনাথকে যাঁরা চিনতেন তাঁদের মধ্যে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সৌভাগ্যক্রমে এখনো আমাদের মধ্যে রয়েছেন। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম জন্মবার্ষিক উপলক্ষে ১৯৬৪ সালের ১ জানুয়ারি যে সংকলন-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় তাতে সুনীতিকুমার প্রসংগ-ক্রমে এক জায়গায় ১৯২২ সালে অবনীনাথের গোপনে ভারত-প্রত্যাবর্তন ও তাঁর সংগে সাক্ষাতের কথা বলেছেন (দ্র. পরিশিষ্ট ১১)। সেখানে তিনি লিখেছেন :

"বৃটিশ আমলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সৈনিক ও সুপরিচিত বিপ্লবী কর্মী পরলোকগত অবনী মুখোপাধ্যায় ছিলেন আমার বন্ধু। বহু বছর আমরা প্রতিবেশী ছিলাম কলকাতা শহরে" ইত্যাদি (পৃ.২৩)।

একটু পরেই দেখা যাবে সে রসায়ন শাস্ত্রের বিখ্যাত অধ্যাপক লাডুলি-মোহন মিত্র, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হরিশচন্দ্র সিংহ প্রভৃতির সংগে অবনীনাথের ঘনিষ্ঠতা ছিল ঐ সময়ে। আর অবনীনাথের জীবনীকার, অধ্যাপক রাখালচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'বিপ্লবী অবনী মুখার্জি' বইয়ে লিখেছেন :

"এই সময় প্রতিবেশী হিসাবে অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখার্জি ও বিনয়কুমার সরকারের সহিত অবনীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে" (পৃ. ১৭)।

মনে হচ্ছে খুব একটা বখা বা অশিক্ষিত মহলে তখন ঘোরাফেরা করতেন না অবনীনাথ।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মাঝামাঝি পর্বের কথা আলোচনা করার সুযোগ পাওয়া যাবে একটু পরেই। এখানে ১৯২৪ সালে তাঁর সোভিয়েত দেশে ফিরে যাওয়ার পরের ঘটনা কিছু বলতে চাই। সোভিয়েত সাংবাদিক ইলিয়া সুচ্‌কভ ঐ সময়কার কথাপ্রসংগে লিখেছেন :

"ভি. আই. লেনিনের প্রচণ্ড প্রভাবে অনুপ্রাণিত অবনী মুখার্জি বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষণবিদ্যা-সংশ্লিষ্ট কাজকর্মে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন ও পরে স্নাতক হয়ে বেরোন মস্কোর "ইনস্টিটিউট অফ রেড প্রফেসার্স" থেকে' (*Soviet Land*, সংখ্যা ১৭, সেপ্টেম্বর ১৯৬৯)।

১৯৬৯ সালে ১ ডিসেম্বর আমি যখন লেনিনগ্রাডে অবনীনাথের স্ত্রী, রোজা ফিটিংহফের (১৯১৮ সাল থেকে ইনি বলশেভিক পার্টি'র সদস্যা। ১৯১৯-২০ সালে তিনি লেনিনের সেক্রেটারি, লিডিয়া ফটিয়েভার দুই সহকারীর মধ্যে একজন আর ১৯২০ সালে তাসখন্দে যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় তার প্রতিষ্ঠাত্রী সদস্যা ছিলেন) সংগে দেখা করি তখন তিনি জানান যে অবনীনাথ 'ইন্‌স্টিটিউট অফ রেড প্রফেসার্স" থেকে স্নাতক হয়ে বেরোন ১৯২৮ সালে এবং তার পরেও তিনি যুক্ত ছিলেন ঐ প্রতিষ্ঠানের সংগে। ঐ বছরেই তিনি চেষ্টা করেন বিলেত গিয়ে বৃটিশ মিউজিয়ামে গবেষণা চালানোর কিন্তু বৃটিশ সরকারের অনুমতি না পাওয়ায় সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয় শেষ পর্যন্ত।

১৯৬৯ সালে ঐ ১ ডিসেম্বর তারিখেই আমি লেনিনগ্রাডের প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানে অবনীনাথ-সম্পর্কিত একটি ফাইল দেখতে পাই। তার থেকে যে খবর পাই তা এই রকম :

অবনীনাথ লেনিনগ্রাড ওরিয়েন্টাল ইনস্টিস্টিউটে ১৯৩০ সালে কোনো-এক সময় থেকে ১৯৩২ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কাজ করেন 'Senior Learned Specialist' হিসেবে। একটি দলিলে তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্য-নির্বাহক কমিটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'প্রাচ্যতাত্ত্বিক-দের সারা ইউনিয়ন সমিতি'র সভাপতি হিসেবে। ১৯৩১ সালে ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও জগদ্‌বিখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ওল্ডেনবার্গ-স্বাক্ষরিত এক সার্কুলারে বলা হয় "মস্কোর কমিউনিস্ট অ্যাকাডেমি"তে নিয়মিত কাজের জন্য কমরেড মুখার্জি'কে রাহা খরচ দেওয়া যায় না এই কারণে যে ইনস্টিটিউটের একজন অগ্রণী কর্মী হিসেবে তাঁকে সেখানকার কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া অসম্ভব'। ২৪. ৪. ১৯৩২ তারিখে দেখা যায় যে অবনীনাথ 'সমসাময়িক সাহিত্যে ভারতবর্ষ" বিষয়ে ১৫ ফর্মার একটি গ্রন্থ রচনার অনুমতির জন্য ইনস্টিটিউট-পরিচালকের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন। সেখানে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে 'ভারত বিভাগের সহকারী প্রধান' হিসেবে। ১৯৩২ সালে ডিসেম্বর মাসে ওল্ডেনবার্গ ও ইন্‌স্টিটিউটের বিজ্ঞান-বিষয়ক সেক্রেটারি, শিটভ্‌-স্বাক্ষরিত এক রিপোর্টে লেখা হয় :

"সুপণ্ডিত মুখোপাধ্যায় অর্থনীতি ও ভারতের গণ-আন্দোলন বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি কয়েকটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা জানেন।

সমসাময়িক ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান আশ্চর্য রকমের। ভারত-বিষয়ক বেশ কয়েকটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার তিনি লেখক। এর মধ্যে অনেকগুলিই ঐ দেশে অনুসৃত বৃটিশ নীতি সম্পর্কিত।"

রোজা ফিটিংহফ জানালেন যে অবনীনাথ ১৯৩৩ সালে কাজাখস্তান অথবা কিরঘিজিয়া গিয়েছিলেন এক বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীদলের সদস্য হিসেবে।

অবনীনাথের লেখা বই ও রচনাগুলি এই :

১ Agrarian India, ২ Malabar Uprising, ৩ Economic situation in India and the British Policy আর *India in Transition* বইখানিতে গ্রন্থকারে নামের জায়গায় লেখা আছে 'অবনী মুখার্জি'র সহ-যোগিতায় মানবেন্দ্রনাথ রায়'। এ ছাড়া অনুশীলন দলের প্রাক্তন নেতা ও বর্তমানে মার্কসবাদী দলের বিশিষ্ট সদস্য, সতীশ পাকড়াশী মহাশয় এক সাক্ষাৎকারে অবনীনাথ প্রসঙ্গে বলেছেন :

"তিনি লিখতেনও বেশ ভালো। ১৯২৩ সালে তিনি 'গরীবের কথা' নামে বাংলায় একটি বই লেখায় ব্যস্ত ছিলেন। তার বেশ খানিকটা তিনি আমায় পড়ে শোনান। কৃষকদের সম্পর্কে তিনি যা লিখেছিলেন তা আমার মনে বেশ রেখাপাত করে"—গৌতম চট্টোপাধ্যায়, *Communism and Bengal's Freedom Movement*, পৃ. ১৪৬।

ঐ বইটির কোনো সন্ধান পাই নি এখনো পর্যন্ত।

অবনীনাথের "Economic situation in India and the British policy" ১৯২৮ সালে কোনো একটি রুশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ধারাবাহিক ভাবে। তারই একটি দফা আমি দেখেছিলাম রোজা ফিটিংহফের কাছে। আর "Malabar Uprising" রচনাটি সম্পর্কেই অবনীনাথ এই চিঠি লিখেছিলেন লেনিনের কাছে :

"প্রিয় কমরেড,

ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক মোপলা অভ্যুত্থান সম্পর্কে আমি যে প্রবন্ধ লিখেছি তারই একটি কপি আপনাকে পাঠাচ্ছি। আমার একান্ত ইচ্ছা যে আপনি অনুগ্রহ করে এই প্রবন্ধটি পড়েন। কিছুদিন আগে আপনাকে আমার যে আগের রচনাটি পাঠিয়েছি তাতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে আমি যে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছি এ রচনাটিতে পাওয়া যাবে তারই ব্যাখ্যা"।

ইলিয়া সুচকভের পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে অবনীনাথের চিঠির এই পর্যন্ত উদ্ধৃত করা হয়েছে।

আর অবনীনাথের ঐ রচনা ও চিঠি প্রসঙ্গেই লেনিন বুখারিনকে লেখেন এই চিঠি :

"কমরেড বুখারিন,

অনুগ্রহ করে এটি পড়ুন। আমাদের প্রয়োজন (এই বিশেষ রচনাটির কথা বাদ দিয়েও এ কথা বলছি। যদিও এ লেখাটিও বোধ হচ্ছে ভালোই) ভারতীয় কমরেডদের কাছ থেকে আরো লেখা পাওয়া—তাঁদের উৎসাহিত করার এবং ভারতবর্ষ ও তার বিপ্লবী আন্দোলন বিষয়ে আরো খবর যোগাড় করার জন্য।

১৪ নভেম্বর, ১৯২১।"

এ চিঠিখানি পাওয়া যাবে মস্কো থেকে প্রকাশিত লেনিনের *Collected Works*-এর ৪৬ খণ্ডের ৩৭৬ পৃষ্ঠায়।

এরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৪১৮ নং নোটটিতে (*Collected Works*, খণ্ড ৪৫, পৃ. ৬৮৯) এ প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে :

"ভারতীয় কমিউনিস্ট, অবনী মুখার্জি যিনি ভারতবর্ষে মালাবার অভ্যুত্থান সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধ লেনিনের কাছে পাঠান—তাঁর চিঠির জবাবে এই চিঠি লেখা।"

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব লিখেছেন : "অবনী মুখার্জির কাজকর্ম হতে আমরা বুঝতে পারি যে তাঁর লোক পটাবার বিশেষ ক্ষমতা ছিল" ('আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পৃ. ২৬৬)। কথাটা ষোলো আনা সত্য, কারণ দেখা যাচ্ছে তাঁর সেই ক্ষমতার দৌড় পৌঁচেছিল রুটগেৰ্স, ওল্ডেনবার্গ থেকে স্বয়ং লেনিন অবধি। একমাত্র মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেবের কাছেই, মনে হচ্ছে, ব্যর্থ হয়েছিল তাঁর সব ছলা কলা—সম্ভবত মুজফ্‌ফর সাহেব তাঁকে কখনো চোখে দেখেন নি বলেই!

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব অবনী মুখার্জি ও নলিনী গুপ্ত সম্পর্কে লিখেছেন :

"…বিপ্লবী হিসাবে তাঁদের দুজনই ভুঁইফোড়। আগে তাঁরা যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টিতে ছিলেন এমন কোনো প্রমাণই পাওয়া যাচ্ছে না।

নলিনী গুপ্তের তবু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টি'র বহু সভ্যের সংগে পরিচয় ছিল, এমন-কি, ১৯১৪ সালে রাজাবাজার বোমার মামলার আসামী অমৃত-লাল হাজরার বিরুদ্ধে পুলিসের নিকটে তিনি একটি বিবৃতিও দিয়ে-ছিলেন। কিন্তু অবনী মুখার্জি'র জমার খাতায় এমন কোনো কিছুও লেখা নেই। তাঁর ওই স্থানে শূন্য আছে বলা চলে"—'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি", পৃ. ২৪২।

নলিনী প্রসংগে দু-চারটি কথার জন্য পরিশিষ্ট ১২ দ্রষ্টব্য। কিন্তু অবনীনাথ যে সত্যই অপদার্থ এর পরেও কি আর তার প্রমাণের প্রয়োজন আছে? নইলে —জমার খাতায় শূন্যস্থান পূর্ণ করার জন্য কি তিনি কোনো বিপ্লবীর বিরুদ্ধে অন্তত একটা বিবৃতিও দিতে পারতেন না?

অবনীনাথের সংগে সত্যই কি কোনো জাতীয় বিপ্লববাদী দলের কোনো সম্পর্ক ছিল না? মুজফ্ফর সাহেবের মতে '…সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী দলের লোকেদের সংগে অবনী মুখার্জি'র কোন পরিচয় ছিল না' (ঐ, পৃ. ২৯৬)। কিন্তু সত্যই কি তাই? এ প্রসংগে কয়েকজন প্রতিনিধি-স্থানীয় বিপ্লবীর অভিমত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে :

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে' লিখেছেন :

"…রাসবিহারী বসুর জাপান যাত্রার উদ্দেশ্য যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট অজ্ঞাত ছিল না এবং রাসবিহারীর খবর না পাওয়াতে তিনি অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়কে জাপানে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে বলেন" (পৃ. ২০-২১)।

এর সংগে সংশ্লিষ্ট নোটে তিনি লিখেছেন যে :

"শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দলের কেহ তাঁহাকে চিনিতেন না এবং এই বিষয়ে কিছু জানেন-ও না" (ঐ, পৃ. ১৭৩-৭৪)।

তাঁরা অবনীনাথকে না চিনুন বা ঐ বিষয়ে কিছু না জানুন, মোদ্দা কথাটা হল এই যে স্বয়ং 'বাঘা যতীনে'র নির্দেশেই সেদিন অবনীনাথ জাপানে গিয়ে-ছিলেন 'মোটা বাবুর' সংগে দেখা করতে। ঐ সময়ে বাংলাদেশে তো বটেই সারা ভারতবর্ষে ও-দুজনের চাইতে ডাকসাইটে বিপ্লবী আর কি ছিলেন কেউ?

চন্দননগরের মতিলাল রায় মহাশয় বাংলাদেশের বিপ্লবী মহলে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। 'অনুশীলন' 'যুগান্তর' -নির্বিশেষে সব বিপ্লবীদেরই এক

সময়ে আশ্রয় ছিল চন্দননগর আর সেখানকারই সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা ছিলেন মতিলাল রায়। তাঁর 'আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী' বইটিতে (পৃ. ১৩৭) তিনি লিখেছেন :

'মার্চ মাসের (১৯১৫ সালে —গ্রন্থকার) প্রথমেই জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বোম্বাই আসিয়া পেঁছান। তাঁহার মুখে বাঙলার বিপ্লবীরা জানিতে পারে যে পূর্বনীতির পরিবর্তন হওয়ায় জার্মানি হইতে অস্ত্র সরবরাহ করা হয় নাই। বিপ্লবীদের কোন বিশিষ্ট প্রতিনিধিকে শীঘ্রই বাটাভিয়ায় প্রেরণ করিতে হইবে। আমরা এই সংবাদ পাইয়া অবনীমোহন মুখার্জিকে বাটাভিয়ায় প্রেরণ করি"।

'অবনীমোহন' নয়, 'অবনীনাথ'— অবনীনাথ বাটাভিয়ায় যান নি, গিয়েছিলেন জাপানে। তবু মতিলাল রায়ের লেখা থেকে এটা স্পষ্ট যে বিপ্লবীরা অবনীনাথকে ঠিক 'ভুঁইফোড়' নয়, 'বিশিষ্ট বিপ্লবীই' মনে করেছিলেন যাঁকে বিদেশে পাঠানো হয় জার্মানি থেকে খবর পাওয়ার সূত্রে।

'যুগান্তর' দলের বিশিষ্ট নেতা শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' গ্রন্থে (পৃ. ৪৬৯) লিখেছেন :

"—অবনী 'অনুশীলনের' লোক আগে ছিল না। তাঁর বাড়ি কলকাতায়। এখনকার কৈলাস বসু স্ট্রীটে। আমরা যখন 'অনুশীলন'-এর (অর্থাৎ কলকাতা 'অনুশীলনের' —গ্রন্থকার) সভ্য, সে সময় আমাদের আরও অনেক সভ্য, থাকতেন ঐ পাড়ায়। সেজন্য কলকাতা অনুশীলনের প্রভাব পড়ে তার উপর"।

প্রসংগত বলে রাখি মুজফ্‌ফর সাহেবের আব-এক ভুঁইফোড় বিপ্লবী নলিনী গুপ্ত সম্পর্কেও এখানেই যাদুগোপাল লিখেছেন : "ইতিমধ্যে 'কুমার' (নলিনী গুপ্তের ছদ্মনাম —গ্রন্থকার) আবার এল। সে ঢাকা অনুশীলনের লোক পূর্বে ছিল" (ঐ, পৃ. ৪৬৯)।

অবনীনাথ সম্পর্কে যাদুগোপাল আরো লিখেছেন :

"...১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে নরেন ভট্টাচার্য (মার্টিন) বাটাভিয়ায় যান। তারই অব্যবহিত পরে যতীন্দ্রনাথের ইংগিতে অবনী মুখার্জি জাপান যায়। অবনীর বাড়ী ছিল সুকিয়া স্ট্রীট, কলিকাতায়। আমাদের সভ্য লাডলিমোহন মিত্রের সংগে সে যুক্ত ছিল। এই জন্য ১৯২২ সালে সে

যখন গোপনে কলকাতায় আসে, লাডলির শরণাপন্ন হয় লাডলি ও অপর একজন সভ্য (প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসর পরে হন) প্রফেসর হরিশ্চন্দ্র সিংহ অবনীকে ভূপতি মজুমদারের কাছে নিয়ে যান" (ঐ, পৃ.৬৫২-৫৩)।

এ-প্রসঙ্গে অবনীনাথের জীবনীকার অধ্যাপক রাখালচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন এইভাবে :

"পশ্চিম বাংলার বিপ্লবী দলের পরিচালক স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তখনো পুলিশের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নাই তাঁহার হাতে তখন বিপুল দায়িত্ব ন্যস্ত। এমন সময় অবনীর সহিত অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল। অবনী তখন তাঁহার "হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ের" চাকুরিটি সবে মাত্র খোয়াইয়াছেন। রাসবিহারী চলিয়া যাইবার কিছুদিনের মধ্যেই, জার্মানীর সাহায্যদানের সঠিক খবর জানিবার জন্য যতীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এ সম্বন্ধে রাসবিহারীর মতামত ও পরামর্শ জানিবার জন্য অবনীকে তিনি জাপানে পাঠাইতে চাহিলেন। কথা রহিল, অবনী প্রথমে জাপান যাইবেন, তৎপরে আমেরিকা এবং অবশেষে সম্ভব হইলে ভারতবর্ষের বিপ্লবী দলের অভিজ্ঞতা নিয়া তিনি জার্মানীতে বার্লিন কমিটির সহিতও যোগদান করিবেন" ('বিপ্লবী অবনী মুখার্জি', পৃ. ৩২)।

অথচ মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব লিখেছেন :

"অবনী মুখার্জি তাঁর সিঙ্গাপুরের স্বীকারোক্তিতে না বললেও, এমন-কি, জাপানে রাসবিহারী বসুকে যতীন মুখার্জীর সঙ্গে তাঁর কোনো পরিচয় ছিল না এ কথা বলা সত্ত্বেও, আমাদের দেশে তাঁর চেষ্টায় একটি কথা রটিত হয়েছিল যে অস্ত্র সংগ্রহ করার জন্যে বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯১৫ সনে তাঁকে জাপান পাঠিয়েছিলেন"—'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পৃ. ২৪৭।

আবার লিখেছেন :

"...আত্মপ্রচারে অবনী মুখার্জির জুড়ি মেলা ভার। যতীন মুখার্জি তাঁকে অস্ত্র সংগ্রহে জাপান পাঠিয়েছিলেন, এ কথার এত জোর প্রচার অবনী মুখার্জি নিজে করেছিলেন ও করিয়েছিলেন যে রাওলাট কমিটির রিপোর্টে পর্যন্ত তা উল্লিখিত হয়েছে" (ঐ, পৃ. ২৪৮-৪৯)।

ওপরে যে মতগুলি দেওয়া হল তাতে মনে হচ্ছে অবনীনাথ সত্যই আশ্চর্য করিৎকর্মা ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর পটাবার ক্ষমতা যেমন ওল্ডেনবার্গ-সুনীতিকুমার থেকে খোদ লেনিন পর্যন্ত পেঁৗছেছিল তেমনি রটাবার ক্ষমতার দৌড় ভূপেন্দ্রনাথ, যাদুগোপাল রাখালচন্দ্র থেকে পেঁৗছেছিল রাওলাট সাহেব অবধি। এই শেষের কৃতিত্বটা বিশেষ করেই অদ্ভুত, কারণ ১৯১৭ সালের শরৎকালে সিংগাপুর থেকে পালিয়ে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা না জাভা কোনো দ্বীপে আত্মগোপন করে থাকতে থাকতেই (যার হদিস আজো আমরা প্রায় কিছুই পাই নি) তিনি এমন জোর আত্মপ্রচার চালিয়েছিলেন যে ১৯১৮ সালে ১৫ এপ্রিল রাওলাট সাহেব ভারত সচিবের কাছে উপস্থাপিত তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছিলেন সে কথা!

যাই হোক, যাদুগোপাল অবনীনাথের উপর 'কলকাতা অনুশীলনের প্রভাব পড়ে' বলে ক্ষান্ত হলেও বিশিষ্ট অনুশীলন নেতা যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর *In Search of Freedom* বইয়ে বেশ স্পষ্ট করেই লিখেছেন "প্রায় ঐ সময়েই পুরানো অনুশীলনপন্থী বিপ্লবী ('Old Anushilanite revolutionary) অবনী মুখার্জিও এলেন মস্কো থেকে" ইত্যাদি (পৃ. ২৪৩)।

আর সর্বশেষে অবনীনাথের জীবনীকার ও অনুশীলন দলের সদস্য, অধ্যাপক রাখালচন্দ্র ঘোষও বেশ স্পষ্ট করেই লিখেছেন :

> "অবনী এই সময় (অর্থাৎ ১৯০৮ সালে —গ্রন্থকার) ঘটনাক্রমে কলিকাতায় আসেন ও "বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে" ভর্তি হন। এইখানেই তিনি বাংলার সবচেয়ে বৃহৎ ও প্রভাবশালী সংগঠন" অনুশীলন সমিতির সভ্য তালিকাভুক্ত হন"— 'বিপ্লবী অবনী মুখার্জি', পৃ. ৪।

মনে রাখা দরকার কুদঘাটের অনুশীলন সমিতি ভবনের দেওয়ালে আজো সসম্মানে টাঙানো আছে অবনীনাথের ছবি—ঠিক যেমন আছে মহাজাতি সদনেও অন্যান্য জাতীয় বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদের ছবির পাশাপাশি। আর এ-ও লক্ষ্য করতে করতে হবে যে উপরে যাঁদের মত প্রকাশ করা হল তাঁরা প্রত্যেকেই—কে জাতীয় বিপ্লবী দলের লোক আর কে নয়—তা বলার নিশ্চয়ই অনেক বেশি অধিকারী মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেবের চাইতে।

অবনীনাথকে নিয়ে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেবের হয়েছে এক বিষম জ্বালা।

নলিনী গুপ্ত সম্পর্কে যেমন তিনি নির্দ্বিধায় লিখে ফেলতে পেরেছেন : "১৯২৭ সালে সে যখন ইওরোপে ফিরে গিয়েছিল আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে তখন বৃটিশ চর রূপেই গিয়েছিল" ('আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পৃ. ৪৯৮)—অবনীনাথ সম্পর্কে তেমন কথা তিনি বলি বলি করেও ঠিক খোলসা করে বলতে পারলেন না শেষ অবধি। আর তাই তাঁর উপরে মুজফ্‌ফর সাহেবের আক্রোশটাও যেন আরো বেশি। বথা, অশিক্ষিত, ইংরেজী ভাষা-জ্ঞানহীন, আত্মপ্রচারের ওস্তাদ, মিথ্যার সম্রাট—অনবরত এ'ধরনের প্রিয়-সম্ভাষণে তিনি তাই বরণ করেছেন অবনীনাথকে। তারপর বলেছেন, রাজনীতি ক্ষেত্রে নাকি অবনীনাথ ছিলেন এক 'ভুঁইফোঁড় বিপ্লবী' যিনি কোনো জাতীয় বিপ্লবী দলের সভ্য তো ছিলেনই না, এমন-কি চিনতেনও না তেমন কোনো বিপ্লবীকে। কথাটা যে ভুল তা আগেই দেখানো হয়েছে।

কিন্তু কথাটা যদি ঠিকও হত তা হলেও তো আগে কোনো জাতীয় বিপ্লবী দলভুক্ত ছিলেন না এমন লোকের নিশ্চয়ই পরে কমিউনিস্ট বিপ্লবী হয়ে ওঠাতে বাধা নেই, ঠিক মুজফ্‌ফর সাহেবের মতোই। অবনীনাথ কি তাই হয়েছিলেন? মুজফ্‌ফর সাহেব দেখাতে চেয়েছেন যে ১৯২০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের' দ্বিতীয় ও তৃতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও অবনীনাথ আসলে কোনোদিনই কমিউনিস্ট হতে পারেন নি। প্রমাণ হিসেবে তিনি পরের পর কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যাতে নাকি অবনীনাথের এমন সব দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে যা রীতিমতো সন্দেহজনক। নলিনী গুপ্তের মতো অবনীনাথকে সরাসরি পুলিসের লোক না বললেও তিনি কাজ হাসিল করতে চেয়েছেন একটু ঘুরিয়ে একই কথা বলে। তাঁর উপস্থাপিত ঘটনাগুলিকে তাই একটু যাচাই করে দেখবার চেষ্টা করব এখানে।

মুজফ্‌ফর সাহেব লিখেছেন :

"…অবনী মুখার্জির সিঙ্গাপুর হতে পলায়ন মনকে চোখঠারা মাত্র। সিঙ্গাপুরের মিলিটারি কর্তৃপক্ষ তাতে কোন বাধা দেন নি" (ঐ, পৃ. ২৬৯)।

এর প্রমাণ হিসেবে তিনি দাখিল করেছেন ভারত সরকারের তদানীন্তন

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাবিভাগের পরিচালক স্যার সেসিল কে'র ২০.৮.১৯২৪ তারিখের 'নোটের' এই বক্তব্যটি :

"...অবনী মুখার্জি সিংগাপুরে তাঁর বিবৃতি দেওয়ার পর তাঁকে 'প্যারোলে' মুক্ত করা হয়— যার থেকে এই কথা মনে হয় যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তিনি 'পালালেন' কি না তাই নিয়ে মাথা ঘামায় নি" (ঐ, পৃ. ২৫৫)।

স্যার সেসিলের পুরো নোটটি পড়লে কিন্তু বোঝা যায় যে মুজফ্‌ফর সাহেব ঐ লাইনের ইংগিত যেভাবে ধরেছেন তা ঠিক নয়, বরঞ্চ মনে হয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটার গুরুত্ব না বুঝে কার্যত অবনীকে সরে পড়ার সুযোগ করে দেওয়ায় মোটেই খুশি হন নি স্যার সেসিল। কারণ ঐ নোটে তিনি বলেছেন যে, অবনীনাথের মেলামেশা বরকতুল্লাহ্‌, ভূপেন্দ্রনাথ ও চট্টোপাধ্যায়ের মতো কুখ্যাত বিপ্লবীদের সংগে। এঁরা মানবেন্দ্রনাথের চাইতেও উগ্রপন্থী। স্যার সেসিল অনুমান করেছেন যে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' বাহ্যত অবনীনাথকে বহিষ্কৃত করলেও ভিতরে ভিতরে তাঁকেই পাঠিয়েছিল রায়-বিরোধী দলের লোক হিসেবে। স্যার সেসিল তাঁর এ 'নোট' শেষ করেছেন এই বলে যে :

"...প্রকাশ্যে তিনি যে বক্তব্যই বলুন না কেন, অবনী মুখার্জি নিশ্চিত-ভাবেই হিংসায় বিশ্বাসী, তাঁর যোগও রয়েছে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সংগে আর তাঁকে যদি ভারতবর্ষে আসতে দেওয়া হয় তা হলে তিনি আসবেন বিপ্লবী ও বলশেভিক চিন্তার প্রচারক হিসাবেই। শুধু বাংলা সরকারের স্বার্থেও আমার মনে হয় তাঁর অনুরোধ নিশ্চয়ই অগ্রাহ্য করা উচিত (অবনীনাথ ঐ সময়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডের কাছে যে-দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন দেশে ফেরার অনুমতি চেয়ে— এখানে তার কথাই বলা হয়েছে —গ্রন্থকার)।

১৩৭৬ বংগাব্দের শারদ সংখ্যা 'দেশহিতৈষী' পত্রিকায় মুজফ্‌ফর সাহেব "অবনী মুখার্জি'র কথা" নামে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাতে তিনি অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি লেখায় স্যার সেসিলের ঐ 'নোট' থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করার সময়ে মুজফ্‌ফর সাহেব-উদ্ধৃত ঐ লাইনটি বাদ দেওয়ার জন্য অনুযোগ করেছেন। কিন্তু মুজফ্‌ফর সাহেব তো অবনী সিংগাপুর থেকে পালান নি, তাঁর এই সিদ্ধান্ত প্রমাণের জন্য ঐ একটি লাইনই উদ্ধৃত করেছেন, নোটের বাকি সমস্ত অংশটাই বাদ দিয়ে— যা তাঁর

সিদ্ধান্তকে সমর্থন তো করেই না বরং নাকচ করে দেয়— আর প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে একটি মাত্র লাইন উদ্ধৃত করেছেন তারও কদর্থ করে।

মুজফ্ফর সাহেব অভিযোগ করেছেন যে অবনীনাথ নাকি কোঠাওয়ালার কাছে তাঁর বিপ্লবী সহকর্মীদের সম্পর্কে 'পেটের সব কথা উগরে দিয়েছিলেন' (ঐ, পৃ. ২৫৩) আর তারই জন্য নাকি ঐ সময়ে তিনি দেশে ফিরতে পারেন নি কারণ তা হলে নাকি "সিংগাপুরের বিবৃতির প্রতিশোধে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের উদ্যত খড়্গ তাঁর মাথায় পড়তে পারত" (ঐ, পৃ. ২৫৫), তাই "অবনীর…ভারতে ফেরার সাহস ছিল না" (ঐ, পৃ. ২৫৬) 'সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা তাঁর উপরে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন এই ভয় তাঁর মনে ছিল" (ঐ, পৃ. ২৬৯) ইত্যাদি।

এ কথা ঠিক যে কোঠাওয়ালার কাছে অবনীনাথের বিবৃতির ব্যাপারে এ দেশের জাতীয় বিপ্লবীমহলে এক সময়ে কিছুটা কানাঘুষো চলেছিল। শ্রীনলিনীকিশোর গুহ তাঁর 'বাংলায় বিপ্লববাদ' বইয়ে এ প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি অভিমত প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে শ্রীভূপতি মজুমদারের মতটি বিশেষ করেই উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে অবনীনাথ যখন সিংগাপুরে আটক ছিলেন তখন ভূপতিবাবুও সেখানে ছিলেন বন্দী হিসেবে। তিনি অবনীনাথের প্রতি যে মোটেই প্রসন্ন নন সে কথাও নলিনীকিশোর তাঁর ঐ বইয়ে উল্লেখ করেছেন (পৃ. ২২১ ও ২২৩)। সেই ভূপতিবাবুর প্রাসঙ্গিক মত 'বাংলায় বিপ্লববাদে' উদ্ধৃত হয়েছে এইভাবে :

> "অবনীর সপক্ষে বলিবার এই যে অবনী কনফেশন করিয়া থাকিলেও কোথাও কোন মামলায় সাক্ষ্য দেন নাই (যেমন অপর কনফেশররা দিয়াছে ও লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছে); ইহা ছাড়া অবনী জেল হইতে ছাড়াও পায় নাই, সে সত্যসত্যই কেল্লা হইতে পলাইয়া যায়' (পৃ. ২২৩)।

মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন :

> "ভূপতি মজুমদার আমায় একদিন বলেছিলেন যে ফোর্ট ক্যানিং-এ অবনী মুখার্জি শ্রীমজুমদারকে পাম্প করে তাঁর পেটের কথা বার করে নিতে চেয়ে অকৃতকার্য হয়েছিলেন" ('আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'', পৃ. ২৫৪-৫৫)।

বলাবাহুল্য এ-ও মুজফ্ফর সাহেবের 'স্মৃতি'র ব্যাপার। অথচ ঠিক এই

প্রসঙ্গে যাদুগোপাল অবনী সম্পর্কে ভূপতিবাবুর বিবৃতির যে অংশটি উদ্ধৃত করেছেন তা এই রকম :

"...১৯১৬ সালের গোড়ায় আমার মোকদ্দমার তদন্তের সময় পুলিস-সাহায্যে আমাকে pump করার জন্য আহূত হয়। আমাকে সে সব কথা ক্রমে বলে ও আমি 'কিছুই জানি না—কাউকে চিনি না' attitude ('military মেরামত' সত্ত্বেও) রাখতে পারি বলে আমাকে পুলিসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সব কথা বলে। তারপর সম্ভবত ১৯১৮ সালে parole-এ city বেড়াতে গিয়ে জাপানি বন্ধুদের সাহায্যে উধাও হয়" ('বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি', পৃ. ৪৬৬)।

অর্থাৎ ভূপতিবাবুকে pump করার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহূত হলেও অবনীনাথ 'পুলিসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সব কথা বলেন' ভূপতিবাবুকে— এই হল মুজফ্ফর সাহেব বর্ণিত pump করতে চেয়ে অকৃতকার্যতার আসল চেহারা।

সিংগাপুর থেকে অবনীনাথের পলায়ন সম্পর্কে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের যে অভিমত 'বাংলায় বিপ্লববাদে' প্রকাশিত হয়েছে তার শেষ কথাগুলি এই :

"...তিনি (অর্থাৎ ভূপেন্দ্রনাথ—গ্রন্থকার) স্বীকার করেন যে পুলিস অবনীকে 'ধর ধর' করিয়া সিংগাপুরে ধরার চেষ্টা করিয়াছিল, এ সংবাদ লোকমুখে তিনি শুনিয়াছেন। তবে সকলের কথাই অনুমান এবং বিরুদ্ধ প্রমাণ না থাকায় অবনী যে মিথ্যা বলিয়াছে, ইহা মনে করার কোন হেতু দেখি না" (পৃ. ২২৬)।

'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে'ও ভূপেন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"...সিংগাপুরের এসিস্ট্যান্ট সার্জন ডাঃ ঘোষ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে শীতকালে কলিকাতায় লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন।...তিনি বলেন 'অবনী গভর্ণমেণ্টের ওয়ার ফাণ্ড তুলিবার জন্য নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন, হঠাৎ একদিন অদৃশ্য হন। পুলিশ তাঁহাকে ধরিবার জন্য তল্লাসী করিতে থাকে। এতদ্দ্বারা আমরা এই তথ্য উপলব্ধি করি, তিনি পুলিসের পাল্লায় পড়িয়া তাহাদের মন যুগাইয়া চলিতেন, পরে সুবিধা পাইয়া পলাইয়া যান" (পৃ. ১৭৪)।

অধ্যাপক বিনয় সরকারের যে অভিমত এ প্রসঙ্গে 'বাংলায় বিপ্লববাদে' উদ্ধৃত হয়েছে তা এই :

"আমরা সাংহাইয়ে অবনীর কেল্লা হইতে পলায়নের কথা শুনি, সংবাদপত্রেও ঐ সংবাদ বাহির হয়, এই পলায়নকে আমরা কিন্তু বাংলার বাহাদুর ছেলের কর্ম বলিয়াই বাহবা দেই। ইহার বিপরীত কোন কথা শুনি নাই" (পৃ. ২২৮)।

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ তাঁর 'বাংলার বিপ্লববাদে'র চতুর্থ সংস্করণের 'পরিশিষ্টে' অবনীনাথ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য সংযোজন করে প্রশ্নাকারে তাঁর সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন এইভাবে: 'অবনী বৃটিশের অনুগ্রহভাজন— এই বিরুদ্ধ-প্রচারের অতঃপর আর অবকাশ আছে কি?' (পৃ. ৩৫৩)

এ-ও লক্ষ্য করা দরকার যে যে-সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের 'উদ্যত খড়্গের' ভয়ে অবনীনাথ নাকি দেশে ফিরতে ভরসা পাচ্ছিলেন না, ১৯২০ সালে গোপনে দেশে ফিরে তিনি আশ্রয় নিলেন ঠিক তাঁদের কাছেই—'অনুশীলন' 'যুগান্তর'-নির্বিশেষে। এমন-কি, মুজফ্‌ফর সাহেবও লিখে ফেলেছেন "উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতুল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তো অবনীকে নিয়ে দড়ি টানাটানি শুরু হয়ে গেল" ('আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি", পৃ. ২৯৯)।

শ্রীনলিনীকিশোর গুহ ঐ প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের মতও প্রকাশ করেছেন তাঁর 'বাংলায় বিপ্লববাদে'। সংশ্লিষ্ট কথাগুলি এই:

'...অবনীর প্রতি মানবেন্দ্র যথেষ্ট প্রসন্ন ছিলেন না।...কিন্তু তিনিও "স্মৃতিকথা"য় অবনী কনফেশন করিয়া বহু লোককে ফাঁসাইয়াছে এইরূপ কথা লিপিবদ্ধ করেন নাই। বরং প্রমাণের অভাবে এই ধরনের কোন কথা সত্য বলিয়া প্রচার করেন নাই। দেরাদুনে প্রতুল গাঙ্গুলীকে নরেন্দ্রনাথ (অর্থাৎ মানবেন্দ্রনাথ —গ্রন্থকার) ইহাও বলিয়াছেন যে, অবনীর বিরুদ্ধে ইউরোপে কাহারো কাহারো নিকট যে অভিযোগ শুনিয়াছিলেন অনুসন্ধানে তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই" (পৃ. ২২৬)।

মানবেন্দ্রনাথ তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় অবনীনাথ সম্পর্কে আগাগোড়া বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তবু সিঙ্গাপুরে অবনীনাথের বিবৃতি ও তার ফলাফল সম্পর্কে তাঁকেও শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তে পেঁছতে হয়েছে, তা সঠিক-ভাবেই উপস্থিত করেছেন শ্রীনলিনীকিশোর গুহ। কিন্তু তাজ্জব ব্যাপার, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেবও তাঁর বইয়ের গোটা একটি পরিচ্ছেদে (পৃ. ২৪২-

৩১৫) তাঁর প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করে অবশেষে পরিচ্ছেদ শেষ করেছেন এই আশ্চর্য কথাগুলি বলে :

"আমার মনে হয় অবনীর স্বীকারোক্তির ফলে ভারতে কারুর ফাঁসি তো দূরের কথা, কেউ কোথাও ধরাও পড়েন নি" ('আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি", পৃ. ৩১৫)।

এত কাণ্ডের পর তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াল কী ?

প্রসংগত বলে রাখি অবনীনাথের বিরুদ্ধে সোভিয়েত দেশে প্রথম যখন অভি-যোগ শোনা যায় তখন তার নিরসনের ব্যাপারে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে যা লিখেছেন তার যাথার্থ্য সম্পর্কে কিছুটা সংশয়ের অবকাশ আছে। যেমন তাঁর 'স্মৃতিকথা'র দু-পৃষ্ঠা (পৃ. ২৯৯-৩০০) জুড়ে তিনি এক নাটকীয় বিবরণ দিয়েছেন কিভাবে 'কমিণ্টার্নের' দ্বিতীয় কংগ্রেস চলার সময়ে লেনিনকে ও পরে মানবেন্দ্রনাথকে সভাস্থল থেকে পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে সোভিয়েত পুলিস কর্তা, পিটারের উপস্থিতিতে লেনিন মানবেন্দ্র-নাথকে প্রশ্ন করেন অবনীনাথের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে এবং তার জবাবে মানবেন্দ্রনাথ সে-বিষয় লেনিনকে আশ্বস্ত করায় কিভাবে অবনীনাথ সে-যাত্রা বেঁচে যান 'চেকা'র হাত থেকে। যতদূর মনে হয় ১৯২০ সালে 'চেকা' কাউকে সন্দেহ করলে ব্যাপারটি সম্পর্কে পুরোদস্তুর অনুসন্ধান ছাড়া শুধু কারো কথায় সন্দেহভাজন ব্যক্তি অব্যাহতি পেতেন না। মানবেন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন :

"তখনকার দিনে রাশিয়াতে গুপ্তচর-বৃত্তির সন্দেহের চাইতে ভীষণ ব্যাপার আর কিছুই ছিল না। এমন-কি, স্বয়ং লেনিনও ঐ অভিযোগে যাকে গ্রেপ্তার করা হত তাকে তার মারাত্মক ফলাফল থেকে বাঁচাতে পারতেন না। ফরাসী বিপ্লবের সময়কার জননিরাপত্তা কমিটির মতোই সর্বশক্তিমান ছিল 'চেকা'" (*Memoirs*, পৃ. ২৮৮)।

আর ঠিক তার পরেই দেখা যাচ্ছে যে লেনিনও যা পারতেন না তিনি ঠিক তাইই করেছেন— বার্লিন কমিটির সভাপতি ডাঃ মনসুরকে মুক্ত করছেন 'চেকার' কবল থেকে ! তাই মনে হয় অবনীনাথ সম্পর্কে নিশ্চয়ই তখন অনুসন্ধান হয়েছিল এবং তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল ঐ অভিযোগ থেকে। ১৯২৪ সালেও, সম্ভবত মানবেন্দ্রনাথের অভিযোগে অবনীনাথের যে আরো একবার

বিচার হয়েছিল সোভিয়েত দেশে অবনীনাথ নিজেই সে কথা ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে জানিয়েছিলেন মস্কো থেকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে। চিঠিতে ছিল :

"এই স্থানে আমার বিচার হইয়াছিল। রায় আমার বিপক্ষে নালিশ আনিয়াছিল যে, আমি গুপ্তচর (Spy)। তাহা হইতে আমি মুক্ত (exonerated) হইয়াছি"—'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', পৃ ৩৩১।

অবনীনাথ সম্পর্কে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী মহলেও গোড়ার দিকে কিছুটা সন্দেহ ছিল। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় লিখেছেন :

"১৯২১ সালে তাঁদের কেউ কেউ (বীরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রমুখ) যখন মস্কোয় আসেন তখন তাঁরা নাকি অবনীনাথের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার ও গুপ্তচর-বৃত্তির অভিযোগ এনেছিলেন এই বলে যে সিঙ্গাপুরে পুলিসের কবল থেকে বাঁচার জন্য তিনি ভারতবর্ষের বহু বিপ্লবীর নাম বলে দিয়েছিলেন··· তাঁর খবরের ভিত্তিতেই তাঁদের গ্রেপ্তার করা ও ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল" (*Memoirs*, পৃ ৩০০)।

আশ্চর্যের ব্যাপার ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত কিন্তু তাঁর 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে' (পৃ ২৮৪) লিখেছেন :

"এই সময়ে অবনী মুখোপাধ্যায়ের উৎপাতে বার্লিনাগত দল অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সে তাহাদের বদনাম করিয়া বেড়াইত এবং আরও নানা রকমের উৎপাত করিত।··· শেষে উত্ত্যক্ত হইয়া চট্টোপাধ্যায়, লোহানী প্রভৃতি 'ভে, চে, কা'র কর্মকর্তা মগিলোস্কিকে এক দরখাস্ত পাঠাইতে চায় যে অবনী যে-সকল কাজ করিতেছে তাহাতে মনে হয় যেন সে একজন গোয়েন্দা (acting as if an agent-provocateur)। সেইজন্য তাহাকে মস্কো হইতে সরাইয়া দেওয়া হউক। লেখক (অর্থাৎ ভূপেন্দ্রনাথ —গ্রন্থকার) চট্টোপাধ্যায়দের বাক্‌জালে বাধ্য হইয়া সেই দরখাস্তে সহি করেন। ব্যাপারটা পরে বুঝিলাম, মুখোপাধ্যায় (অর্থাৎ অবনীনাথ —গ্রন্থকার) বিদেশীয় ডেলিগেটদের কাছে বলিয়া বেড়াইতেন 'বার্লিনাগত বৈপ্লবিকেরা জার্মান এজেন্ট।— তাহারা কমিউনিস্ট নহে' ইত্যাদি"।

বিশ্বাসঘাতকতা বা পুলিসকে এমন খবর জোগানো যার ভিত্তিতে বিপ্লবীদের ফাঁসি হল— এ-সবের কোনো কথাই নেই এখানে। অথচ মুজফ্‌ফর সাহেব 'বার্লিন কমিটি'র বিপ্লবীদের অন্যতম প্রধান প্রতিনিধির কথায় কান

না দিয়ে ঐ বিপ্লবীদের অভিযোগ সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথের কথাই বেদবাক্য ধরে নিয়েছেন। প্রমাণের জন্য একটি তথ্যও উপস্থিত না করে তিনি নির্বিবাদে লিখেছেন :

"ডক্টর দত্ত যে ভাষায় দরখাস্ত পাঠানোর কথা বলেছেন তার চেয়ে অনেক বেশী উগ্র ছিল তাঁদের ভাষা (কি করে জানলেন ? তিনি কি দেখেছেন সেই দরখাস্ত ? —গ্রন্থকার)। এম. এন. রায় অবনীকে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন যে কড়া নজরের ভিতরে অবনীকে মস্কোতে রেখে দেওয়া হোক। কিন্তু এই সংক্রান্ত কাগজপত্র অবনী মুখার্জির নামে কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের মুহাফেজখানায় নথিভুক্ত হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে আরকাইবসে অবনী মুখার্জির ফাইল হতে এই কাগজগুলি এবং আরও অনেক এই ধরনের কাগজপত্র নিশ্চয়ই ঘুমন্ত অবস্থা থেকে মাথা তুলে থাকবে। ১৯৩৭ সালেই সোভিয়েত ইউনিয়নে অবনী মুখার্জির মৃত্যুদণ্ড হয়" ('আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি',' পৃ. ২৬৯)।

মুজফ্ফর সাহেবের ভাষা এখানে 'পাতালে এক ঋতু'র লেখকের বা পাতালের চির-বাসিন্দা ডাঃ সত্যনারায়ণ সিংহের রোমাঞ্চকর কাহিনীর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু ঘটনা যে ঠিক ঐ ভাবেই ঘটেছিল তার কোনো প্রমাণ দাখিলের তিনি প্রয়োজনবোধ করেন নি। আর বিশ্বাসঘাতকতার নয়, বার্লিন-বিপ্লবীদের 'জার্মান এজেণ্ট' বলে বদনাম দেওয়ার (যে কাজে কিন্তু মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব চির-উৎসাহী —গ্রন্থকার) যে অভিযোগ অবনীনাথের বিরুদ্ধে ঐ বিপ্লবীরা সেদিন এনেছিলেন তারও ধার নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কারণ ঠিক তার পরের বছরই অবনীনাথকে দেখা যায় ভূপেন্দ্রনাথ ও বরকতুল্লাহ্‌র অভিজ্ঞানপত্র নিয়েই গোপনে ভারতবর্ষে ফিরে আসতে।

ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের এক চিঠিতে (No. E. 11/54/13911/67 Eur (E)) পাওয়া যায় যে অবনীনাথের মৃত্যু হয় ১৯৩৭ সালের ২৮ অক্টোবর। যতদূর জানা যায় যে শেষ দিকে তিনি লেখাপড়ার কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। তবে ১৯২৮ সালে লেখা তাঁর "Economic situation in India and the British Policy" নামক যে রচনাটি আমি রোজা ফিটিং-হফের কাছে দেখি তার উপরে তাঁর হাতে লেখা একটি 'উৎসর্গে' তিনি রচনাটি দিয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে 'সেই সব দিনের কথা স্মরণ করে যেদিন তাঁরা একত্রে

প্রচণ্ড লড়াই চালিয়েছিলেন সুবিধাবাদী decolonisationist-দের বিরুদ্ধে'। এর থেকে বোঝা যায় যে রাজনৈতিক সংগ্রামে তখনো তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল।

ব্যক্তি-পূজার দুর্দিনগুলিতে সোভিয়েত দেশে যে-সব অনাচার ঘটে অবনীনাথের মৃত্যুদণ্ড তারই এক দৃষ্টান্ত। তার বিশদ বিবরণ আমরা এখনো জানি না। তবে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসের পর ঐ ধরনের বহুক্ষেত্রের মতো যে অভিযোগগুলির ভিত্তিতে অবনীনাথের মৃত্যুদণ্ড হয় তার পুনর্বিচারের ব্যবস্থা হয় আর তাতে ঐ অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ায় তাঁকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করা হয় পূর্ণ কমিউনিস্ট মর্যাদায়। তাঁর সম্পর্কে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের মনোভাবের প্রতিফলন দেখা যায় অবনীনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী, শ্রীমতী অমিতা রায়কে ১৯৬৯ সালে ৯ জানুয়ারি তারিখে লেখা 'নিউ টাইমস' পত্রিকার প্রধানা সম্পাদিকা শ্রীমতী সেগেইয়েভার চিঠির এই লাইনটি থেকে: "অসামান্য এক ভারতীয় কমিউনিস্ট হিসেবেই আপনার পিতৃব্যকে সোভিয়েত ইউনিয়নে মনে রাখা হয়েছে।"

প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী : মস্কোয়

অবনী প্রসঙ্গ ছেড়ে এবার ফেরা যেতে পারে ১৯২১ সালের গোড়ার যুগের মস্কোয়। কারণ সোভিয়েত দেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের তৎপরতার কেন্দ্র ঐ সময়ে তাসখন্দ থেকে স্থানান্তরিত হয় মস্কোতেই। তাসখন্দের ভারতীয় মিলিটারি স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। মানবেন্দ্রনাথের মতে ঐ স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে থেকে ২২ জনকে বাছাই করে তাসখন্দ থেকে মস্কো পাঠানো হয় রাজনৈতিক ট্রেনিং-এর জন্য আর ৩ জন যোগ দেন সেনাবাহিনীতে। এ ছাড়া যাঁরা ছিলেন তাঁরা হয় কোনো-একটা জীবিকা গ্রহণ করে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান তুর্কিস্তানে অথবা সোভিয়েত সহায়তায় ফিরে যান ভারতবর্ষে (দ্র. মানবেন্দ্রনাথ রায়, *Memoirs*, পৃ. ৪২৮)।

তাসখন্দের ভারতীয় মিলিটারি স্কুল ও তারপর সদ্য-প্রতিষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্মের সূত্রেই ১৯২০ সালে তাসখন্দে সমবেত হয়েছিলেন ভারতীয় বিপ্লবীগণ। ১৯২১ সালের গোড়ায় এঁদের অনেকেই চললেন মস্কোয়— মিলিটারি স্কুলের ছাত্ররা 'প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ে' যোগ দেবার উদ্দেশ্যে আর মানবেন্দ্রনাথ প্রমুখেরা 'কমিণ্টার্নের' তৃতীয় কংগ্রেসের প্রস্তুতির কাজে। এ'ও লক্ষ করা দরকার, যে-তুর্কিস্তান ব্যুরোর উপরে এতাবৎ প্রাচ্য দেশগুলিতে কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল সেটিকে তুলে দিয়ে ঐ দায়িত্ব সরাসরি 'কমিণ্টার্নে'র কার্যনির্বাহক সমিতির উপরে অর্পণ করার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয় ঐ সময় নাগাদ। ঐ তুর্ক-ব্যুরোর দপ্তর ছিল তাসখন্দে আর তার তিন জন সদস্যের অন্যতম ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ। তাই তুর্ক-ব্যুরো তুলে দেওয়ার ফলে মানবেন্দ্রনাথ এবার মস্কোয় এলেন তাসখন্দের পাট চুকিয়েই।

এঁরা ছাড়াও ঐ সময়ে একদিক থেকে মৌলানা বরকতুল্লাহ্, আবদুর রব পেশোয়ারীর মতো প্রবীণ বিপ্লবী আর জার্মানি থেকে 'বার্লিন কমিটি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বেশ-কিছু বিপ্লবীও মস্কোয় পৌঁছলেন নিজেদের মধ্যে এবং সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে।

মানবেন্দ্রনাথ মনে হয় ১৯২১ সালের জানুয়ারির শেষে অথবা ফেব্রুয়ারির

গোড়ায় পেঁীচেছিলেন মস্কোয়। কারণ দেখা যাচ্ছে যে ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি লেনিনের সংগে দেখা করে তাঁকে অবহিত করছেন মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি আর মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষের মেহনতী মানুষের অবস্থা সম্পর্কে (এম. ট্রাশ, *Soviet Foreign Policy : Early Years*, নোভোস্তি প্রেস, মস্কো, পৃ. ২৫৫)।

সম্ভবত ১৯২১ সালের ২৪ জানুয়ারি লেনিন তাঁর সেক্রেটারিকে 'কমিণ্টানের' সম্পাদকীয় দপ্তরের সংগে যোগাযোগ করে ভারতীয় বিপ্লবী খুশগুল খাঁ-র অনুরোধ মতো তাঁর সংগে ২৮ জানুয়ারি সাক্ষাতের দিন আপাতত স্থির করে রাখতে বলেন। খুশগুল খাঁ-র পরিচয়, তাঁর সংগে লেনিনের সাক্ষাৎ শেষ পর্যন্ত হয়েছিল কি না বা হয়ে থাকলে সেখানে কী কথা-বার্তা হয়েছিল— এ-সব খবর অবশ্য জানা নেই। শুধু উপরোক্ত ঘটনাটুকুর উল্লেখ মাত্র আছে ১৯৭১ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারি *Mainstream* পত্রিকায় প্রকাশিত জি. এল. বন্দারেভ্স্কির "India and Early Years of Soviet Foreign policy" প্রবন্ধে।

১৯২১ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি লেনিনের সংগে দেখা করেন আবদুর রব পেশোয়ারী। আগেই বলেছি যে ১৯১৯ সালে ৭ মে মহেন্দ্রপ্রতাপের নেতৃত্বে যে ভারতীয় প্রতিনিধিদল লেনিনের সংগে দেখা করে আবদুর রব ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। সুতরাং এটি হল সম্ভবত লেনিনের সংগে তাঁর দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। লেনিন এবার রবকে অনুরোধ করেন ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে তাঁকে সাহায্য করবে এমন একটি বইয়ের তালিকা তৈরি করে দিতে। আবদুর রব দু-দিনের মধ্যে ঐ তালিকা পেশ করেন লেনিনের কাছে। তালিকায় উল্লিখিত বইগুলি এইরকম :

List of Books about Indian Movement

Smiles of Congress by Surya Narayan Guntur

Amritsar and our Duty to India by B. G. Hornima.

Life and Speeches of Gandhi

Life and Speeches of B. G. Tilak

Life and Services of Mohamed Ali

Speeches of Sarojini Naidu

Indian National Congress by A. S. Ranjam

Indian Home Rule by Gandhi

India for the Indians by C. R. Das

Non-Cooperatien by Gandhi

Rights of Citizen by Satyamurti

Agony of the Punjab by Lajpat Rai

Political Future of India by Lajpat Rai

Young India ,, ,, ,,

England's Debt to India ,, ,,

Ethics of Passive Resistance

Indian Constitution by P. Mukherjee

Present Crisis in Hindu Socity

Indian Nation-Builders (3 vols.)

Economic Menace to India

Responsible Government by B. C. Pal

The World Situation ,, ,, ,,

Nationality and Empire ,, ,, ,,

Non-Cooperation ,, ,, ,,

Ideal of Human Unity by Arabinda Ghose

(Other Political Works of ,, ,,)

Presidential Addresses of the Indian National Congress.

Speeches of Surendra Nath Banerji

Evolution of Indian Nationalism by Ambika Charan Mazumdar

Life of Ranade by B. G. Tilak

Madras Speeches of B. C. Pal.

Trade-Unionism in India by B. P. Wadia.

History of the Indian National Congress.

Report of the Sedetion Committee (Rowlatt Report)

Hunter Report (on the Punjab Disturbances)

Report of the Congress Committee on the Punjab Atrocities of 1919.

Cult of Nationalism by Tagore

তালিকার শেষে আবদুর রব ছোট্ট একটি ইংরেজীতে লেখা নোটে জানান 'এর খুব কম বইই ইংলণ্ডে পাওয়া যাবে। তাই দরকার এগুলির জন্য "কর, মজুমদার অ্যাণ্ড কোং, পোস্ট বক্স ৬০, কর্নওয়ালিশ বিল্ডিং, কলিকাতা"—এই ঠিকানায় অর্ডার দেওয়া'। উল্লিখিত তালিকার ফোটোস্টাট কপিটি পাওয়া গেছে মস্কোর 'ইন্‌স্টিটিউট অফ মার্কসিজ্‌ম্‌-লেনিনিজ্‌মে'র অন্তর্ভুক্ত কেন্দ্রীয় পার্টি মহাফেজখানার সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, আর. ল্যাভরভ-এর সৌজন্যে।

লেনিন ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে তালিকা পেয়ে পরদিনই তালিকাটিতে তাঁর মন্তব্য লেখেন 'চমৎকার', আর লণ্ডনস্থ সোভিয়েত প্রতিনিধি, ক্রাসিনকে নির্দেশ পাঠান তাঁর জন্য অবিলম্বে বইগুলি সংগ্রহ করতে। এর কিছু বই (যেমন, *England's Debt to India*, *Evolution of Indian Nationalism*, রবীন্দ্রনাথের *Nationalism*, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রিপোর্ট, প্রস্তাব ও সভাপতির ভাষণ, সুরেন্দ্রনাথের ভাষণ, সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা ও রচনা, বিপিনচন্দ্রের *The New Economic Menace to India*, সরোজিনী নাইডুর বক্তৃতা ও রচনাবলী প্রভৃতি) দেখা যায় ক্রেমলিনের লেনিনের নিজস্ব গ্রন্থ-সংগ্রহের মধ্যে।

আর-একটি কথা। এই তালিকা থেকে কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় আবদুর রবের ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গিরও। স্বভাবতই এতে লাল-বাল-পাল ও অরবিন্দের মতো তখনকার কালের চরমপন্থী নেতাদের প্রাধান্য রয়েছে, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ, অম্বিকাচরণ, চিত্তরঞ্জন, সত্যমূর্তি— কেউই বাদ পড়েন নি তালিকা থেকে আর ১৯২১ সালের গোড়াতেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে গান্ধীর উপরে। ওদিকে রাওলাট ও হাণ্টার রিপোর্টের পাশাপাশি রয়েছে ওয়াদিয়ার ট্রেড ইউনিয়নের বই, আবার রবীন্দ্রনাথের *Nationalism*-ও। লক্ষ করতে হবে যে মানবেন্দ্রনাথের মতো লোক কাছাকাছি থাকলেও লেনিন

সেদিন বইয়ের তালিকার জন্য অনুরোধ করেছিলেন আবদুর রবকে আর তালিকা পেয়ে খুশিও যে হয়েছিলেন তাঁর সংশ্লিষ্ট মন্তব্যই তার প্রমাণ।

এ-ব্যাপারে কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়— 'কর, মজুমদার অ্যাণ্ড কোং' কোথায় ছিল, এবং সেখানে ঐ ধরনের বই পাওয়ার সম্ভাবনার খবর আবদুর রব পেলেনই বা কী করে ?

১৯২১ সালের ২১ এপ্রিল মস্কোয় 'শ্রমজীবী প্রাচ্যের কমিউনিস্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়' (Communist University of the Toilers of the East— রুশ ভাষায় এর সংক্ষিপ্ত নাম 'KUTV') প্রতিষ্ঠিত হয়। তাসখন্দের ভারতীয় মিলিটারি স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে যে ২২জনকে বাছাই করে এখানে পাঠানো হয় তাঁরা হলেন : হবীব আহ্‌মদ নসীম (শাহ্‌জাহানপুর), ফিরোজুদ্দীন মনসুর (লাহোর), মীর আবদুল মজীদ (লাহোর), ফজল ইলাহী কুরবান (লাহোর), আবদুল্লা সফদর (লাহোর), আবদুল কাদির সেহ্‌রাই (পেশোয়ার) ফিদা আলী (পেশোয়ার), মিঞা মহম্মদ আকবর শাহ্‌ (পেশোয়ার), সুলতান মাহমুদ রিহানা (হাজারা জিলা), গওহর রহমান খান (হাজারা জিলা), রফীক আহ্‌মদ (ভূপাল), আবুল মজীদ (কোহাট), গুলাম আহ্‌মদ খান (হাজারা), সঈদ আহ্‌মদ রাজ (দিল্লী), মসুদ আলী শাহ্‌ (উত্তর প্রদেশ), মাস্টার আবদুল হামীদ (লাহোর), আজিজ আহ্‌মদ (লাহোর), আদুল আজীজ (লাহোর), শওকৎ উসমানী (বিকানীর) এবং সম্ভবত কোয়েটার সেনাবাহিনী থেকে পলাতক নিজামুদ্দীন ও আবদুল রহিম।

মস্কোয় পেঁছিবার পর এঁদের মধ্যে কেউ কেউ যোগ দেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'তে। রফিক আহ্‌মদের মতে—

"প্রথমে শওকৎ উসমানী পার্টি'তে যোগ দিলেন। তারপর একসঙ্গে পার্টি'তে যোগ দিলেন গওহর রহমান খান, মিঞা মুহম্মদ আকবর শাহ্‌ ও সুলতান মাহ্‌মুদ। তারও পরে মীর আবদুল মজীদ, ফিরোজুদ্দীন মনসুর ও ফিদা আলী জাহিদ পার্টি'তে এলেন। তাঁদের অনুসরণ করলেন রফিক আহ্‌মদ ও হবীব আহ্‌মদ নসীম। তার কিছু পরে পার্টি'তে এলেন ফজল ইলাহী কুরবান ও আবদুল্লা সফদর।…কিছুদিন পরে আবদুল কাদির পার্টি'র মেম্বর হতে পেরেছিল"—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' গঠন', পৃ. ৩১।

প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে শওকৎ উসমানী লিখেছেন :

"ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষ, চীন, ইন্দোনেশিয়া, তুর্কিভাষী বিভিন্ন জাতি ও দূর প্রাচ্যের অনেক জায়গা থেকে ছাত্রেরা এসেছিলেন।... শিক্ষা দেওয়া হত ইংরেজী, ফারসী, তুর্কি ও চীনা ভাষায়। ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ ইংরেজী ভাষা ভালো রপ্ত না থাকায় যোগ দিয়েছিলেন ফারসী ভাষার ক্লাসগুলিতে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন মোহম্মদ হাতা ও মুসোর মতো মানুষ যাঁরা উত্তরকালে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ইন্দো-নেশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে।

"যাঁরা ক্লাসে বক্তৃতা দিতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বুখারিন, রাডেক ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের আরো অনেক নেতা" —"India and the Russian Revolution" ৬নং দফা, *Mainstream*, ৫ অগাস্ট ১৯৬৭, পৃ. ৩০।

ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার আগে শওকৎ উসমানী, আবদুল মজীদ, আবদুল কাদির সেহ্‌রাই যখন প্রথমবার তাসখন্দ থেকে মস্কো আসেন তখন তাঁদের

"অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ে পাঠ নিতে হয়েছিল। তাঁদের ক্লাস নিতেন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ফিনবার্গ, ইংরেজ কমিউনিস্ট টম কোয়েলশ, বোরোডিন ও আরো অনেকে"—"India and the Russian Revolution" ৪নং দফা, *Mainstream*, ২২ জুলাই ১৯৬৭, পৃ. ২০।

শওকৎ উসমানী লিখেছেন যে ঐ সময়ে তিনি তিনবার লেনিনকে দেখেন। প্রথমবার লেনিনকে দেখেন ১৯২১ সালে ৭ ফেব্রুয়ারি বিখ্যাত নৈরাজ্যবাদী তাত্ত্বিক ক্রোপট্‌কিনের মৃত্যু উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শোকসভায়। এটি হয়েছিল মস্কোর ট্রেড ইউনিয়ন হলে। দ্বিতীয়বার ক্রেমলিনে— তাঁর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে লেনিন বিদেশী প্রতিনিধিদের সঙ্গে হাত মেলান— শওকৎ উসমানীর সঙ্গেও। আর তৃতীয়বার ১৯২১ সালের জুলাই মাসে উসমানী লেনিনকে ঐ ট্রেড ইউনিয়ন হলেই বক্তৃতা দিতে দেখেন 'নয়া অর্থনৈতিক নীতি' বা 'নেপে'র সমর্থনে (দ্র. "India and the Russian Revolution" ৪নং দফা, *Mainstream*, ২২ জুলাই ১৯৬৭, পৃ. ২০-২১।

আর রফিক আহ্‌মদ সোভিয়েত সাংবাদিক লিউনিদ মিত্রোখিনের সংগে এক সাক্ষাৎকারকালে বলেছেন :

"…একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেই আমাদের বলা হল— লেনিন পরের দিন তাঁর সংগে দেখা করার জন্য ভারতীয় ছাত্রদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

"আমরা যে কতখানি আনন্দ উত্তেজনা বোধ করেছিলাম তা বর্ণনা করা কঠিন। সেদিন সারা দিন ধরে কোনো কাজ না করে আমরা শুধু লেনিনের সংগে আমাদের আসন্ন সাক্ষাৎকারের কথা আলোচনা করে কাটালাম। কিন্তু আমার ভারি দুর্ভাগ্য যে পরের দিন সকালে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। জ্বরটা অত্যন্ত বেশি হওয়ায় ক্রেমলিনে যেতে পারি নি। আমার বন্ধুরা অবশ্য সেখানে গিয়ে লেনিনের সংগে কথাবার্তা বলেন। সেদিন যে কতখানি মন খারাপ লেগেছিল তা আপনি ধারণা করতে পারবেন না। ক্রেমলিন থেকে ফিরে আসার পর তাঁরা বহুক্ষণ ধরে লেনিনের সংগে তাঁদের আলাপ-আলোচনার বিবরণ দিলেন। একজন বললেন, জানো, আমরা এখানে যে চা খাই, লেনিন আর তাঁর বন্ধুরাও সেই একই ধরনের চা খান— অর্থাৎ শুকিয়ে নেওয়া আপেল-পাতার 'চা'! তাঁরা বিনা দুধ চিনিতেই খান! সোভিয়েত সরকারের এক নির্দেশ বলে তখনকার দিনে একমাত্র শিশুদের জন্যই ছিল দুধ আর চিনির বরাদ্দ। আমি আমার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করলাম— কিন্তু লেনিন কী বললেন তোমাদের? তাঁরা বললেন— লেনিন আমাদের বলেছেন : এখানে শেখার প্রত্যেকটি সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করুন; শুধু— বই থেকে শেখা নয়। জনগণ কিভাবে বিপ্লব ঘটাচ্ছে সেটা দেখুন। যখন আপনারা ভারতে ফিরে যাবেন তখন শুরু করবেন উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আপনাদের সংগ্রাম।

"কিন্তু কিছুদিন বাদে আমি নিজেও লেনিনের দেখা পাই। ১৯২২ সালের কথা— মস্কোয় তখন প্রাচ্য জাতিগুলির সম্মেলন চলছিল। লেনিন মঞ্চে আবির্ভূত হওয়ার সংগে সংগে সেদিন গোটা হলঘর জুড়ে হর্ষধ্বনি উঠল।…

"মস্কোয় থাকা কালে আরও কয়েকবার আমি লেনিনের ভাষণ শুনেছি"
—'সোভিয়েত দেশ', সংখ্যা ২১, নভেম্বর ১৯৬৬, পৃ. ৩৩)।

প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ভারতীয় ছাত্ররা সেদিন লেনিনের সংগে দেখা করেন তাঁদের নাম বা ঐ সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বিবরণ আমাদের জানা নেই এখনো পর্যন্ত।

রুশ-বিপ্লবের ৫০-তম বার্ষিক উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৯৬৭ সালে কিকি দুর্গ রক্ষার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রফিক আহ্‌মদ যখন বিশেষ সম্মানিত অতিথি হিসেবে সোভিয়েত দেশে যান তখন মারিয় আলেক্সান্‌দ্রোভ্‌না ফর্টুস নামে প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষয়িত্রীর সংগে তাঁর দেখা হয়। ঐ মহিলার এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ভারতীয় ছাত্রের নাম বেশ মনে আছে। তাঁর বিবাহ হয় একজন স্প্যানিস কমিউনিস্টের সংগে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর স্বামী ও উনিশ বছরের বৈমানিক পুত্র উভয়কেই মৃত্যুবরণ করতে হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধে। মারিয়া আলেক্সান্‌দ্রোভ্‌না নিজেও ঐ গৃহযুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য স্বর্ণপদক-ভূষিত হন। তিনি রুশ-বিপ্লবে ও গত বিশ্বযুদ্ধেও লড়াই করেছিলেন এবং তারই জন্য লেনিন-সম্মান সমেত বহুবিধ সম্মানের অধিকারীও হয়েছিলেন। (দ্রষ্টব্য মাসুদ আলি খান, "Recalling days when Indians fought shoulder to shoulder with the Soviet people for revolution"—সাপ্তাহিক *New Age*, ১ অক্টোবর ১৯৬৭, পৃ. ৮)।

প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম দফার ভারতীয় বিপ্লবীদের অধিকাংশই ১৯২২ সালের গোড়ার দিক থেকে ছোটো ছোটো দলে ভারতে ফিরে আসার চেষ্টা করেন এবং গ্রেপ্তার হয়ে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হন। তাঁদের মধ্যে ফিরোজুদ্দীন মনসুর, মীর আবদুল মজীদের মতো কিছু বিপ্লবী ভারতবর্ষ ও পরে পশ্চিম পাকিস্তানের কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংগে আজীবন জড়িত ছিলেন। কেউ কেউ কারামুক্তির পর ধীরে ধীরে সরে গেছেন রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত থেকে। অল্প কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আন্দোলনের প্রতি। আবার আবদুল্লা সফ্‌দরের মতো বিপ্লবী প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ের পর উচ্চ পর্যায়ের মার্কসবাদী শিক্ষালাভের জন্য যোগ দিয়েছিলেন 'ইন্‌স্টিটিউট অফ রেড প্রফেসার্স''এ। পরে তিনি আত্মগোপন করে ভারতবর্ষে ফেরেন ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আবার সোভিয়েত দেশে যাওয়ার জন্য রওনা হন। তার পরের খবর আমার জানা নেই— শুধু শুনেছি তাঁর উপরে শেষের দিকে কিছুটা নাকি প্রভাব পড়েছিল মানবেন্দ্রনাথের।

প্রথম দফার ছাত্ররা প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যাবার পর অন্যান্য যে-সব ভারতীয় সেখানে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের পূর্ণ তালিকা এখনো সংগৃহীত হয় নি। তবে প্রথম দফার ছাত্ররা যেমন প্রায় সবাই একসঙ্গে এসেছিলেন হিজরৎ আন্দোলনের কর্মী হিসাবে তেমনই ১৯২৪-২৫ সালের পর 'গদর' পার্টির সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবীরাও দলে দলে এসে যোগ দিয়েছিলেন ঐ শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁদের কথা পরে আলোচিত হবে। মুহাজিরীন ও 'গদর' কর্মীরা ছাড়া যে অল্পসংখ্যক বিপ্লবী ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সম্ভবত এসেছিলেন দল বেঁধে নয়— একা একা অথবা ছোটো ছোটো দলে, যেমন, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে সোভিয়েত দেশে পৌঁচেছিলেন ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধির নেতৃত্বে ১০ জনের একটি যাত্রীদলে। শিবনাথবাবু "Smriti o Bismriti" নামে *Modern Review* পত্রিকায় যে ধারাবাহিক স্মৃতিকথা লিখেছেন তার থেকে (ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, পৃ. ১৩৭) জানা যায় যে তিনি ছাড়াও ঐ দলের জাফর হোসেন, আবদুল আজিজ ও সম্ভবত ডাঃ নুর মোহম্মদও যোগ দিয়েছিলেন মস্কোর শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ে। হয়তো আরো দু-একজনও যোগ দিয়ে থাকতে পারেন। শিবনাথবাবুর মতে ঐ দলভুক্ত আবদুল হামিদ ছিলেন মৌলানা ওবায়দুল্লাহ্-র ভাইপো। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব কিন্তু তাঁর বইয়ে ওবায়দুল্লাহ্‌র ভাইপোর নাম লিখেছেন 'আজীজ আহমদ'।—দ্র. 'প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন', পৃ. ৭৫।

অন্যদিকে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন :

"জার্মান-বিপ্লবের পর 'বার্লিন কমিটি' ভাঙিয়া দেওয়া হয়; প্রত্যেক বৈপ্লবিক নিজের মতানুযায়ী কর্ম করিতে পারেন। এখন হইতে যে-সকল ঘটনার উল্লেখ করা হইবে তাহা কোন বৈপ্লবিক দলের সংঘবদ্ধ কর্ম নয়"— 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', পৃ. ২৪৮।

আসলে 'বার্লিন কমিটি' বা 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কমিটি' তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৯১৮ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখে (দ্র. পরিশিষ্ট ১৩)। সুতরাং তার পর থেকে আর ঐ কমিটির প্রতিষ্ঠানগত অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু যুদ্ধের বছরগুলি জুড়ে একত্রে বিপ্লবী কাজকর্ম চালানোর দরুন তার কর্মীদের পরস্পরের মধ্যে একটা অন্তরের টান বজায় ছিল বরাবরই— যদিও

তাঁদের মধ্যে কিছুটা দৃষ্টিভঙ্গীর বৈষম্য অনিবার্যভাবেই দেখা দিয়েছিল রুশ-বিপ্লবের প্রচণ্ড ধাক্কায়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ঐ বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কম-বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক মতবাদের দিকে। অন্যদের চিন্তা-ধারা আগের মতো বইছিল অভ্যস্ত জাতীয়তাবাদী খাতেই। তবে যাঁরা সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকছিলেন তাঁদের চিন্তায় তখনো পুরানোর জের ছিল যথেষ্ট। আবার জাতীয়তাবাদী পক্ষও সাম্রাজ্যবাদের, বিশেষ করে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী নতুন এক প্রবল শক্তি হিসেবে মোটের উপর সোভিয়েতের প্রতি সহানুভূতিশীলই ছিলেন অনেকখানি। তাই ভূপেন্দ্র-নাথের ভাষায় :

"পরামর্শ করিয়া এই স্থির হইল যে, যাঁহারা জাতীয়তাবাদী থাকিবেন তাঁহারা একটি সংস্থা স্থাপন করিয়া কার্য করুন ; যাঁহারা বামপন্থীয় অর্থাৎ কমিউনিস্ট মতাবলম্বী হইবেন তাঁহারা অন্য আর একটি সংস্থা স্থাপন করিয়া কার্য করুন ; কিন্তু সর্ব দলই ভারতের স্বাধীনতার জন্য কার্য করিবেন"—ঐ, পৃ. ২৫৬।

ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন এই প্রস্তাব গদর দলকে পাঠানো হয় আর সুইডিশ শ্রমিক নেতা স্ট্রমের পরামর্শে স্থির হয় যে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা পাকাপাকি করার জন্য বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে গোড়ায় পাঠানো হবে মস্কোয়। ১৯২০ সালের নভেম্বরে প্রাক্তন 'বার্লিন কমিটি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভারতীয় বিপ্লবীদের ঐ প্রস্তাব নিয়েই বীরেন্দ্রনাথ পেঁছিন সোভিয়েত দেশে।

ইতিমধ্যে কিন্তু জল গড়িয়ে গিয়েছিল অনেক দূর। মানবেন্দ্রনাথ অবনীনাথেরা সোভিয়েত দেশে পেঁাছে যোগ দিয়েছেন 'তৃতীয় আন্ত-র্জাতিকে'র দ্বিতীয় কংগ্রেসে, সেখানে জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নে লেনিনের প্রস্তাবের পাশাপাশি— অবশ্য বহু সংশোধনী সমেত— গৃহীত হয়েছে মানবেন্দ্র-নাথের পরিপূরক নিবন্ধ (Supplementary Thesis)। ওদিকে ভারতবর্ষে খিলাফৎ আন্দোলনের সূত্রে শুরু হয়েছে হিজরৎ আন্দোলন এবং ঐ আন্দোলনে যোগদানকারী কিছু মুহাজিরীন তরুণ আফগানিস্তান হয়ে পেঁাচেছেন তাসখন্দে। সেখানে তাঁরা ভারতীয় মিলিটারি স্কুলে সামরিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছেন কিছুটা রাজনৈতিক শিক্ষাও। তারপর ঐ তাসখন্দেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'।

এ-সব ঘটে গেছে ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে বীরেন্দ্রনাথের মস্কো পেঁছোনোর আগেই। আসলে তিনি যখন মস্কো পেঁছান তখন মানবেন্দ্রনাথ, অবনীনাথ প্রমুখেরা ছিলেন তাসখন্দে। তাই সেবার দেখা হয় নি উভয়পক্ষে। ভূপেন্দ্রনাথের ভাষায় :

"১৯২০ খৃস্টাব্দের শীতকালে চট্টোপাধ্যায় মস্কোতে যান এবং তথাকার লোকেদের সহিত আলাপ করিয়া আসেন। তথাকার 'কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে'র কর্তারা তাঁহাকে বলিলেন "তুমি অন্যান্য বৈপ্লবিকদের এই স্থলে আনয়ন কর এবং একটি কমিটি স্থাপন করিয়া কার্য কর।" তিনিও অন্যান্যদের আনিবার কথায় স্বীকৃত হন এবং তদনুসারে বার্লিন প্রত্যাবর্তন করেন"—ঐ, পৃ. ২৬৩)।

অর্থাৎ ১৯২০ সালের নভেম্বর মাসে বীরেন্দ্রনাথের মস্কোযাত্রা আসলে পরের বছর প্রাক্তন 'বার্লিন কমিটি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদলের মস্কোযাত্রার ব্যবস্থা পাকা কবার জন্যই।

মনে হয় ঐ প্রতিনিধি দল মস্কো পেঁছয় ১৯২১ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ। মানবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, ঐ দলে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে, গোলাম আম্মিয়া খান লুহানী, নলিনী গুপ্ত ও আগনেস স্মেডলি সমেত মোট ১৪ জন প্রতিনিধি ছিলেন (দ্র. *Memoirs*, পৃ. ৪৭১)। ভূপেন্দ্রনাথের 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে' "মস্কো যাত্রা" শীর্ষক পরিচ্ছেদ পড়লে এই দলের আরো দু-জনের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা হলেন হেরম্বলাল গুপ্ত ও আবদুল ওয়াহেদ। এই ন'জনের নামই দিয়েছেন মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব তাঁর 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'তে (পৃ. ৭১)।

শওকৎ উসমানী তাঁর "India and the Russian Revolution" (৪নং দফা) প্রবন্ধে আবার এরই সঙ্গে যোগ করেছেন আরো তিন জনের নাম : নাম্বিয়ার, ডা: তারকনাথ দাস ও চম্পকরমণ পিল্লাই, (সাপ্তাহিক *Mainstream*, ২২ জুলাই, ১৯৬৭, পৃ. ২২)। তিনি লিখেছেন :

"ডা: চম্পকরমণ পিল্লাই ও ডা: তারকনাথ দাস উভয়েরই মতাদর্শ ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদী। প্রসঙ্গত এই চিত্তাকর্ষক ঘটনা অনেকেরই অজানা যে প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মান ক্রুজার 'এমডেন' যখন মাদ্রাজে বোমাবর্ষণ

করে ডাঃ পিল্লাই তখন ছিলেন সেই জাহাজে। তিনি মস্কো এসেছিলেন শুধু লেনিনের সংগে দেখা করার জন্যই। শেষোক্ত যখন সুইজারল্যাণ্ডে নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন তখন তাঁকে চিনতেন ডঃ পিল্লাই" —সাপ্তাহিক *Mainstream*, ২৯ জুলাই ১৯৬৭, পৃ. ৬৬।

উসমানীর উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থন কিন্তু অন্য কোনোদিক থেকে এখনো পাওয়া যায় নি। আবার উপরে যাঁদের নাম উল্লিখিত হল তাঁদের মধ্যে লুহানী ও নলিনী গুপ্ত 'বার্লিন কমিটি'র সংগে যুক্ত ছিলেন না কোনোদিনই। আগনেস স্মেডলির সংগেও 'বার্লিন কমিটি'র যোগ কিছুটা পরোক্ষ— বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মারফৎ। তবে এঁরা সবাই তখন আসছিলেন বার্লিন থেকেই।

অন্যদিকে 'বার্লিন কমিটি'র আরো দুজন বিপ্লবী ঐ সময়ে মস্কোয় উপস্থিত থাকলেও তাঁরা ঐ প্রতিনিধি-দলভুক্ত ছিলেন না। এঁরা হলেন 'বার্লিন কমিটি'র প্রাক্তন সভাপতি ডাঃ মহম্মদ হাসান মনসুর ও আবদুল হাফিজ। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"মস্কোতে যাইয়া লেখকের (অর্থাৎ ভূপেন্দ্রনাথের —গ্রন্থকার) মনসুরের সহিত সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু কোন রাজনীতিক কর্মের সহিত তাঁহার সংশ্রব ছিল না। বোধ হয় ইংরেজী ভাষার শিক্ষাদান করিয়া তিনি জীবিকা অর্জন করিতেন। পরে তথায় ডাঃ আবদুল হাফিজ উপস্থিত হন। ইনি ভূতপূর্ব 'বার্লিন কমিটি'র লোক, আমেরিকা হইতে 'কমিটি' তাঁহাকে বার্লিনে আনয়ন করেন··· তাঁহার সহিত লেখকদের দলের মস্কোতে পুনরায় সাক্ষাৎ হয়"—'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', পৃ. ২৬৫-৬৬।

ঐ সময়ে আরো তিন জন 'বার্লিন কমিটি'র সংগে যুক্ত বিপ্লবী মস্কোয় উপস্থিত ছিলেন এবং যোগও দিয়েছিলেন আলোচনায়। এঁরা হলেন মৌলানা বরকতুল্লাহ্, আবদুর রব ও প্রতিবাদী আচার্য। কিন্তু এঁরা তিন জনেই তখন এসেছিলেন কাবুল থেকে তাসখন্দ হয়ে—বার্লিন থেকে নয়। শওকৎ উসমানী লিখেছেন যে এঁরা মস্কোয় মিশে গিয়েছিলেন বার্লিন থেকে আগত বিপ্লবীদলের সংগে।

ডাঃ গংগাধর অধিকারী *Marxist Miscellany* (২নং) প্রবন্ধ-সংকলনে প্রকাশিত তাঁর "The Comintern Congresses and the C. P. I." প্রবন্ধে

এ প্রসঙ্গে নাম করেছেন দাউদ আলি দত্তেরও (পৃ.৪)। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন :

"...লেখকের বার্লিনে পৌঁছিবার (অর্থাৎ ভূপেন্দ্রনাথের মস্কো ফেরত বার্লিনে পৌঁছবার —গ্রন্থকার সাত দিন পরে চট্টোপাধ্যায়ের দল বার্লিনে ফিরিয়া আসেন।— এই সময়ে চট্টোপাধ্যায় ও খানখোজে বলিলেন, "তাঁহাদের মস্কো ছাড়িবার দিন ইরান হইতে প্রমথ দত্ত আসিয়া হাজির হন। পূর্বেই মস্কোর ফরেন অফিসের মাধ্যমে তাঁহাকে ইরান হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। তিন মাস চেষ্টার পর তিনি মস্কো আসিয়া হাজির হন" ।— 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', পৃ. ২৯৮-৯৯

ভূপেন্দ্রনাথের ঐ গ্রন্থে খানখোজের যে বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়েছে তাতেও এ বক্তব্য সমর্থিত হয় (ঐ, পৃ. ২৩৮)।

সুতরাং দাউদ আলি দত্ত (প্রমথনাথ দত্তের ছদ্মনাম —গ্রন্থকার) 'বার্লিন কমিটি'র লোক হলেও তাঁকে ঠিক ঐ প্রতিনিধি-দলভুক্ত বলা চলে না। আর তাই 'বার্লিন কমিটি'র সঙ্গে যুক্ত যে ভারতীয় দল ১৯২১ সালে মস্কোয় পৌঁছয় তাতে ১৪ জন প্রতিনিধি ছিলেন— মানবেন্দ্রনাথের এই কথা যদি ঠিক হয় (ভূপেন্দ্রনাথ কোনো সংখ্যার উল্লেখ করেন নি —গ্রন্থকার) তা'হলে সম্ভবত তাঁরা ছিলেন— বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে, গোলাম আম্বিয়া খান লুহানী, নলিনী গুপ্ত, আগনেস স্মেডলি, হেরম্বলাল গুপ্ত, আবদুল ওয়াহেদ, চম্পকরমন পিল্লাই, তারকনাথ দাস —বার্লিন থেকে আগত এই ১১জন বিপ্লবী এবং কাবুল বা তাসখন্দ থেকে আগত মৌলনা বরকতুল্লাহ্, প্রতিবাদী আচার্য ও আবদুর রব পেশোয়ারী। কিন্তু আগেই বলেছি চম্পকরমন ও তারকনাথ যে ঐ দলের সঙ্গে সেবার অথবা কখনো মস্কো গিয়েছিলেন তা শওকৎ উসমানী ছাড়া আর কেউ বলেন নি। মস্কোয় যাঁরা বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন বলে ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর বইয়ে নাম উল্লেখ করেছেন তাঁদের মধ্যেও এঁদের নাম নেই। অথচ চম্পকরমন বা তারকনাথ উপস্থিত থেকে আলোচনায় যোগ দেবেন না, এ কথা মনে করা কঠিন। আর অন্যদের তুলনায় সোভিয়েত আদর্শের থেকে এঁদের দুজনারই চিন্তার ব্যবধান ছিল সম্ভবত সব চাইতে বেশি। তাই তাঁরা যে সেবার মস্কো গিয়েছিলেন ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে, এ-ব্যাপারে

সংশয় রয়ে গেল কিছুটা। এঁরা ছাড়াও শওকৎ উসমানী নাম করেছেন নাম্বিয়ারের। তাঁর সঙ্গেই বা প্রতিনিধিদলের কী সম্পর্ক?

১৯২১ সালে এপ্রিল-মে মাসে মস্কোয় সমবেত ভারতীয় বিপ্লবীদের নিজেদের মধ্যে এবং তাঁদের সঙ্গে সোভিয়েত নেতাদের যে-আলোচনা হয় তার সম্পর্কে দুটি স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়— একটি মানবেন্দ্রনাথের, অন্যটি ভূপেন্দ্রনাথের। সম্ভবত বার্লিন থেকে আগত বিপ্লবীদের অধিকাংশই ছিলেন দ্বিতীয় মতের সমর্থক— প্রতিনিধিদলের নেতা, বীরেন্দ্রনাথের মত ভারতবর্ষে বিপ্লবীদের আশু কর্তব্য বিষয়ে ভূপেন্দ্রনাথের মতের সঙ্গে পুরোপুরি না মিললেও অন্তত আলোচনা ফলপ্রসূ না হওয়ার কারণ নির্দেশের ব্যাপারে ভূপেন্দ্রনাথের অনুরূপ ছিল। এখানে যেটা বলা দরকার সেটা এই যে, এত বছর পরে মস্কোর সেদিনকার ঘটনার মূল্যায়ন করতে গিয়ে কিন্তু মুজফ্ফর সাহেব আগাগোড়া শুধু প্রতিধ্বনি করেছেন মানবেন্দ্রনাথের সংশ্লিষ্ট বক্তব্যের— এমন-কি, খুঁটিনাটি ব্যাপারেও। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে এখানে। মুজফ্ফর সাহেব লিখেছেন:

"...মস্কোতে যে ভারতীয় বিপ্লবীরা গিয়েছিলেন তাঁদের নেতা ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কিন্তু তাঁদের মুখপাত্র হয়েছিলেন লোহানী। চট্টোপাধ্যায় পরিষ্কারভাবে কোনো বিষয় তুলে ধরতে পারতেন না।"
—'প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন', পৃ. ১০৩

অথবা

"...চট্টোপাধ্যায় (অর্থাৎ বীরেন্দ্রনাথ —গ্রন্থকার) সুশিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু মনে হচ্ছে তিনি খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারতেন না।"
—'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পৃ. ৭২

যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন এমন কথা মুজফ্ফর সাহেবের হঠাৎ কেন মনে হচ্ছে, তিনি তো আর ঐ আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন না বীরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ অথবা মানবেন্দ্রনাথের মতো— তা হলে তার উত্তর মিলবে মানবেন্দ্রনাথের *Memoirs*-এর এই ছত্রগুলিতে:

"স্পষ্টতই চ্যাটো (অর্থাৎ বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় —গ্রন্থকার) ছিলেন ভারতীয় দলের নেতা। কিন্তু বক্তা হিসেবে তিনি খুবই দুর্বল ছিলেন এবং আগনেস স্মেডলি তাই উদ্গ্রীব ছিলেন তাঁর হয়ে কথা বলতে।

কিন্তু ভারতীয়দের তরফ থেকে অভারতীয় কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে আলোচনা শুরু করানো ঠিক হবে না— সে কাজ তাই করলেন লুহানী" ইত্যাদি (পৃ. ৪৮৩-৮৪)।

অর্থাৎ কে গুছিয়ে কথা বলতে পারেন, না পারেন— সে বিষয়ে মুজফ্ফর সাহেবের 'মনে হওয়া'র পিছনে রয়েছে মানবেন্দ্রনাথের 'মনে হওয়া'। অথচ সেখানে উল্লেখমাত্র নেই মানবেন্দ্রনাথের সংশ্লিষ্ট বক্তব্যের।

মস্কো-আলোচনা ফলপ্রসূ হয় নি। তার কারণ কী, কে তার জন্য দায়ী এ বিষয়ে মুজফ্ফর সাহেবের মত— অবশ্য অনেকখানি মানবেন্দ্রনাথের মতের ছাঁচেই— বড়োই সহজ ও ব্যক্তিগত। সেটা তাঁর ভাষায় :

"...এম. এন. রায় আগে হতে মস্কোতে এসে জাঁকিয়ে বসে গেছেন তো বটেই, তিনি তাঁদের পুরানো মত ও পথ বর্জন করে কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। মস্কোতে রায়ের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করলে তাঁরই নেতৃত্ব মেনে নিতে হত। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় হরদয়ালের নেতৃত্ব মানতে পারেন নি (এ কথাটিও মানবেন্দ্রনাথের *Memoirs*-এর ২৯১ পৃষ্ঠায় যে কথা বলা হয়েছে তারই প্রতিধ্বনি —গ্রন্থকার), এম. এন. রায়ের নেতৃত্ব কি করে মেনে নেবেন ? দশ জন ফকীর অনায়াসেই একখানা চাদর পেতে তার ওপরে ঘুমুতে পারেন, কিন্তু দুজন বাদশাহের জায়গা কি এক দেশে হতে পারে ? অথচ কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের টাকা তাঁদের চাই-ই। অতএব দীর্ঘ নির্বাসনের পচা মনোবৃত্তি তাঁদের প্রেরণা যোগাল যে হটতে হবে এম. এন. রায়কেই" ('আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পৃ. ২৯২-৯৩)।

অর্থাৎ এ হল নিছক রাজ্যদখলের জন্য দুই বাদশাহের লড়াই— এ-লড়াইয়ে কোনো বালাই নেই মতাদর্শের।

মানবেন্দ্রনাথ অবশ্য অতদূর যান নি। তিনি লিখেছেন :

"...মনে হয় তাসখন্দে ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের খবরে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন প্রবীণ জাতীয় বিপ্লবীরা— নতুন সংগঠনটিকে তাঁরা মনে করেছিলেন তাঁদের কর্তৃত্বের প্রতি এক চ্যালেঞ্জস্বরূপ" (*Memoirs*, পৃ. ৪৭৯)।

প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে লুহানী নাকি তাঁদের সহযোগিতার শর্ত হিসাবে

দাবি করেছিলেন ঐ পার্টি'র বিলোপ। যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি'র সংগঠনের সংগে একটি বিশিষ্ট মতাদর্শ ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই মনে হয় মানবেন্দ্রনাথের কাছে এখানে সমস্যাটা নেহাৎ সাংগঠনিক নয়, অন্তত পরোক্ষভাবেও মতাদর্শগত। এ ছাড়া মানবেন্দ্রনাথ বলেছেন যে ভারতীয় বিপ্লবীদের মতামত শুনবার জন্য জার্মান কমিউনিস্ট নেতা, থেলহাইমার, বৃটিশ কমিউনিস্ট নেতা, টম কোয়েল্‌শ, বোরোডিন প্রমুখকে নিয়ে যে কমিশন গঠিত হয় তার সামনে বীরেন্দ্রনাথ নাকি অভিযোগ এনেছিলেন যে অবনীনাথ এমন একজন পুলিসি গুপ্তচর যিনি বহু ভারতীয় বিপ্লবীর মৃত্যুদণ্ডের জন্য দায়ী আর তাই মানবেন্দ্রনাথ তার সংগে সম্পর্ক রাখলে তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না সহযোগিতা করা (*Memoirs*, পৃ. ৪৮৩-৮৫)। এই শেষের কথাটা যে ঠিক নয়, আগেই তা দেখানো হয়েছে।

ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে' "মস্কো-যাত্রা" নামে গোটা একটি অধ্যায় লিখেছেন এ প্রসংগে। তার থেকে অবশ্য বোঝা যায় যে বার্লিন থেকে আগত বিপ্লবীরা ঐ-সময়ে বেশ কিছুটা বিরূপ ছিলেন তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র ও অবনীনাথের প্রতি। দ্বিতীয়ত কমিশনের সামনে বার্লিন থেকে আগত বিপ্লবীরা ব্যক্তিগত মতামত দেবেন, না তাঁদের পক্ষ থেকে একজন বলবেন— এই নিয়ে (ঐ, পৃ. ২৮৫) এবং কমিশনের সদস্য হিসেবে বোরোডিনের সভায় উপস্থিত থাকার ন্যায্যতার (ঐ, পৃ. ২৮৯) মতো সাংগঠনিক প্রশ্নেও যে উভয় পক্ষের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল এ'ও ঠিক। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর গ্রন্থে ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে মতানৈক্যের মূলে যে রাজনৈতিক প্রশ্ন ছিল তার কথা স্পষ্ট করে লিখেছেন আর সে মতানৈক্য শুধু মানবেন্দ্রনাথের সংগে প্রাক্তন 'বার্লিন কমিটি'র সংগে যুক্ত সমস্ত বিপ্লবীদেরই নয়, শেষোক্তদের মধ্যেও বীরেন্দ্রনাথ, খানখোজে, লুহানী, স্মেডলি প্রভৃতির সংগে ভূপেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও আবদুল ওয়াহেদেরও।

আসলে ঐ তিন মতের তিনটি নিবন্ধ উপস্থাপিত করা হয়েছিল কমিশনের সামনে। ভূপেন্দ্রনাথের মতে

"রায়ের এই থিসিসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, প্রথমে রাজনীতিক বিপ্লব, তারপর সামাজিক বিপ্লব। এই বিষয়ে লেখক (অর্থাৎ ভূপেন্দ্রনাথ— গ্রন্থকার) রুটগের্স প্রভৃতিদের আলোচনা করিতে শুনিয়াছিলেন যে,

বিপ্লবকে এইভাবে বিভাগ করা ঠিক হয় নাই। চট্টোপাধ্যায়দের (অর্থাৎ বীরেন্দ্রনাথ, খানখোজে, লুহানী প্রমুখ —গ্রন্থকার) প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে অগ্রে ধ্বংস করা প্রয়োজন। তজ্জন্য তৃতীয় আন্তর্জাতিক একটি 'Revolutionary Board' স্থাপন করিয়া ভারতে বৈপ্লবিক কর্মে সহায়তা প্রদান করুক। ইহা "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" গোছের অভিমত। ট্রয়ানোস্কি ইহা পাঠ করেন এবং বলেন "ইহা ন্যাশনালিস্ট থিসিস।"... লেখকের (অর্থাৎ ভূপেন্দ্রনাথের —গ্রন্থকার) থিসিসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল :

যতক্ষণ বিদেশী শত্রু মাথার উপরে আছে ততক্ষণ বিভিন্ন শ্রেণীকে একত্র ভাবে কর্ম করিয়া রাজনীতিক বিপ্লব সংসাধিত হইবে।... কিন্তু প্রথম হইতেই কমিউনিস্ট দল সংগঠিত করিতে হইবে যাহা রাজনীতিক বিপ্লবের পর সামাজিক বিপ্লবের দ্বারা সোশ্যালিজম দেশমধ্যে স্থাপন করিবে" (ঐ, পৃ. ২৮৯-৯০)।

মানবেন্দ্রনাথের নিবন্ধ বলতে ভূপেন্দ্রনাথ এখানে তৃতীয় আন্তর্জাতিক দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত পরিপূরক নিবন্ধের উল্লেখ করছেন কি না, জানি না। যদি তা না হয় তা হলে ঐ তিনটি নিবন্ধের কোনোটিই আমরা দেখি নি। শুধু *Soviet Land* পত্রিকার ১৯৬৯ সালে মে মাসের ৯ সংখ্যায় প্রকাশিত আর. ইউনিৎস্কাইয়ায় "Lenin and Indian Revolutionaries" প্রবন্ধ থেকে শেষ দুটি নিবন্ধ সম্পর্কে এই কথা জানা যায় :

১৯২১ সালের ৭ জুলাই 'কমিণ্টানে'র তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলার সময়ে বীরেন্দ্রনাথ, লুহানী ও খানখোঁজে লেনিনের কাছে তাঁদের 'Theses on India and the World Revolution" পাঠান (ঐ নিবন্ধ উপস্থাপিত করা হয়েছিল 'কমিণ্টানে'র কার্যনির্বাহক সমিতি ও কংগ্রেসের প্রাচ্য দেশ-সংশ্লিষ্ট কমিশনের সামনে)। ঐ নিবন্ধের সংগে একটি নোটে ঐ বিপ্লবীরা লিখেছিলেন : 'আমরা আশা করি আপনি সময় করতে পারলে আমরা ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে আপনার সংগে ব্যক্তিগত আলাপের সুযোগ পাব'। 'ইনস্টিটিউট অফ মার্কসিজ্‌ম-লেনিনিজ্‌মে' সংরক্ষিত কেন্দ্রীয় পার্টি মহাফেজখানায় লেনিন-কর্তৃক প্রেরিত চিঠিপত্রের একটি রেজিস্টার আছে। তাতে ১৯২১ সালে ৮ জুলাই তারিখে ৫০১নং দফায় দেখা যায় যে, লেনিন

ঐদিন চট্টোপাধ্যায়, লুহানী ও খানখোজেকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ইনস্টিটিউটে সেই চিঠি বা তার প্রতিলিপি কোনোটিই বহুদিন অবধি পাওয়া যায় নি। ইতিমধ্যে সোভিয়েত গবেষক ই. এন. কোমারভ বীরেন্দ্রনাথের স্ত্রী, লিডিয়া এডোয়ার্ডোভ্না করুনোভস্কাইয়ার কাছ থেকে বীরেন্দ্রনাথের পূর্বোল্লিখিত বক্তৃতাটির সন্ধান পান। ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে বার্লিনে অধ্যাপক ক্রুগারের কাছ থেকে আমি শেষ পর্যন্ত ঐ বক্তৃতাটি জোগাড় করতে পারি। ১৯৩৪ সালের ১৮ মার্চ প্যারি কমিউনের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে 'International Agency of Aid to the Fighters of Revolution'-সংস্থা কর্তৃক বীরেন্দ্রনাথ আহূত হন লেনিনগ্রাড বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির গবেষকদের সভায় মূল বক্তৃতা দেবার জন্য। জার্মান ভাষায় প্রদত্ত ঐ বক্তৃতায় বীরেন্দ্রনাথ লেনিনের ঐ চিঠি সম্পর্কে বলেন :

"রায়ের (অর্থাৎ মানবেন্দ্রনাথের —গ্রন্থকার) তদানীন্তন অতি-বামপন্থী মতের বিরুদ্ধে আমরা ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখে লেনিনের কাছে পাঠাই। লেনিন তার জবাবে ইংরেজীতে তাঁর নিজের হাতে লেখা এই ক'টি লাইন আমাদের পাঠান :

"কমরেড চট্টোপাধ্যায়, লুহানী ও খানখোজে,

"আমি প্রবল আগ্রহ নিয়ে আপনাদের নিবন্ধ পড়েছি। কিন্তু নতুন নিবন্ধ কেন? শীঘ্রই আমি এ বিষয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলব।

আপনাদের ভ্রাতৃপ্রতিম

এন. লেনিন"

ভূপেন্দ্রনাথের গ্রন্থে কিন্তু ঐ চিঠিটির পাঠ এই রকম :

"প্রিয় কমরেড চট্টোপাধ্যায়,

"আমি আপনার থিসিস পড়িয়াছি। আমি আপনার সহিত একমত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভাঙিতেই হইবে। কখন আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে তাহা আমার সেক্রেটারি আপনাকে জানাইবেন।

ভি. উলিয়ানাফ্ (লেনিন)

পুনঃ— আমার ভুল ইংরেজি অনুগ্রহ করিয়া মাফ করিবেন"—'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', পৃ. ২৯০।

দুই পাঠে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। তবে চিঠিটির অন্যতম উদ্দিষ্ট হিসেবে

বীরেন্দ্রনাথের প্রথম পাঠটি গ্রহণ করাই বোধ হয় সমীচীন— যদিও ঐ ব্যাপারে একেবারে নিঃসংশয় হওয়া সম্ভব নয় এখনো। কারণ পূর্বোক্ত বক্তৃতাতেই বীরেন্দ্রনাথ বলেছেন যে "লেনিনের ঐ চিঠি আমার এই পত্রের সংগে সংরক্ষিত ছিল বার্লিনের "সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লীগের" দপ্তরে। হিটলারের পুলিস জোর করে ঐ দপ্তর বন্ধ করে দেয় এবং নেতার ঐ মহামূল্য চিঠিটি সমেত সব-কিছুই বাজেয়াপ্ত করে নেয়।" ইউনিৎস্কাইয়া তাঁর প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের 'ইন্স্টিটিউট অফ মার্কসিজম্-লেনিনিজম্' এখন চেষ্টা চালাচ্ছে লেনিনের লেখা ঐ চিঠিটি উদ্ধারের।

ইউনিৎস্কাইয়া তাঁর *Soviet Land*-এর ঐ প্রবন্ধেই লিখেছেন যে ১৯২১ সালের ২৩ অগাস্ট ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর নিবন্ধ "Communist Revolution—Final Solution of the Problem" লেনিনের কাছে পাঠান। তার সংগে ছিল এই চিঠি :

"কমরেড লেনিন,

প্রিয় কমরেড, পশ্চিম ইউরোপ থেকে যে ভারতীয় বিপ্লবীরা এসেছেন আমি তাঁদেরই সংগে আগত এক ভারতীয়। ভারতবর্ষের পরিস্থিতি ও ঐ দেশে বিপ্লবী শক্তিগুলির চরিত্রসম্পর্কিত আমার প্রবন্ধের সংশোধিত পাঠ আমি আপনাকে পাঠাচ্ছি।

ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের সারবস্তু ও লক্ষ্য বিষয়ে নানা মত উপস্থিত করা হয়েছে। আমিও পাঠাচ্ছি আমার অভিমত। আপনি যদি অনুগ্রহ করে প্রবন্ধটি পড়েন এবং ঐ প্রবন্ধে আলোচিত বিষয় সম্পর্কে আপনার মতামত জানান তা হলে আমি বিশেষ বাধিত হব।

আন্তরিকভাবেই আপনার

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত"

পূর্বোল্লিখিত রেজিস্টার থেকে জানা যায় যে লেনিন ২৬ অগাস্ট ভূপেন্দ্রনাথকে এই উত্তরটি পাঠান :

"প্রিয় কমরেড দত্ত,

আমি আপনার নিবন্ধ পড়েছি। সামাজিক শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা থাক্। মনে হয় আমাদের ঔপনিবেশিক প্রশ্ন বিষয়ে আমার নিবন্ধ (অর্থাৎ 'কমিণ্টার্নে'র দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত লেনিনের জাতীয় ও ঔপনিবেশিক

প্রশ্ন সম্পর্কিত নিবন্ধ —গ্রন্থকার) অনুযায়ী চলা উচিত। ভারতবর্ষে কৃষক সমিতি থাকলে তাদের সম্পর্কে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করুন।

আপনার

ভি. উলিয়ানভ্ (লেনিন)"

—*Collected Works*, খণ্ড ৪৫, পৃ. ২৭০।

১৯৫২ সালে প্রকাশিত তাঁর *Dialectics of Land Economics of India* গ্রন্থে (পৃ. ১১) ডা: ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লেখেন :

"লেনিনের চিঠি লেখকের কাছে এক আশ্চর্য রহস্যোদ্ঘাটনের মতো হাজির হয়েছিল। জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের পক্ষে যে কৃষক আন্দোলনের গুরুত্ব আছে, এ কথা জাতীয় বিপ্লবীর কখনো খেয়াল হয় নি। জাতীয়তাবাদের প্রধান আশ্রয় হল হৃদয়াবেগ। মধ্যশ্রেণী নিজেকে মনে করে জাতির প্রতিভূ আর সব আন্দোলনকে দেখে সেই পরিপ্রেক্ষিতেই। সুতরাং লেনিনের সামাজিক শ্রেণী নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বরং কৃষক আন্দোলনের ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হওয়ার নির্দেশ লেখককে ভাবিয়ে তুলল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপায় ও পদ্ধতি বিষয়ে [illegible]-নির্দেশ রূপান্তর ঘটাল লেখকের সামগ্রিক দৃষ্টির।"

অন্যদিকে পূর্বোক্ত বক্তৃতায় বীরেন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন যে "আমাদের ঐ নিবন্ধ বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেই ভ্রান্ত ছিল রাজনৈতিকভাবে। আমরা একান্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলাম লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে।"

৮ই জুলাই (১৯২১) তারিখে পাঠানো চিঠিতে লেনিন বীরেন্দ্রনাথ, খানখোজে ও লুহানীকে 'শীঘ্রই আপনাদের সঙ্গে কথা বলার' যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটা কি তিনি রাখতে পেরেছিলেন শেষ পর্যন্ত? খুব সম্ভবত পারেন নি। অসুস্থ হয়ে তাঁকে ঐ সময়ে মস্কো ছেড়ে বাধ্য হয়ে চলে যেতে হয়েছিল গর্কিতে। সোভিয়েতের তরফেও সরকারীভাবে অমন কোনো সাক্ষাৎকারের উল্লেখ পাওয়া যায় নি এতাবৎ। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় অবশ্য লিখেছেন যে বীরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ ও সম্ভবত খানখোজে নাকি দেখা করেছিলেন লেনিনের সঙ্গে— এমন-কি, লেনিন তাঁদের কী পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাঁরা লেনিনের সঙ্গে দেখা করে কি রকম নিরাশ, এমন-কি, ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তার কথাও তিনি বলেছেন সবিস্তারে (*Memoirs*, পৃ. ৪৮১-৮২)। আশ্চর্যের

ব্যাপার ভূপেন্দ্রনাথ কোথাও লেখেন নি— এমন-কি, সোভিয়েত দেশ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে কখনো আমাদের কাছে বলেনও নি অমন কোনো সাক্ষাৎকারের কথা। 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে' পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজের ১৯৪৯ সালে ৭ জুন তারিখে স্বাক্ষরিত যে ইংরেজী বিবৃতির তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে সেখানেও উল্লেখ নেই ঐ সাক্ষাৎকারের। আর বীরেন্দ্রনাথ বলেছেন :

"...আমরা একান্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলাম লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। কিন্তু আমাদের বিরোধীরা সে-চেষ্টা বানচাল করে দিল। নেতার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ না পেয়েই আমাদের ফিরে আসতে হল দুঃখের সঙ্গে।"

আর সে-বিরোধীরা যে কারা তাও অস্পষ্ট নয় বীরেন্দ্রনাথের ঐ বক্তৃতার রিপোর্টে।

তাঁর কথায় :

"আমি আবার মস্কোয় এলাম "কমিণ্টানে"র তৃতীয় কংগ্রেসের জন্যে, বেশ কয়েকজন ভারতীয় কমরেডের সঙ্গে। আমরা তখনো সংঘবদ্ধ হই নি পার্টির মধ্যে। আশা করেছিলাম সেটা ঘটবে মস্কোয়। কিন্তু রায় (অর্থাৎ মানবেন্দ্রনাথ —গ্রন্থকার) নিজেকে পরিবেষ্টিত করেছিলেন বেশ-কিছু দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী ও সাম্রাজ্যবাদী দালালের দ্বারা। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি ঐ সময়ে "কমিণ্টানে"র নেতৃস্থানীয় কমরেডদের আস্থাভাজন ছিলেন। আমাদের দিক থেকে আমরা দৃঢ়সংকল্প এক সংগ্রাম চালালাম রায়-গোষ্ঠীর বিপক্ষে। রায়ের পিছনে ছিল ট্রট্‌স্কি, জিনোভিয়েভ, বুখারিন ও রাডেকের সমর্থন। ...চার মাস পরে আমাদের মস্কো ছাড়তে হল রায় ও তাঁর লোকজনদের প্রকৃত চরিত্র বিষয়ে কমরেডদের চোখ খুলতে অপারগ হয়েই। রায় আজ প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের শিবিরে আর আমরা এখন বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য।"

দুটি কথা বলা যেতে পারে এ প্রসঙ্গে। বীরেন্দ্রনাথ ও লুহানী ছাড়া ঐ ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে আর কেউ কোনো কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন বলে আমার জানা নেই। বীরেন্দ্রনাথ প্রথমে জার্মান ও পরে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন এর কয়েক বছরের মধ্যেই।

দ্বিতীয়ত লেনিনের কাছে লেখা ঐ বিপ্লবীদের দুটি চিঠির ও তার জবাবের

লেনিনের দুটি উত্তরের তারিখ থেকে বোঝা যায় যে '…কমিউনিস্ট ইণ্টার-ন্যাশানালের তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার আগেই তাঁরা (অর্থাৎ বার্লিন থেকে আগত ভারতীয় বিপ্লবীরা —গ্রন্থকার), সোভিয়েত দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন' ('আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'', পৃ. ৭৪) মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেবের এই ধারণা সম্ভবত ঠিক নয়। ভূপেন্দ্রনাথ লেনিনকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন ১৯২১ সালের ২৩ অগাস্ট আর লেনিন তার উত্তর পাঠিয়েছিলেন ২৬ অগাস্ট। সুতরাং ভূপেন্দ্রনাথ ২৬ অগাস্ট না হলেও অন্তত ২৩ অগস্ট মস্কোয় ছিলেন। আর ভূপেন্দ্রনাথের মস্কো থেকে 'বার্লিনে পেঁৗছিবার সাত দিন পরে' যদি 'চট্টোপাধ্যায়ের দল বার্লিনে ফিরিয়া আসেন' ('অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', পৃ.২৯৮) তা হলে অন্তত ৩১ অগাস্টের আগে বীরেন্দ্রনাথ মস্কো ছাড়েন নি। আর কমিন্টার্নের তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন ১৯২১ সালের ২২ জুন শুরু হয়ে শেষ হয়েছিল ১২ জুলাই তারিখে।

'বার্লিন কমিটি'র সংগে সংশ্লিষ্ট যে-তিন জন ভারতীয় বিপ্লবীর সংগে ১৯২১ সালে লেনিনের দেখা হয়েছিল বলে মানবেন্দ্রনাথ লিখেছেন (*Memoirs*, পৃ. ৪৮২) তার মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথের সংগে যে লেনিনের দেখা হয় নি, তা আগেই দেখানো হয়েছে। কিন্তু পাণ্ডুরংগ খানখোজের সম্পর্কে কিছুদিন আগে একটি নতুন তথ্য প্রকাশ করেছেন সোভিয়েত গবেষক, লিওনিড মিত্রোখিন। মিত্রোখিনের তথ্য যাচাই করে দেখার আগে খানখোজের সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে এখানে।

সত্যই বিচিত্র জীবন মারাঠী বিপ্লবী পাণ্ডুরংগ সদাশিব খানখোজের। ১৯০০ সালে তিনি যোগ দেন মহারাষ্ট্রের তরুণ বিপ্লবীদের এক সমিতিতে। তিলক তাঁকে পরামর্শ দেন বিদেশে গিয়ে সামরিক শিক্ষা লাভের চেষ্টা করতে। ১৭ বছর বয়সে তিনি তাই ভারতবর্ষ ছেড়ে পালান এক ফরাসী জাহাজে। আমেরিকা পেঁৗছে তিনি প্রথমে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, তারপর **Mount Kamalpais Military Academy**তে ও সর্বশেষে ওরেগন কৃষি কলেজে শিক্ষালাভ করেন।

খানখোজে আমেরিকায় তারকনাথ দাস, খগেন্দ্রচন্দ্র দাস, অধরচন্দ্র লস্কর প্রভৃতির সংগে একযোগে বিপ্লবী কাজকর্ম শুরু করেন ১৯০৭ সাল থেকে।

তাঁদের কাজের ক্ষেত্র ছিল শুধু ভারতীয় ছাত্র বা শিক্ষিত মহল নয়, আমেরিকা ও কানাডায় দলে দলে আগত শিখ শ্রমিক, কৃষক ও কারিগরেরাও। সেখানে সরকারী বর্ণবৈষম্য নীতির শিকার বনে ঐ শিখেরা তখন পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন সংঘ গড়ার ও সংগ্রামের পথে। ১৯১১ সালে লালা হরদয়াল আমেরিকা পেঁছানোর পর তাঁদের দলটি পরিচিত হয় 'গদর (অর্থাৎ বিদ্রোহ —গ্রন্থকার) দল' নামে। খানখোজে তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন :

"...গদর পার্টির দুইটি বিভাগ ছিল, একটি হইতেছে "প্রচার বিভাগ" (propaganda), অন্যটি হইতেছে "প্রহারক বিভাগ" (military)। শ্রীহরদয়াল প্রচার বিভাগের কর্মসচিব নিযুক্ত হন এবং আমি "প্রহারক বিভাগের" কর্মসচিব পদে মনোনীত হই"— ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', পৃ. ২৩০-৩১।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সংগে সংগে গদর দলের নির্দেশে খানখোজে ও মারাঠী বিপ্লবী আগাশে (ওরফে 'মহম্মদ আলি') তুর্কিস্তানে যান ও সেখানে প্রমথনাথ দত্তের (ওরফে 'দাউদ আলি') সংগে মিলিত হন। তুর্কিস্তান থেকে তাঁরা প্রথমে যান বাগদাদে ও তারপর পারস্যে। সেখানে তাঁদের দেখা হয় প্রবীণ ভারতীয় বিপ্লবী অম্বাপ্রসাদের সংগে। তারপর কেরমানে পেঁছে তাঁরা ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য একটি পল্টন গঠন করেন— তাতে ভারতীয়দের পাশাপাশি যোগ দিয়েছিলেন ইরানীরাও।

কেরমান থেকে খানখোজে ইরানী বালুচিস্তান সীমান্তের নিকটবর্তী বাম শহরে গিয়ে বালুচিদের সংঘবদ্ধ করেন ও সীমান্তের ঠিক ওপারের প্রদেশটির উপরে আক্রমণ চালিয়ে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন একটি অস্থায়ী সরকার। কিন্তু কিছুদিন পরেই পরাস্ত হয়ে তিনি পিছু হঠতে বাধ্য হন। এরপর তিনি দুবার পারস্যে ইংরেজ বাহিনীর হাতে বন্দী হয়েও শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যান এবং ১৯১৯ সালে গোপনে ভারতবর্ষে ফিরে দেখা করেন তিলকের সংগে। তিলক তাঁকে পরামর্শ দেন সোভিয়েত দেশে যাবার। অতঃপর দেশ থেকে আবার পালিয়ে তিনি ইরান ও তুর্কি হয়ে জার্মানি পেঁছন। সেখান থেকে বীরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথের সংগে তিনি যে ১৯২১ সালে মস্কো যান তা আমরা এর আগেই দেখেছি। তারপর মস্কো থেকে বার্লিনে ফিরে তিনি বীরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহযোগিতায় Indian News and Information

Bureau নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। দু'বছর পরে, ১৯২৪ সালে মেক্সিকোয় তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন কৃষি-বিজ্ঞান বিষয়ে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৯ সালে তিনি মধ্যপ্রদেশ সরকারের কৃষি-বিষয়ক পরামর্শদাতা হিসাবে অবশেষে ফিরে আসেন স্বদেশে। খানখোজের মৃত্যু নাগপুরে, ১৯৬৭ সালের জানুয়ারি মাসে।

১৯৬৬ সালে মিত্রোখিন খানখোজের কাছে একটি চিঠি লিখে জানতে চান তাঁর সঙ্গে লেনিনের দেখা হয়েছিল কিনা এবং হয়ে থাকলে সেই সাক্ষাতের বিবরণ ও তাঁর কাছে ঐ সাক্ষাৎ-সংশ্লিষ্ট দলিল, ফোটো বা অন্য কোনো রকমের মালমসলা আছে কিনা। এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি উত্তর পান খানখোজের সেক্রেটারি, আনন্দরাও যোশীর কাছ থেকে। তাতে যোশী লেখেন যে খানখোজে মিত্রোখিনকে জানাতে বলেছেন যে লেনিনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল এবং সেই সাক্ষাৎ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল প্রচণ্ডভাবে— ইয়োরোপ ও আমেরিকায় তিনি বহু অসামান্য ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসেছিলেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে মহত্তম হচ্ছেন লেনিন।

এই পত্র-বিনিময়ের সূত্র ধরে মিত্রোখিন খানখোজের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছেন এমন সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে খানখোজের মৃত্যু হয়। এর কিছুদিন পরে মিত্রোখিনের সঙ্গে দেখা হয় খানখোজের স্ত্রীর। তিনি বেলজিয়ান মহিলা। তিনিও জানান যে খানখোজের সঙ্গে লেনিনের দেখা হয়েছিল এবং দীর্ঘ আলোচনাও হয়েছিল দুজনের মধ্যে। তাঁর মতে লেনিন বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিলেন খানখোজেকে।

শ্রীমতী খানখোজের হাতে কিন্তু কোনো দলিল ছিল না খানখোজের বিপ্লবী জীবনের ঐ পর্ব-সম্পর্কিত। তবে তিনি প্রসঙ্গত জানান যে খানখোজের সঙ্গে একজন রুশ ভদ্রলোকের নাকি অনেক কথা হয়েছিল ঐ বিষয়ে।

অনেক চেষ্টার পর মিত্রোখিন সন্ধান পান সেই রুশ ভদ্রলোকের। তিনি একসময়ে ভারতে-সোভিয়েত দূতাবাসের কর্মচারী ছিলেন। নাম ক্রাসেনিন্নিকভ। তাঁর কাছ থেকে মিত্রোখিন পেলেন ১৯৬৬ সালের ১৫ এপ্রিল খানখোজের সঙ্গে তাঁর আলাপের এই বিবরণ :

১৯২০ সালের শেষ দিকে অথবা ১৯২১ সালের গোড়ায় খানখোজে যখন ইরানে (ইরানী বালুচিস্তানে) বৃটিশদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দো-

লনের অন্যতম নেতা হিসাবে ইরানে বাস করছিলেন তখন তিনি ভি. আই. লেনিনের কাছ থেকে এক আমন্ত্রণ পান মস্কো সফরের।

খানখোজে বলেন যে লেনিন তাঁকে মস্কোতে ডেকে পাঠান দুটি উদ্দেশ্যে:

১. "লেনিন চাইছিলেন ইরানের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বের সংগে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করতে। কারণ, ১৯২০ সালের শেষার্ধে রুশ-সোভিয়েত ফেডারেশন ইরানের সংগে কথাবার্তা চালাচ্ছিল দুদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে।

২. "ইরানবাসী খানখোজে ভারতবর্ষের বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন— লেনিন তাই তাঁর কাছ থেকে সঠিক খবর পেতে চাইছিলেন আন্দোলনের অবস্থা, বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি ও গোষ্ঠী সম্পর্কে। খানখোজের মতে ভি. আই. লেনিন একটি বস্তুনিষ্ঠ চিত্র চাইছিলেন ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের বিষয়ে।"

১৯২১ সালের গোড়ায় খানখোজে ইরান ছেড়ে তুর্কি হয়ে বার্লিন পৌঁছন এবং সেখান থেকে বার্লিন কমিটির অন্যান্য ভারতীয় বিপ্লবীদের সংগে মস্কো যাত্রা করেন। খানখোজের মতে তাঁরা মস্কো পৌঁচেছিলেন ১৯২১ সালের মার্চ মাসের এমন সময়ে যখন ক্রনস্টাডের অভ্যুত্থান চলছিল (ক্রনস্টাড অভ্যুত্থান শুরু হয় ১ মার্চ, ১৯২১। খানখোজের কথা ঠিক হলে তাঁরা মস্কো পৌঁচেছিলেন মার্চ, ১৯২১ সালে —গ্রন্থকার)।

খানখোজের সংগে মস্কোতে ব্যক্তিগত যোগাযোগ হয় লুনাচারস্কি, চিচেরিন ও ট্রটস্কির। তাঁর সংগে কথা বলতে বলতে চিচেরিন নাকি উঠে গিয়ে আগুন দিয়েছিলেন উনুনে। খানখোজে বলেছেন কোনো দেশের পররাষ্ট্র সচিব এমন কাজ নিজে হাতে করে থাকেন —এ কথা কল্পনা করা যায় না।

ক্রাসেনিন্নিকভের সংগে সাক্ষাৎকারে খানখোজে বলেন যে তিনি যোগ দিয়েছিলেন 'কমিণ্টানে''র তৃতীয় কংগ্রেসে এবং তার কিছু দিন পরেই দুবার দেখা করেন লেনিনের সংগে। প্রথমবার লেনিন তাঁর সংগে আলোচনা করেন ইরানের পরিস্থিত সম্পর্কে এবং দ্বিতীয়বার তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল ভারতবর্ষের অবস্থা। তাঁরা দোভাষীর সাহায্য না নিয়ে সরাসরি আলাপ করেছিলেন ইংরেজী ভাষায়। তাঁদের আলোচনার খুঁটিনাটি ব্যাপার, লেনিনের প্রশ্ন ও মন্তব্যগুলি খানখোজের তখন আর মনে ছিল না। শুধু তাঁর সারল্য,

বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব, বিপুল পাণ্ডিত্য ও প্রবল যুক্তি গভীর রেখাপাত করেছিল খানখোজের মনে।

খানখোজে বলেন, 'আমাদের যুগের মহত্তম নেতা ভি. আই. লেনিন—তাঁর সংগে আমার সাক্ষাতের ফলে নির্ধারিত হয়ে গেল আমার পরবর্তী দিনের মতামত। আমি লেনিনবাদী হলাম ও আজও তাই আছি যদিও আমি সদস্য নই কমিউনিস্ট পার্টির।"

মিত্রোখিন লিখেছেন যে ভারতবর্ষের জাতীয় মহাফেজখানায় খানখোজের স্মৃতিকথার যে টেপ-রেকর্ড সংরক্ষিত রয়েছে তার বিবরণ দুর্ভাগ্যক্রমে শেষ হয়েছে মস্কো যাত্রার পূর্বেই। কাজেই তাতে লেনিনের সংগে তাঁর দেখা হওয়ার কোনো কথা থাকা সম্ভব নয়।

আর ভূপেন্দ্রনাথ কলকাতায় তাঁর কাছ থেকে ইংরেজীতে স্বাক্ষরিত ৭ জুন, ১৯৪৯ তারিখের যে-বিবৃতিটি 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে' প্রকাশ করেছেন তাতে মস্কো যাত্রার ও সোভিয়েত দেশে অবস্থানের কথা থাকলেও লেনিনের সংগে তাঁর সাক্ষাতের বা 'কমিণ্টানে'র তৃতীয় কংগ্রেসে যোগদানের কোনো উল্লেখ নেই সেখানেও। সুতরাং কিছুটা সংশয় এখনো রয়ে গেল এ বিষয়ে। বিশেষ করে খানখোজে যে 'কমিণ্টানে'র তৃতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন এই বক্তব্যের সমর্থনসূচক কোনো প্রমাণ দেখি নি মস্কোর 'ইন্স্টিটিউট অফ মার্কসিজ্‌ম-লেনিনিজ্‌ম' দপ্তরে সংরক্ষিত সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রে। আর যদি তা সত্য হয় তা হলে বীরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ বা অন্য 'বার্লিন কমিটি'র সদস্যরাও কি যোগ দিয়েছিলেন ঐ কংগ্রেসে? তাঁরাও তো তখন উপস্থিত ছিলেন মস্কোয়। মস্কোর 'ইন্স্টিটিউট অফ মার্কসিজ্‌ম-লেনিনিজ্‌ম' থেকে আমি ১৯৭০ সালে যে খবর পাই তাতে জানা যায় যে, 'ঐ কংগ্রেসে চার জন ভারতীয় প্রতিনিধি যোগ দেন কিন্তু তার মধ্যে নাম উল্লেখ আছে শুধু মানবেন্দ্রনাথের'। বাকি তিনজন তবে কারা? অবনীনাথও তো প্রতিনিধি ছিলেন কংগ্রেসের। তিনি কি যোগ দিয়েছিলেন ঐ কংগ্রেসে?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর এখনো আমরা জানি না। তবে বীরেন্দ্রনাথ বা ভূপেন্দ্রনাথ কেউই কোথাও লেখেন নি যে তাঁরা যোগ দিয়েছিলেন ঐ তৃতীয় কংগ্রেসে বা তাঁদের দেখা হয়েছিল লেনিনের সংগে। বীরেন্দ্রনাথ বরং তাঁর বক্তৃতায় উল্টো কথাটাই বলেছিলেন লেনিনের সংগে সাক্ষাতের ব্যাপারে।

আর-একটি কথা। ক্রাসেনিন্নিকভের কাছে খানখোজে নাকি বলেছিলেন যে 'বার্লিন কমিটি'র ভারতীয় বিপ্লবীদের দল (মিত্রোখিনের লেখায় দেখা যায় খানখোজে বিশেষ করে উল্লেখ করেছিলেন আগনেস স্মেডলি, আর. গুপ্ত ও মানবেন্দ্রনাথের কথা, যাঁদের সঙ্গে নাকি তাঁর বার্লিনে দেখা হয়েছিল মস্কো যাত্রার আগে। এর মধ্যে শেষের নামটি নিশ্চিতভাবেই ঠিক নয়— কারণ মানবেন্দ্রনাথ ঐ সময়ে ছিলেন মস্কোয় এবং সেখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল 'বার্লিন কমিটি'র লোকেদের। দ্বিতীয়ত আর. গুপ্ত নামে কেউ ছিলেন না ঐ দলে— ছিলেন নলিনী গুপ্ত, হেরম্বলাল গুপ্ত ও বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত —গ্রন্থকার) যখন মস্কোয় পৌঁচেছিল তখন ক্রনস্টাড অভ্যুত্থান চলছিল। তা হলে তাঁরা পৌঁচেছিলেন মার্চ মাসের গোড়ায়। 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে' প্রকাশিত খানখোজের বিবৃতিতে দেখা যায় '১৯২১ খৃস্টাব্দে শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতির সহিত মস্কো যাত্রা করি এবং তথায় তিন মাস থাকি' (পৃ.২৩৮)। আবার বীরেন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বোক্ত বক্তৃতায় বলেছেন: '...চার মাস পরে আমাদের মস্কো ছাড়তে হল' ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে তাঁরা সোভিয়েত দেশে ছিলেন ১৯২১-র মে বা বড়জোর জুন মাস অবধি। তাই যদি হয় তা হলে মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব যে লিখেছেন "...অধ্যাপক খানখোজেকে ধন্যবাদ, তিনি অন্তত লিখেছেন যে মস্কোতে তাঁরা তিন মাস ছিলেন। সব মিলিয়ে এটা বোঝা যায় যে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার আগেই তাঁরা সোভিয়েত দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন" ('আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি", পৃ. ৭৩-৭৪)— এই হিসেব ঠিক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এর আগেই জানা গেছে যে এর সঙ্গে একদিকে বীরেন্দ্রনাথ, খানখোজে ও লুহানীর আর অন্যদিকে ভূপেন্দ্রনাথের— লেনিনের কাছে লেখা চিঠির বা ওগুলির জবাবে লেনিনের চিঠি দুটির তারিখের সংগতি নেই। বিশেষ করে ভূপেন্দ্রনাথের চিঠির উত্তরে লেনিনের চিঠিতে যে তারিখের (২৭ অগাস্ট, ১৯২১) স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে লেনিনের বহির্মুখ ডাক রেজিস্টারে এবং লেনিনের *Collected Works* খণ্ড ৪৫, ২৭০ পৃষ্ঠায়—তার থেকে মনে হয় যে বীরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, খানখোজে প্রমুখ বিপ্লবীরা মস্কোয় উপস্থিত ছিলেন 'কমিন্টার্নে'র তৃতীয় কংগ্রেসের সময়ে আর তা হলে তাঁরা তিন মাস নয়, প্রায় ছ'মাস ছিলেন মস্কোয়। ব্যাপারটি সম্পর্কে তাই এখনো সংশয় রয়ে গেল কিছুটা।

'কমিন্টার্নে'র তৃতীয় কংগ্রেস শেষ হওয়ার কয়েক মাস পরে ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধার জন্য মানবেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য ভারতীয় কমিউনিস্ট-দের কেন্দ্র মস্কো থেকে স্থানান্তরিত হয় বার্লিনে। তার আগে অবশ্য মানবেন্দ্র-নাথ অবনীনাথের সহযোগিতায় *India in Transition* বইটি রচনা করেন মস্কো থাকতেই, যদিও পরের বছর (১৯২২ সালে) সেটি প্রকাশিত হয় বার্লিন থেকে (নামপত্রে প্রকাশ-স্থানের উল্লেখ ছিল জেনিভা বলে)।

তারপর ১৯২১ সালের ১ ডিসেম্বর মানবেন্দ্রনাথ ও অবনীনাথের যুক্ত-স্বাক্ষরে প্রকাশিত হয় আহমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম ইস্তেহার ('আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট ভারতের পার্টি', পৃ. ৬২৫-৩৫)। মনে রাখতে হবে ১৯২০ সালে প্রথমবার মস্কো পৌঁছনোর আগে ঠিক ঐ দু'জন ও শান্তিদেবী (অর্থাৎ এভেলিন রায় —গ্রন্থকার) এক কমিউনিস্ট ইস্তেহার রচনা করেছিলেন বার্লিন থেকে। অর্থাৎ মানবেন্দ্রনাথ পরে যা-ই লিখুন তাঁর স্মৃতিকথায় ১৯২০ সালে মার্চ, এপ্রিল মাস থেকে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর অবধি মানবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন অবনীনাথ এবং তত্ত্বগত দিক থেকে ভারতীয় কমিউনিস্টদের সর্বাগ্রগণ্য হিসেবে ঐ দু'জনার নামই যুক্ত রয়ে গেছে একাধিক ঐতিহাসিক দলিলে। কী কারণে ১৯২২ সালে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল তার কারণ পুরোপুরি পরিষ্কার নয় এখনো। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন অবনীনাথ ঐ সময়ে বার্লিনে আসার পর তাঁকে নাকি বলেছিলেন 'বহুদিন আগেই রায়ের সহিত ঝগড়া বাধিয়াছিল। কিন্তু তোমরা আসিয়া ঝগড়া করাতে তাহা ধামাচাপা থাকে' ('অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', পৃ. ২৯৯)। ঝগড়ার কারণ কিন্তু বলা হয় নি সেখানেও।

১৯২২ সালে ১৫ মে মানবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে বার্লিন থেকে প্রকাশনা শুরু হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম পাক্ষিক পত্রিকা *The Vanguard of Indian Independence*। কিছুদিন পর এ পত্রিকারই নতুন নতুন নামকরণ হতে থাকে— প্রথমে *Advance Guard*, তারপর এক বছর পরে শুধু *The Vanguard* আর সবশেষে ১৯২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে *The Masses of India*। শেষের পত্রিকাটি অবশ্য প্রকাশিত হত প্যারিস থেকে। মানবেন্দ্র-নাথই ছিলেন এই সব ক'টি পত্রিকারই প্রধান পরিচালক—তবে প্যারিস থেকে সরকারী আদেশে তাঁর বিতাড়নের পর এভেলিন রায়, লুহানী ও মহম্মদ আলি

*The Masses of India*র দৈনন্দিন কাজকর্ম চালাতে থাকেন— যদিও পত্রিকার সম্পাদক ও প্রধান লেখক বরাবরই ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ।

১৯২২ সালের শেষ দিকে যে ওবায়দুল্লাহ সিন্ধির নেতৃত্বে ১০ জনের একটি দল কাবুল থেকে প্রথম তাসখন্দে ও পরে মস্কো পেঁছয় তা আমরা আগেই দেখেছি। এঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ও ঐ দলের দু তিন জন যে মস্কোর 'প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ে' যোগ দিয়েছিলেন, সে কথাও বলা হয়েছে এর আগে।

১৯২২ সালের শেষভাবে ঠিক আগের বছর আহমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনের মতো গয়ায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনের প্রতিনিধিদের কাছেও একটি বাণী পাঠানো হয়— এবার কিন্তু আর মানবেন্দ্রনাথ বা অন্য কোনো ভারতীয় কমিউ-নিস্টের নামে নয়, আনুষ্ঠানিকভাবে 'কমিন্টানে''র চতুর্থ কংগ্রেসের সভাপতি-মণ্ডলীর তরফ থেকেই। আর তারই সঙ্গে এল কংগ্রেসের জন্য একটি কর্ম-সূচীর প্রস্তাব (দ্র. মুজফ্ফর আহমেদ, 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পৃ. ৬৩৬-৪৭)। রয়টার গয়া অধিবেশনের ঠিক আগে ঐ প্রস্তাব প্রায় পুরোটাই লণ্ডন থেকে পাঠায় এদেশে এবং 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি খবরের কাগজে তা প্রকাশিতও হয় অনেকটাই। ঐ নিয়ে সেদিন প্রচণ্ড হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মহলে।

১৯২২ সালের ৫ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর অবধি মস্কোয় কমিউনিস্ট চতুর্থ কংগ্রেসের অধিবেশন চলে। লেনিনের জীবদ্দশায় অনুষ্ঠিত এই শেষ কংগ্রেস। তিনি এতে যোগও দিয়েছিলেন অসুস্থতা সত্ত্বেও।

মস্কোর 'ইন্স্টিটিউট অফ মার্কসিজম-লেনিনজমে'র নথিপত্র থেকে ১৯৭০ সালের মে মাসে যে খবর পাই তাতে দেখা যায় যে ঐ কংগ্রেসে ভারতবর্ষ থেকে চার জন প্রতিনিধি আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কিন্তু একজন মাত্র যোগ দিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত। তবে তাঁর নামের কোনো উল্লেখ নেই সেখানে। গোয়েন্দা-প্রধান স্যার সেসিল কে তাঁর *Communism in India*-তে (Editions Indian কর্তৃক ১৯৭১ সালে প্রকাশিত সংস্করণ, পৃ. ২১) লিখেছিলেন যে ভারতীয়দের মধ্যে নাকি চতুর্থ কংগ্রেসে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন : চিররঞ্জন দাশ (চিত্তরঞ্জন দাশের পুত্র) ও সুভাষচন্দ্র বসু। মানবেন্দ্রনাথও মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেবকে লেখা তাঁর এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে 'কমিন্টান'' কর্তৃপক্ষ চান

যে চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্র যেন চতুর্থ কংগ্রেসে যোগ দেন এবং তাঁদের কাছে কমিন্টার্নের আমন্ত্রণ-পত্র পৌঁছোনোর ভারও তিনি দিয়েছিলেন মুজফ্ফর সাহেবের উপরেই। চিত্তরঞ্জনের চিঠি পৌঁছোনোর বিষয় মুজফ্ফর সাহেব কিছু লেখেন নি কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কে লিখেছেন যে তাঁর আমন্ত্রণ-পত্র মুজফ্ফর সাহেবের কাছ থেকে 'যুগান্তর' দলের বিখ্যাত নেতা ও সুভাষচন্দ্রের সহপাঠী, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত নিয়ে যান তাঁকে দেবার জন্য। কিন্তু সুভাষচন্দ্র সে পত্র গ্রহণ করেন নি, পরে মুজফ্ফর সাহেবের কাছ থেকেও সুভাষচন্দ্র নিতে রাজী হন নি। বলেছিলেন, "যাঁরা তাঁকে পত্র লিখতে চান তাঁরা যেন সোজাসুজি লেখেন" (দ্র. 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' (পৃ. ৩২৩-২৪)।

ডাঙ্গেকে মানবেন্দ্রনাথ নিজেই চিঠি পাঠিয়েছিলেন চতুর্থ কংগ্রেসে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানিয়ে। ডাঙ্গে অবশ্য কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন নি শেষ অবধি। তবে নলিনী গুপ্ত ১৯২৩ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে পুলিসের কাছে তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন যে তিনি নাকি যোগ দিয়েছিলেন ঐ কংগ্রেসে এবং তাঁর সঙ্গে আর যে-সব ভারতীয় সেখানে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন মানবেন্দ্রনাথ, আলি শাহ্ এবং গদর দলের দুজন সদস্য (দ্র. জাতীয় মহাফেজ-খানা, Home Pol. File No. ২১।১, ১৯২৪)। আলি শাহ্-র খবর আমার জানা নেই কিন্তু গদর দলের ঐ দুই সভ্য সম্পর্কে কিছু খবর পাওয়া যায় আর-এক দিক থেকেও।

কংগ্রেস অধিবেশনের পর মানবেন্দ্রনাথ ১৯২২ সালের ১২ ডিসেম্বর ডাঙ্গেকে যে চিঠি লেখেন তাতে তিনি আপসোস করেছেন যে ভারতবর্ষ থেকে সরাসরি কেউ আসতে পারেন নি কংগ্রেসে (কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় প্রদর্শিত ৭নং দলিল)। 'কমিন্টার্নে'র পত্রিকা *International Press Correspondence*-এর (সংক্ষেপে Inprecor) ২২-১২-১৯২২ তারিখের খণ্ড ২, ১১৫ নং সংখ্যায় দেখা যায় যে মানবেন্দ্রনাথ প্রাচ্য দেশ-সংক্রান্ত মূল রিপোর্ট ও নিবন্ধ পেশ করছেন ঐ কংগ্রেসের সামনে। মানবেন্দ্রনাথই কি তবে সেই একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি যিনি শেষ পর্যন্ত যোগ দিতে পেরে-ছিলেন কংগ্রেসে, চার জনকে আমন্ত্রণ পাঠানো সত্ত্বেও? মানবেন্দ্রনাথের উপরোক্ত আপসোস থেকে সে কথা মনে হতে পারে। কিন্তু নলিনী গুপ্তের

সাক্ষ্য ছাড়াও আরো তিন জায়গা থেকে পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে এই মতের যে 'গদর' বিপ্লবীদের তরফ থেকেও কেউ হয়তো যোগ দিয়েছিলেন ঐ কংগ্রেসে। যেমন স্যার সেসিল কে তাঁর *Communism in India*-তে স্পষ্ট করেই লিখেছিলেন "ক্যালিফোর্নিয়া থেকে গদর দল দুজন প্রতিনিধি —সন্তোখ সিং ও রতন সিং-কে চতুর্থ কংগ্রেসে যোগদানের জন্য পাঠায়" (পৃ. ৩৯)। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত চতুর্থ কংগ্রেসে যোগ দেবার কথা না বললেও লিখেছেন :

"…লেখক (অর্থাৎ ভূপেন্দ্রনাথ —গ্রন্থকার) মস্কো থেকে প্রমথ দত্তের (অর্থাৎ দাউদ আলি দত্তের —গ্রন্থকার) এক পত্র প্রাপ্ত হন। প্রমথ তাহাতে লিখিয়াছিল যে একটি বড় রাস্তায় দুই জন ভারতীয় যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা বলেন, তাঁহারা আমেরিকা হইতে আসিয়াছেন, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কাছে গদর পার্টিকে 'বৈপ্লবিক শ্রমিক সংস্থা' বলিয়া অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতে। আন্তর্জাতিক এম. এন. রায়ের উপরে এই বিষয়ে অন্তর্ভুক্তি নির্ধারণ করিবার ভার দিয়াছিল। কিন্তু বহুদিন হইল কার্য কিছুই অগ্রসর হইতেছে না। পরে শুনিলাম, গদর পার্টির সন্তোখ সিং এবং রতন সিং উভয়ে আমেরিকা হইয়া মস্কোয় গিয়াছিলেন"… ('অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', পৃ. ৩৫০)।

সর্বশেষ সাক্ষ্য সর্দারা সিং চিমার। একদা গদর পার্টির সদস্য সর্দারা সিং বহু বৎসর যাবৎ সোভিয়েত দেশের নাগরিক। ১৯৭০ সালের ১৫ মে এঁর সাক্ষাৎ পাই তাঁর কর্মস্থল, মস্কোর 'ওরিয়েন্টাল ইন্স্টিটিউটে'। তিনি জানান যে গদর দলের দুই নেতা ভাই সন্তোখ সিং (অমৃতসর জিলা) ও বাবা রতন সিং (জলন্ধর জিলা) ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েত দেশে যান এবং সেখানে দেখা করেন লেনিনের সঙ্গে— তবে তাঁদের চতুর্থ কংগ্রেসে যোগদানের ব্যাপারে তিনিও নীরব। সর্দারা সিং জানালেন যে লেনিনের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাতের খবরটি নাকি প্রকাশ করেছেন ইকবাল সঈদাই। তিনি লাহোরের 'ইমরোজ' পত্রিকার দুটি সংখ্যায় (১৯৬৯ সালের ২ ও ৯ নভেম্বর) "ইনকিলাবি কে শরগুদাস্ত" নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে গদর পার্টি ও তার নেতাদের সম্পর্কে বহু তথ্যের মধ্যে এ খবরটিও দিয়েছেন। সর্দারা সিং বলেছেন যে এক সময় ইকবাল সঈদাই নাকি সদস্য ছিলেন গদর পার্টির।

শওকৎ উসমানীর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে কিন্তু তাঁকে দেখানো হয়েছে খিলাফৎ দলের সদস্য হিসাবে।

সে যাই হোক, গদর পার্টির দুই নেতা সন্তোখ সিং ও রতন সিং যে কমিন্টার্নের চতুর্থ কংগ্রেসের আগে মস্কো পৌঁচেছিলেন এতে কোনো ভুল নেই। নলিনী গুপ্ত তাঁর পূর্বোক্ত বিবৃতিতে বলেছেন যে গদর পার্টির ঐ দুই প্রতিনিধি "আলাপ করেন মানবেন্দ্রনাথ এবং কমিণ্টার্নের প্রাচ্যদেশ-সংশ্লিষ্ট আরো দুই বিশিষ্ট নেতা, সাফারভ ও তিভেলের সঙ্গে।...আমি এও দেখেছিলাম যে ঐ দুই ব্যক্তি কমিণ্টার্নের অবগতির জন্য দীর্ঘ বিবরণী লিখছেন পাঞ্জাবের কাজকর্ম সম্পর্কে" (জাতীয় মহাফেজখানা, Home Pol, File No. ২১।১, ১৯২৪)।

সব মিলিয়ে তাই ডাঃ গঙ্গাধর অধিকারীর এই অনুমান ঠিক বলেই বোধ হয় যে "এটি নিশ্চিত যে এঁরা দুজনেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজনের ভোটাধিকারও ছিল" ("The Comintern Congresses and the C P I," *Marxist Miscellany*, No. 2, পৃ. ২১)।

তবে একটা কথা : লেনিনের সন্তোখ সিং ও রতন সিং-এর সাক্ষাতের এখনো কোনো সমর্থন পাওয়া যায় নি সোভিয়েতের তরফ থেকে। আর সাক্ষাৎ যদি হয়ে থাকে তা হলে তার বিশদ খবরও পাওয়া দরকার আমাদের।

আমরা আগেই দেখেছি যে ১৯২২ সাল নাগাদ আবার ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় বার্লিন। একদিকে মানবেন্দ্রনাথ প্রাচ্য দেশের মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ করার সুবিধার জন্য ঐখানে তাঁর দপ্তর পাতেন এবং *The Vanguard of Indian Independence*, *Advance Guard* ও *The Vanguard*—একের পর এক ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই মুখপত্রগুলি প্রকাশ করতে থাকেন। আর অন্যদিকে পুরানো 'বার্লিন কমিটি'র সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবীরাও 'Indian News and Information Bureau' নামে একটি সংস্থা এবং অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সম্পাদনায় *Indian Independence* নামে একটি পত্রিকা চালু করেন ঐ বার্লিনেই। তা ছাড়া ঐ ব্যুরো মারফত যে-সব ভারতীয় ছাত্রকে জার্মানির বিভিন্ন টেকনিক্যাল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করা হত তাদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় 'Hindusthan Association of Central

Europe' বা সংক্ষেপে 'Hindusthan Association'। সেখানে ভারতবর্ষের নানা পত্রিকা রাখার ব্যবস্থা ছিল এবং মাঝে মাঝে আয়োজন করা হত বিশিষ্ট ভারতীয় অতিথিদের দিয়ে বক্তৃতাদানের ও আলোচনার। ১৯২৪ সালে ঐ সংঘের সভাপতি হয়েছিলেন উত্তরকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি, ডাঃ জাকীর হোসেন। পরে বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা, ডাঃ গঙ্গাধর অধিকারীও এক সময়ে সভাপতি হয়েছিলেন ঐ সংঘের (ডাঃ গঙ্গাধর অধিকারী ১৯২২ সালে জার্মানি গিয়েছিলেন পদার্থ-রসায়নে গবেষণার জন্য। সেখানে বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আকৃষ্ট হন কমিউনিজমের দিকে এবং শেষ পর্যন্ত যোগ দেন জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টিতে। ছ'বছর পরে ১৯২৮ সালে দেশে ফেরার কয়েক মাসের মধ্যেই ডাঃ অধিকারী গ্রেপ্তার হন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় —গ্রন্থকার)।

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ছোটো বোন সুহাসিনী, তাঁর স্বামী শ্রীযুক্ত নাম্বিয়ার, সরোজিনী নাইডুর পুত্র ডাঃ জয়সূর্য নাইডুও (১৯৫২ সালে ইনি কমিউনিস্ট পার্টি-সমর্থিত 'পিপল্‌স ডেমোক্র্যোটিক ফ্রন্টে'র প্রার্থী হিসাবে লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন হায়দ্রাবাদ থেকে) জার্মানিতে ছিলেন ঐ সময়ে। এঁদের প্রত্যেকের উপরেই সেদিন পড়েছিল রুশ-বিপ্লবের প্রভাব।

ইতিমধ্যে ১৯২২সালেই আফগানিস্তান থেকে (অবশ্য মাঝে বেশ কয়েক মাস সোভিয়েত দেশে কাটিয়ে) মৌলানা বরকতুল্লাহ্‌ ও আমেরিকা থেকে সুরেন্দ্রনাথ করও পেঁাছে গিয়েছিলেন বার্লিনে। এরপর প্রতিবাদী আচার্য, অবনী মুখার্জি, মহম্মদ আলি, রহমত আলি জ্যাকারিয়া প্রভৃতিও যে একে একে ওখানেই জড়ো হয়েছিলেন তা বোঝা যায় জার্মানি থেকে ঐ-সব 'Indian Seditionist'-দের বিতাড়ন বিষয়ে ভারত সরকার ও ইণ্ডিয়া অফিসের মধ্যে এবং তাদের উভয়ের সঙ্গেই জার্মান সরকারের পত্রালাপ থেকে।

বরকতুল্লাহ্‌ বার্লিনে আসার পর 'বার্লিন কমিটি'র প্রাক্তন সভ্যরা রাশিয়ায় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের সাহায্যের জন্য একটি 'Indian Committee for Russian Famine Relief' প্রতিষ্ঠা করেন। তার সভাপতি ছিলেন মৌলানা বরকতুল্লাহ্‌ ও সম্পাদক ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ঐ কমিটির চিঠি নিয়েই অবনীনাথ ১৯২২ সালে এসেছিলেন ভারতবর্ষে।

প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী : পশ্চিম গোলার্ধে

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে আমেরিকা ও কানাডায় গদর দলের প্রতিষ্ঠা এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধার পর 'বার্লিন কমিটির' সংগে একযোগে ঐ দলের ব্যাপক বিপ্লবী তৎপরতার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। অনেকের মতো আমারো ধারণা ছিল যে গদর দলের কাজকর্ম মোটের উপর বুঝি সীমাবদ্ধ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম প্রান্তের ক্যালিফোর্নিয়া, ওরেগন ও ওয়াশিংটন রাজ্য আর কানাডার পশ্চিম প্রান্তের বৃটিশ কলাম্বিয়া রাজ্যের সীমানার মধ্যেই। মস্কোয় সর্দারা সিং চিমা কিন্তু আমায় বললেন :

"যেখানেই দৈহিক শ্রমের চাহিদা দেখা গেছে সেখানেই গেছে শিখ আর যেখানেই শিখ গেছে, সেখানেই গেছে গদর পার্টি। ল্যাটিন আমেরিকার প্রায় প্রত্যেকটি দেশে, ফিজি, মরিশাস, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে, এশিয়ার পূর্বাঞ্চলের প্রায় সর্বত্র, এমন-কি, আফ্রিকাতেও ঐভাবে প্রসারিত হয়েছিল সেদিন গদর দলের তৎপরতা।"

আর-একটা কথা মনে রাখা দরকার এখানে। গদর দলে পাঞ্জাবী শিখ ছাড়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু, মুসলমানেরাও নিশ্চয়ই ছিলেন বেশ-কিছু। তার নেতাদের মধ্যেও সোহন সিং ভাখ্না, কেশর সিং, উধম সিং, হরনাম সিং, ঈশ্বর সিং প্রভৃতির পাশাপাশি পাওয়া যায় হরদয়াল, বরকতুল্লাহ্, খানখোজে, রামচন্দ্র প্রভৃতির নাম। তবু এ দলের প্রধান শক্তি নিশ্চয়ই ছিলেন পাঞ্জাবী শিখ কৃষকেরা। কিছু শ্রমিক, কারিগর ও অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকও ছিলেন—তাঁরাও প্রধানত পাঞ্জাবী শিখ। বিদেশে তাঁরা পাড়ি দিয়েছিলেন কারখানায় বা বড়ো বড়ো খামারে কাজ করে জীবিকা অর্জনের আশায়। সমগ্র সংস্থাটির মধ্যেই তাই পরিস্ফুট ছিল বেশ একটা শ্রমজীবী চরিত্র যদিও খানখোজে, সত্যেন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ করের মতো বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরাও কেউ কেউ যোগ দিয়েছিলেন গদর দলে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে গদর দলের নির্দেশে কয়েক হাজার সদস্য স্বদেশে ও দূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে ফিরে যান স্বাধীনতার সংগ্রামে আরো প্রত্যক্ষভাবে যোগদানের উদ্দেশ্যে। সেখানে প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা এবং অন্যান্য

মামলায় তাঁদের অনেকের মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। পুলিস ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষেও তাঁদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেন। প্রচণ্ড অত্যাচার চালিয়ে সেদিন দমন করা হয়েছিল তাঁদের আন্দোলন।

এইভাবে এঁরা দলে দলে দেশে ফিরে যাওয়ায় যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দেখা গেল যে আমেরিকা ও কানাডায় গদর দলের শক্তি হ্রাস পেয়েছে বিশেষভাবে। ইতিমধ্যে রুশ-বিপ্লবের খবরও পেঁৗছে গিয়েছিল গদর বিপ্লবীদের কানে। তাঁরা নতুন করে ভাবতে শুরু করেন পরিবর্তিত দুনিয়ায় ভারতবর্ষের পরিস্থিতি সম্পর্কে। পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে তাঁর পূর্বোল্লিখিত বিবৃতির এক জায়গায় লিখেছেন :

"...বার্লিন কমিটির নিকট হইতে (বিশ্বযুদ্ধের সময়ে —গ্রন্থকার) গদর পার্টি অর্থ সাহায্য পাইত। যুদ্ধের পরে এই পার্টি পুনর্গঠিত হয়...। বেশির ভাগ ভারতে প্রত্যাবর্তন করায় পার্টির তেমন লোকবল ও অর্থবল ছিল না। একজন কৃষক যুবক, ভাই সন্তোখ সিং নিজের জীবিকা ছাড়িয়া এবং অর্থ দান করিয়া পার্টিতে কর্মসচিব নিযুক্ত হন। এই সময়ে সুরেন্দ্র-নাথ কর এই পার্টির একটি বিভাগের কর্তৃপক্ষদের অন্যতমরূপে মনোনীত হন..." ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', পৃ. ২৩৩।

ভূপেন্দ্রনাথ নিজেও লিখেছেন :

"সুরেন্দ্রনাথ কর একবার লেখককে (অর্থাৎ ভূপেন্দ্রনাথকে —গ্রন্থকার) বলেন "...মস্কো হইতে ভাই সন্তোখ সিং এবং ভাই রতন সিং-এর পত্র পান। সন্তোখ সিং একজন শ্রমিক। নিজের যথাসর্বস্ব গদর পার্টিকে দিয়েছিলেন এবং যুদ্ধের পরে পার্টির সেক্রেটারি হন। লেখকের সঙ্গে তাঁহার পত্র-বিনিময়ও হইয়াছিল" (ঐ, পৃ. ৩৪৯-৫০)।

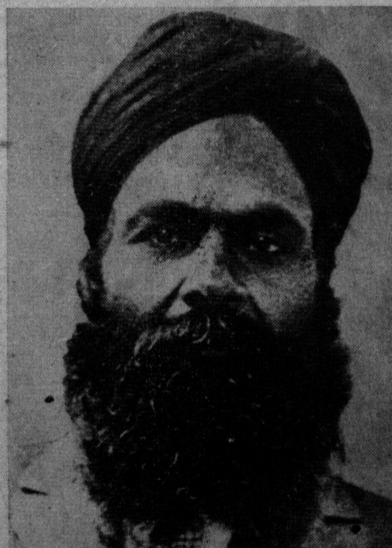
বোঝা যায় গদর পার্টির রূপান্তর ঘটেছিল সন্তোখ সিং, সুরেন্দ্রনাথ কর প্রভৃতির উদ্যোগে। আর তাঁরা শুধু নিজেরাই যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন রুশ-বিপ্লবের প্রতি তাই নয়, গদর পার্টিকেও তাঁরা পুরোনো পথ থেকে সরিয়ে এনে-ছিলেন কমিউনিজমের পথে। আর এটা সহজ হয়েছিল বোধ হয় ঐ দলের শ্রেণী-চরিত্রের জন্যই। আশ্চর্যের ব্যাপার গদর দলের এই যুদ্ধোত্তর রূপা-ন্তরের বিশদ বিবরণ গদর সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ ও রচনার কোনোটিতেই তেমন পাওয়া যায় না। ভূপেন্দ্রনাথ শুধু লিখেছেন :



(উপরে) গদর দলের নেতৃবৃন্দ: বাম থেকে দক্ষিণে—বাবা শের সিং, বাবা হরনাম সিং গুজ্জরওয়াল, বাবা হরনাম সিং তুণ্ডিলাট, বাবা সোহন সিং ভাখনা, বাবা গুরমুখ সিং, অজ্ঞাত, বাবা ভাগ সিং কানাডিয়ান ও বাবা করম সিং চিমা।
('অজয়-ভবন' সংরক্ষণশালার সৌজন্যে)



(মাঝে) ১৯২২ সালে পুনর্গঠিত 'গদর দলে'র সম্পাদক, ভাই সন্তোখ সিং।



(নিচে) ১৯২২ সালে সোভিয়েতদেশে ভাই সন্তোখ সিং-এর সহযাত্রী, বিপ্লবী ভাই রতন সিং।

দ্রষ্টব্য॥ পৃ. ২৩১—'৩৭ ও পৃ. ২১৯-'২০

('অজয়-ভবন' সংরক্ষণশালার সৌজন্যে)

A NEW PRINCIPLE A NEW PARTY A NEW PROGRAMME

THE ADVANCE-GUARD

Vol. I No. 1 LONDON October 1st, 1922

CRISIS IN THE NEAR EAST

WANTED A NEW PARTY

SWARAJ FOR THE 98 PER CENT

THE MASSES OF INDIA

PARIS

POINT OF VIEW OF THE MASSES

An Indian Communist?

"NOT THE MASSES FOR REVOLUTION" – BUT "REVOLUTION FOR THE MASSES"

THE VANGUARD OF INDIAN INDEPENDENCE

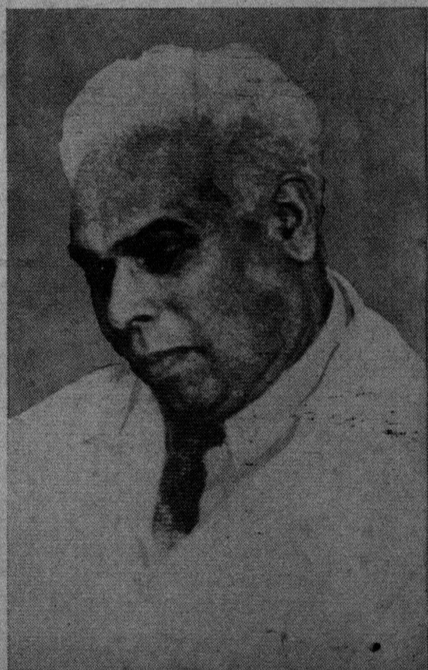
BERLIN / PARIS / LONDON / ZURICH / ROME

WHICH WAY?

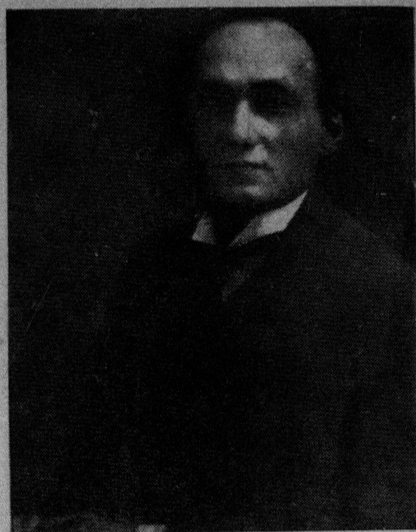
BENGAL TRADE UNION CONFERENCE



(উপরে) প্রেম সিং গীল।
দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ৩১৪-'১৫।
('Link' পত্রিকার সৌজন্যে)



(নিচে) কোলাচালা সীতারামাইয়া।
দ্রষ্টব্য ঃ পৃঃ ২৪৭ ও[illegible]:১৪।
'(Link' পত্রিকার সৌজন্যে)



উপরে)—সপুরজী সাকলাৎওয়ালা ।
দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ২৪৪-’৪৫ ।
(ডাঃ পঞ্চানন সাহার সৌজন্যে)

(নিচে)—রজনী পাম দত্ত
দ্রষ্টব্য ॥ পৃঃ ২৪৫-’৪৬ ।
(শ্রীদিলীপকুমার বসুর
সৌজন্যে)

"…১৯২৬ খৃস্টাব্দে অমৃতসরে আকালীদের আড্ডায় সন্তোখ সিং-এর সহিত লেখকের সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি ক্ষয়কাশ রোগে মৃতপ্রায় (সুরেন্দ্রনাথ করও আমেরিকার জেলে যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হন। যুদ্ধের পর জার্মানিতে এসে তিনি কমিউনিস্টদের সংগে যোগ দেন কিন্তু ১৯৩৪ সালে যক্ষারোগেই মারা যান সেখানে —গ্রন্থকার)। লেখকের সহিত পত্র-বিনিময়ের কথা তিনি স্মরণ করেন। জ্ঞানী গোপাল সিং-এর কাছে শুনা গেল, রতন সিং পুনরায় ভারতের বাহিরে গিয়াছেন। কমিউনিস্ট বন্ধুদের কাছ হইতে পরে শুনা যায় 'গদর পার্টি" একটি বৈপ্লবিক শ্রমিক সংস্থা বলিয়া কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অন্তভুর্ক্ত (Affiliation) হয়েছে…" (ঐ, পৃ. ৩৫০)।

১৯৭০ সালে মস্কোর 'ইন্‌স্টিটিউট অফ মার্কসিজম-লেনিনিজমে'র শ্রীযুক্ত ল্যাভ্‌রভকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করলে কিন্তু তিনি জানান যে গদর দলের ঐ affiliation-এর কোনো তথ্য তাঁদের নথিপত্রে নেই। তবে 'কমিন্টার্নে"র অনুমোদন থাকুক বা না থাকুক এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই যে ঐ সময়ে ভূপেন্দ্রনাথের ভাষায়: "…গদর পার্টি'…পুনরায় সংগঠিত হয়। এই সময়ে ইহা প্রকৃতভাবে একটি শ্রমিক সংস্থায় বিবর্তিত হয়। সন্তোখ সিং ইহার সম্পাদক হন…" (ঐ, পৃ. ১৬৬)।

সন্তোখ সিং, রতন সিং প্রভৃতির পরিচালনায় যুদ্ধোত্তর গদর দলের আমূল রূপান্তরের আরো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলাম ঐ সর্দারা সিং চিমার কাছেই। দেখা হওয়া মাত্র আমি তাঁকে প্রশ্ন করি: 'আপনি কি গদর দলের তরফ থেকে প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন শিক্ষালাভের জন্য?' সর্দারা সিং জানালেন তিনি ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে সোভিয়েত দেশে এসে যোগ দিয়েছিলেন মস্কোর ঐ প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর আগে ও পরে বহু গদর কর্মীও ঐভাবে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন সেখানেই। শেষ পর্যন্ত আমার বিশেষ অনুরোধে সর্দারা সিং গদর দল থেকে যাঁরা প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়েছিলেন তাঁদের এক তালিকা তৈরি করে দেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্য, তবে বারবার বলেন যে এটি নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ, এ ছাড়াও আরো কেউ কেউ হয়তো এসেছিলেন যাঁদের নাম তাঁর আর মনে নেই এখন। তাঁর মন্তব্য সমেত পুরো তালিকাটি এখানে প্রকাশ করা হল:

"১৯২৮ সালের আগে কয়েকজনকে—বোধ হয় পাঁচ ছ'জনের মতো কমরেডকে সান্ ফ্রান্ সিস্কোর গদর পার্টি এখানে পাঠিয়েছিল যাতে তাঁরা সোভিয়েত দেশ ও সর্বহারা বিপ্লবের পরিচয় লাভ করতে পারেন। তাঁদের মধ্যে এই ক-জনের নাম আমার মনে আছে। এঁরা সবাই এসেছিলেন সান্ ফ্রান্সিস্কো থেকে ;

১. কমরেড করম সিং ধূত (কপূরথলা)

২. " হরজব সিং 'মহিলপুরী' (হোসিয়ারপুর)

৩. " সন্ত সিং 'গণ্ডিউইণ্ড' (অমৃতসর)

৪. " হরনাম সিং 'কাসেল' (ঐ)

'এ ছাড়াও আরো হয়তো ছিলেন কিন্তু এখন আর আমার তাঁদের নাম মনে নেই।

১৯৩০ সালের পরে যাঁদের পাঠানো হয় তাঁরা হলেন :

১। কমরেড তেজা সিং 'স্বতন্ত্র' (গুরুদাসপুর)
এসেছিলেন আর্জেন্টিনা থেকে

২। „ ভগৎ সিং 'বিলগা' (জলন্ধর) ঐ

৩। „ ভূজা সিং চাকমৈদাস (ঐ) ঐ

৪। „ চিন্তা সিং (লায়ালপুর) ঐ

৫। „ পূরণ সিং (রুরুকা) ঐ

এই প্রথম দলটি মস্কোয় পৌঁচেছিল ১৯৩১ সাল নাগাদ।

৬। „ করম সিং ধূলেতা (জলন্ধর) ঐ

৭। „ শরণ সিং বাটুরা ঐ ঐ
(এঁর নাম সম্পর্কে নিশ্চিত নই। ইনি মারা যান সোভিয়েত দেশে)

৮। „ জাওয়ান্দ সিং (অমৃতসর)—এসেছিলেন আর্জেন্টিনা থেকে
(ইনি এখানেই বিয়ে করে থেকে যান)

এই দ্বিতীয় দলটি মস্কো পৌঁছয় ১৯৩২ সনে।

৯। „ নয়না সিং ধূত (কপূরথলা) ঐ

১০। „ কর্তার সিং সরিন (লায়ালপুর) ঐ

১১। „ বাণ্টা সিং ভুল্লারাই (জলন্ধর)

১২। „ পাখার সিং কালা (কপূরথলা) ঐ
—এঁরা দুজন যক্ষ্মা রোগে মারা যান সোভিয়েত দেশে

১৩। „ রাজা সিং খেৌদি (হোশিয়ারপুর) ঐ
১৪। „ রাজা সিং সরদুল্লাপুর (হোসিয়ারপুর) ঐ
১৫। „ মিলখা সিং আট্টা (জলন্ধর) ঐ
১৬। „ 'কুদ্‌লে' বাগুলা „ ঐ
(এঁর আসল নাম মনে নেই)
১৭। „ লাভ সিং জামশের (জলন্ধর) ঐ

'এই তৃতীয় দলটি মস্কো পেঁছয় ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে।

১৮। „ সর্দারা সিং চিমা (জলন্ধর) ঐ
(এঁর সংগেই আমি দেখা করি—
এঁরই তৈরি এই তালিকা —গ্রন্থকার)
১৯। „ বাওয়া সিং (হোশিয়ারপুর) ঐ
(ইনি মস্কোয় পাঠ গ্রহণ করে
আর্জেন্টিনায় ফিরে যান ও সেখানেই বসবাস করেন)
২০। „ হরবংশ সিং বাগুালা (জলন্ধর) ঐ
২১। „ গুলজারা সিং (ঝিন্দ রাজা) ঐ

'এই চতুর্থ দলটি মস্কো পেঁছয় ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে।

২২। „ গঞ্জন সিং (ফিরোজপুর) ঐ
(ইনি বিয়ে করে সোভিয়েত দেশেই থেকে যান)
২৩। „ বাচান সিং ঘোলিয়া (ফিরোজপুর) ঐ
২৪। বাচান সিং তখনওয়াদ (ফিরোজপুর)
২৫। „ কেহার সিং (ফিরোজপুর) ঐ
২৬। „ হুকুমা সিং (জলন্ধর) ঐ
২৭। „ মুনসি ঐ ঐ
২৮। „ 'বার্কো' ঐ ঐ
(আসল নাম মনে নেই) ঐ
২৯। „ জিয়াগু সিং (অমৃতসর) ঐ

'এই পঞ্চম দলটি মস্কো পেঁছয় ১৯৩৪ সালে।

৩০। ” উজাগর সিং (ফিরোজপুর) ঐ
৩১। „ মেহার সিং ঐ

৩২। „ কর্তার সিং মুসাপুর (জলন্ধর) ঐ

৩৩। „ মেলা সিং বিলগা „ ঐ

৩৪। „ শরণ সিং মন্ধালি „ ঐ

৩৫। „ 'স্যাঙ্গার' (হোশিয়ারপুর) ঐ

(কমরেড নয়না সিং-এর ভাই। ব্যক্তিপূজার আমলে নিহত)

'এই ষষ্ঠ দলটি মস্কো পেঁছয় ১৯৩৪-৩৫ সালে।

৩৬। „ নিধান সিং (ফিরোজপুর) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে

৩৭। „ নিরঞ্জন সিং পাণ্ডোরি (হোসিয়ারপুর) ঐ

৩৮। „ হরবংশ সিং বাণ্ডালা (জলন্ধর) ঐ

৩৯। „ 'এডাম' (লাহোর) ঐ

(আসল নাম মনে নেই)

৪০। „ 'রোজার্স' (হোসিযারপুর) ঐ

(আসল নাম এখন আর মনে নেই) ঐ

৪১। „ আচ্ছার সিং ছিনা (অমৃতসর) ঐ

৪২। „ 'নেলসন' (জলন্ধর)—কোন্ দেশ থেকে এসেছিলেন জানা নেই।

৪৩। „ ইকবাল সিং ধাদিয়াল (জলন্ধর) কানচডা থেকে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য—পরে কানাডা ফিরে যান

৪৪। „ দুলা সিং —পানামা থেকে এসেছিলেন

৪৫। „ ধীলন (লুধিযানা) ঐ

৪৬। „ সুবা সিং থাঠিয়া (অমৃতসর)—আফ্রিকা থেকে এসেছিলেন

৪৭। „ উজাগর সিং বোপা রাই (জলন্ধরা) ঐ

৪৮। „ শিব সিং (জলন্ধর) —ফিজি থেকে এসেছিলেন

৪৯। „ মিলখি কেরনানা (জলন্ধর)

(যক্ষ্মা রোগী—সোভিয়েত হাসপাতালে মারা যান)

৫০। „ 'লিটন'—সরাসরি ভারতবর্ষ থেকে এসেছিলেন। বাঙালী—আসল নাম জানা নেই

৫১। „ 'র‍্যান্ডলফ' (দক্ষিণ ভারতের লোক)

৫২। „ 'অসকার (গুজরাটি—সোভিয়েত দেশে মারা যান)

'এই সপ্তম দল মস্কো পেঁীছয় ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ।

'এ ছাড়াও আরো হয় তো কেউ কেউ ছিলেন যাঁদের নাম আর আমার মনে পড়ে না। আর কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা পড়াশুনা করেছেন অন্যত্র ; যেমন

৫৩। „ রাম সিং দত্ত (গুরুদাসপুর)। ইনি 'প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ব-বিদ্যালয়ে' পড়েন নি কিন্তু মার্কসবাদের জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এঁকে গদর পার্টি পাঠিয়েছিল আফগানিস্তান অথবা ইরান থেকে।

৫৪। „ যোগা সিং পাণ্ডোরি (হোশিয়ারপুর)। ইনি গদর পার্টির সম্পাদক ছিলেন। তিনিও এখানে এসেছিলেন এবং মারাও গিয়েছিলেন এখানেই।

৫৫। „ ধরম সিং কোটলি (জলন্ধর)—এসেছিলেন আর্জেন্টিনা থেকে।

৫৬। „ সোহন সিং কোটলি (জলন্ধর) ঐ

সর্দারা সিং চিমা জানান যে এঁরা ছাড়া কমরেড মহম্মদ আলি ও কমরেড 'আচকভ' (এঁর আসল নাম তিনি জানেন না) পড়েছিলেন 'Scientific Research Institute on National and Colonial Problems'-নামক প্রতিষ্ঠানে।

সর্দারা সিং চিমার তালিকায় দেখা যায় বেশ কয়েকটি ছদ্মনাম। মন্ত্রগুপ্তির দরুন তাঁদের আসল নাম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী মহলেও জানা নেই। তবে কমরেড 'লিটন' যে আসলে হরেন্দ্রনাথ দত্ত—তা অনেকেই বললেন। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রাম অথবা নোয়াখালি জেলায়। তিনি এখনো জীবিত—তবে মস্কোবাসী নন। আর আচকভের আসল নাম নাকি নিশার। তিনি সম্ভবত চট্টগ্রামের লোক। অন্যদের আসল নাম আগামী কয়েক বছরের মধ্যে জানা না গেলে হয়তো আর কোনোদিনই জানা যাবে না কারণ যাঁরা জানতে পারেন তাঁরা নিশ্চয়ই এখন যথেষ্ট বৃদ্ধ। তাই এই বিপ্লবীদের প্রকৃত পরিচয় জানার চেষ্টা করা দরকার অবিলম্বে।

'বার্লিন কমিটি'র প্রাক্তন সদস্যদের আরো অনেকেই (বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রতিবাদী আচার্য, লাড্‌লী প্রসাদ বর্মা প্রভৃতি) ১৯২৪-২৫ সাল নাগাদ দেশে ফিরতে থাকেন একে একে। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও খুব চেষ্টা করেছিলেন দেশে ফেরার। তাঁর ঐ সময়কার মনের অবস্থা প্রসঙ্গে জওহরলাল আত্মজীবনীতে লিখেছেন: 'No exile can escape the malady of his tribe, that consumption of the soul, as Mazzini called it' (*An Autobiography* পৃ. ১৫৪)। শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশও তাঁর 'কবির সঙ্গে য়ুরোপে' বইয়ে (পৃ.১৭৩-৭৫) বীরেন্দ্রনাথের সেই 'আত্মার ক্ষয়রোগের কথা লিখেছেন এইভাবে:

"সত্যিই অসাধারণ মানুষ। কবি এবং লর্ড সিংহ (ইনিও তখন ইয়োরোপে ঘুরছিলেন কবির সঙ্গে—গ্রন্থকার), দুজনেই মুগ্ধ হলেন বীরেন চট্টোর মনের পরিচয় পেয়ে। তিনি সেই সময় বার্লিনের শহরতলীতে একটা ইস্কুলে মাস্টারী করছেন। খুব মোটা রকমের পোশাক এবং সেই রকমই অত্যন্ত মোটা রকমের জীবনযাত্রা।···খুব বামপন্থী মতামত, কিন্তু স্বদেশপ্রেমের প্রতিমূর্তি যেন।···

"কবি এবং লর্ড সিংহকে একদিন বললেন: আমার একটিমাত্র ইচ্ছে একবার দেশে ফিরে যাবার। এই আকাঙ্ক্ষা আপনারা দুজনে মিলে যেমন ক'রে হোক পূর্ণ করুন।···কবি লর্ড সিংহকে মিনতি ক'রে বললেন···বৃটিশ রাজের আপনার কথার উপরে আস্থা আছে এবং আপনার অনেক উঁচু স্তরের লোকদের সঙ্গে হৃদ্যতাও আছে। আপনি চট্টোকে সুপারিশ করলে হয়ত ওরা ক্ষমা করতেও পারে। লর্ড সিংহ কবিকে কথা দিলেন যে ফিরে গিয়েই তিনি এ বিষয়ে চেষ্টা করবেন এবং কী ফলাফল হল, কবিকে জানাবেন। একদিন চিঠি এল কবির কাছে যে, ব্রিটিশ রাজনীতির একেবারে উপরের লোক, যাদের হাতে চট্টোর ভাগ্যের কলকাঠি আছে তাদের বিশেষ অনুরোধ করেও কোনো ফল হয় নি।···সেদিন যখন বীরেন আবার কবির কাছে জানতে এলেন যে লর্ড সিংহের কাছ থেকে খবর

এসেছে কিনা, কবি চিঠিটা পড়ে শোনালেন। ভদ্রলোক স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, শুধু জলে চোখ ভরে এল। পরে বললেন : এই আশংকাই করেছিলাম। তবে মনে হয়েছিল, লর্ড সিংহের এত ইনফ্লুয়েন্স আছে যে হয়ত উনি চেষ্টা করলে হতে পারে। আমার ভারতবর্ষের মাটিতে মরা হল না।"

সত্যই দেশের মাটিতে মরা হয় নি বীরেন্দ্রনাথের। তাঁর শেষ জীবনের বৃত্তান্ত দিয়েই বার্লিন প্রসংগ শেষ করা যেতে পারে যদিও সে কাহিনী আমাদের বার্লিন থেকে আবার নিয়ে যাবে সোভিয়েত দেশে।

১৯২৬ সালের শেষ দিকে বীরেন্দ্রনাথ জড়িত হয়ে পড়েন নতুন এক ধরনের কাজে। খুব সম্ভব ইতিমধ্যে তিনি যোগ দিয়েছিলেন জার্মাণ কমিউনিস্ট পার্টিতে। ১৯২৭ সালের ১০ থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারি ব্রাসেলসে যে 'ঔপনিবেশিক অত্যাচার ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সম্মেলন' অনুষ্ঠিত হয় তিনি ছিলেন তার এক প্রধান উদ্যোক্তা। এ সম্মেলনে যে 'সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং জাতীয় স্বাধীনতার সমর্থক সংঘ' (League against Imperialism and for National Independene) গঠিত হয় তিনি পরবর্তী কালে তার সম্পাদকও হয়েছিলেন জার্মান কমিউনিস্ট, মুনজেনবুর্গের সংগে। এ আন্দোলনে ও সংঘে তখন সমবেত হয়েছিলেন বহু দেশের কমিউনিস্ট ও জাতীয় আন্দোলনের প্রতিনিধিবর্গ।

১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে লাইপজিগের ডিমিট্রভ মিউজিয়ামে বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের কাগজপত্রের মধ্যে আমি জার্মান ভাষায় এ সম্মেলনের যে-বিবরণীটি পাই তার থেকে জানা গেল যে ঐ সম্মেলনে ভারতবর্ষ থেকে ৭ জন, চীন থেকে ২৫ জন, ইন্দোনেশিয়া থেকে ৬ জন, ইন্দোচীন থেকে ৬ জন, জাপান থেকে ১জন (বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা, সেন কাটায়ামা), জার্মানি থেকে ২৬ জন, ইংল্যাণ্ড থেকে ১৫ জন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৫ জন ও ফ্রান্স থেকে ১৪ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে ভারতীয় প্রতিনিধিদের তালিকায় দেওয়া হয়েছে এই নামগুলি :

১। জওহরলাল নেহরু—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

২। মৌলানা অধ্যাপক এম. বরকতুল্লাহ—হিন্দুস্তান গদর পার্টি

৩। বাকের আলি মির্জা—ইণ্ডিয়ান মজলিশ, অক্সফোর্ড

৪। এম. এ, রহমান—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, এডিনবরা

৫। কে. এম, পানিক্কর—লণ্ডন ইণ্ডিয়ান মজলিশ

৬। জয়সূর্য নাইডু—অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ানস ইন সেন্ট্রাল ইয়োরোপ

৭। ডাঃ কে. এস. ভাট—ওয়ার্কার্স ওয়েল্‌ফেয়ার লীগ অফ ইণ্ডিয়া, লণ্ডন

৮। এ. সি. এন. নাম্বিয়ার—অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্টস্‌ ইন ইয়োরোপ

৯। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

১০। তারিনী পি. সিংহ—ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট লেবার পার্টির ভারতীয় কমিটি

১১। জওহরলাল নেহরু—হিন্দুস্তান সেবা দল।

এর মধ্যে নেহরুর নাম জাতীয় কংগ্রেস ও হিন্দুস্তান সেবাদলের প্রতিনিধি হিসেবে দু বার দেখানো হয়েছে আর সম্মেলনে যথাসময়ে উপস্থিত হন নি বলেই বোধ হয় এম. এ. রহমান, সর্দার পানিকর ও ডাঃ ভাটকে ধরা হয় নি প্রতিনিধি হিসেবে।

সম্মেলনে যে সভাপতি মণ্ডলী নির্বাচিত হয় তাতে ছিলেন আইনস্টাইন, আঁরি বারবুস, মাদাম সুন্‌ ইয়াট্‌ সেন ও জেনারেল লু চুং লিনের মতো বিখ্যাত মানুষেরা। কার্যনির্বাহক কমিটির প্রধান নির্বাচিত হন জর্জ লান্স-বেরি ও এডো ফানিমেন এবং সেই কমিটিতে ছিলেন নেহরু ও ইন্দোনেশিয়ার মহম্মদ হাতার মতো জননেতা। আর সাধারণ সংসদে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন শাকলাৎওয়ালা। এই সম্মেলনের আয়োজনের সূত্রেই বীরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা, ডিমিট্রভের সঙ্গে।

জওহরলাল নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে ১৯২৬ সালের শেষ দিকে বার্লিন পৌঁছে তিনি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মেলনের তোড়জোড়ের কথা শোনেন এবং তাঁরই সুপারিশে জাতীয় কংগ্রেস যোগ দেয় ঐ সম্মেলনে। অনেকেরই ধারণা। ১৯২৭ সালে জওহরলালের ঐ সম্মেলনে যোগদান এবং তার কিছু দিনের মধ্যেই নেহরু পিতাপুত্রের সোভিয়েত-যাত্রার পিছনে সেদিন ছিল বীরেন্দ্রনাথের উৎসাহ।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৯৩১ সাল অবধি যুক্ত ছিল 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংঘে'র সঙ্গে।

১৯৩২ সাল থেকে হিটলার গুণ্ডাবাহিনীর উপদ্রব উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে জার্মানিতে। 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংঘে'র দপ্তরের কাছেই আবার ছিল মস্ত এক নাৎসী ঘাঁটি। যে-কোনো সময়ে দপ্তরের উপর হামলার ও বীরেন্দ্রনাথের প্রাণহানির আশঙ্কা করে জার্মানির তদানীন্তন সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত, ভ্যাভুরোস্কি তাঁকে অবিলম্বে জার্মানি ছেড়ে সোভিয়েত দেশে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। পরামর্শ যে কত সঠিক ছিল তা বোঝা যায় এই থেকে যে বীরেন্দ্রনাথ জার্মানি ছাড়ার অল্প সময়ের মধ্যেই নাৎসী বাহিনী সংঘের সমস্ত কাগজ ও জিনিসপত্র তচনচ করে ফেলে হামলা চালিয়ে। তারই মধ্যে হারিয়ে যায় তাঁকে লেখা লেনিনের চিঠি।

অতঃপর সোভিয়েত দেশে শুরু হয় বীরেন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্ব। যতটা খবর পাওয়া যাচ্ছে তার থেকে মনে হয় অবনীনাথের মতো তাঁরও এই শেষ পর্ব কেটেছিল প্রধানত জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায়। অশ্রান্ত রাজনৈতিক তৎপরতার ফাঁকে ফাঁকে তিনি ইতিমধ্যেই বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন নৃকুল-বিজ্ঞানে (Ethnography)। ১৯৩৩ সালে তিনি লেনিনগ্রাডের নৃকুলবিজ্ঞান পরিষদে (Institute of Ethnography) যোগ দেন ভারতীয় বিভাগের প্রধান হিসেবে। সেইসঙ্গে আবার তিনি ছিলেন ইন্স্টিটিউটের সমগ্র এশীয় শাখার বিজ্ঞান-বিষয়ক সম্পাদক।

ভারতবর্ষের সমাজতত্ত্ব, বিশেষ করে এদেশের মানবগোষ্ঠীর ক্রমবিকাশ বিষয়ে বীরেন্দ্রনাথের ছিল প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। পাঞ্জাবী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সোভিয়েত গবেষক, শেরেব্রিয়াকভ আমাকে জানান যে বিখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত এ. আই. ভস্ট্রিকভের পরামর্শে তিনি একদা বীরেন্দ্রনাথের কাছে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন ভারতবর্ষের বৈষয়িক সংস্কৃতি প্রসঙ্গে এবং তাঁর কাছেই লাভ করেছিলেন মহাজাতিক ভারতীয় সমস্যার প্রতি সঠিক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম পরিচয়।

বীরেন্দ্রনাথ ইংরেজ, ফরাসী ও জার্মান খুবই ভালো জানতেন। গোড়ায় রুশ ভাষায় তাঁর তেমন দখল না থাকায় তিনি অনেক সময়ে লেখালিখির ব্যাপারে সাহায্য গ্রহণ করতেন ঐ ইন্স্টিটিউটেরই আর-এক কর্মী, শ্রীমতী লিডিয়া

এডোয়ার্ডোভ্না কর্নোভস্কাইয়ার। এরই সূত্রে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা ও পরে বিবাহ।

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় আমাকে জানান যে বীরেন্দ্রনাথের বহু লেখা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন দেশের নানা পত্রিকা ও সংকলনে। রচনাগুলির বিষয় থেকে তাঁর জ্ঞান ও আগ্রহের পরিধি কিছুটা অনুমান করা যায়— রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, দর্শন কিছুই বাদ যায় নি সেই তালিকা থেকে। তবে শেরেব্রিয়াকভ বীরেন্দ্রনাথের দুটি রচনার দিকে বিশেষ করেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দুটিই অবশ্য নৃকুলবিজ্ঞান-বিষয়ক। একটি হল এংগেলসের সুবিখ্যাত 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উদ্ভব' গ্রন্থ প্রকাশের ৫০-তম বার্ষিক উপলক্ষে ১৯৩৪ সালে সোভিয়েত দেশে শ্রেণীবিভাগের পূর্বেকার সমাজ-বিষয়ক যে সংকলনটি প্রকাশিত হয় তার ভিতরে বীরেন্দ্রনাথের ভারতীয় গোষ্ঠী সংক্রান্ত রচনা (রুশভাষায় লেখা প্রায় ৬০ পৃষ্ঠার ঐ প্রবন্ধের একটি কপি শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় আমাকে দিয়েছেন —গ্রন্থকার)। দ্বিতীয়টির বিষয় হল সোভিয়েত *Ethnographic Journal*-এর ১৯৩৬ সালের ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত (পৃ. ১১৬-২১) 'ভারতীয় নৃকুলবিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্য'।

গবেষণা ছাড়া বীরেন্দ্রনাথকে ঐ সময়ে মাঝে মাঝে বক্তৃতা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করতে দেখা যেত ভারতের জাতীয় আন্দোলনের স্তর সম্পর্কে। আর-এক জায়গায় দেখা যায় যে তাঁকে 'কমিন্টানে'র দপ্তর থেকে মস্কো পাঠানো হচ্ছে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক নীতি সম্পর্কে মালমশলা সংগ্রহের জন্য। কিন্তু ঐ সময়ে তাঁর কোনো লেখা দেখলাম না 'কমিণ্টান' প্রকাশিত 'ইনপ্রেকর' পত্রিকার ফাইলে যদিও ১৯৩০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৩১ সালের ২২ অক্টোবরের মধ্যে তাঁর ৩৪-টি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল ঐ পত্রিকায়। প্রসঙ্গত এও উল্লেখযোগ্য যে ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে 'ইনপ্রেকর' পত্রিকা প্রকাশ শুরু হওয়ার সময় থেকে ১৯২৯ সালে 'কমিন্টান' থেকে বিতাড়নের সময় পর্যন্ত মানবেন্দ্রনাথের বহু লেখা যখন প্রকাশিত হচ্ছিল ঐ পত্রিকায় তখন বীরেন্দ্রনাথের একটি লেখাও ছাপা হয় নি সেখানে।

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় নিজেও ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসাবে সোভিয়েত পণ্ডিত মহলে বিশেষ সমাদৃতা। বীরেন্দ্রনাথের নৃকুলবিজ্ঞান-বিষয়ক বহু লেখা ও নিদর্শন তিনি রক্ষা করেছেন পরম যত্নে এবং

স্থির করেছেন তাঁর মৃত্যুর পর ঐগুলি এবং তাঁকে লেখা বীরেন্দ্রনাথের শতাধিক চিঠি প্রেরিত হবে বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সংরক্ষণশালায়। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের ধারণা ঐ চিঠিগুলি প্রকাশিত হলে একদিকে যেমন তাতে পরিস্ফুট হবে বীরেন্দ্রনাথের চারিত্রিক মহত্ত্ব, তেমনই আবার পরিষ্কার হয়ে যাবে ঐ সময়কার বহু জটিল সমস্যাও। ইতিমধ্যে তিনি ও বীরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এ. ডাল্স্কি (শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের মতো এঁরও বয়স এখন ৮০-র উপরে। এঁর সঙ্গেও আমার দেখা হয়েছিল শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে —গ্রন্থকার) দুজনেই লিখেছেন বীরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁদের স্মৃতিকথা। আমাকে তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁদের লেখা দুটি পাঠানোর।

শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের মতে সোভিয়েত-প্রবাসী ভারতীয়দের সেদিন বিস্তর ক্ষতি করেছিলেন মানবেন্দ্রনাথ। তাঁর ধারণা মানবেন্দ্রনাথের মতামত লেনিনের নয়, আসলে ছিল ট্রট্স্কি ও রাডেকের চিন্তার কাছাকাছি।

অবনীনাথের মতো বীরেন্দ্রনাথকেও শেষ পর্যন্ত শিকার হতে হয় স্তালিন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিপূজা পর্বের ব্যাপক অনাচারের। ১৯৩৭ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাঠানো হয় কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে। সেখান থেকে তিনি আর ফিরে আসেন নি। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২০-তম কংগ্রেসের পর অনেকের মতো তাঁর ক্ষেত্রেও পুনর্বিচারের ব্যবস্থা হয়। শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় যে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি ছিল মিথ্যা এবং অবনীনাথের মতো তিনিও এখন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত পূর্ণ কমিউনিস্ট মর্যাদায়। ১৯৫৮ সালে শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়কে জানানো হয় যে বীরেন্দ্রনাথ মারা যান ১৯৪৩ সালের ৬ এপ্রিল তারিখের আগে কোনো এক সময়ে। মৃত্যুর কারণ ও স্থান এখনো পর্যন্ত অজ্ঞাত।

রুশবিপ্লব ও ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা

রুশ-বিপ্লব সেদিন যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল শুধু জার্মানির নয়, বৃটেনের ভারতীয় মহলেও। একটা বড়ো নমুনা সকলেরই জানা —সাপুরজী সাকলাৎওয়ালা। ১৮৭৪ সালে বোম্বাইয়ের এক ধনী পার্শী পরিবারে তাঁর জন্ম— মায়ের দিক থেকে তো তিনি টাটা পরিবারের সঙ্গেই সম্পর্কিত। সেই টাটারা যখন দেখলেন যে মাঝে-মাঝেই তাঁর অবনিবনা হচ্ছে ভারত-সরকারের সঙ্গে তখন বিব্রত হয়ে তাঁরা তাঁকে বিলেত পাঠিয়ে দেন তাঁর মতিগতি ফেরানোর জন্য। তাঁকে সেখানে তাই ন্যাশনাল লিবারাল ক্লাবের আজীবন সভ্যও করা হয়েছিল। কিন্তু একদিন দেখা গেল বৃটিশ উদারনীতির সব থেকে খ্যাতনামা প্রবক্তা, স্বয়ং লর্ড মর্লের সঙ্গে প্রচণ্ড বিতণ্ডার পর তাঁকে সেই ক্লাবের সভ্যপদে ইস্তফা দিয়ে যোগ দিতে 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট লেবার পার্টি''তে। সেখানেও স্বস্তি পেলেন না সাকলাৎওয়ালা। মনে হল ঐ দল ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক-স্বার্থের জন্য লড়াইয়ের চেষ্টা করছে গোটা ধনতান্ত্রিক শোষণ-ব্যবস্থার স্বরূপ না চিনেই আর ইংলণ্ডের বাইরে যে বিশাল দুনিয়া তার— বিশেষ করে তাঁর ভারতবর্ষের— কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে যোগস্থাপন না করেই।

এমন সময়ে এল ১৯১৭ সালের নভেম্বর-বিপ্লব। এত দিনে পথ খুঁজে পেলেন সাকলাৎওয়ালা। তখন থেকে তাঁর প্রথম কাজ হল সদ্যোজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকমহল যে অপপ্রচার চালাচ্ছিল তাকে প্রতিহত করা। তারপর ১৯১৯ সালে 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক' গঠনের খবর পাওয়া মাত্র তিনি দাবি তুললেন তাঁর পার্টিকে যোগ দিতে হবে ঐ 'আন্তর্জাতিকে'। নেতারা সে দাবি না মানায় সাকলাৎওয়ালা 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট লেবার পার্টি'' ছাড়লেন। ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার তোড়জোড় চলছিল বৃটেনেও। তারই জন্য ১৯২০ সালে যে ঐক্য সম্মেলন হয় তাকে অভিনন্দিত করে সাকলাৎওয়ালা এক বাণী পাঠালেন ও পরের বছরই অর্থাৎ ১৯২১ সালে যোগ দিলেন সদ্য-প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট-পার্টিতে। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি সদস্য ছিলেন ঐ পার্টিরই।

বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণীর এক শ্রেষ্ঠ নেতা ছিলেনব সাকলাৎওয়ালা। শ্রমিকদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তার একটি প্রমাণ লণ্ডনের শ্রমিক-প্রধান ব্যাটারসি কেন্দ্র থেকে তাঁর দু-দুবার বৃটিশ পার্লামেণ্টে নির্বাচন। পার্লামেন্টের ভিতরে ও বাইরে তিনি বরাবর প্রচণ্ড সংগ্রাম করেছেন বৃটিশ শ্রমিক আন্দোলন আর তাঁর ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের সপক্ষে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ঐ দুই আন্দোলনের মধ্যে সেতু-স্বরূপ।

১৯২৭ সালের জানুয়ারি মাসে সাকলাৎওয়ালা তিন মাসের জন্য ভারত সফরে আসেন। সেখানে তিনি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেন জাতীয় আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংগে। তাঁর বাগ্মিতা, সমাজতন্ত্রের পক্ষে অবিরাম প্রচার, গান্ধীজীর সংগে প্রকাশ্য বিতর্ক এবং বর্তমান দুনিয়ার পরিস্থিতি বিষয়ে সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ সেদিন গভীর রেখাপাত করে দেশের মানুষের মনে।

সাকলাৎওযালার মৃত্যু ১৯৩৬ সালের ১৬ জানুয়ারী তারিখে।

দুই দত্ত—জ্যেষ্ঠ ক্লেমেন্স ও আমাদের কাছে আরো সুপরিচিত কনিষ্ঠ, রজনী পাম দত্তকে অবশ্য পুরোপুরি ভারতবর্ষের তরফ থেকে দাবি করা ঠিক হবে না। তাঁরা বৃটেনে প্রবাসীও নন—স্থায়ী বাসিন্দা। রমেশচন্দ্র দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র, উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত তাঁদের পিতা আর মাতা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান। *Inida Today* গ্রন্থ রচনা ও ভারতবর্ষে আসার দরুন রজনী পাম দত্তের নাম ভারত-বাসীর কাছে বেশি পরিচিত। কিন্তু মনে রাখা দরকার 'কমিণ্টার্নে'র কার্য-নির্বাহক সমিতির প্রাচ্যদেশসংক্রান্ত বিভাগের তরফ থেকে ভারতবর্ষের জন্য যে বিশেষ 'ব্যুরো'টি গঠিত হয় তার তিন জন সদস্যের অন্যতম ছিলেন ক্লেমেন্স দত্ত (অন্য দুজন হলেন মানবেন্দ্রনাথ ও মহম্মদ আলি—গ্রন্থকার)। মানবেন্দ্রনাথের সুপারিশে এইটিই ১৯২৭ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বৈদেশিক ব্যুরোতে পরিণত হয় এবং প্রথমে বার্লিন ও পরে প্যারিস থেকে কাজ চালাতে থাকে।

'কমিণ্টার্নে'র পত্রিকা 'ইনপ্রেকরে'ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল ক্লেমেন্স দত্তের—রজনী পাম দত্তের ভারত-সম্পর্কিত লেখা লিখির অনেক আগে থেকে। তিনি রুশ ও জার্মান খুবই ভালো জানেন। মার্কস, এংগেলস ও লেনিনের মূল রচনা ইংরেজীতে অনুবাদের জন্য আমরা সকলেই তাঁর কাছে গভীর ঋণী।

রজনী পাম দত্তের পরিচয় ভারতবাসীকে নতুন করে দেবার প্রয়োজন নেই। প্রথমে *Modern India* ও পরে আরো সুপরিচিত *India Today*-র লেখক 'আর. পি. ডি'কে কে না চেনেন? ৫০ বছরেরও বেশি কাল ধরে তাঁর *Labour Monthly* পত্রিকার সুসম্পাদনাও আর এক বিস্ময়কর কৃতিত্ব। ১৯৭১ সালের ১৯ জুন তাঁর ৭৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। ক্লেমেন্স দত্ত সম্ভবত তাঁর চাইতে বছর দুয়েকের বড়ো।

এই শতকের বিশের কোঠায় বিলেতে আরো অনেক ভারতীয় রুশবিপ্লবের প্রভাবে আকৃষ্ট হন। এঁরা প্রায় সকলেই তখন ছাত্র। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক, অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পরবর্তী দিনে যোজনা কমিশনের সহকারী সভাপতি, ডি. আর. গাড্‌গিল, অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার, ডাঃ অজেয় বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনি বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন), নাথালাল জগজীবন উপাধ্যায় ও খান নামে পরিচিত জনৈক তরুণ মুসলমান (এঁরা দুজনেই ঘনিষ্ঠ ছিলেন বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গ) চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, পি. সি. নন্দী, মেদিনীপুরের ব্যারিস্টার, পুলিনবিহারী দিন্দা, লাহোরের ব্যারিস্টার, জীবনলাল কাপুর প্রভৃতি। এঁদের প্রায় সকলেরই তখন যোগাযোগ ঘটেছিল সাকলাৎওয়ালা ও রজনী পাম দত্তের সঙ্গে। ক্ষিতীশ প্রসাদ প্রমুখ কয়েকজন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন বার্লিনে।

আর ত্রিশের কোঠায় সাকলাৎওয়ালা ও রজনী পাম দত্তের সান্নিধ্যে এসে বহু ভারতীয় ছাত্র কমবেশি পরিমাণে প্রভাবিত হন সাম্যবাদী ভাবধারায়। অবশ্য রুশ-বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাবের চাইতে, বলা যায়, এঁদের আকৃষ্ট করেছিল অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পাশাপাশি ঐ সময়ে সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সমাজের জয়যাত্রা এবং ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলনে সোভিয়েতের এবং বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টদের ভূমিকা। তাঁদেরই অন্যতম, অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর একটি লেখায় নাম করেছেন এরকম কয়েকজনের : "...লণ্ডনে আশ্‌রফ, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার, জেড. এ. আহ্‌মদ, প্যারিসে শৌকতুল্লা আনসারী, প্রমোদ সেন, অক্সফোর্ড-কেম্‌ব্রিজে মহ্‌মুদজ্জফর, ইফতিখারউদ্দীন, সাজ্জাদ জহীর ("নিজের কথা", ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ৪০-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত 'কালান্তর' বিশেষ সংখ্যা, পৃ. ১০০)। সম্ভবত

এর সঙ্গে যুক্ত করা উচিত হাজরা বেগমেরও নাম। আবার এঁদেরই উত্তরসূরী হলেন ভূপেশ গুপ্ত, এন. কে. কৃষ্ণণ, মোহন কুমারমঙ্গলম, নিখিল চক্রবর্তী, জ্যোতি বসু, সরফ আথার আলি, রেণু চক্রবর্তী, পার্বতী কৃষ্ণান, মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিত গুপ্ত, রমেশচন্দ্র, অরুণ বসু, স্নেহাংশু আচার্য, মনীন্দ্রলাল বিশ্বাস প্রভৃতি।

সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিস্টদের প্রভাবেই ডেট্রয়েটের ফোর্ড কোম্পানির শ্রমিক, আমীর হায়দর খান ও শামসুল হুদা বিশের কোঠার গোড়ার দিকে সাম্যবাদী হন ও দুজনেই খালাসী হয়ে চলে যান সোভিয়েত দেশে। শামসুল হুদা সেখানে পৌঁছন সম্ভবত ১৯২৬ সালে। এঁরা দুজনেই পরে আসামী ছিলেন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় যদিও আমীর হায়দর খানকে তখন ধরতে পারে নি এ দেশের পুলিস। আমেরিকা থেকে কোলাচালা সীতারামাইয়াও পেট্রো-রসায়ন বিশেষজ্ঞ হিসাবে সোভিয়েত দেশে ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে। এই অন্ধ্রবাসী বিপ্লবীর সঙ্গে আমার দেখা হয় মস্কোয়।

আর ১৯২৪ সালে অনুশীলন দলের গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তী লেনিনের মৃত্যুর অল্পদিন পরে এবং ১৯২৮ সালে 'কমিন্টার্নে'র ষষ্ঠ কংগ্রেসে 'ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেন্টস' দলের পক্ষ থেকে ভোটাধিকারহীন প্রতিনিধি হিসেবে সৌম্যেন্দ্র-নাথ ঠাকুর যে সোভিয়েত দেশে গিয়েছিলেন তার উল্লেখ করা হয়েছে আগেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে অথবা ঐ যুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন দেশে যে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য তৎপর হয়েছিলেন সম্ভবত তাঁদের প্রায় সকলকেই (জাপানে রাসবিহারী বসু প্রমুখ ভারতীয় বিপ্লবীদের কথা জানি না —গ্রন্থকার) বেশ কিছুটা আকৃষ্ট করে রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব। তাঁদের অনেকে বহু কষ্ট স্বীকার করে সেদিন ছুটে গিয়েছিলেন স্বচক্ষে বিপ্লবের দেশকে দেখার জন্য। এটা নিছক কৌতূহল নয়, এর পিছনে ছিল এই ধারণা যে এখানেই হয়তো হদিস মিলবে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার পথের। এমন-কি, তাঁদের মধ্যে কয়কজনের সঙ্গে দেখা ও কথা হয়েছিল রুশ-বিপ্লবের অদ্বিতীয় নেতা লেনিনের।

যে-সকল প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী সেদিন ঐভাবে রুশ-বিপ্লবের আদর্শে কম বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এই ক'টি ধারা লক্ষ্য করা যায়: 'বার্লিন কমিটি', কাবুলের অস্থায়ী ভারত সরকার, হিজরৎ আন্দোলন, বৃটিশ

সৈন্যবাহিনী থেকে পলাতক ভারতীয় সিপাহী, তাসখন্দের 'ভারতীয় বিপ্লবী সমিতি', সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত মধ্য-এশিয়ার দেশগুলির ভারতীয় বাসিন্দা, আর 'গদর' দল। আর কিছু বিপ্লবী এসেছিলেন যাঁরা মানবেন্দ্রনাথ বা অবনীনাথের মতো একদা ভারতবর্ষের জাতীয় বিপ্লবী দলের তরফ থেকে বিশ্বযুদ্ধের সময়কার জগদ্ব্যাপী বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে যোগ দিয়ে থাকলেও, পরে সোভিয়েত দেশে পৌঁচেছিলেন কমিউনিস্ট হিসেবেই।

একটু নজর করলে দেখা যাবে যে এই ধারাগুলির মধ্যে তখন সমাবেশ হয়েছিল বিচিত্র ধরনের মানুষের। যেমন মহেন্দ্রপ্রতাপ ছিলেন একজন সামন্ত রাজা। সিপাহী-বিদ্রোহ দমনের যে চোট একদিন যুক্তপ্রদেশ ও অযোধ্যার তালুকদারদের উপরে পড়েছিল তারই অপমান ও লাঞ্ছনার অনুভূতিই হয়তো তাঁকে টেনে এনেছিল বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে। মৌলানা বরকতুল্লাহ্ বা মৌলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধি ছিলেন ইসলামী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ধর্মপ্রাণ মুসলমান। এঁদের উপরে হয়তো কিছুটা কার্যকর ছিল উনিশ শতকের ওহাবী আন্দোলনের ঐতিহ্য।

ধনী পার্শী পরিবারের কন্যা ও বধূ শ্রীমতী ভিকাজী রুস্তম কামাই সম্ভবত ভারতবর্ষের প্রথম মার্কসবাদী। ১৯০৭ সালেই তিনি ধরতে পেরেছিলেন বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে লেনিনের ভূমিকার গুরুত্ব, ১৯০৭ সালের আগেই তিনি সদস্য হয়েছিলেন ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টির এবং স্বাগত জানিয়েছিলেন ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবকে। বীরেন্দ্রনাথ, খানখোজে, ভূপেন্দ্রনাথ, মানবেন্দ্র-নাথ, অবনীনাথ, রহমৎ আলি জ্যাকারিয়া, সুরেন কর, লুহানী, মহম্মদ আলি— এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী—তাঁদের স্কুল-কলেজের লেখাপড়ার দৌড় যাই হোক-না-কেন। এঁরা প্রত্যেকেই জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বা ঐ সময় থেকেই। আর প্রেম সিং গীল ও সীতারামাইয়া যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হিসেবেই সোভিয়েত দেশে পৌঁছেছিলেন —তা তো আগেই দেখেছি।

আবার এঁদের পাশাপাশি ছিলেন হিজরৎ বা 'গদর' আন্দোলনভুক্ত (কিছু সাধারণ ছাত্রের পাশাপাশি), বহু অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত কৃষক ও মজুর। আর বৃটিশবাহিনী থেকে পলাতক ভারতীয় সিপাহীরাও তো আসলে উর্দীপরা কৃষকই।

এঁদের মধ্যে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের যেমন সেদিন বিশেষভাবেই আকৃষ্ট করেছিল রুশ-বিপ্লবের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের বাণী ও কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ, তেমনই আবার শ্রমিক কৃষক ও গরিব মানুষের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল প্রধানত মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও অত্যাচারের উচ্ছেদসাধন, চাষের জমি পাওয়া ও সাধারণভাবে গরিবের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার ঘটনা। তাঁরা প্রত্যেকেই আপন আপন চেতনার স্তর থেকে শুরু করেই সেদিন এগোবার চেষ্টা করেছিলেন ভারতবর্ষের মুক্তিসাধনার পথে। সে মুক্তি বিদেশীর পরাধীনতা শৃঙ্খল থেকেই শুধু নয়, সবরকম শোষণ থেকেই মুক্তি।

আর তারই জন্য রুশ-বিপ্লবের গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্তে প্রভাবিত প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা তাঁদের সঠিক পথের সন্ধানের মধ্য দিয়ে সেদিন নতুন এক অধ্যায় যোজনা করতে পেরেছিলেন ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে।

—

পরিশিষ্ট

'পরিশিষ্ট' সম্পর্কে একটা কথা। মূল ইংরেজী দলিল-গুলি এখানে ইংরেজিতেই রাখা হয়েছে। আর রুশ বা জার্মান ভাষার দলিল প্রকাশ করা হয়েছে বাংলায়— অধি-কাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য সরাসরি নয়, ইংরেজী তর্জমার তর্জমা ক'রে। ঐ সব ভাষা থেকে যাঁরা সরাসরি বাংলায় অথবা ইংরেজীতে তর্জমা করেছেন তাঁদের নাম যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে। আর অন্যরকম উল্লেখ না থাকলে সাধারণভাবে এই বইয়ের সমস্ত বাংলা তর্জমা ধরতে হবে লেখকেরই।

১

দ্রষ্টব্য ॥ পৃ. ৩

রবার্ট ওয়েনের পুত্র, রবার্ট ডেল ওয়েনকে লেখা রামমোহন রায়ের এই চিঠিটি সংরক্ষিত রয়েছে নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরিতে। সেখানে এর সন্ধান পান শ্রীচঞ্চল সরকার ও তাঁর কাছ থেকে খবর পেয়ে ঐ চিঠির একটি কপি ঐ লাইব্রেরি থেকে সংগ্রহ করেন শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস।

48 Bedford Square
April 19th 1833

Dear Sir,

Not having been sufficiently fortunate yesterday to find you, or any of your friends at home I feel induced to make one or two remarks in writing to which, from what I have heard from you on Tuesday night, I think you will agree. They are as follows : It is not necessary either in England or in America, to oppose Religion in promoting the Social domestic and political welfare of their Inhabitants particularly a system of Religion which inculcates the doctrine of Universal love and charity. Did such philanthropists as Locke or Newton oppose Religion ? No ! They rather tried to remove the perversions gradually introduced in Religions. Admitting for a moment that the Truth of the Divinity of Religion cannot be established to the satisfaction of a freethinker, but from an impartial enquiry, I presume we may feel persuaded to believe that a system of Religion (Christianity) which consists in love and charity is capable of furthering our happiness, facilitating our reciprocal transactions and curbing our obnoxious sus-

picions and feelings. I grieve to observe that by opposing Religion your most benevolent father has hitherto impeded his success. He, I seriously believe, is a follower of Christianity in the above sense though he is not aware of being so. Allow me to send Hamiltons (Hamilton's) East Indies (1st. vol.) in which you will find page 35 line 36, that more than two thousand years ago wise and pious Brahmans of India entertained almost the same opinions which your father offers though they by no means were destitute of religion.

My desire to see you and your father crowned with success in your benevolent undertakings, has emboldened me to make these observations, a freedom which I hope, you will, in consideration of my motives, excuse. With my best compliments to your father and kind regards to Mrs. and Miss Owen, I remain with my best wishes for your success Dear Sir

Yours very faithfully,
Rammohun Roy

P. S. I am now troubled with a strong attack of Influenza, which prevents me from sitting for a few minutes or writing a few lines. R. R.

২

দ্রষ্টব্য ॥ পৃ. ২৫
হাইণ্ডমান তাঁর আত্মস্মৃতিতে লিখেছেন : "লেখা শেষ করে আমি *Nineteenth Century*-তে পাঠাবার তোড়জোড় করছি কিন্তু কেবল মনে হচ্ছে লেখাটার পরিসংখ্যান-গত দিকটি যতটা স্পষ্ট ও প্রত্যয়সিদ্ধ করা দরকার ছিল ততটা ঠিক হল না, এমন সময় একদিন বেড়াতে বেড়াতে পার্লামেন্টের বইয়ের দোকান কিংস কোম্পানিতে হাজির হলাম··· । দোকান থেকে বেরোবার সময়ে একটি মলাট-ছেঁড়া পুস্তিকা আর তলা থেকে সাদা পৃষ্ঠপটের উপরে বেশ মোটা হরফে 'Poverty of India' কথাগুলি নজরে এল। মলাটটা থাকলে কথাগুলি নিশ্চয়ই চোখে পড়ত না। আমি জানতে চাইলাম 'ওটা কি ?' জবাব পেলাম 'শুধু এক ঝুড়ি পরিসংখ্যান'। তখুনি বইটা হস্তগত করলাম— দেখলাম যে শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরজী সেখানে আমার লেখাটা সম্পূর্ণ করার জন্য ভারত-সম্পর্কে আমার যে পরিসংখ্যানের দরকার ছিল ঠিক তাই আমাকে জুগিয়েছেন" (*The Record of an Adventurous Life*, পৃ. ১৭৫)।

দাদাভাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ কীর্তি *Poverty and un-British rule in India*-র সঙ্গে এমনি আকস্মিক পরিচয় হাইণ্ডমানের। এই যোগাযোগ অনতিবিলম্বে পরিণত হয় পরস্পরের গুণগ্রাহিতা ও অন্তরঙ্গতায়। তবে নরমপন্থী দাদাভাইয়ের সঙ্গে বৃটিশ শ্রমিক মহলে তখনকার দিনে বামপন্থী বলে পরিচিত হাইণ্ডমানের কিছুটা দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যও ধরা পড়ে পত্রবিনিময়-কালে।

১৮৮২ সালের ২৮ জানুয়ারি হাইণ্ডমান দাদাভাইকে লেখেন "···এখানে বিপ্লব (Revolution) না ঘটা অবধি ভারতবর্ষের জন্য কিছুই করা যাবে না। উচ্চ আর মধ্যশ্রেণী কোনো কথাই শোনে না— তোয়াক্কাও করে না। কাজেই আমি সম্ভব হলে শান্তিপূর্ণ পন্থায় বিপ্লব সংঘটনের চেষ্টা করছি। তবে চূড়ান্ত মুহূর্তে বলপ্রয়োগ থেকেও আমি নিরস্ত হতে চাই না, অবশ্য যদি আমরা তার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠি।··· ধীরে ধীরে আমরা এখানে মস্ত একটা অভ্যুত্থানের ('A great upheaval') জন্য কাজ করে চলেছি। সেটা যখন

ঘটবে তখন তার থেকে লাভবান হবে ভারতবর্ষও।...সত্য কথা বলতে গেলে গত বছর-দুইয়ের মধ্যে ভারতের ব্যাপারটা **পিছু হটে গেছে** উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মধ্যে আর এগিয়ে গেছে শ্রমিক শ্রেণীর ভিতরে। তাদের কাছে, শুধু তাদের কাছেই আপনি আশা করতে পারেন ন্যায়বিচার।"

জবাবে দাদাভাই লিখলেন: "...শ্রমজীবী শ্রেণীদের উদ্বুদ্ধ করলে যে অনেক কিছু ভালো সম্ভব হবে তাতে সন্দেহ নেই। খুবই কঠিন একটি ব্রত—শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সাধনের কাজে আপনি হাত দিয়েছেন। আন্তরিকভাবে আমি আপনার সাফল্য কামনা করি।"—আর. পি. মাসানি, *Dadabhai Naoroji*, পৃ. ৭৬-৭৭)।

হাইণ্ডমান ও বিলাতের শ্রমিক মহলের সঙ্গে দাদাভাইয়ের এই ঘনিষ্ঠতায় কিন্তু সেদিন অস্বস্তিবোধ করেছিলেন তাঁর কোনো কোনো ভারতীয় বন্ধু। এমন-কি, হরিশ মুখুজ্যের স্মৃতি-বিজড়িত *Hindu Patriot* পর্যন্ত দাদাভাইয়ের এই নয়া হালচালকে বরদাস্ত করতে পারে নি—বলেছিল, এ হল এক 'বিপজ্জনক নীতি' ('A dangerous policy') ঠিক যেমন কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় একদিন সুরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন 'A hot-headed disciple of Mazzini'! দাদাভাইকে জবাবদিহিতে বলতে হয়েছিল: "সমাজতন্ত্রীরা আমাদের সাহায্য করছে বলে বিরূপ হবেন না। ভারতবর্ষের ব্যাপারে ইংরেজদের মাথা ঘামানোয় প্রবৃত্ত করার কাজটা যে কত কঠিন তা আপনারা যদি পুরোপুরি জানতে পারতেন... তা হলে আপনারা সমাজতন্ত্রীদের কাছ থেকে আমরা যে সাহায্য পাচ্ছি তার মূল্য বুঝতেন—আর সেটা আমরা পাচ্ছি তার কারণ তাঁদের নেতা হলেন শ্রীযুক্ত হাইণ্ডমান।... এটা আমাদের একটা পরম অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য যে ভারতবর্ষের ব্যাপারটা এখন হাতে নিয়েছে শক্তিশালী ও অগ্রণী একটা সংস্থা। ভবিষ্যৎ মূলত তাদেরই হাতে।"

কিছুদিন পরে ১৮৯৭ সালে হাইণ্ডমান *Justice* পত্রিকায় লেখেন: 'একটা জবরদস্ত গোছের আন্দোলন না চালালে কিছুই হবে না। এখানে এবং ভারতবর্ষে যে-সব ভারতীয় গুরুত্ব দিয়ে নিজেদের কাজটা গ্রহণ না করে সব ব্যাপারটাই বরাত দিয়ে রাখে আপনার এই অধমের উপরে আর দিন কয়েক আগে যেমনটা ঘটেছে জাতীয় কংগ্রেসে বোকার মতো প্রস্তাব নেয় মহারাণীকে অভিনন্দিত ক'রে—তাদের সম্পর্কে আমি ঘৃণা বোধ না করে পারি না। কীজন্য

অভিনন্দন ? আগামী দু-তিন পুরুষ পর্যন্ত ভারতবর্ষকে সর্বস্বান্ত করার জন্য ? খুবই মর্মান্তিক এই ঘটনা। হোমরা চোমরারা আমায় প্রশ্ন করেছেন : "কোথায়, মিঃ হাইণ্ডমান, অসন্তোষের প্রমাণ ? ভারতবাসীদের নিজেদের তরফ থেকে কোথায় ন্যায়বিচারের দাবি ? আপনি যেমনটা বলেন মানুষ যদি সেখানে সত্যই অত গরিব ও নিপীড়িত হত তা হলে আমরা নিশ্চয়ই আজ যতটা পাচ্ছি তার চাইতে আর একটু বেশি শুনতাম তার কথা !" কি জবাব আমি দেব ঐ চ্যালেঞ্জের উত্তরে ? কোনো জবাবই নেই।…ভালো কিছু চাইলে এখন সময় হয়েছে উঠে পড়ে লাগার, আলোড়নের। আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব, আমাদের সংস্থা ও *Justice* পত্রিকাও করবে ; কিন্তু ঈশ্বর তাদেরই সাহায্য করেন যারা নিজেদের সাহায্য করতে প্রস্তুত।"

ঘাবড়ে গিয়ে দাদাভাই হাইণ্ডমানকে জবাবে লেখেন : "জাস্টিস পত্রিকায় আপনার প্রবন্ধ পড়ার পর আর আমার পক্ষে সম্ভব নয় ভারতীয় ব্যাপারে আপনার ও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশনের সঙ্গে কাজ করা। আমার কামনা ও লক্ষ্য বিদ্রোহে ('rebellion') উৎসাহদান নয়, বিদ্রোহ যাতে না ঘটতে পারে আর ভারতের সঙ্গে বৃটিশের সম্পর্ক যাতে দুই দেশের পক্ষেই মঙ্গলদায়ক ও আশীর্বাদ-স্বরূপ হয়—তাই দেখা" (ঐ, পৃ. ১৩০-৩১)।

বছরখানেক পরে হাইণ্ডমান আবার দাদাভাইকে লিখলেন : "নরমপন্থা চালিয়ে কী লাভ হয় আপনাদের ? তারা আপনাদের লাথি মারে আর আমাদের ক্ষেত্রে যা করে তার চাইতে অনেক বেশি আইন চালু করে রাজদ্রোহ সম্পর্কে। আমাদের অন্তত এই সান্ত্বনা আছে যে আমরা তাদের পিছনে লাগি, তাদের ঠাট্টা করি, বোকা বানাই ও চটিয়ে দিই।" দাদাভাই কিন্তু এবার এ অভিযোগের যাথার্থ্য মেনে নিলেন, লিখলেন : "জন বুল ঘেউ ঘেউ ডাকে ঘাবড়ায় না— সে শুধু বোঝে কামড় আর আমরা পারি না কামড়াতে।"

১৯০০ সালের পর হাইণ্ডমান ধৈর্য হারিয়ে আক্রমণ শুরু করেন কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনসর্বস্ব নীতির বিরুদ্ধে। ১৯০৪ সালের ১ অক্টোবর দাদাভাই ফের হাইণ্ডমানকে লিখলেন : "আপনি যদি কংগ্রেসকে আক্রমণ বা হেয় করেন তা হলে আপনি দুর্বল ও নিরুদ্যম করবেন সেই একটি মাত্র সংস্থাকে যার মারফৎই ভারতবর্ষকে সন্ধান করতে হবে তার মুক্তির দিশা। সে-কাজ হবে

ভারতের ক্ষতিসাধন যা আপনি নিশ্চয়ই চান না। আমি তাই আশা করি আপনি এমন কাজ করবেন না যাতে ক্ষতি হয় কংগ্রেসের।"

—Prof. Sachchidananda, "Hyndman and India", *Modern Review*, অক্টোবর, ১৯৪৯।

হাইণ্ডমান ছাড়াও ঐ সময়ে বৃটিশ শ্রমিক নেতা, কেয়ার হার্ডি'র সঙ্গেও ভারতীয়দের বেশ-কিছুটা যোগাযোগ হয়। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোল্লিখিত স্মৃতিচারণে সে-কথার উল্লেখ করেছেন তা আমরা আগেই দেখেছি। গোখলে ও বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গেও তাঁর কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯০৮ সালে কেয়ার হার্ডি ভারত-সফরে আসেন। লেনিন তাঁর সুপরিচিত "বিশ্ব রাজনীতি-ক্ষেত্রে দাহ্য পদার্থ" প্রবন্ধে সে-সফর প্রসঙ্গে লেখেন : "···বৃটিশ পার্লামেণ্ট সদস্য ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টি'র সভ্য, কেয়ার হার্ডি যখন ভারতভ্রমণের এবং ভারতীয়দের কাছে একান্ত প্রাথমিক গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়া সম্পর্কে কথা বলার দুঃসাহস দেখান তখন সমগ্র বৃটিশ বুর্জোয়া সংবাদপত্রমহল প্রচণ্ড সোরগোল শুরু করে ঐ 'বিদ্রোহী'র বিরুদ্ধে" (*Collected Works*, খণ্ড ১৫, পৃ. ১৮৪)। কলকাতা সফরকালে কেয়ার হার্ডি 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা সম্পাদক, কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের ৬নং কলেজ স্কোয়ার-স্থিত বাড়িতে যান এবং কৃষ্ণকুমারকে ঐ সময়ে বিনা বিচারে আগ্রা জেলে আটক রাখার ব্যাপারে তাঁর পুত্র, শ্রীসুকুমার মিত্রের সঙ্গে কথা বলেন। অপূর্বকুমার ঘোষ, অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কে চৌধুরী প্রমুখ যাঁরা তখন কিছুটা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করেছিলেন হার্ডি তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। শোনা যায় তাঁদেরই একজন—প্রেমতোষ বসু মহাশয় নাকি পরে বিলেতে গিয়ে একান্ত সচিব হন কেয়ার হার্ডি'র।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। স্বদেশী যুগে প্রবল জাতীয়তাবাদী ভাবনার জোয়ার ও গুপ্তসমিতিগুলির রোমাঞ্চকর, সীমিত সশস্ত্র কার্যকলাপের পাশাপাশি আরো একটি চিন্তা ও কর্মকাণ্ডের ধারাও লক্ষ্য করা গিয়েছিল এ দেশে, অবশ্য খুবই অপরিস্ফুট রূপে। সেটি হল সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও তারই দ্বারা প্রভাবিত শ্রমিক আন্দোলনের ধারা। আর এই ধারার নেতৃত্বে যাঁদের দেখা গিয়েছিল তাঁদের প্রেরণার উৎস ছিল ইয়োরোপের সমাজতান্ত্রিক ও শ্রমিক আন্দোলন। এঁরা অনেকেই ছিলেন বিলেত-ফেরত

ব্যারিস্টার। এঁদের প্রসঙ্গেই *Englishman* সেদিন লিখেছিল : "কোনো কোনো বাঙালী ব্যারিস্টার ও আরো কেউ কেউ যাঁরা বৃটিশ পণ্য বয়কটের ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা এখন তাঁদের অবসরকাল নিয়োগ করছেন ইয়োরোপীয়দের দ্বারা পরিচালিত বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্ম-চারীদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার কাজে। বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে কলিকাতা ও তার আশেপাশের চটকল কারখানা গুলির উপরে" (১৯০৬ সালের ২৮ জুলাইয়ের *Times of India* থেকে উদ্ধৃত)। এঁদের কয়েকজনের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে এ-প্রসঙ্গে। গণিতশাস্ত্রবিদ পি. ঘোষের পুত্র, এথেনেসিয়াস অপূর্বকুমার ঘোষ ছিলেন একজন খৃস্টান ব্যারিস্টার। তিনি অনুশীলন দলের প্রতিষ্ঠাতা, প্রমথনাথ (ব্যারিস্টার পি. মিত্র নামে সুপরিচিত) মিত্রের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন কিন্তু কখনো ঐ দলের সভ্য হন নি। কারণ-তিনি ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের পথে বিশ্বাসী ছিলেন না, বরং ব্যাপক আকারে অহিংস প্রতিরোধের দ্বারা দেশের লোকের সাহস ও সংহতি বৃদ্ধিই তাঁর কাম্য ছিল। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে তিনি বলতেন, 'সরকারের আইন ভেঙে লোকজন ময়দানে এসে জড়ো হোক, তাতে পুলিস গুলী ছোঁড়ে তো ছুঁড়ুক, আমি সেই সমাবেশে যোগ দেব'।

অপূর্বকুমার ঘোষ ডঃ দত্তের ভাষায় সোশ্যালিস্ট ছিলেন। "অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (এঁর কথায় পরে আসছি —গ্রন্থকার) আমাকে বলেছিলেন, "লণ্ডনে সোশ্যালিজম বিষয়ে তিনি **lectured from a hundred platform**। সোশ্যালিজম এবং ভারতের রাজনীতিতে তাহা কি প্রকারে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহা তিনি আমায় ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেন" (ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম', পৃ. ১৪৪-৪৮)। "তাঁহার সঙ্গে আমায় দেখা হইলেই তিনি কেবল সোশ্যালিজমের কথা পাড়িতেন' (ঐ, পৃ. ৩৩)।

ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ও তাঁর 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'তেও (পৃ. ২০৭) এঁর সম্পর্কে লিখেছেন : "ব্যারিস্টার অপূর্ব ঘোষ বলতেন 'জগতে সমসমাজবাদের দিন এগিয়ে আসছে। পুঁজিবাদের নিজের ভারে নিজে ভেঙে উল্টে পড়ার সময় সমাগতপ্রায়। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে যুবকদের কাজে অগ্রসর হওয়া যুক্তিসংগত। কাঁচামালের বাজার ভারতকে যারা করে রেখেছে, স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য এদেশে কিছু কল-কারখানা ও বিদ্যাগার তারা করতে বাধ্য। তার

ফলে কৃষিপ্রধান সভ্যতা ও আগামী শিল্পপ্রধান সভ্যতার ঠোকাঠুকি লেগে এদেশে একটা অসাধারণ নবজাগরণ হবে। সেইটেতেই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলে সাফল্য হস্তামলকবৎ প্রত্যক্ষ হয়ে দাঁড়াবে। এই-যে নানারকম যুদ্ধবিগ্রহ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে, এ আর কিছু নয় শুধু পুঁজিবাদের জীবন অযথা বাড়াবার বিফল প্রচেষ্টা।"

আর-এক জায়গায় (পৃ. ২৭১) যাদুগোপাল লিখেছেন, অনুশীলন সমিতির অনুষ্ঠানে "বিপিনচন্দ্র রাষ্ট্রনীতির ক্লাস নিতেন। সি. আর. দাশ রাষ্ট্রনীতিক সংঘর্ষের রূপ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী রাজনীতি অর্থনীতির ব্যাখ্যা শোনাতেন। · অপূর্ব ঘোষ আমাদের সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছিলেন। সখারামবাবু ইতিহাসের ক্লাস নিতেন"।

তবু শুধু যদি এই হত তা হলে হয়তো বলা যেত এ-সব ব্যারিস্টারী পড়ার সময়ে বিলেতে রপ্ত করা সমাজতন্ত্রের বুলি কপচানো মাত্র। কিন্তু ডঃ দত্ত লিখেছেন "স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং বিভাগের ধর্মঘট হয় (১৯০৫ সালে —গ্রন্থকার) তখন বিপিনচন্দ্র পাল ও ইনি (অর্থাৎ অপূর্বকুমার ঘোষ —গ্রন্থকার) তাহা পরিচালনা করেন। ১৯০৭ খৃঃ E I R স্ট্রাইক হইলে ধর্মঘটীদের প্রথম সভা 'সন্ধ্যা' অফিসের ছাতে (কর্নওয়ালিস স্ট্রীট) আহূত হয়, তিনি তাহার সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় 'সন্ধ্যা' পত্রের পক্ষ হইতে আমি রিপোর্টারের কর্ম করি···" ('ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম', পৃ. ১৪৭)। যাদুগোপালও তাঁর 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'তে লিখেছেন : "···গভর্নমেন্টের ছাপাখানায় একটা ধর্মঘট হয়। বিপিনচন্দ্র পাল ও ব্যারিস্টার অপূর্ব ঘোষ তার নেতৃত্ব করেন। সসম্মানে এটির নিষ্পত্তি হয়। এইখানে প্রথম দেখা যায় জনপ্রিয় নেতারা ধর্মঘট পরিচালনা করছেন। এর পর ইস্ট-ইণ্ডিয়ান রেলে ধর্মঘট হয়। এতে ব্যারিস্টার ঘোষ খুব বড় অংশ গ্রহণ করেন" (পৃ. ২৫৩-৫৪)।

লাল-বাল-পালের চরমপন্থী নেতৃত্ব ঐ সময়ে যেমন একদিকে 'স্বদেশী' ও রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রণী তেমনি আবার ১৮৯৬ সালে জি. আই. পি. রেলওয়ে সিগনালার্স ইউনিয়নের ও তিন বছর পরে তাদের ধর্মঘটের পুরোভাগেও দেখা যায় বালগঙ্গাধর তিলককে (১৯০৮ সালে তাঁর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে যে বোম্বাইয়ে শ্রমিক ধর্মঘট হয় তা দৃষ্টি আকৃষ্ট করে লেনিনের);

বিপিনচন্দ্র পালকে ১৯০৫ সালে দেখি সরকারী ছাপাখানা ধর্মঘট পরিচালনা করতে আর আরো পরে ১৯২০ সাল সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে।

এই যেমন একদিক তেমনি অন্যদিকে অপূর্বকুমার ঘোষ, অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী, প্রেমতোষ বসু, জে. এন. রায়, সুরেন্দ্রনাথ হালদার প্রমুখ ব্যক্তিরা যাঁরা শ্রমিকদের মামলা চালাতেন, তাদের ধর্মঘট পরিচালনা করতেন এবং সমাজতন্ত্র অথবা রাজনীতির অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রচার করতেন, তাঁরা সকলেই আবার যোগ দিয়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনেও। ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে' (পৃ. ১৪৮) অপূর্বকুমার ঘোষ সম্পর্কে লিখেছেন: "তিনি সোশ্যালিস্ট হইয়াও বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদীর কর্মের সহিত যোগদান করিতেন। এইজন্য শিবাজী উৎসব উপলক্ষে তিলককে যে সম্বর্ধনা করা হয় তজ্জন্য সখারাম বাবু ও আমি তাঁহাকে আমন্ত্রিত করিতে যাইলে তিনি বলিলেন, 'আমি হিন্দু নহি, আমি খৃষ্টান, কিন্তু আমাদের দেশের লোক এত ধর্মান্ধ যে তাহাদের ধর্মের খ্যাপান দিয়া জাগ্রত করিবার চেষ্টাতে আমার আপত্তি নাই'।"

অপূর্বকুমার তখনকার দিনের ধর্মঘটগুলির সংগে যেমন জড়িত ছিলেন তেমনি আবার 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে ভূপেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যখন সরকার মামলা করে, তখন মকদ্দমার দ্বিতীয় দিনে তিনি কোর্টে দাঁড়ান ভূপেন্দ্রনাথের পক্ষে।

তেমনি হেমচন্দ্র কানুনগোর 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা"য় প্রকাশিত (পৃ ৩৩০) জনৈক এ. সি. রায়ের চিঠি থেকে জানা যায় যে আলিপুর জেলে সত্যেন বসুর ফাঁসীর পর (নরেন গোস্বামীর হত্যার জন্য কানাইলাল দত্তের সংগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত) তাঁর দেহের সৎকারের জন্য তিনি "···কোন দেশমান্য সম্পাদকের শরণাপন্ন হইলাম। তথায় কোন আশা না পাইয়া ··স্বদেশ প্রেমিক এবং এ দেশে ধর্মঘটের ইতিহাসের সর্বপ্রথম নায়ক ও আমার পরম সুহৃদ শ্রীযুক্ত বাবু প্রেমতোষ বসু মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলাম। ইস্ট ইণ্ডিয়া (রেল) কর্মচারীদিগের প্রথম ধর্মঘটের ইনিই উদ্যোক্তা, হোতা ও নেতা। ইনি পরে বিলাতে কেয়ার হার্ডির প্রাইভেট সেক্রেটারি হইয়াছিলেন ও তথায় পরলোকগমন করেন।

প্রেমতোষ বাবু দাহের নিমিত্ত লোকজন সংগ্রহ করিয়া দিলেন ও অগ্রবর্তী হইয়া দাঁড়াইলেন।"

সত্যেন বসুর তরফে "প্রিভি কাউন্সিলে আপীলের জন্য প্রেমতোষ বসুর উদ্যোগে শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও আনন্দমোহন পাল মহাশয়ের সহায়তায় পোস্তার বাজারে প্রায় ৪ শত টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল" (ঐ, পৃ. ৩৩৩)।

ব্যারিস্টার অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বয়সে ব্যারিস্টার পি. মিত্রর চাইতে বেশ-কিছু ছোটো হলেও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন ও সেই সূত্রে বিশিষ্ট সদস্যও হয়েছিলেন অনুশীলন সমিতির। তবে ঐ সময়ে তাঁর বিশেষ খ্যাতি শ্রমিক নেতা হিসাবেই। দক্ষিণে বজবজ পর্যন্ত বহু চটকল শ্রমিককে তিনি 'মিলহ্যাণ্ডস্ ইউনিয়নে' সংঘবদ্ধ করেন। তা ছাড়া সরকারী ছাপাখানা ও আসানসোল ই. আই. রেলওয়ে কর্মচারীদের ধর্মঘটেও তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। স্বদেশী যুগ সম্পর্কে অধ্যাপক সুমিত সরকার লিখিত প্রকাশিতব্য গবেষণাগ্রন্থে বহু তথ্য জানা যাবে অশ্বিনীকুমার সম্পর্কে।

কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার এ প্রসঙ্গে। এর আগেও—১৮২৭ সালে কলকাতার পালকি-বেয়ারাদের ধর্মঘট থেকে শুরু করে আমরা এখানে কয়েকটি শ্রমিক ধর্মঘট ও বিক্ষোভের কথা শুনেছি। কিন্তু সেগুলি ছিল প্রচণ্ড শোষণের বিরুদ্ধে বহুলাংশেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ। দ্বিতীয়ত, সেগুলি ছিল একান্তভাবেই সংকীর্ণ বৃত্তি ও এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কোনো বৃহৎ জাতীয় আলোড়নের পৃষ্ঠপটে ওগুলি সংঘটিত হয় নি সেদিন।

ঐ দুই দিক থেকেই ১৯০৫-০৮ সালের প্রয়াসগুলি কিছুটা স্বতন্ত্র ধরনের। স্বদেশী আন্দোলনের পৃষ্ঠপটে, অনেক সময়ে স্বদেশী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতাদের পরিচালনায় ঐ ধর্মঘট বা বিক্ষোভগুলি সংগঠিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তাদের নেতৃবর্গের অনেকের মনে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সঙ্গে সেদিন পেঁচেছিল সমাজতন্ত্রের অস্ফুট বাণীও।

৩

দ্রষ্টব্য ॥ পৃ. ৫০

রুশ প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে যাঁরা মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পরাধীন দেশ বা উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস বিচারের সূত্রপাত করেন মিখায়েল পাভলোভিচ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে প্রকাশিত তাঁর এই বইগুলির নাম থেকেও সে কথা কিছুটা ধরা পড়ে: 'বিশ্বযুদ্ধ ও কৃষ্ণ মহাদেশ ভাগাভাগির সংগ্রাম'; 'ঔপনিবেশিক ও জাতীয় নীতির প্রশ্ন এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিক'; 'সোভিয়েত রাশিয়া, আজারবাইজান, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, তুর্কি', মস্কো, ১৯২০; 'এশিয়া ও আফ্রিকার উপরে আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রাম', লেনিনগ্রাড, ১৯২৫; ভি. এ. গুর্কো-ক্রিয়াজিনের সহযোগিতায় প্রকাশিত 'স্বাধীনতা সংগ্রামে তুর্কি', মস্কো ১৯২৫ ইত্যাদি।

১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে লাইপজিগের ডিমিট্রভ মিউজিয়ামে প্রখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ডিমিট্রভের বন্ধু হিসাবে ঐ মিউজিয়ামের একটি বিভাগকে নামাঙ্কিত করা হয়েছে এঁর নামে— গ্রন্থকার)। কাগজপত্রের মধ্যে প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের সারা-রুশ বিজ্ঞান সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত একটি সংকলন গ্রন্থ দেখতে পাই। ৫৯৪ পৃষ্ঠার সেই সুবৃহৎ সংকলনটির প্রধান সম্পাদক ছিলেন মিখায়েল পাভলোভিচ। বিশেষজ্ঞদের লেখা বহু রচনার মধ্যে দেখলাম সেখানে এই বইগুলির সমালোচনাও রয়েছে: মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়, *India in Transition* (সমালোচক—ভি. গ্যালিন); *Cambridge History of India*-র ই. জি. রেপসন প্রণীত "Ancient Period"-সংশ্লিষ্ট খণ্ড এবং রেপসনের লেখা *Ancient India, from Earliest Times to 1st. Centnry A D* (সমালোচক—এম. ওল্ডেনবার্গ) এবং ওল্ডেনবার্গের *Indian Fairy Tales* (সমালোচক—এন. গুড্সিগ)। এই সংকলনটি থেকে আরো খবর পাওয়া গেল সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত প্রথম বাংলা বই, 'বাংলা সাহিত্যের উদাহরণ-মালা'র (প্রকাশ—১৯২২ সাল) লেখক মিখায়েল তুবিয়ানস্কি ঐ সময়ে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনা করছিলেন পেট্রোগ্রাড ওরিয়েন্টাল

ইনস্টিটিউটে এবং 'ভারতীয় শিল্প' বিষয়ে অধ্যাপক আলেক্‌সিয়েভ ও 'তিব্বত' সম্পর্কে অধ্যাপক ওল্ডেনবার্গের আলোচনার পাশাপাশি 'প্রাচ্য দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ' বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা করেছিলেন মিখায়েল পাভলোভিচ।

আলোচ্য রচনাটি পাওয়া যায় মিখায়েল পাভলোভিচ, ভি. এ. গুর্কো-ক্রিয়াজিন ও এম. ভেলৎমান-প্রণীত 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবর্ষ' গ্রন্থে। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত ঐ বই সোভিয়েত পণ্ডিতদের মতে ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের প্রথম প্রয়াস। বইখানির সন্ধান পাই মস্কোর বিখ্যাত লেনিন লাইব্রেরিতে। মূল রুশ থেকে এই অংশের তর্জমা করেছেন শ্রীমতী কনক করাল —গ্রন্থকার।

বিপ্লবীদের ছবি

বিশ্বযুদ্ধের আগে আমাকে যখন কয়েক বছর বাধ্য হয়ে প্যারিসে কাটাতে হয়েছিল তখন আমি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করি প্রাচ্য দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে। আমারই মতো ঐ রকম যাঁরা তখন ফ্রান্সের রাজধানীতে বসবাস করছিলেন তাঁরা ছিলেন ইরাণী, তুর্ক চীনা ও মিশরী বিপ্লবী। তাঁদের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হত ও মাঝে মাঝে তাঁদের সঙ্গে নানা দেশের নামকরা প্রবাস-জীবী প্রসঙ্গে আলোচনা করতাম। এই প্রবন্ধে আমি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই প্যারিসের কয়েকজন প্রবাসী ভারতীয় সংশ্লিষ্ট আলোচনার মধ্যেই। এখানে এ কথা বলা দরকার যে প্যারিস যদিও ছিল ইউরোপের সব থেকে মুক্ত শহর তবু যুদ্ধের সময়ে প্রাচ্য দেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বিশেষ করেই নজরে পড়েছিল ব্রিটিশ পুলিসের। আমার রুশ ভাইয়েরা খবর দিলেন যে কয়েকজন গোয়েন্দা নাকি নিয়মিত পিছু নিচ্ছে আমার। তাদের চেহারা রুশ বা ফরাসী গোয়েন্দাদের মতো নয়, তারা হল ইঙ্গ-ভারতীয় গোয়েন্দা পুলিসের লোক।

বলতেই হবে যে চিন্তাভাবনা বা সামাজিক অবস্থিতির দিক থেকে ভারতীয় প্রবাসী বিপ্লবীদের সঙ্গে তুলনায় প্রবাসী রুশদের মিল খুবই কম ছিল। শ্রেণীলক্ষণ থেকে মনে হত যে অধিকাংশ প্রবাসী ভারতীয়ই এসেছিলেন বেশ সম্পন্ন মধ্য শ্রেণী থেকে আর অল্প এক অংশ নিম্ন মধ্যবিত্ত স্তর থেকে। এঁদের মধ্যে ছিলেন কিছু ছাত্র আর আইন ও চিকিৎসা-বিদ্যার ডিগ্রিধারী। কিন্তু

প্যারিসের প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে আমি একজনও শ্রমিক দেখি নি। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে তাঁদের অধিকাংশই, এমন-কি অগ্রগণ্যরাও ছিলেন বেশ অনগ্রসর, হয়তো বা প্রতিক্রিয়াশীলও। তাঁরা বিপ্লবী ছিলেন এই পর্যন্ত যে ভারতবর্ষের দিক থেকে ইংরেজ দম্ভের বিরোধিতা করার অনিবার্যতা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু অনগ্রসর চিন্তার দরুন তাঁদের অনেকেই আসলে হয়ে পড়েছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। আমার মনে পড়ে ১৯০৯ সালে এক ভারতীয় তরুণ আমার সঙ্গে দেখা করেন যাঁর সম্পর্কে তাঁর সঙ্গী আমার কাছে এই সুপারিশ জানান যে নিজের জীবন দিয়েও তিনি নাকি ভারতকে মুক্ত করতে দৃঢ় সংকল্প।—মাতৃভূমির জন্য অন্যান্য সংগ্রামী সাথীদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে তিনি সদাই প্রস্তুত। মতামতের দিক থেকে কিন্তু তিনি ছিলেন উৎকট রকমের গোঁড়া। আমি যখন তাঁর কাছে ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের পদ্ধতি সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর কথা খুলে বললাম এবং জানালাম যে তার জন্য জাতীয় মুক্তির ভাবনা ছড়িয়ে দেওয়া একান্তভাবেই প্রয়োজন ব্যাপক জনসাধারণের—সবার উপরে ভারতবর্ষের সর্বহারাদের মধ্যে, তখন সেই তরুণ বিস্মিত হলেন ঐ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পেয়ে। তিনি জানালেন যে তাঁর মতে ভারতবর্ষের মুক্তির মহৎ দায়িত্ব পালনে যাঁদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সংগ্রাম করা যায় সেই বিশ্বস্ত বিপ্লবীদের নিজেদের হতে হবে মুক্ত পুরুষ আর একমাত্র বিত্তশালীরাই হতে পারেন সেরকম মুক্ত পুরুষ। আমার সঙ্গী বললেন 'গরিব লোককে তো কিনে নেওয়া যায় ঘুষ দিয়ে আর ভারতবর্ষের গরিব মানুষও এ অবস্থা সম্পর্কে সচেতন'। আমি প্রশ্ন করলাম 'আপনি কি এসেছেন ধনী পরিবার থেকে'? 'না, আমার পরিবার টাকা-পয়সার দিক থেকে আদৌ স্বচ্ছল নয়। কিন্তু এই প্যারিসে হীরাজহরতের ব্যবসা করেন এমন আমার এক ধনী দেশবাসী দু'বছর যাবৎ আমায় একটি বৃত্তি জোগাচ্ছেন। আমি পড়াশুনো করছি সেই বৃত্তির সাহায্যে আর নিজেকে প্রস্তুত করছি আমার মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার সংগ্রামের উদ্দেশ্যে'।

প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে কদাচিৎ এমন লোক পাওয়া যেত যিনি মার্কস, লেনিন, প্লেখানভ, বেবেল ও কাউটস্কির সম্পর্কে কিছু খবর রাখেন। তবে তাঁদের রচনার সঙ্গে পরিচিত না হলেও সবাই জানতেন অন্তত স্পেন্সার, মিল ও রুশ লেখকদের মধ্যে তলস্তয়ের নাম।

তলস্তয় বিশেষ করেই সুপরিচিত ছিলেন ভারতীয় তরুণ মহলে। ভারতীয় অবস্থিতির 'অপরিবর্তনীয়তা' ও 'অতুলনীয়তা'র দরুন বহু ভারতবাসীরই মনে হত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম বুঝি অসম্ভব। অংশত এই কারণে তলস্তয়ের 'পাপ দিয়ে পাপকে প্রতিরোধ না করা'র নীতি ব্যাপক সমর্থন পায় ভারতবর্ষে। রাশিয়ার তুলনায় তলস্তয়ের চিন্তার প্রতিক্রিয়াশীল দিকটির প্রভাব প্রশ্নাতীতভাবেই প্রবল ছিল ভারতবর্ষে।

তবে তলস্তয়ের সমর্থক অর্থাৎ যাঁরা পরোক্ষ প্রতিরোধ সমর্থন করতেন তাঁদের পাশাপাশি বেশ-কিছু হিংসাত্মক আন্দোলনের প্রচারকও ছিলেন প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে। এঁরা চাইতেন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কার্যকলাপ। এঁরা তাঁদের কাজকর্মের মূলধারা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ। সন্ত্রাসবাদের সমর্থকেরা লোকচক্ষে প্রতিপন্ন হয়েছিলেন চরমপন্থী হিসেবে যাঁরা দাবি তুলেছিলেন ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার ও যাঁদের লক্ষ্য ছিল প্রকৃত স্বাধীন, সার্বভৌম এক রাষ্ট্র।

ঐ চরমপন্থীদের প্রধান প্রবক্তাদের অন্যতম ছিলেন বিখ্যাত ভারতীয় লেখক ও সাংবাদিক, শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা। একটি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা, *Indian Sociologist*-র তিনি ছিলেন সম্পাদক। পত্রিকাটি প্রকাশিত হত লণ্ডন থেকে ও স্বভাবতই তার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল ভারতবর্ষে।

কৃষ্ণবর্মার ব্যক্তিত্ব ছিল খুবই রাশভারী এবং তাঁর দেশবাসীর উপরে তাঁর প্রভাব একদা এত প্রবল ছিল যে তাঁর অন্তরঙ্গ একটা পরিচয়দান হয়তো সময়ের অপচয় বোধ হবে না। *Review of Reviews* পত্রিকার ভাষায় 'অনাবশ্যক-ভাবে অতিকৃত চাপে', সত্যসত্যই অপরিসীম কষ্টস্বীকার করে এই 'ভারতীয় ভীমরুল', কৃষ্ণবর্মা ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে উত্তেজিত করার ব্যাপারে একা যা করেছিলেন বিরোধী আন্দোলনের অন্য সব বীরপুরুষদের কাজকর্মের যোগফলের চাইতে তা অনেক বেশি।

প্যারিসে ঐ 'ভারতীয় ভীমরুল' শহরের সব চাইতে অভিজাত ও সমৃদ্ধ এলাকা, বোলোনের এক জমকালো ফ্ল্যাটে বাস করতেন। আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার জবাবে আমি যখন প্রথমবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই তখন প্রবাসী ভারতীয়দের ঐ নেতার জীবনযাত্রার ধরনের সঙ্গে ঐ একই অবস্থায় পড়ে যে প্রবাসী রুশেরা সেখানে থাকছিলেন তাঁদের জীবনযাপনের রূপের

বিপুল বৈসাদৃশ্যে আমি চমকিত হয়েছিলাম। কৃষ্ণবর্মাকে ঐ অবস্থায় দেখে আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল ঠিক লোকের কাছে এসেছি তো! তবে কৃষ্ণবর্মার সুদীর্ঘ বিশাল দেহ, সুন্দর মুখশ্রী, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ ও অতি সম্ভ্রান্ত আদব-কায়দা বেশ রেখাপাত করেছিল আমার মনে।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কচ্ছ অঞ্চলে কৃষ্ণবর্মার জন্ম। চিরাচরিত ভারতীয় প্রথায় তাঁকে মানুষ করা হয়— যে প্রথায় বিশেষ জোর দেওয়া হয় স্মৃতিশক্তির বিকাশের উপরে। তারপর তিনি সংস্কৃত ভাষাশিক্ষায় আত্ম-নিয়োগ করেন ও শীঘ্রই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন ঐ ভাষায়। ১৮৭৮ সালে তাঁর সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যের খবর পেঁছিয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক, আচার্য মনিয়ের উইলিয়ামসের কানে। মনিয়ের উইলিয়ামস বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে ঐ তরুণকে আনতে চান তাঁর সহকারী হিসেবে। কৃষ্ণবর্মা ঐ সময়ে আশ্চর্য রকম দক্ষতা অর্জন করেন পাশ্চাত্ত্য ইয়োরোপীয় বিদ্যাতেও। ইয়োরোপে যাবার আগে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল যদিও তিনি ইয়োরোপ-যাত্রার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন এক বছর ধরে। কিন্তু অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বিশেষ অধ্যাপক পদে বৃত হন। ভারত সরকারের তরফে তিনি বার্লিনে অনুষ্ঠিত প্রাচ্য-তাত্ত্বিক সম্মেলনে যোগ দেন ভারতের সদস্য হিসেবে। এই সম্মেলনে তাঁর নিবন্ধটির ফলে সাড়া পড়ে যায় সমস্ত পৃথিবীর পণ্ডিতমহলে। লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড চেম্বারলেন ও ব্রিটিশ রাজপুরুষ মহলের অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জয়মাল্যে ভূষিত কৃষ্ণবর্মা দেশে ফিরে একের পর এক অলংকৃত করেন ভারতের তিনটি দেশীয় রাজ্যের দেওয়ানের পদ।

ভারতের শাসকশ্রেণী কিন্তু অনতিবলম্বে ঐ লোকটির মধ্যেই তাদের শত্রুর সন্ধান পায়। অক্সফোর্ডে কৃষ্ণবর্মা ছিলেন উত্তরকালে ভারতের বড়লাট, লর্ড মর্লির শিক্ষক। কিন্তু উচ্চ মহলের ঐ-সব যোগাযোগ নিরস্ত করতে পারে নি কৃষ্ণবর্মাকে— তাঁকে তাই দেখা গেল ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকায়। *Indian Sociologist* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক হিসাবে কৃষ্ণবর্মার তৎপরতা অসন্তোষের উদ্রেক করল ভারত সরকারের বিরুদ্ধে। ভারতীয় ছাত্রদের জন্য তিনি বৃত্তিরও ব্যবস্থা করেন— তবে যে-

সব ছাত্রদের তিনি ঐভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করতেন তাদের প্রতিজ্ঞা করতে হত যে তারা কখনো ইংরেজ শাসকদের অধীনে কাজ করবে না।

কৃষ্ণবর্মা তাঁর গুরু, হার্বার্ট স্পেন্সারের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে স্পেন্সারের মৃত্যুর পরেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করা। কৃষ্ণবর্মার চোখে হার্বার্ট স্পেন্সার ছিলেন এক বিরাট ও মহৎ বিজ্ঞানী যিনি ভারতবর্ষকে বুঝতেন ও তার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি বলতেন তাঁর সব-কিছু কৃতিত্বের মূলে ছিলেন স্পেন্সার। কৃষ্ণবর্মা চেয়েছিলেন তাঁর গুরুর শেষ জীবন শান্তিতে কাটুক (দ্রষ্টব্য *Indian Sociologist*, ১৯০১, ১ম সংখ্যা)। এই যুক্তিটি খুবই অদ্ভুত এবং বিপ্লবী দৃষ্টিতে অমার্জনীয়ও বটে। কিন্তু এ কথা ঠিক যে এই যুক্তিই তিনি দিতেন কারো সংগে দেখা হলে, এমন-কি, এ-কথা তিনি ঘোষণাও করেছিলেন তাঁর লেখায়।

কৃষ্ণবর্মা প্যারিসে বসবাস শুরু করেন এই উদ্দেশ্যে যে তিনি এখানে তাঁর কাজকর্মের ধারা পরিবর্তনের পূর্ণ স্বাধীনতা পাবেন। চরমপন্থীদের এই নেতা নরমপন্থীদের অভিহিত করলেন 'বিশ্বাসঘাতক' বলে যাঁরা অবিশ্বস্ত হয়েছেন তাঁদের নিজের দেশের প্রতি। তিনি নরমপন্থীদের তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন কারণ তাঁরা খোসামোদ করতেন ব্রিটিশ সরকারের ও নির্ভর করতেন ইংরেজ জাতির চেতনা ও ন্যায়পরায়ণতার উপরে। তিনি এর উপরে জোর দিতেন যে ইংলণ্ড কখনোই ভারতবর্ষে সে ধরনের স্বাধিকার দেবে না যা সে দিয়েছে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-আফ্রিকাকে কারণ সেই স্বাধিকার পাওয়া যায় শুধু দীর্ঘদিন, জয়লাভে দৃঢ়সংকল্প, চূড়ান্ত সংগ্রাম চালিয়েই। আর সে ক্ষেত্রে মধ্যপন্থার কোনো স্থান নেই। এইভাবে সব বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে তিনি দাঁড়ালেন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থাৎ নিজেদের জাতীয় সরকার সমেত নিঃসর্তভাবে স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপক্ষে।

ইংরেজের দম্ভ চূর্ণ করার জন্য কোন্ পন্থা ধরলেন কৃষ্ণবর্মা?

ভারতবর্ষের সম্পন্ন পরিবার থেকে উদ্ভূত বহু ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর মতোই কৃষ্ণবর্মাও ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সাফল্যের সম্ভাবনায় নিঃসংশয় ছিলেন না। বলাই বাহুল্য যে ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের এক প্রবল সেনাবাহিনী আছে যা নিপুণভাবে গড়ে তোলা বিস্তীর্ণ রেলপথের

দরুন অতি দ্রুত যে-কোনো জায়গায় সমবেত করা যায়। প্রয়োজন হলে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে সম্ভব তার নিজস্ব নৌ-বাহিনীর সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে স্বদেশ থেকে বা মাল্টা, ইজিপ্ট, জিব্রল্টার থেকে বিদ্রোহদমনের উপযোগী সৈন্যবাহিনী এনে ফেলা। যুদ্ধ প্রস্তুতির দিক থেকে সিপাহীবিদ্রোহের সময়ের থেকে এখনকার ইংলণ্ড দশগুণ শক্তিশালী— কৃষ্ণবর্মার যুক্তি ছিল এই। তিনি তাই সিদ্ধান্ত করলেন যে ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর সব থেকে কার্যকর হাতিয়ার হল ভারতবর্ষে যে ইংরেজরা বাস করছেন তাদের পুরোদস্তুর বয়কট করা। এ শুধু বিলিতি সামগ্রীর সহজ ও ছেলেমানুষী বয়কট নয়[১] এ হল যা-কিছু বিলিতি তার সব-কিছুই বর্জন। কৃষ্ণবর্মা বললেন, ইংরেজ শাসকেরা যেদিন দেখবে যে দেশে একজন মানুষও নেই তাদের অধীনে কাজ করার আর ইংরেজ সরকার যেদিন তাদের পুলিস-বাহিনীতে বা পল্টনে একজন রেক্রুটও আর পাবে না, অর্থাৎ ভারতবর্ষ যেদিন তার আপন দাসত্ব দিয়ে ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসনের সহায়তা করতে অস্বীকার করবে— সেদিনই খতম হয়ে যাবে ঐ শাসন। চরমপন্থী দল সন্ত্রাসবাদী ব্যবস্থাদির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করত— শুধু সামগ্রিক বয়কটের প্রচারেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইত না। কৃষ্ণবর্মা তাঁর পত্রিকায় সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি স্পষ্টতই সহানুভূতিপূর্ণ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯০৮ সালের ডিসেম্বরে তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত "সন্ত্রাসবাদী" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণবর্মা প্রমাণ করেন যে ব্রিটিশ বুর্জোয়া সংবাদপত্র জগতের ঐরকম ঘোষণা সত্ত্বেও ঐ ধরনের বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে কোনো নৈরাজ্যবাদী তত্ত্ব নিহিত ছিল না। তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে ভারতবর্ষে নৈরাজ্যবাদী বলে কেউ নেই, এমন-কি, 'নৈরাজ্যবাদী' শব্দটিও এ দেশে সুপরিচিত নয়। ভারতীয় সন্ত্রাসবাদীরা জাতীয় সরকারের কথা বলেন, ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের কথা বলেন— কখনো কখনো বা সাধারণ-

১। ১৯০৫-০৬ সালে ভারতবর্ষে ঐ ধরনের বাণিজ্যগত বয়কট বা স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়। বাঙালী জাতির ঐক্য বিনাশ করার উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে দু'টুকরো করে ফেললে আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। ঐ সময় থেকে বিলিতি সামগ্রী বয়কট ভারতবর্ষের বড়ো বড়ো শহরগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে ও বিপুল আকার ধারণ করে।

ভাবে শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে জাতিগত যুদ্ধের কথাও প্রচার করেন কিন্তু কোনো রকম নৈরাজ্যবাদী তত্ত্বের সঙ্গে তাঁরা আদৌ পরিচিত নন।

বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক বছর আগে থেকে বিপ্লবী ভারতীয়দের উপরে কৃষ্ণবর্মার প্রভাব বহুলাংশে খর্ব হয়ে যায়। ভারতের বিপ্লবী-আন্দোলনে তাঁর যোগদানও সীমিত হয়ে আসে। তিনি অবশ্য প্রবাস থেকে ***Indian Sociologist*** নামে উল্লেখযোগ্য পত্রিকাটির প্রকাশনা চালাতে থাকেন। ভারতে বিটিশ-শাসনে অসন্তুষ্ট কিছু কিছু বিশিষ্ট ভারতীয়ের মতে সব দিক বিবেচনা করে বলা চলে যে ঐ পত্রিকা স্বীকৃতি দিয়েছিল সন্ত্রাসবাদের প্রয়োজনীয়তাকে।

শ্রীমতী কামা বাস করতেন এতোয়ান এলাকার একটি মামুলী বোর্ডিং হাউসে। প্রবাসী ভারতীয়েরা, বিশেষ করে তরুণেরা প্রায়ই জড়ো হতেন তাঁর ছোট্ট ঘরটিতে। তখন তাঁর যথেষ্ট বয়স, স্বাস্থ্যও ভালো যাচ্ছিল না, তবু আশ্চর্য ছিল তাঁর তেজস্বিতা ও সজীবতা। কৃষ্ণবর্মার চাইতে তিনি প্রথম থেকেই তাঁর দেশের লোকের ছবি অনেক বেশি গেঁথে দিলেন আমার মনে এবং খুব শীঘ্রই আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ নিয়মিত দেখা হত ও আমরা আলোচনা করতাম ভারতবর্ষে বিপ্লবের সমস্যা সম্পর্কে। কৃষ্ণবর্মার যা ছিল না শ্রীমতী কামার সেই প্রবল আগ্রহ ছিল রাশিয়ার বিপ্লবী কার্যকলাপ আর বিশেষ করে ১৯০৫ সালের বিপ্লব ও সেই অভ্যুত্থানে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা বিষয়ে। তিনি মার্কসবাদও কিছুটা পড়েছিলেন। রুশ লেখকদের মধ্যে তিনি সব থেকে আগ্রহান্বিত ছিলেন গর্কি সম্পর্কে ও একবার তিনি আমাকে অনুরোধ করেন গর্কির বিখ্যাত কবিতা 'বাজপাখি'র বিষয়বস্তু তাঁকে বলতে। আমি তাঁর অনুরোধ রেখেছিলাম— তিনি আমাকে বলেছিলেন কবিতাটি জোগাড় করে সেটিকে তর্জমা করতে ফরাসী ভাষায়। অতি শীঘ্রই আমি তাঁর ইচ্ছা পূরণ করি। মনে পড়ে কী খুশি হয়েছিলেন তিনি— তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছিল যখন আমি তাঁকে আমার তর্জমাটি শোনাই। আমার তর্জমা নিশ্চয়ই ভালো হয় নি তবে কবিতাটি তো সুন্দর! এই কবিতা তাঁর গর্কি সম্পর্কে আগ্রহ আরো উদ্দীপিত করে। বিচলিত হয়ে তিনি বলেছিলেন "এই ছোট্ট লেখাটি যে-কোনো প্রবন্ধ বা ঘোষণার চাইতে অনেক ভালো। এ হল তোমাদের তলস্তয়ের

বিরোধী আর আমাদের যে শত্রুরা ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের নিন্দা করে, তাদেরও বিরোধী"।

বৃটিশ গোয়েন্দারা কামার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে তিনি যে সংগঠন বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী সাভারকারের পুলিশ হেফাজত থেকে পলায়নের ব্যবস্থা করেছিল তাকে সাহায্য করেছেন এবং ঐ পলায়নের সূত্রে সারা ইয়োরোপে যে সোরগোল ও আন্দোলনের উদ্ভব হয় তার জন্যও দায়ী নাকি তিনি। ঐ ঘটনাটি এত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে তার দিকে একটু নজর দেওয়া দরকার এখানে।

সাভারকারের জন্ম বোম্বাই থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নাসিক শহরের এক চিৎপাবন ব্রাহ্মণ পরিবারে, জাতি হিসাবে সর্বোচ্চে যার স্থান। জাতীয় আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে যোগ দেন ও ইংরেজ আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নায়কতা করেন। তাঁর দুই ভাইও তাঁরই মতো বিপ্লবী ছিলেন এবং জাতীয় আন্দোলনে যোগদানের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন—একজন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও অন্যজন কয়েক বছরের কারাদণ্ড ভোগ করেন। সাভারকার-সংক্রান্ত ঘটনাটি যখন ঘটে দুই ভাইই তখন কারাগারে।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পাঠ করে সাভারকার ২২ বছর বয়সে সুপরিচিত ভারতীয় নেতা তিলকের অনুবর্তী হন। প্রায় এরই কাছাকাছি সময়ে তিনি তাঁর নাসিক শহরে 'মিত্রমেলা' নামে একটি জাতীয়তাবাদীদের সমিতি গড়ে তোলেন। সেই সমিতি ও ঐ ধরনের অন্যান্য সংঘ সমগ্র দক্ষিণাত্যে প্রচার আন্দোলন চালাত, ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করত এবং বহু সভার আয়োজন করত যেখানে জীবনী পড়া হত শিবাজী বা রামদাসের মতো মহান জাতীয় বিপ্লবী ও মাৎসিনির মতো বিদেশী নেতার। সাভারকারের মনে গভীর রেখাপাত করে ঐ-সব মহাপুরুষের জীবনী। সাভারকার ও তাঁর বড়ো ভাই গণেশ সর্বত্র প্রচার করে বেড়াতেন জাতীয় স্বাধীনতার আদর্শের কথা। ইটালীয়ান স্বাধীনতা আন্দোলনের বীরদের কার্যকলাপের অনুসরণে তিনি সমর্থন জানাতেন সশস্ত্র বিদ্রোহের কর্মপন্থায়। ঐ তরুণ জাতীয়তাবাদীর মন্ত্র ছিল 'বন্দে মাতরম্'।

বিনায়ক দামোদর সাভারকার ইংলণ্ডে এসেছিলেন আইনশাস্ত্রের শেষ পরীক্ষা দিতে ও লণ্ডনের গ্রেস ইনে নাম রেজিস্টারিও করেছিলেন তারই জন্য।

সেই সময়ে তাঁর বয়স ছিল ২৪। প্রবল উৎসাহে তিনি প্রচার আন্দোলন চালিয়েছিলেন লণ্ডনের ভারতীয় মহলে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হার্বার্ট স্পেন্সারের বিভাগে পাঠ গ্রহণের সময়ে কৃষ্ণবর্মা-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লণ্ডনস্থ ভারতীদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'ইণ্ডিয়া হাউস'কে ঘিরেই চলত সেই কাজকর্ম। 'ইণ্ডিয়া হাউসে' এসেই সাভারকার ভূমিকা লেখেন মাৎসিনির জীবনীর মারাঠি সংস্করণের। এর কিছুদিন পরে তিনি লেখা শুরু করেন ১৮৫৭ সালের ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস (সিপাহী বিদ্রোহ) ও সেটি শেষও করেন ঐখানেই। ইণ্ডিয়া হাউসের কয়েক জন সদস্য ইংরেজী ভাষায় ঐ বইখানি তর্জমা করেন ও সেটি প্রকাশিত হয় 'জনৈক ভারতীয় জাতীয়তাবাদীর' লেখা হিসেবে। ঐ বইটির শেষ অনুচ্ছেদে পাওয়া যায় ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়ন।

তিনি লিখেছেন যে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ স্পষ্টই দেখিযে দিয়েছে যে স্বাধীনতার নামে ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধভাবে সেদিন বহুদূর অগ্রসর হয়েছিল জনসাধারণের শক্তির উপরে নির্ভর ক'রে। তার ব্যর্থতার কারণ হল নিরুদ্যম, ভীরু, স্বার্থপর ও বিশ্বাসঘাতক কিছু মানুষ যারা সাহায্য করেছিল শত্রুপক্ষকেই। কিন্তু কার এমন বুকের পাটা যে সেই বীরদের সমালোচনা করবে যাঁদের তলোযার রঞ্জিত হযেছিল শত্রুর উষ্ণ রক্তে এবং মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও যাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন যুদ্ধের আগুনে? তাঁরা দুঃসাহসী বা উন্মাদ ছিলেন না। পরাজয়ের জন্য তাঁরা দায়ী নন— কেউ পারবে না তাঁদের উপর কোনো দোষারোপ করতে। ঐ-সব মহাত্মাদের আহ্বানেই আমাদের ভারত জননী জেগে উঠেছেন গভীর নিদ্রা থেকে, দাসত্বের অবসান ঘটানোর জন্য। একহাতে তিনি সেদিন আঘাত হেনেছেন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ও অন্যহাতে ছুরি বসিযেছেন নিজের বুকে (*Indian War of Independence*, পৃ. ৪৪৩)।

সাভারকার তাঁর বই শেষ করেছিলেন দিল্লি প্রাচীরের সামনে নিহত শেষ মোগল বাদশাহ্ বাহাদুর শাহের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। "সেদিন থেকে আমাদের বীরেদের বুকে দেশপ্রেমে শানিত হয়ে উঠেছে হিন্দুস্তানের খড়্গ। একদিন হয়তো তার ঝলক দেখা যাবে লণ্ডনের প্রবেশপথেও।" সাভারকারের গোটা বইটি জাতীয়তার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, যে গভীর অনুভূতি জড়ানো

তাঁর লেখার ছত্রে ছত্রে। ইংরেজী রক্ষণশীল সংবাদপত্র মহলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে যে নৈরাজ্যবাদের অভিযোগ তোলা হয়— সাভারকার তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁর বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায়।

১৯০৬-'০৮ সালে কৃষ্ণবর্মার প্যারিস যাত্রার পর সাভারকারের উপর 'ইণ্ডিয়া হাউস' পরিচালনার ভার পড়ে। সেখানে তিনি তখন লণ্ডনস্থ ভারতীয়দের পরের পর কয়েকটি সভা করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের বার্ষিক দিবস উদ্‌যাপিত হয় ঐখানেই। ১৯০৯ সালে রাজভক্ত ভারতীয়রা ইংরেজ সরকারের কাছে নতজানু হয়ে ইংলণ্ডের প্রতি তাদের আনুগত্য এবং জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যার জন্য ধিংড়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানায়। সাভারকার এই কাজের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন যে 'অপরাধী' শব্দটির অর্থও বিভিন্ন রকম হতে পারে আর আলোচ্য ঘটনাটির এখনো তো বিচার সম্পন্ন হয় নি আদালতে। সাভারকার ঐ সময়ে ব্যারিস্টারির তালিকায় নিজের নাম রেজিস্টারি করতে যাচ্ছিলেন। ঐ কাজের জন্য তাঁর সনদ কেড়ে নেওয়া হয় ব্যারিস্টারির।

সাভারকার যে ঐ সময়ে ইণ্ডিয়া হাউসের রাঁধুনী ও ভারতীয় দলের এক পুরানো সদস্য, ছত্রভুজকে দিয়ে বিপ্লবী কাজের জন্য প্যারিস থেকে কেনা ২০টি ব্রাউনিং পিস্তল-ভরা একটি বাক্স আনান— তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ লোকটি ১৯০৮ সালে যখন বোম্বাই যাচ্ছিল তখন সাভারকার তাকে দিয়ে ঐ কাজ করান। এ কথা ঠিক যে তারই একটি রিভলভার দিয়ে ১৯০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে নাসিক শহরে হত্যা করা হয় কালেক্টর, জ্যাকসন সাহেবকে।

সাভারকারের ভাই, গণেশ সাভারকারের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডেই সে বিচারের পরিসমাপ্তি হতে পারত। কিন্তু নাসিকে সে বিচার শেষ হওয়ার কয়েক মাস আগে সন্ধান পাওয়া গেল বিনায়ক সাভারকারের কয়েকটি চিঠির— যার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে তিনিও সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছেন জাতীয় আন্দোলনের ঘোষণাটির সঙ্গে।

১৯০৯ সালের ডিসেম্বরের শেষে জ্যাকসন-হত্যার পর বৃটিশ পুলিশ সিদ্ধান্ত করে সাভারকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের। ঐ তরুণ লেখক সাভারকার মাস চারেক যাবৎ বাস করছিলেন প্যারিসে। লণ্ডনে ফেরার সময়ে ১৯১০ সালে মার্চ মাসে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় ভিক্টোরিয়া স্টেশনে

এবং তাঁকে একটি বিলিতি জাহাজে চড়ানো হয় ভারতবর্ষে পাঠিয়ে কড়া-বিচারের উদ্দেশ্যে। ১৯১০ সালের ৮ জুলাই ঐ জাহাজ যখন মার্সাই বন্দরে থামে তখন সাভারকার পালিয়ে ফরাসী ভূখণ্ডে আত্মগোপনের চেষ্টা করেন। ইংরেজ পুলিসও তখন তাঁর পিছনে পিছনে ধাওয়া ক'রে তাঁকে জবরদস্তি গ্রেপ্তার করে ফরাসী এলাকার মধ্যে। একজন পুলিস তাঁর গলা টিপে ধরে আর-একজন ধরে তাঁর হাত আর ঐভাবে তাঁকে তারা হিঁচড়ে টেনে নিয়ে জাহাজে তোলে ফরাসী কর্তৃপক্ষের চোখের সামনে। সাভারকারকে তারপর শৃঙ্খলিত অবস্থায় নির্জন একটি ঘরে বন্ধ রাখা হয় কড়া পাহারায়। আর ফরাসী ভূখণ্ডে ভারতীয় রাজনৈতিক পলাতককে গ্রেপ্তারের ঐ কলঙ্কজনক ঘটনার পর সেই বিলিতি জাহাজ যাতে সাভারকার বন্দী ছিলেন—সেটা ঐ ফরাসী বন্দরেই থাকে ২৪ ঘণ্টা ধরে। সমাজতন্ত্রীদের ও ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 'লু' মানিতে' পত্রিকার তৎপর কর্মীদের প্রতিবাদের ফলে, এমন-কি, পিশঁর নিকটে জ্যোরের হস্তক্ষেপের দরুন শেষ পর্যন্ত ফরাসী সরকার বৃটিশ সরকারের কাছে দাবি জানায় সাভারকারকে ফেরত দেওযার। ইংলণ্ড এই দাবি পূরণে অসম্মত হয় ও সাভারকারকে বোম্বাই পাঠায় বিচারের জন্য। বিচারে তাঁকে দণ্ডিত করা হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে এবং বাজেয়াপ্ত করা হয় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি। ওদিকে উভয় পক্ষই রাজি হয় মামলাটি হেগ্ ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির করতে। ইংরেজ সরকার রাজী হয় ট্রাইব্যুনালের রায় দানের আগে বোম্বাই হাইকোর্টের রাযকে কার্যকর না করতে, কারণ ঐ সরকার স্থির নিশ্চিত ছিল সেখানে জয়লাভের ব্যাপারে। আর ওদিকে সাভারকার ঐ সময় অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

১৯১১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি সাভারকারের ব্যাপারে যে তৃতীয় আদালতের রায় দেবার কথা ছিল তার অধিবেশন শুরু হয় হেগ্ শহরে। স্বভাবতই যাঁরা রাজনৈতিক প্রবাসীদের পলাযনের অধিকারের প্রশ্নে আগ্রহী ছিলেন তাঁরা সকলেই কম্প্রবক্ষে প্রতীক্ষা করছিলেন সমস্ত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ও উচ্চতম বিচারালযের রাযের। বহু ভারতীয় বিপ্লবীরই স্থির বিশ্বাস ছিল যে হেগ্ ট্রাইব্যুনাল সাভারকারের মুক্তির আদেশ দিয়ে এ ব্যাপারে সুবিচার করবেন। ঐ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছিল এই ক'জন জগদ্বিখ্যাত বিচারকদের নিয়ে, সভাপতি—বিখ্যাত শান্তিবাদী বার্নেয়ার, যথাক্রমে হল্যাণ্ড ও নরওয়ের

পরামর্শদাতা আইনজ্ঞ ক্যাভরনিন-লোম্যান ও গ্রাম্, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লুই রোলা, ইংরেজ আইনবিদ লর্ড হ্যামিল্টন ডেকার, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক বেইস্ ও ইংরেজ আইনজ্ঞ কোলি।

সাভারকার হেগ্ ট্রাইব্যুনালের সামনে তাঁর মামলা সমর্থন করার জন্য দায়িত্ব দেন জাঁ লুংগের উপরে। তিনি তাঁর বিস্তারিত রিপোর্টে একের পর এক বহু অখণ্ডনীয় যুক্তি উপস্থিত করেন রাজনৈতিক আত্মগোপনকারীদের সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আইনের মূল নীতি বিষয়ে যার ভিত্তিতে সাভারকার দাবি জানালেন ভারতীয় জেল থেকে তাঁর অবিলম্বে মুক্তির ও যেখানে তাঁকে বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সেই ফরাসীভূমিতেই তাঁকে ফেরত পাঠানোর।

সমস্ত দেশের সমাজতন্ত্রীদের স্তম্ভিত ও বিক্ষুব্ধ করে হেগের আন্তর্জাতিক তৃতীয়-আদালত— যাতে ছিলেন বিখ্যাত সব বুর্জোয়া বিচারক ও 'শান্তিবাদী —রায় দিলেন যে ভারতীয় অপরাধী, সাভারকার যিনি ফরাসীভূমি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর বিষয়ে চূড়ান্ত এক্তিয়ার নাকি ইংলণ্ডের। এই রায়ের মারফত হেগ্ ট্রাইব্যুনাল রাজনৈতিক পলাতকদের অধিকার সম্পর্কে অবজ্ঞা ও বিপ্লবীদের সম্পর্কে তার বিদ্বেষ প্রদর্শন করেছিল— এমন-কি, সাভারকারের মতো একজন কর্মীর ক্ষেত্রেও যিনি, জারতন্ত্রী রাশিয়ার চাইতেও চরিত্রে কোনো অংশে কম বীভৎস নয় সেই ইঙ্গ-ভারতীয় বিধানে জর্জরিত ৩০ কোটি মানুষের দুঃসহ অবস্থার ন্যূনতম নিরসন মাত্র চাইছিলেন। তাঁদের সেই কলঙ্কজনক রায়কে সমর্থন করার জন্য হেগ্ আদালত জোর দিলেন ফাঁকা কতকগুলি আনুষ্ঠানিকতার উপরে ও তাঁদের সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে এই ধরনের যুক্তি ফাঁদলেন : "আন্তর্জাতিক কানুনে এমন কোনো ব্যবস্থা নেই যার জোরে এক রাষ্ট্রকে বাধ্য করা যায় ভুল করে অন্য রাষ্ট্র তার হাতে যাঁকে তুলে দিয়েছে, তাঁকে ফেরত দিতে। মার্সাইয়ের কর্তৃপক্ষ বা ফরাসী পুলিস যদি আন্তর্জাতিক অধিকারের নিয়ম না জেনে ভুল করে ফরাসীভূমিতে রাজনৈতিক অপরাধী সাভারকারের গ্রেপ্তার মেনে নিতেন, বা এমন-কি, তাঁর গ্রেপ্তারে সহায়তা করতেন অথবা জোর করে তাঁকে ফেরত পাঠিয়ে দিতেন তা হলেও সাভারকারের পক্ষে তাতে খারাপ বই ভালো কিছু হত না। ফরাসী কর্তৃপক্ষের সে ভুল শোধরানোর ও সাভারকারকে ফ্রান্স ফিরিয়ে দেবার দায়িত্ব ইংলণ্ডের নেই। বরঞ্চ

ফরাসী প্রতিনিধিরা নিজেরাই যখন সহায়তা করেছেন সাভারকারের গ্রেপ্তারে, তখন তার থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে ঐ ঘটনায় ফরাসী সার্বভৌমতার কোনো লংঘন ঘটে নি এবং তাতে এই কথাটাই বরং জোরালো হয়ে উঠেছে যে ইংলণ্ড বাধ্য নয় সাভারকারকে ফেরত দিতে।"

হেগ্ ট্রাইব্যুনাল সাভারকারের সম্পর্কে ঐ রকম বিদ্বেষদুষ্ট ও চূড়ান্ত রকমের অপরাধমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফরাসী পুলিস তাদের ক্ষমতা-বহির্ভূত কাজ করেছিল রাজনৈতিক অপরাধীর গ্রেপ্তারে সাহায্য করে ও তাঁকে ইংরেজ পুলিসের হাতে তুলে দিয়ে। এ ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার প্রাথমিক দাবি ছিল এই যে ফরাসী কর্তৃপক্ষ ফরাসী পুলিসের ভুল (বা ত্রুটি) শুধরে দেবেন। হেগ্ ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্ত করলেন যে সে ভুলের মাশুল গুণবেন নিরস্ত্র ও অসহায় সাভারকার ভারতের জেলখানায় পচে। বোঝা গেল যে হেগ্ ট্রাইব্যুনালের রায় বিক্ষুব্ধ ও স্তম্ভিত করেছে শুধু সমাজতন্ত্রীদেরই নয়, যথার্থ গণতন্ত্রীদেরও। 'দিল্লি নিউজ' পত্রিকা লিখল: "হেগ্ ট্রাইব্যুনাল আত্ম-গোপনকারীদের অধিকারকে খুবই সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে পুরেছে—যেমন ধরা যাক যদি রুশ গোয়েন্দারা প্রিন্স ক্রোপোটকিনকে ইংরেজ পুলিসের সহায়তায় কিন্তু ইংরেজ সরকারের অগোচরে ইংলণ্ডে গ্রেপ্তার করত ও রাশিয়ায় পাচার করত তা হলে ইংলণ্ডের কোনো অধিকার থাকত না তাঁর মুক্তি দাবি করার।"

সাভারকার-মামলার রায় থেকে বোঝা গেল যে ব্রিটিশ সরকারের জবরদস্তি ও বেআইনি কার্যকলাপ থেকে ভারতীয় বিপ্লবীকে রক্ষা করার ব্যাপারে কোনো সুবিচার আশা করা যেতে পারে না ঐ বুর্জোয়া আন্তর্জাতিক তৃতীয় ট্রাইব্যুনালের কাছ থেকে। হেগ্ ট্রাইব্যুনালে যে আইনবিদেরা জড়ো হয়েছিলেন তাঁরা জানতেন যে সাভারকার হলেন এমন এক বিপ্লবী যিনি চেষ্টা করছিলেন ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক ভিত্তি উৎখাতের, তাঁরা জানতেন যে ইংরেজ সরকার তাঁকে জেল থেকে মুক্ত করতে অনিচ্ছুক আর এও জানতেন যে ফরাসী সরকার শুধু ভান করছিলেন সাভারকারের মুক্তির ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হওয়ার। ফলে ঐ পক্ষপাতদুষ্ট আদালত সমস্ত ন্যায়পরায়ণতার নিয়মকে পদদলিত করে তাদের নির্লজ্জ, নীতিহীন ও ফাঁকা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল ফরাসীভূমিতে ইংরেজ পুলিসের কলংকজনক আচরণ ও ইঙ্গ-ভারতীয় আদালতের হাতে সাভারকারের অমানবিক শাস্তির ব্যাপারে।

হেগের বিচারকেরা জেনেশুনেই এ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক দেশের রাজনৈতিক অপরাধী সম্পর্কিত ব্যবস্থাদির সমস্যা-বিষয়ক আন্তর্জাতিক কানুনগুলির মৌলিক শর্ত প্রয়োগ থেকে নিরস্ত রইলেন এবং তাঁদের জবাব সীমাবদ্ধ রাখলেন শুধু এ কথাতেই যে আন্তর্জাতিক কানুনে নাকি কোনো নজীর নেই সাভারকারের মামলার সংগে তুলনীয়। কিন্তু আসলে এটা স্পষ্ট বোঝা গেল যে আন্তর্জাতিক কানুন সম্পর্কিত সব-কিছু ঘটনাই যদি আগে থাকতেই জানা থাকত তা হলে তো প্রয়োজনই হত না হেগের তৃতীয় ট্রাইবুনাল গঠনের।

সাভারকারের মুক্তির ব্যাপারে যাঁরা সচেষ্ট হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সব চাইতে তৎপর ছিলেন শ্রীমতী কামা। জরা ও ভগ্নস্বাস্থ্যের তোয়াক্কা না করে তিনি নিজে এই রচনার লেখককে সংগে নিয়ে বহু সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের কর্মীদের সংগে দেখা করেন, তাঁদের পত্রিকায় সাভারকার-সম্পর্কিত মন্তব্যকে স্থান দেবার অনুরোধ জানিয়ে। এ ছাড়া তিনি ফ্রান্সের যে সমাজকর্মীরই দেখা পেয়েছেন তাঁকেই প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন যাতে তিনি সাভারকারের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। অনতিবিলম্বে ফ্রান্সের বহু সমাজকর্মী এই বৃদ্ধা মহিলার পিছনে এসে দাঁড়ান। প্রায়ই তাঁরা অবশ্য তাঁর কাছে নৈরাশ্য প্রকাশ করতেন এবং ভারতীয় বিপ্লবীর ভাগ্য সম্পর্কে তাঁরা নিশ্চয়ই অতটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন না তাঁর মতো। কিন্তু বর্তমান বুর্জোয়া বিচারালয়ের, এমন-কি, 'তৃতীয় আদালতেরও শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কে অবহিত নন' এমন বহু ভারতীয় বিপ্লবীর মতোই তিনিও গভীরভাবে বিচলিত হন হেগ্ আদালতের রায়ের ফলে। আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া আইনের পণ্ডিতদের নিয়ে গঠিত 'তৃতীয় ট্রাইবুনাল' সাভারকার মামলার রায়ে স্পষ্টই দেখিয়ে দিলেন যে ইয়োরোপীয় বুর্জোয়ারা চমৎকারভাবেই বোঝেন যে পৃথিবীতে তাঁদের আধিপত্য নির্ভর করে সমুদ্রপারের উপনিবেশগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারের উপরে এবং ইয়োরোপের কোনো এশীয় বা আফ্রিকান উপনিবেশে বিপ্লবী তৎপরতার উন্মেষ আন্তর্জাতিক বুর্জোয়া, তথা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তির পক্ষেই বিপদজনক।

শ্রীমতী কামা ঐ সময়ে প্যারিসে বাস করতেন ও সেখানে তাঁর মস্ত একদল বন্ধু ছিলেন ফরাসী ও রুশ বিপ্লবী মহলে। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ বাধবার সংগে সংগেই ব্রিটিশ সরকারের দাবি অনুসারে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিস হেপাজতে

পাঠানো হয় দক্ষিণ ফ্রান্সের সুদূর এক গ্রামে। এ ব্যবস্থার দ্বারা ইংরেজ পুলিস চেষ্টা করেছিল শ্রীমতী কামাকে নিরস্ত করতে ফ্রান্সে প্রেরিত ভারতীয় সৈন্যদের সংগে মেলামেশা করার থেকে।

বন্ধুদের সহায়তায় রুগ্ণ শ্রীমতী কামা যখন অবশেষে অনুমতি পেলেন প্যারিসে ফেরার তখন দূরদর্শী ব্রিটিশ সরকারের প্ররোচনায় ফরাসী প্রিফেক্ট তাঁকে কিছুদিনের জন্য নিষেধ করেন রাস্তায় দেখা হলেও ভারতীয় সৈন্যদের সংগে কথা বলতে।

শ্রীমতী কামা কাতরভাবে বললেন 'কত বছর আমি আমার স্বদেশবাসীর দেখা পাই নি। আমাকে অনুমতি দিন আমার দেশবাসীর সংগে দেখা হলে অন্তত মামুলি সৌজন্য প্রকাশের।' পুলিস কর্মচারী জানালেন 'তা সম্ভব নয়। গোয়েন্দারা অবিশ্রাম আপনার পেছনে লেগে থাকবে আর এই শর্তের প্রথম লংঘনেই আপনাকে বিতাড়িত হতে হবে ফ্রান্স থেকে। এ হল সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ। আপনি বুঝতে পারছেন এ ক্ষেত্রে আমরা নিরুপায়। আপনার ব্যাপারে বৃটিশরাজের সংগে কোনো ঝামেলায় পড়ার হাত থেকে অনুগ্রহ করে আমাদের বাঁচাবেন।'

রুশ ও ইংগ-ফরাসী পুলিসের কৃপায় নানা বিপত্তিতে পরিশ্রান্ত, বেচারী কামা এ কথা বলতে গিয়ে একজন ভারতীয় সিপাহীর সংগেও কথা বলতে না পারার দুঃখে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই শ্রীমতী কামা দক্ষিণ-ফ্রান্সে তাঁর নির্বাসন-স্থলে ফিরে যান। সেখানে তাঁর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন একটি পরিবার বাস করত। সেটি হল এক প্রবাসী ভারতীয় পরিবার, তাঁরই মতো যাদেরও বৃটিশ শক্তির পীড়াপীড়িতে সরানো হয়েছিল প্যারিস থেকে।

শ্রীমতী কামা ও তাঁর বন্ধুদের বিপত্তি কিন্তু শেষ হয় নি দক্ষিণ-ফ্রান্সেও।

ভারতীয় সৈন্যদের ফ্রান্সে অবতরণের অল্পদিনের মধ্যে ও যুদ্ধ ফ্রণ্টে তাদের সংখ্যা বেড়ে ওঠার পরে হাজার হাজার আহত ভারতীয় অফিসার ও সৈনিক ভর্তি হলেন দক্ষিণ-ফ্রান্সের বিভিন্ন হাসপাতালে। ঐ সময়ে বৃটিশ সরকার দাবি জানালেন যে শ্রীমতী কামা ও তাঁর বন্ধুদের মতো বিপদজনক বিপ্লবীদের অবশ্যই খাস ফ্রান্স থেকে সরাতে হবে এবং অন্তরীণ করতে হবে ফ্রান্সের কোনো উপনিবেশে।

কোনো কোনো বিখ্যাত ফরাসী সোশ্যালিস্টের তৎপর হস্তক্ষেপের ফলে—প্রসঙ্গক্রমে যাঁদের আবার এর জন্য অনুরোধ করেছিলেন কামার কিছু রুশ বন্ধু— ঐ বৃদ্ধা ও রুগ্‌ণা মহিলা শেষ পর্যন্ত অনুমতি পান ফ্রান্সেই থাকার। কিন্তু তাঁর সহকর্মীদের নির্মমভাবে বিতাড়িত করা হয় ফ্রান্স থেকে এবং কড়া পুলিস পাহারায় পাঠানো হয় ফ্রান্সের একটি উপনিবেশে।

উদার সংবিধানের দেশ ইংলণ্ডের সরকার ঐ রকম নিষ্ঠুর ও ন্যায়নীতি-বর্জিতভাবে ভারতীয় বিপ্লবীদের সেদিন তাড়িয়ে বেড়িয়েছিলেন, এমন-কি, যাঁরা ইয়োরোপীয় মহাদেশে ছিলেন তাঁদেরও। আর এও লক্ষণীয় যে ফরাসী সরকারও ভারতীয় বিপ্লবীদের অধিকারের কথা কিছুমাত্র বিবেচনা না করে, এমন-কি, 'ফরাসী বিপ্লবের মহৎ সব নীতি' বিস্মৃত হয়ে বিনা প্রশ্নে পূরণ করেছিলেন তাঁদের সব-কটি দাবি।

রুশ-বিপ্লবের গতিপথের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন শ্রীমতী কামা। ১৯১৭ সালের অগাস্ট মাসে আমার রাশিয়া ফেরার আগে তিনি আমায় গর্কিকে লেখা তাঁর একটি চিঠি দেন এই অনুরোধ জানিয়ে যে সেটি যেন প্রকাশ করা হয় রাশিয়ায়। দুঃখের বিষয় সে চিঠিটি কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

৪

দ্রষ্টব্য ॥ পৃ. ৫৪

জাতীয় পতাকার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারা বিষয়ে কয়েকটি কথা এখানে বলা যেতে পারে।

যতদূর জানি ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে জাতীয় পতাকার কোনো প্রচলন ছিল না। এমন কি, মৌর্য, গুপ্ত বা মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার প্রায় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে হলেও সেই সর্বভারতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে তখন কোনো পতাকা ব্যবহারের কথা শোনা যায় না। গুপ্তদের আমলে যে গরুড় ধ্বজার উল্লেখ পাওয়া যায় তা ভারতের নয়, গুপ্তবংশের পতাকা। তেমনি শিবাজী বা গুরু রামদাসের গৈরিক পতাকা বিশেষভাবেই মহারাষ্ট্রীয়দের পতাকা। আসলে ইতিহাসের ঐ পর্বে গোটা ভারত-জোড়া কোনো মহাজাতি উদ্ভবের বাস্তব ক্ষেত্র তৈরি হয়ে ওঠে নি। এমন-কি, আজো সেই মহাজাতি

গঠন প্রক্রিয়া যে সম্পূর্ণ হয় নি, তার লক্ষণও তো থেকে থেকেই জানান দিচ্ছে।

আমাদের ক্ষেত্রে মহাজাতি গঠনের বাস্তব উপাদানগুলি দানা বাঁধতে থাকে এ-দেশে ব্রিটিশ অভ্যুদয়ের পর। আর তারই সংগে সংগে দেশবাসীর মধ্যে উন্মেষ হতে থাকে ক্রম-পরিস্ফুট জাতীয়তাবোধের। তবে গোড়ার দিকে সে-বোধ এতটা জাগ্রত হয় নি যে আমরা আমাদের নিজস্ব পতাকার কথা ভাবতে পারি। আমাদের যুগচেতনা সেদিন এ-ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছিল সরাসরি নয়, কিছুটা ঘুরপথে। যেমন, রামমোহনকে ১৮৩১ সালের জানুয়ারি মাসে দেখা গেল বিলাতযাত্রা-পথে কেপটাউন বন্দরে খোঁড়া পা নিয়েও ফরাসী জাহাজের তেরংগা ঝাণ্ডাকে '*Glory, Glory, Glory to France*'! ধ্বনিতে অভিনন্দন জানাতে (Sophia Dobson Collet, *Raja Rammohan Roy*, পৃ. ৩০৮)। এর কিছুদিন আগে ১৮৩০ সালের বড়দিনের দিন সকালে সেই ফরাসী তেরংগা ঝাণ্ডাকেই উড়তে দেখা গিয়েছিল অক্টারলোনি মনুমেণ্টের চুড়োয়— অবশ্য ইউনিয়ন জ্যাকের পাশাপাশি! ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে এ কাণ্ডটি করেছিলেন হিন্দু কলেজের 'নব্য বংগীয়' ছাত্ররা অথবা কোনো 'Anglo-Indian enthusiast' (*History of Political thought from Rammohun to Dayananda*, খণ্ড ১, পৃ. ৮৪)। মনে রাখতে হবে ঐ ফরাসী তেরংগা ঝাণ্ডা সেদিন সারা পৃথিবীর প্রগতিপন্থীদের চোখে শুধু দেশবিশেষের জাতীয় পতাকাই ছিল না, ছিল 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা'র বিপ্লবী মন্ত্রের প্রতীক।

তবু শুধু পরের গরবে গরবিনী হয়েই চিরকাল মানুষের মন ভরে না— স্বদেশী ভাষার মতোই বিনা স্বদেশী পতাকা কি আর আশা মেটে? স্বভাবতই তখন নজর গেল নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের উপযুক্ত প্রতীক সন্ধানের অর্থাৎ নিজেদের পতাকা উদ্ভাবনের দিকে। এ-ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগের কথা ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম'-এ লিখেছেন এইভাবে : 'ডাঃ ফণীন্দ্রনাথ বসু এম. এ. পি. এইচ. ডি মহোদয়-কৃত *Life of Sris Chandra Bose* নামক পুস্তকে নিম্নলিখিত সংবাদ দিতেছেন : "হিন্দু এবং মুসলমানের প্রীতি সম্বন্ধ স্থাপন জন্য শ্রীশবাবু ১৮৮০ খৃঃ লাহোরে The Indian National Society নামক একটি সমিতি স্থাপন করেন। ইহার

সভ্যেরা জাতীয় সংগীত সহকারে একটি 'জাতীয় পতাকা' উড্ডীন করিয়া রাস্তায় পরিভ্রমণ করিতেন" (পৃঃ ২৩১-৩২) ।"

শ্রীশচন্দ্র ছিলেন এলাহাবাদের সুপরিচিত পাণিনি প্রকাশন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত এবং *Rise of Christian Power in India, Ruin of Indian Trades and Industries* প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক, মেজর বামনদাস বসু মহাশয়ের ভাই। তাঁর পরিকল্পিত সেই জাতীয় পতাকা কেমন ছিল, লাহোরের রাস্তায় ১৮৮৩ সালে তাঁরা কি জাতীয় সংগীত গেয়ে মিছিল করতেন— এ-সব খবর আমাদের জানা নেই। তবে তাঁর সেই পতাকা নিশ্চয়ই সেদিন স্বাধীন ভারতবর্ষের পতাকা হিসেবে পরিকল্পিত হয় নি। আমাদের রাজনৈতিক কল্পনার দৌড় নেহাত মামুলী ধরনের স্বায়ত্তশাসনের উপরে ওঠে নি তখনো অবধি।

ভূপেন্দ্রনাথ আরো খবর দিয়েছেন: "...রাজনারায়ণ বসুর 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামক পুস্তকে লিখিত আছে পদ্ম ফুলই ভারতের জাতীয় প্রতীক। তদানীন্তন *Liberal* নামক সংবাদপত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া একটি জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা অনুমান ১৮৮৮ খৃঃ তিনি উক্ত পুস্তকে প্রদান করেন" (ঐ, পৃ. ২৩২)।

সে-পরিকল্পনা সম্ভবত কোনোদিনই রূপ পরিগ্রহ করে নি— তার বিশদ বিবরণও জানি না। তবু পরবর্তী কালে এ-ধরনের চেষ্টার ক্ষেত্রে রাজনারায়ণের বক্তব্যের প্রভাব যে কিছুটা পড়েছিল, সে-সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরে দেওয়া যাবে।

জাতীয় পতাকারচনার প্রয়াস বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করে রজনী পাম দত্ত তাঁর *India Today*-তে যাকে বলেছেন "The First Great Wave of National Struggle", সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে। এমন-কি, এও হয়তো বলা চলে যে ঐ সময়ে যে ত্রিরঙ্গ জাতীয় পতাকার উদ্ভব হয় নানা যোগ-বিয়োগ ও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেইটিই আজ বহুলাংশে গৃহীত হয়েছে স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা হিসেবে— অন্তত মোটের উপর একটা ধারাবাহিকতার সূত্র পাওয়া যায় ঐ উদ্যোগের সময় থেকেই।

স্বদেশী আন্দোলনেব সময়কার সেই জাতীয় পতাকার জন্মবৃত্তান্ত পাওয়া যায় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ -লিখিত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু মহাশয়ের জীবনীতে। শচীন্দ্র-

প্রসাদ ছিলেন কৃষ্ণকুমার মিত্রের জামাতা এবং এ-দেশের ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। বৃত্তান্তটি এই রকম :

'শচীন্দ্রপ্রসাদ স্যার সুরেন্দ্রনাথের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। তিনি ১৯০৬ সালে একদিন তাঁহার বন্ধুর পরামর্শে সুরেন্দ্রনাথকে ধরিলেন যে আমাদের একটি জাতীয় পতাকা চাই। সুরেন্দ্রনাথ শিষ্যের অনুরোধে রাজী হইলেন। বলিলেন, আচ্ছা, তোমরা জাতীয় পতাকা তৈয়ারী কর ও পতাকা আনিয়া দেখাও। শচীন্দ্রপ্রসাদ ও তদীয় বন্ধু পরমোৎসাহে গৃহে ফিরিয়া এক পতাকা তৈয়ারী করিলেন। পতাকার রূপ ত্রিবর্ণরঞ্জিত— সবুজ, পীত ও লাল। সুরেন্দ্রনাথ এক পরামর্শ সভা আহ্বান করিলেন। তাহাতে স্যার আশুতোষ চৌধুরী, স্যার আবদুল হালিম গজনভী প্রভৃতি যোগ দেন (সুকুমার মিত্রের মতে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' হলে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন সমস্ত জেলার নেতৃবর্গ —গ্রন্থকার)। তাঁহারা স্থির করেন যে এই ত্রিবর্ণের উপর আবার মানচিত্রের সংস্থান অনুসারে ভারতবর্ষের ৭টি প্রদেশের জন্য ৭টি পদ্মের দ্বারা শোভিত থাকিবে। সুরেন্দ্রনাথ পরম আগ্রহে, পরম স্নেহে পতাকার দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে জাতীয় পতাকার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করাইয়া লইলেন। ১৯০৬ সালের ৭ই অগাস্ট বয়কট দিবসে এই পতাকা গ্রিয়ার পার্কে উড্ডীন করা হয়। নরেন্দ্রনাথ সেন পতাকার জন্য প্রার্থনা করেন, ভূপেন্দ্রনাথ বসু তাহা সুরেন্দ্রনাথের হস্তে দেন ও তিনি তাহা ১০১টি বোমার ধ্বনির মধ্যে উড্ডীন করেন। ১৯০৬ সালে স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলিকাতায় যে জাতীয় মহাসভার অধিবেশন হয় তখন সেই পতাকা সভামণ্ডপের শীর্ষে উড্ডীন করা হয়। ডেলিগেটদের ব্যাজেও এই ত্রিবর্ণ ছিল। এই ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকাই কংগ্রেসের প্রথম পতাকা। কাল-ক্রমে ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা বর্তমান রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে…” (পৃ. ৩২-৩৩)।

যে বন্ধুর পরামর্শে শচীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথের কাছে সেদিন জাতীয় পতাকার প্রস্তাব তুলেছিলেন এবং নেতার অনুমতিলাভের যাঁর সঙ্গে 'পরমোৎসাহে গৃহে ফিরে এক পতাকা' বানালেন তিনি হলেন কৃষ্ণকুমারের পুত্র, শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র। সুকুমারবাবু ভূপেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন “…এই পতাকা ১৯১১ খ্রী: পর্যন্ত কলিকাতার রাস্তায় কোন demonstration-কালে উড্ডীন করিয়া বাহিত

হইত। পারে বংগভংগ রদ হইলে ইহা লোকচক্ষুর অন্তরাল হয়” (ঐ, পৃ. ২২৬)।

শুধু সেই পতাকা নয়, তারই সংগে সেই পতাকাটি যাঁর উদ্ভাবন ও হাতে তৈরি সেই সুকুমার মিত্র মহাশয়ও রয়ে গেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। তাঁর বয়স এখন ৮৯ যদিও স্মৃতিশক্তি যথেষ্ট প্রখর। আমাকে তিনি বলেছেন যে ঐ ত্রিবর্ণ পতাকার কথা তাঁদের মাথায় এসেছিল ফরাসী-বিপ্লবের বিখ্যাত তেরংগা ঝাণ্ডার অনুসরণে। তাঁদের পরিকল্পিত পতাকাটির উপরের দিকে লাল অংশের উপরে ছিল ভারতের সাতটি প্রদেশের প্রতীক হিসেবে সাতটি পদ্মকোরক, মাঝখানে হলদে রঙের জমির উপরে ছিল দেবনাগরী অক্ষরে 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র আর নীচে সবুজ জমির উপর সূর্যচন্দ্র— হিন্দুমুসলমানের প্রতীক হিসেবে। সেই পতাকাটিই তিনি বানিয়েছিলেন নিজের হাতে।

সুকুমারবাবুর কথার সমর্থন পাওয়া যায় ঐ পতাকা পরিকল্পনার ব্যাপারে আরো একজন যিনি জড়িত ছিলেন সেই সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের (ইনি ছিলেন কালিঘাটের হালদারদের দৌহিত্র গোষ্ঠীয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য ও কংগ্রেসসেবী —গ্রন্থকার) সংগে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের এই আলাপে : “···লেখক যখন জিজ্ঞাসা করেন, ইহা ফরাসী বিপ্লবের ত্রিবর্ণলাঞ্ছিত পতাকার নকল কি না ? তাহাতে তিনি প্রত্যুত্তর করেন, হাঁ, ফরাসী ত্রিবর্ণ পতাকার ভাবই আমরা আসলে গ্রহণ করি কিন্তু প্রকাশ্যে ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতীক বলিয়া ব্যাখ্যা দিই···” (ঐ, পৃ. ২২৯)।

ভূপেন্দ্রনাথও লিখেছেন : “···তখনকার গরমদলের ও সুরেন্দ্রবাবুর বিপক্ষীয় দলের পত্রিকাতে পতাকানুষ্ঠান বিষয়ে উপহাস করা হয়। কেবল 'যুগান্তর' পত্রিকায় আমরা ইহা সমর্থন করিয়াছিলাম, লিখিয়াছিলাম—“জাতীয় বৈপ্লবিক পতাকারূপে ইহাকে আমরা গ্রহণ করিতেছি”। সুকুমারবাবু বলেন, ঐ পতাকার সঠিক বিবরণ 'সঞ্জীবনী' ও ইংরেজী 'বন্দে মাতরম' পত্রে প্রকাশিত হয়। তিনি স্বীকার করেন 'যুগান্তর' ব্যতীত আর কোনো সংবাদপত্র এই পতাকাকে অভিনন্দিত করে নাই” (ঐ, পৃ. ২২৬)।

সেই 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক, ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এ-প্রসংগে আর-এক জায়গায় লিখেছেন : “···যখন সুরেন্দ্রবাবুর বিপক্ষদলীয় পত্রিকাগুলিতে ৭ই অগাস্টের পতাকা-অনুষ্ঠানকে ব্যংগ করিয়াছিল তখন এই ত্রিবর্ণলাঞ্ছিত

পতাকাটি সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি, বলিয়াই লেখক 'যুগান্তর' পত্রিকায় অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। সেই একদিন গিয়াছে" (ঐ, পৃ. ২২৯-৩০)।

এখানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দেশের মধ্যে কিছু লোক ঐ জাতীয় পতাকা রচনার প্রয়াসকে ব্যংগ করছে। অন্যদিকে যাঁরা সে প্রয়াসের সংগে যুক্ত তার মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ, গজনভী বা আশু চৌধুরীর মতো প্রবীণ ও সংস্কারপন্থী নেতারা পতাকাটিকে গ্রহণ করছেন ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসন লাভের কামনার প্রতীক হিসেবে আর সুকুমার মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ, সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তরুণ বিপ্লবীরা তারই মধ্যে দেখছেন ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শে এক ভারতীয় বিপ্লবের ও তারই ফলে উদ্ভূত স্বাধীন ভারতের ইংগিত। এ'ও দ্রষ্টব্য যে প্রবীণ নেতাদেরই ঝোঁক হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতীক হিসেবে পতাকার ব্যাখ্যাদানের। আর তরুণদের ঝোঁক তার বিপ্লবী ব্যঞ্জনার উপরে যদিও প্রকাশ্যে তাঁরাও সায় দিচ্ছেন প্রবীণদের ঐ সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যায়।

এখানে একটি সংখ্যা নিয়ে কিছুটা গোলমাল বেধেছে। যে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার বিবরণ সুকুমারবাবু সঠিক বলে মনে করেন তাতে দেখা যায় সাতটি নয়, আটটি পদ্মের উল্লেখ। সম্ভবত এই আট সংখ্যাটিই ঠিক। আর পতাকায় পদ্মের আবির্ভাব সম্ভবত রাজনারায়ণ বসু-লিখিত 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা"য় প্রকাশিত সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবের সূত্রেই। কারণ নিবেদিতা *Modern Review* পত্রিকায় যে পতাকার প্রস্তাব করেন তাতেও ভারতাত্মার প্রতীক হিসেবে বজ্র ও পদ্মের উল্লেখ থাকলেও, সে-প্রস্তাব এসেছিল এই সময়ের বেশ কিছুটা পরে।

ইতিমধ্যে কিন্তু হঠাৎ আর-একটি ঘটনা ঘটল দেশের বাইরে। ১৯০৭ অগাস্ট মাসে স্টুটগার্টে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রীদের সম্মেলনে বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী নেতা, ভিখাজী রুস্তম কামা একটি জাতীয় পতাকা তোলেন। এ-বিষয়ে ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের প্রকাশন বিভাগ 'আমাদের পতাকা' নামে যে পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছেন তাতে আছে। "শ্রীমতী কামা এবং তাঁহার বৈপ্লবিক সহকর্মীগণ ১৯০৭ সালে (কাহারও কাহারও মতে ১৯০৫ সালে) প্যারিসে···পতাকাটি উত্তোলন করেন। ইহা প্রায় প্রথম পতাকার মতই ছিল; শুধু উপরের ফালিটিতে একটি পদ্ম ও সপ্তর্ষির প্রতীক স্বরূপ সাতটি তারকা অংকিত ছিল [এইখানে পাদটীকায় লেখা হয়েছে: 'এ কথা

বিতর্কমূলক। পদ্মফুল অঙ্কিত ছিল কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত জানা যায় নাই' —গ্রন্থকার]। বার্লিনে সমাজতন্ত্রবাদীদের সমাজতান্ত্রিক এক সম্মেলনে এই পতাকা প্রদর্শন করা হয়" (পৃ. ১)।

আশ্চর্যের ব্যাপার ভারত সরকার -প্রকাশিত পুস্তিকার এই অনুচ্ছেদটিতে অনেকগুলি ভুল রয়েছে। যেমন, শ্রীমতী কামা ঐ পতাকা প্রথম তোলেন প্যারিসে বা বার্লিনে অনুষ্ঠিত সমাজতন্ত্রী সম্মেলনে নয়— ১৯০৫ সালেও নয় —নিশ্চিতভাবেই, ১৯০৭ সালের অগাস্ট মাসে স্টুটগার্ট শহরে অনুষ্ঠিত 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে'র সপ্তম কংগ্রেসে। ঐখানেই ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে শ্রীমতী কামা ঐ পতাকাটি তোলেন ও তাকে অভিবাদন জানিয়ে এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন : "That the continuance of British rule in India is positively disastrous and extremely injurious to the best interest of India, and lovers of freedom all over the world ought to cooperate in freeing from slavery the fifth of the whole human race inhabiting that oppressed country, since the perfect social state demands that no people should be subject to any despotic or tyrannical form of government" (ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, 'ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা', পৃ. ৬৩)।

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য ঐ সম্মেলনে উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন লেনিন, লিটভিনভ, লুনাচারস্কি প্রমুখ রুশ নেতা, কার্ল লিবক্নেখ্‌ট, রোসা লুক্সেমবুর্গ, বেবেল, কাউট্‌স্কি প্রমুখ জার্মান নেতা এবং জ্যোরে-র মতো ফরাসী নেতা। র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের মতো সুবিধাবাদী শ্রমিক নেতাদের ঘোরতর বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও সেদিন শ্রীমতী কামার ঐ প্রস্তাবের মূল কথাটি সম্মেলন গ্রহণ করেছিল, তা প্রথমোক্ত নেতাদের সমর্থনের জোরেই— এমন-কি, শ্রীমতী কামা ও তাঁর ভারতীয় সংগী, সর্দার সিং রাওজী রাণা সেদিন সম্মেলনে যোগ দিতে পেরেছিলেন তাঁদেরই সাহায্যে। সেদিনের কথা কথা মনে করেই ১৯২০ সালে কার্ল কাউট্‌স্কি ভূপেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন : 'I remember an Indian lady waving a flag' ('ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম', পৃ. ২২৭)।

পতাকাটি ওড়ানোর পর শ্রীমতী কামা যে প্রস্তাব তোলেন তার ভাব ও

ভাষা এবং শ্রীমতী কামার ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক মতামত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে শ্রীমতী কামা ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের চোখে ঐ পতাকা ছিল নিঃসংশয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রতীক। ঐ পতাকার বর্ণনা দিয়েছেন হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা'য় এইভাবে : "…লাল, গেরুয়া ও নীল, পরপর এই তিনটি রঙ। ওপরে লাল রঙ, তাতে আটটি আধফোটা সাদা পদ্ম, মাঝখানে গেরুয়ার ওপর দেবনাগরী অক্ষরে লেখা "বন্দে মাতরম" তলায় নীল রঙের ওপর এক ধারে সূর্য, অন্যধারে অর্ধচন্দ্র ও তারা" (পৃ. ২০৫)।

ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর পূর্বোক্ত বইটিতে লিখেছেন "মাডাম কামা তাঁহার বহুদিনের পরিকল্পিত স্বহস্ত নির্মিত পতাকা উত্তোলন করিলেন" ইত্যাদি (ঐ, পৃ. ৬৩)। ডাঃ ভট্টাচার্যের বইটিতে আমি বহু সঠিক তথ্যের সন্ধান পেয়েছি কিন্তু তাঁর এই খবরটি ঠিক নয়। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রতীক হিসেবে একটি জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা সম্ভবত শ্রীমতী কামার ছিল। কিন্তু পতাকার পূর্বোল্লিখিত বিশিষ্ট রূপটি তাঁর সৃষ্ট নয়, আর স্টুট্‌গার্ট সম্মেলনে উত্তোলিত পতাকাটি তাঁর 'স্বহস্ত নির্মিত'ও নয়। মনে হয় বিদেশ থেকে দেশে ফেরার আগে ভূপেন্দ্রনাথেরও ধারণা ছিল অবিনাশচন্দ্রের মতোই। কিন্তু দেশের ফেরার পর তিনি এ-প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র কানুনগোকে প্রশ্ন করলে হেমচন্দ্র তাঁকে চিঠিতে জানান: "আমার বইতে (অর্থাৎ 'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা'য় —গ্রন্থকার) যা লিখেছি তাতে ঐ জাতীয় পতাকার আবিষ্কারক বলে আমি একটুও দাবী করি নাই। যদিও আমিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে (ওটি) তৈরী করেছিলাম" ('ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম', পৃ. ২২২)। হেমচন্দ্র তাঁর বইতেও লিখেছেন যে স্টুটগার্ট সম্মেলন-যাত্রী, শ্রীমতী কামার জন্যই তিনি পতাকাটি বানিয়েছিলেন প্যারিসে থাকার সময়ে।

হেমচন্দ্রের পুত্র, শ্রীমানববন্ধু কানুনগোও আমাকে এক চিঠিতে জানিয়েছেন যে "শ্রীমতী কামা, শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা প্রভৃতির কথা মতো '**First Indian National Flag**' প্যারিসে বাবা তৈরী করেছিলেন"। হেমচন্দ্র দক্ষ চিত্রশিল্পী ও ফোটোগ্রাফার ছিলেন তাই এই কথাটা ঠিক বলেই মনে হয়। কিন্তু নিজের হাতে না বানালেও ঐ পতাকার পরিকল্পনা কি তবে শ্রীমতী কামার?

হেমচন্দ্র আবার ভূপেন্দ্রনাথকে চিঠিতে এও লিখেছিলেন যে "…সাভারকার

ঐ পতাকার ফুল (পদ্ম), সূর্য, চন্দ্রাদির যে ব্যাখ্যা বোম্বের কাগজে দিয়েছিল (তা'তে) মুস্লিমের প্রতীক যে চাঁদ তা অস্বীকার করে। আর সেই যে পতাকার পরিকল্পনা দিয়েছিল, তা জাহির করেছিল।...ঐ পতাকার পরিকল্পনা একেবারে আমার নয় ; আমি ঐ পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম, বিশেষ করে পতাকার মাঝখানে 'বন্দে মাতরম্' লেখার বিরোধী ছিলাম" ('ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম', পৃ. ২২২)।

পতাকার পরিকল্পনা সাভারকারের— এই বক্তব্যের সমর্থন বা বিরুদ্ধতা— হেমচন্দ্র এখানে কোনোটাই স্পষ্টভাবে করেন নি। কিন্তু আসল ব্যাপার এই যে, ঐ পরিকল্পনা শ্রীমতী কামা বা সাভারকারের কারোই হতে পারে না। তার কারণ ১৯০৭ সালে স্টুটগার্ট সম্মেলনে শ্রীমতী কামার তোলা পতাকা আর তার ঠিক আগের বছর স্বদেশী আন্দোলনে আলোড়িত কলকাতার পতাকাটির আশ্চর্য সাদৃশ্য। দুটিই তেরঙা। দুটিরই উপরের রঙ লাল ও তার উপরে আটটি পদ্মকোরক। মাঝখানে কলকাতারটিতে আছে হলদে রঙের উপর দেবনাগরীতে 'বন্দে মাতরম' লেখা আর প্যারিসেরটিতে গেরুয়া রঙের উপর দেবনাগরীতে 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র আর সবার নীচে কলকাতারটিতে যেখানে সবুজ রঙের উপর সূর্যচন্দ্র, প্যারিসেরটিতে সেখানে নীল রঙের উপর ঠিক সেই চিহ্নই।

এতটা মিল কিছুতেই নিছক আকস্মিক হতে পারে না। আর যেহেতু কলকাতায় পতাকা উড়েছিল ১৯০৬ সালের ৭ই অগাস্ট আর স্টুটগার্ট সম্মেলনে তার এক বছর পরে (১৯০৭ সালের অগাস্ট মাসে) তাই এই অনুমান মোটেই অসমীচীন নয় যে কলকাতার পতাকাটির নমুনা নিশ্চয়ই প্রবাসী বিপ্লবীদের হাতে পৌঁছে গিয়েছিল ইতিমধ্যে এবং তারই কিছুটা পরিবর্তন করে স্টুটগার্ট সম্মেলনের প্রাক্কালে প্যারিসে হেমচন্দ্র তৈরি করেছিলেন দ্বিতীয় পতাকা। প্রসঙ্গত এ'ও লক্ষণীয় যে, যে দুইক্ষেত্রে পতাকা দুটির গরমিল, তার মধ্যে একটিতে হলদে ও গেরুয়ার মধ্যে ভুল হওয়া বিচিত্র নয়।

শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্রও আমাকে বলেছেন যে ঐ সময়ে যে-সব তরুণ বিপ্লবী বিদেশ-যাত্রা করেছিলেন তাঁদের মধ্যেই কেউ নিশ্চয়ই সেই পতাকার নমুনা নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে করে। তিনি এ-প্রসঙ্গে নামও করলেন হেরম্বলাল গুপ্তের, অবশ্য বললেন যে তিনি এ-ব্যাপারে অবশ্য নিশ্চিত নন পুরোপুরি।

হেরম্বলালের বিদেশযাত্রার সময় আমার জানা নেই— তাই তাঁর মারফৎই কলকাতার পতাকার নমুনা পেঁচেছিল কিনা প্রবাসী বিপ্লবী মহলে তা জোর করে বলতে পারছি না।

ভূপেন্দ্রনাথ কিন্তু বেশ পরিষ্কার করে একটি কথা লিখেছেন এ-প্রসঙ্গে। বরোদার সেনাধ্যক্ষ মাধো রাও-এর ভাই, খাঁসী রাও ছিলেন একজন বিপ্লবী। যুদ্ধবিদ্যা শেখার জন্য তিনি গিয়েছিলেন সুইজারল্যাণ্ডে। সেখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল হেমচন্দ্র কানুনগোর। ভুপেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "তিনি ১৯০৭ খৃঃ বাঙ্গলার কংগ্রেস দ্বারা প্রদত্ত ত্রিবর্ণলাঞ্ছিত জাতীয় পতাকার একটি ক্ষুদ্র নমুনা সঙ্গে লইয়া যান" ('ভারতে দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' পৃ. ১৫৩)।

সুতরাং কলকাতার পতাকা প্যারিসে পেঁছোনোর সূত্র এখানে পরিষ্কার।

যাই হোক, শ্রীমতী কামার সেই পতাকার প্রতিচ্ছবিই ছাপা হত তাঁর 'তলোয়ার' পত্রিকার প্রচ্ছদে। লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউসে' ও অন্যত্রও তিনি ঐ পতাকাকে লক্ষ্য করেই বক্তৃতা করতেন : 'This is the flag for which Khudiram and Prafulla Chaki died'। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন : "এই জন্য লেখক নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, বাঙ্গলার কংগ্রেস প্রদত্ত পতাকাই প্যারিসের বৈপ্লবিকদের পতাকায় পরিণত হয়" (ঐ, পৃ. ২২৭)।

প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে ঐ পতাকার সম্পর্ক ঐখানেই শেষ হয় নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ১৯১৫ সালে বার্লিনে প্রতিষ্ঠিত প্রবাসী ভারতীয়দের Indian Independence Committee (সচরাচর 'বার্লিন কমিটি' নামেই সমধিক পরিচিত —গ্রন্থকার) ঐ পতাকাটিকেই তাদের পতাকা হিসেবে গ্রহণ করে— অবশ্য বেশ কিছু পরিবর্তনের পর। এ-বিষয়ে ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন : '...ছদ্মবেশে নানা দেশ ঘুরিয়া ১৯১৫ খৃঃ গ্রীষ্মের প্রাক্কালে... লেখক বার্লিনে উপনীত হন, তখন কমিটির বাড়িতে এই পতাকা দেখেন। কিন্তু তাহা কেবল পরিষ্কার ত্রিবর্ণ-চিহ্নিত ছিল। লেখক যখন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেন, এই পতাকার উপর চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি কেন অপসারিত হইল তখন তিনি উত্তর করিয়াছিলেন—'উহা ম্যাডাম কামার সৃষ্ট ; আমরা উহা উঠাইয়া দিয়াছি" (ঐ, পৃ. ২২৭-২৮)।

ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন ঐ পতাকাকে লক্ষ্য করেই তিনি তাঁর এক জার্মান সহকর্মী, ভিন্‌সেন্ট ক্রাফট-কে বলেছিলেন 'এই পতাকার জন্য অনেকেই প্রাণ

দিয়েছেন'। ক্রাফট উত্তরে বলেন 'আরো অনেকেই দেবেন'। ভূপেন্দ্রনাথ এর উপরে নিজেই মন্তব্য করেছেন : "বার্লি'নের এই পতাকাটি যে কলিকাতার ৭ই অগাস্টে প্রদত্ত পতাকার অভিব্যক্তি এই ধারণার বশবর্তী হইয়াই লেখক এই কথা বলিয়াছিলেন" (ঐ, পৃ. ২২৮)।

ভূপেন্দ্রনাথ আরো খবর দিয়েছেন যে ঐ পতাকা তখন প্রকাশ্যে বিশেষ ব্যবহার হত না, তবে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী থেকে পলাতক ভারতীয় সিপাহীদের নিয়ে 'বার্লি'ন কমিটি' যখন মেসোপটেমিয়াতে 'স্বেচ্ছাবাহিনী' গড়ে তোলেন তখন সেই বাহিনী থেকে ঐ পতাকা ওড়ানো হত। বার্লি'ন কমিটির প্রাক্তন সদস্য, কর্তারামজী ১৯৪৮ সালে জামসেদপুরে এক সাংবাদিককে জানান যে 'বার্লি'ন কমিটি'র পতাকাটি নাকি তাঁর কাছে আছে। তিনি আর এখন জীবিত নেই—পতাকাটি হয়তো তাঁর ছেলের কাছে পাওয়া যেতে পারে (ঐ, পৃ. ২২৮-২৯)।

যুদ্ধের সময়ে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা যখন ঐ-সব করছেন দেশের ভিতরে তখন অ্যানি বেসান্ট ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেছেন Home Rule League আর তারই তরফ থেকে চালাবার চেষ্টা করছেন একটি জাতীয় পতাকা। তাতে 'পাঁচটি লাল এবং চারটি সবুজ রঙের ফালি আড়াআড়িভাবে পর্যায়ক্রমে সাজানো ছিল। সপ্তর্ষি-মণ্ডলের অনুরূপ সাতটি তারকা লাঞ্ছিত ছিল এবং উপরের বাম কোণে (ধ্বজাদণ্ডের দিকে) ইউনিয়ন জ্যাক চিত্রিত ছিল। আর-এক কোণে একটি শুভ্র অর্ধচন্দ্র এবং তারকা ছিল' ('আমাদের পতাকা', ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকাধীন প্রকাশন বিভাগ, পৃ. ১-২)।

স্পষ্টই বোঝা যায় এই পতাকার প্রবক্তাদের মাথায় 'ডোমিনিয়ান স্টেটাস' বা স্বায়ত্তশাসন যাই থাকুক-না কেন, পূর্ণ স্বাধীনতার কামনা ছিল না। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক মেজাজ এর কিছুদিন পর থেকেই যেভাবে চড়তে থাকে তাতে ইউনিয়ন জ্যাক-লাঞ্ছিত পতাকা স্বভাবতই কোনো দাগ কাটতে পারে নি সেদিন দেশবাসীর মনে।

১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বিজয়ওয়াড়া অধিবেশনে একজন অন্ধ্রবাসী তরুণ একটি পতাকার পরিকল্পনা গান্ধীজীর কাছে পেশ করেন।—সেই পতাকা দু'রঙা—হিন্দুর প্রতীক হিসেবে লাল ও মুসলমানের প্রতীক হিসেবে সবুজ। গান্ধীজী এরই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান

বাদে অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতীক হিসেবে একটি সাদা ফালি এবং পতাকার মাঝখানে একটা চরখা যুক্ত করার পরামর্শ দেন। ঐ তেরংগা পতাকা সরকারীভাবে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত না হলেও গান্ধীজীর অনুমোদনের দরুন কংগ্রেসের বহু সভায় ক্রমেই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের বেলগাঁও অধিবেশনের ঠিক আগে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অ্যান্ড্রুজ প্রমুখ মনীষী শান্তিনিকেতন থেকে গান্ধীজীকে এক চিঠিতে অনুরোধ জানান আমাদের বৈরাগ্যের আদর্শের প্রতীক হিসেবে জাতীয় পতাকায় গৈরিক রঙকে স্থান দিতে ('The National Flag", *Modern Review*, জুন ১৯৩১, পৃ. ৬৮৪)।

ইতিমধ্যে গান্ধীজীর অনুমোদনের ফলে চরখা-লাঞ্ছিত সাদা, সবুজ, লাল -রঙের তেরংগা ঝাণ্ডা উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা অর্জন করে— বিশেষ করে কংগ্রেসী মহলে। ঐ পতাকাই ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর রাত বারোটার সময় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে ওড়ানো হয় স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণের সংগে সংগে এবং ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রথম 'স্বাধীনতা দিবসে' সারা দেশে ওড়ানো হয় ঐ পতাকাই। তার পর ঐতিহাসিক ডাণ্ডী অভিযান, ধরসানা লবণ গোলা অভিযান এবং পেশোয়ার, শোলাপুর, বোম্বাই ও অন্যান্য জায়গায় আইন অমান্য আন্দোলন কালে ব্যাপক প্রচলন দেখা যায় ঐ পতাকার।

কিন্তু ঐ সময়ই আবার বিপত্তি দেখা দেয় তেরংগা ঝাণ্ডার সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার দরুন। শিখদের তরফ থেকে বলা হয় লাল ও সবুজ যদি হিন্দু-মুসলমানের প্রতীক হয় তা হলে বাকি সব সম্প্রদায়ের প্রতীক সাদা রঙ— এই বললেই চলবে না। সে-ক্ষেত্রে তাঁদের জন্যও চাই কোনো একটি রঙ। তবে রঙগুলি যদি সম্প্রদায়ের নয়, জাতীয় আদর্শের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়, তা হলে তাঁদের কোনো আপত্তি নেই ঐ পতাকায়।

এই বিতণ্ডার নিষ্পত্তির জন্য ১৯৩১ সালে এপ্রিল মাসে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে সাত-জনের একটি জাতীয় পতাকা কমিটি নিযুক্ত হয় ডাঃ পট্টাভি সীতারামাইয়ার সভাপতিত্বে। ঐ কমিটি কংগ্রেসের নানা স্তরের কমিটি, বিভিন্ন সংস্থা ও দেশবাসীর সংশ্লিষ্ট মতামত জানার জন্য সাধারণ্যে একটি

প্রশ্নাবলী প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এরই জবাবে কিছু মত পাওয়া যায় বিভিন্ন লোক ও সংস্থার। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ কালিদাস নাগ প্রমুখ মনীষী ঐ সময় বিদেশে ছিলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে সেখানে এ-বিষয়ে যে আলোচনা করেন তারই জের টেনে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় *Modern Review* পত্রিকায় পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধ লেখেন। সেখানে জাতীয় পতাকায় সন্নিবিষ্ট রঙগুলির সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার প্রবল বিরুদ্ধতা করা হয়। তারই সংগে আবার কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে ভেবে দেখতে বলা হয় তেরংগের বদলে পতাকাকে চৌরংগ করা যায় কি না।

এই-সব মতামতে শোনার পর 'জাতীয় পতাকা কমিটি' কংগ্রেসের কাছে সুপারিশ জানান জাফরানী রঙের পটভূমির উপর একেবারে বাঁ দিকে লালচে বাদামী রঙের একটি চরখা-আঁকা পতাকার। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কিন্তু তাঁদের সুপারিশ গ্রহণ না করে ১৯৩১ সালের ৭-৮ অগাস্টের অধিবেশনে সাব্যস্ত করেন যে "জাতীয় পতাকা হবে তিন রঙা, আগের মতোই আড়াআড়ি ভাবে সাজানো। তবে রঙগুলি উপর থেকে নীচ অবধি যথাক্রমে হবে জাফরানী, সাদা ও সবুজ। মাঝের সাদা ফালির উপরে গাঢ় নীল রঙে আঁকা থাকবে চরখা। রঙগুলি সম্প্রদায়ের নয়, আদর্শের প্রতীকতা করবে। জাফরানী রঙ সাহস ও আত্মত্যাগের, সাদা রঙ শান্তি ও সত্যের, সবুজ রঙ বিশ্বাস ও শৌর্যের আর চরখা হবে জনসাধারণের কামনার প্রতীক। পতাকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত হবে তিন-দুই-এর" (ডাঃ পট্টাভি সীতারামাইয়া, *The History of the Congress*, খণ্ড ১, পৃ. ৩১১-১২)।

কংগ্রেস কর্তৃক সরকারীভাবে গৃহীত ঐ পতাকার মান রাখতেই ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে মাতঙ্গিনী হাজরা ও সারা দেশের বহু শহীদ চরম আত্মোৎসর্গ করেন। আবার ঐ পতাকাটিকেই জাতীয় পতাকা হিসেবে গ্রহণ করে সুভাষচন্দ্র-পরিচালিত আজাদ হিন্দ সরকার ও 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি'—অবশ্য চরখা বাদ দিয়ে। আর সবশেষে ১৯৪৭ সালের ২২ জুলাই ভারতের সংবিধান পরিষদ চরখার বদলে অশোকের ধর্মচক্র (২৪টি ব্যাসার্ধের) যুক্ত ক'রে ঐ পতাকাকেই ঘোষণা করে স্বাধীন ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট সেই জাতীয় পতাকাই ওড়ানো হয় দিল্লীতে ও দেশের সর্বত্র। এরপর থেকে বছর বছর ২৬ জানুয়ারি ও ১৫ অগাস্ট ঐ

পতাকা ওড়ানো হচ্ছে জাতীয় পতাকা হিসেবে আর চরখা-লাঞ্ছিত জাফরানী-সাদা-সবুজের পুরোনো তেরংগা ঝাণ্ডা পর্যবসিত হয়েছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পতাকায়।

ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকার ইতিহাসে তাই বহু পরিবর্তনের মধ্যেও একটি ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। নরমপন্থী, চরমপন্থী, বিপ্লবী ও গান্ধীবাদী —দেশের ভিতরে ও বাইরে— সমগ্র জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন ধারার মানুষের হাত পড়েছে ঐ পতাকা রচনায়। সবার পরশে পবিত্র হয়ে উঠেছে আমাদের জাতীয় পতাকা।

৫

দ্রষ্টব্য ॥ পৃ. ৫৬

১৯৩৪ সালের ১৮ মার্চ 'প্যারিস কমিউন দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে লেনিনগ্রাড বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির গবেষকদের এক সাধারণ সভায় বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে আহ্বান জানানো হয় মূল ভাষণদানের। বীরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিয়েছিলেন সম্ভবত জার্মান ভাষায়। অন্তত জার্মান ভাষায় তাঁর বক্তৃতার অনুলেখন আমি পেয়েছিলাম জার্মান অধ্যাপক হর্স্ট ক্রুগারের কাছে। তিনি আবার তা সংগ্রহ করেছিলেন সোভিয়েত গবেষক ডাঃ কোমারভের কাছ থেকে।

জার্মান থেকে বক্তৃতাটি ইংরেজীতে তর্জমা করেন ডাঃ গংগাধর অধিকারী।

বীরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় সেদিনকার কিছু কিছু ঘটনা ও ব্যক্তি প্রসংগে তাঁর আগ্রহোদ্দীপক মন্তব্য পাওয়া যায় তাঁর স্মৃতিচারণের সূত্রে। —গ্রন্থকার।

লেনিনের কথা আমি প্রথম শুনি ১৯১০ সালের গ্রীষ্মকালে। লণ্ডন-প্রবাসী ছাত্র হিসেবে আমরা তখন— তার পরেও বহু বছর যাবৎ— ছিলাম জাতীয় বিপ্লবী। আমাদের যোগাযোগ ছিল কেয়ার হার্ডি, হাইণ্ডমানের মতো বৃটিশ শ্রমিক নেতাদের সংগে। লণ্ডন সম্মেলনে (এখানে বীরেন্দ্রনাথ ১৯০৩ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত 'রাশিয়ান সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি'র দ্বিতীয় কংগ্রেসে বলশেভিক ও মেনশেভিক ঝোঁকের উদ্ভবের উল্লেখ করছেন —গ্রন্থকার)

বলশেভিজম প্রতিষ্ঠার মতো যুগান্তকারী ঘটনার আমরা কোনো খবরই রাখতাম না।

১৯১০ সালের জুলাই মাসে আমি প্যারিসের প্রবাসী ভারতীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সংগে গিয়ে জুটলাম, কারণ আসন্ন গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য আমাকে তখন পালাতে হয়েছিল ইংলণ্ড থেকে। সেই প্রবাসীদের মধ্যে একজন ছিলেন নারী— শ্রীমতী ভিকাজী কামা। তিনি জন্মেছিলেন বোম্বাইয়ের এক সচ্ছল পরিবারে কিন্তু নিজেকে ও তাঁর যথাসর্বস্ব তিনি নিয়োগ করেছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের কাজে। তিনি সমাজতন্ত্রী হয়েছিলেন ও যোগ দিয়েছিলেন ফরাসী সোশ্যালিস্ট পার্টিতে, আমিও যে-দলে যোগ দিই ১৯০৭ সালে। শ্রীমতী কামা ১৯০৭ সালে স্টুটগার্ট সম্মেলনে (সমাজতন্ত্রী আন্তর্জাতিকের) যোগ দিয়েছিলেন প্রতিনিধি হিসেবে। ঐ সম্মেলন সম্পর্কে লেনিন তাঁর প্রথম রিপোর্টে সেখানে ভারতীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতির কথা বলেছিলেন, তবে কারো নাম উল্লেখ করেন নি। ভিকাজী কামা আমাদের লেনিন ও রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের কথা আর যুদ্ধ ও জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁদের মনোভাবের কথা প্রায়ই বলতেন। কিন্তু আমরা কেউই তখন সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক দলের মধ্যেকার বিভেদের আর লেনিনের ভূমিকার বিপুল তাৎপর্য ধরতে পারি নি। আমরা ঘুরতাম 'লুমানিতে' চক্রের আশপাশে (জ্যোরে, লুংগে প্রভৃতি)। এখন আমার অবাক লাগে যে মিখায়েল পাবলোভিচ ও কার্ল রাপোপোর্টের মতো কমরেডদের সংগে আমাদের প্রায়ই দেখা হলেও তাঁরা কেন একটি কথাও বলেন নি লেনিন সম্পর্কে।

এর পর বছরের পর বছর কাটতে লাগল। যুদ্ধের বছরগুলিতে আমি খবর শুনলাম লেনিনের সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থানের আর জার্মানির বুকের উপর দিয়ে তাঁর সেই বিখ্যাত 'বন্ধ ট্রেনে' যাত্রার। ১৯১৭ সালের মে মাসের (?) গোড়ায় স্টকহল্মে পেঁছে আমি বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মানুষের ভিড় দেখতে পাই। আমি খোঁজ করি লেনিন তখনো স্টকহল্মে আছেন কি না। লেনিনের সংগে দেখা করতে না পাওয়ায় সেদিন আমি খুবই হতাশ হই।

ইতিমধ্যে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই আমি যোগাযোগ করি পেট্রো-

গ্রাডের সংগে। তারপর এল অক্টোবর-বিপ্লব— সে-বিপ্লব আমার পরবর্তী জীবনের চূড়ান্ত নিয়ামক শক্তি। ১৯১৮ সালে কমরেড রেন্‌স্কি আমায় একটা টেলিগ্রাম পাঠান যাতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় সেখানে (পেট্রোগ্রাডে) যাওয়ার। নানা কারণে— এখানে তার সবিস্তার বিবরণে অনেক সময় লাগবে— আমি কিন্তু মস্কো পেঁছিতে পারি নি ১৯২০ সালের নভেম্বরের আগে। রায় ইতিমধ্যেই সেখানে পেঁছে গিয়েছিলেন ১৯১৯ সালে (কথাটি ঠিক নয়। মানবেন্দ্রনাথ সোভিয়েত দেশে পেঁছান ১৯২০ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ —গ্রন্থকার)।

এরপর আমি আবার মস্কোয় আসি তৃতীয় কংগ্রেসের ('কমিণ্টান''-এর) সময়ে। আমার সংগে ছিলেন দত্ত, লুহানি, খানখোজে (অর্থাৎ ডাঃ ভূপেন্দ্র-নাথ দত্ত, গুলাম আম্বিয়া খান লুহানি ও পাণ্ডুরংগ খানখোজে, প্রভৃতি বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী —গ্রন্থকার) ও আরো কয়েকজন ভারতীয় কমরেড। আমরা তখনো সংঘবদ্ধ হই নি পার্টির মধ্যে— আশা করেছিলাম সেটা ঘটবে মস্কোয়। কিন্তু রায় তখন নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন কিছু দুঃসাহসী ভাগ্যান্বেষী ও সাম্রাজ্যবাদী দালালের জালে। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি আস্থা অর্জন করেছিলেন 'কমিন্টান''-এর তদানীন্তন নেতৃস্থানীয় কমরেডদের। আমরা আমাদের তরফ থেকে দৃঢ়সংকল্প সংগ্রাম চালাই রায়-চক্রের বিরুদ্ধে। রায়ের পিছনে সমর্থন ছিল ট্রট্‌স্কি, জিনোভিয়েভ, বুখারিন ও রাডেকের। দ্বিতীয় কংগ্রেসে তাঁর উপনিবেশ-সংক্রান্ত নিবন্ধের (আসলে মূল নিবন্ধটি রচনা করেছিলেন লেনিন। মানবেন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন ঐ বিষয় সংক্রান্ত পরিপূরক নিবন্ধ —গ্রন্থকার) ফলে তিনি বেশ-কিছুটা পরিচিতি লাভ করেছিলেন। চার মাস পরে আমাদের মস্কো ছাড়তে হল রায় ও তাঁর সংগীদের প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে কমরেডদের চোখ খুলতে না পেরেই (রায় আজ প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া শিবিরে আর আমরা এখন নানা দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য)।

রায়ের তখনকার অতি-বাম দৃষ্টিভংগির বিরুদ্ধে আমরা ভারতীয় প্রশ্ন প্রসংগে নিবন্ধ লিখে লেনিনের কাছে পাঠাই। লেনিন তার জবাবে নিজের হাতে ইংরেজীতে এই ক-লাইন লিখে পাঠালেন :

কমরেড চট্টোপাধ্যায়, লুহানি ও খানখোজের প্রতি,

আমি সাগ্রহে আপনাদের নিবন্ধ পড়েছি। তবে আর নতুন নিবন্ধ কেন? আমি শীঘ্রই এ-প্রসঙ্গে আপনাদের সঙ্গে আলাপ করব।

আপনাদের ভ্রাতৃপ্রতিম

এন. লেনিন

বহু জরুরি ব্যাপারে আমাদের নিবন্ধটি ছিল রাজনৈতিকভাবে ভুল। তবে আমরা লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য উৎকণ্ঠাভরে অপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু আমাদের প্রতিপক্ষ তা বানচাল করে দিল। নেতার সঙ্গে দেখার সুযোগ না পেয়েই আমাদের ফিরে আসতে হল দুঃখিত চিত্তে। আমার বইপত্রের সঙ্গে লেনিনের চিঠিটি রক্ষিত ছিল বার্লিনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংঘের দপ্তরে। সংঘের সেই দপ্তর হিটলারের পুলিস জোর করে বন্ধ করে দেয় আর নেতার অমূল্য চিঠিটি সমেত সবকিছু বাজেয়াপ্ত করে নেয়।

(অক্টোবর) বিপ্লবের আগে লেনিনের সঙ্গে কোনোদিন কোনো ভারতীয় বিপ্লবীর যোগাযোগ ঘটেছিল কিনা— এই প্রশ্নের উত্তর জানার ব্যাপারে আমার বিশেষ আগ্রহ আছে। প্রশ্নটি আমি তাই ক্রুপস্কায়ার কাছে তুলি:

সোভিয়েত বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি,

লেনিনগ্রাড

২৫ জানুয়ারি, ১৯৩৪

কমরেড এন. ক্রুপস্কায়ার প্রতি

প্রিয় কমরেড,

লেনিনের জীবন প্রসঙ্গে আমি কয়েকটি ব্যাপারে কিছু খবর জানতে চাই যে বিষয়ে আপনার স্মৃতিকথায় বা অন্যান্য জীবনীতে কোনো উল্লেখ পাই নি। আপনি যদি এই প্রশ্নগুলির জবাব দেবার সময় করতে পারেন তা হলে আমি বিশেষ বাধিত হব:

ক. লেনিনের বিলাতে প্রবাসকালে কি তিনি কোনো ভারতীয়ের সংস্পর্শে আসেন? যদি তা-ই হয় তা হলে আপনি কিছু খবর দিতে পারেন?

খ. ১৯০৭ সালের স্টুটগার্ট সম্মেলনে দু-জন ভারতীয় যোগ দেন। তাঁদেরই একজন, ভিকাজী রুস্তম কামা নামে এক মহিলা সেখানে ভারতীয়

জনসাধারণের অবস্থা প্রসঙ্গে বক্তৃতা করেছিলেন। লেনিনের সঙ্গে কি তাঁর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোনো কথাবার্তা হয়েছিল ?

গ. অক্টোবর-বিপ্লবের আগে— বিশেষ করে ১৯১২-১৭-এর মধ্যে— কি লেনিন ব্যক্তিগতভাবে অথবা অন্যান্য কমরেড মারফত কোনো চেষ্টা করেছিলেন ভারতবর্ষের প্রবাসী জাতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের ?

বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির এক লেনিন-সংকলনের জন্য আমি একটি প্রবন্ধ লিখছি 'লেনিন ও ভারতবর্ষ' প্রসঙ্গে। তারই জন্য আমার জরুরি দরকার ঐ খবরের।

আপনার সুবিধামতো আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার প্রশ্নগুলির জবাব দিলে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে। আপনি অবশ্য জবাবগুলি রুশভাষাতেই দিতে পারেন।

আপনি যেহেতু আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন না তাই আমি কমরেড পিয়াটিনস্কি বা মালিনোভস্কির উল্লেখ করতে পারি এ-ব্যাপারে।

আপনার ভ্রাতৃপ্রতিম

(চট্টোপাধ্যায়)

৭.২.১৯৩৪

তাঁর কাছ থেকে আমার পত্রের নিম্নলিখিত উত্তর পাই :

লেনিনগ্রাড,

বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি,

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধেয় কমরেড,

যে সব প্রশ্নে আপনার আগ্রহ দুর্ভাগ্যক্রমে তার সম্পর্কে আমার কিছুই মনে নেই।

আমার যতটা মনে পড়ে লণ্ডনে কোনো ভারতীয়ের সঙ্গে কোনো সাক্ষাৎ ঘটে নি। স্টুটগার্ট সম্মেলনে আমি উপস্থিত ছিলাম না আর ভ্লাদিমির ইলিচও আমায় কিছু বলেন নি ঐ প্রসঙ্গে। খুব সম্ভব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর্বে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু আমার কিছুই মনে পড়ছে না সে-ব্যাপারেও।

অভিনন্দন সহ,

এন. ক্রুপস্কায়া

৬

দ্রষ্টব্য ॥ পৃ. ৬৬

জার্মান কাইজারের কাছে মহেন্দ্রপ্রতাপের এই কাবুল মিশন -সংক্রান্ত হাতে-লেখা রিপোর্টটি পেয়েছি জাতীয় মাহাফেজখানায় সংরক্ষিত Germain Foreign Ministry Archives-এর ৪০০ নং রীলের মাইক্রো-ফিল্মে —গ্রন্থকার।

For the gracious perusal of His Imperial Majesty the Emperor of the German Empire

An account of the trip from Berlin to Berlin through Turkey, Persia, Afghanistan and Russia

by

Mahendra Pratap (Kumar and Raja)

(Servant of mankind)

In the name of God and with the strong armour of the good wishes of H. I. M, the Kaisar of the German Empire, I left Berlin on the 10th of April, 1915 via Vienna, Budapest, Bukharest and Sofia, I reached Constantinople in a week. There I stayed for seventeen days. During this sojourn I had the honour of getting an audience of H. I. M, the Sultan and had the pleasure of having an interview with H. E Enver Pasha, H. E. Talat Pasha and others. The Sultan and the ministers were extremely Kind to me and H. I. M gave me an autographed letter for H. M, the King of Afghanistan. I am extremely thankful for the letter as it introduced me to the King of Afghanistan in terms which are not often used. For this Imperial graciousness I have also to thank the then Imperial German Ambassador at Constantinople who was very good to me and

who did his best to have me introduced to the Turkish Government.

I need not tarry on the description of the tour from Constantinople to Herat, the Afghan frontier province ; suffice it to say that it was extremely unpleasant from mental standpoint since I was having experiences which were quite foreign to me. Physically, too, it was a series of hardships— travelling day and night often without food or even water. But a tourist loves these physical hardships and they form in the dim past some of the best pictures of the memorable days gone by and so I have nothing to complain about these or for the loss of all my personal luggage in Persia. On the contrary I look back with pride and satisfaction on those bodily and material ordeals through which I had the good or bad luck to pass through during this trip.

I am, however, sorry to note that Herr von Hentig was pleased to leave behind in Persia tweentythree out of tweenty-six Imperial German Government letters addressed by H. E. the Chancellor to the Indian Princes and as these never reached Afghanistan our Indian Work suffered a great blow from this loss.

It was in the third week of August, 1915 that I reached Herat together with my friends and since Maulvi Barkatullah, the famous Mussalman leader and Captain Kasim Bey, the Turkish officer had preceeded us by a couple of days and had introduced our Mission with their natural ability, quite a royal reception was given to our Mission by H. E, the Governor of Herat.

From the day we entered Afghanistan and up to the time

we left it we were the honoured guests of the Afghan Government.

On the second of October, 1915 Kabul was reached. Towards the end of October I had the good fortune of presenting the two Imperial letters from H. I. M, the Kaisar and H. I. M, the Sultan to H. M, the Amir. Soon afterwards I and Maulvi Barkatullah were received by H. M, the Amir and princes at an informal conversation. Later followed a number of conferences and conversations between us and the Afghan Government. By the grace of God I had the good fortune to enjoy the confidence of all the parties in Kabul. But I regret very much that I could not accomplish the great work in view —the revolution in India as *I had not a single farthing* to start my Indian work. I mean that not a single farthing was placed at my disposal either by the Indian public or our friends —Germany and Turkey— to carry on my holy duties. True, besides that there were also a few official handicaps from the Afghan side but these were only due to the backward state of Afghan civilisation and they could have been easily mended by a flow of shining metal. H. M, the Amir wished that all of us should stay on in Kabul so that whenever an opportunity presents itself the Afghan Government may openly side with Germany and Turkey. In the mean time military preparations were pushed forward and my Indian work was carried on secretly under certain restrictions by the Afghan Government.

Maulvi Obeidullah, another famous leader of the Mussalmans in India, came from India and joined my work. At his own expense he kindly sent a messenger to India for me. This man was not heard of for several months. Another messenger

was sent and he returned even with some gold from one of my intimate friends.

I together with Maulvi Barkatullah and Maulvi Obeidullah had formed a Provisional Government of India. I was acting as the President of this Government and Maulvi Barkatullah (Diwan Sahib) was working as the Prime Minister and Maulvi Obeidullah was our Administrative Minister. We did not care to put down much in black and white but we were everyday labouring for our cause as best as we could. I have even with me the minutes and the seal of the Provisional Government of Hind. But as our German friends had left Kabul in May, 1915 and my estates were confiscated and my friends in India were extremely watched and as they were also sending messages that to start the big revolution they wanted a few thousand German and Turkish troops and since this was also the idea of the Afghan Government that the Afghan Government could not openly join our side in the ordinary circumstances without the help of money, arms, ammunition and troops I, Captain Kasim Bey and Maulvi Barkatullah Sahib took leave of the Afghan Government.

H. M, the Amir was good enough to give me the replies of the two Imperial letters and we left Kabul on the 17th. of September, 1916.

I may also note here that Captain Kasim Bey, Maulvi Barkatullah and myself were also doing our best to push forward our cause in the tribal area on the frontier. Captain Kasim Bey and Maulvi Barkatullah's proclammations to the Mussalmans proved very useful and inspiring which I hope my proclammations to the Hindus and the proclammation of the

Provisional Government to all the Indians must have proved of great benefit to our holy cause.

I may here specially recommend Haji Abdur Rasiq, the right hand man of H. R. H, the Naibus Salatant who was doing his best to push on our cause with all his means, official or non-official. Captain Khairiuddeen Bey and his friend, Saiyud running away to the tribal country at their great personal sacrifice and organising an army there is itself an epoch of our work in Afghanistan. Maulvi Basheer and the students who had come from India running away from their homes, proved useful in Kabul.

When we left Kabul we were obliged for want of funds to ask the Afghan Government for a loan to meet our personal expenses. The Afghan Government was pleased to grant me a loan of one thousand English pounds and one thousand English pounds were granted in loan for Captain Kasim Bey and Maulvi Sahib.

Since I was trying for some time with the consent and wish of the Afghan Government to win the sympathy of Russia for our Cause and had met with some important success, I left for Russian frontiers to get through Russia to Germany and Maulvi Barkatullah and Captain Kasim Bey left for Herat to get through Persia to Turkey and Germany. I was, however, detained long at Mazar Sharif, the capital of Afghan Turkestan and my friends could not enter Persia on account of the Anglo-Russian barricade in Persia. In the meantime the English diplomacy succeeded to overawe the Russian Government and they gave an unfavourable reply to me and handed over my two messengers to the English, one of whom Dr. Mathura Singh was

publicly hanged in Lahore and the other, Mr. Abdul Kadir Khan B. A. was pardoned on certain conditions. Now it was winter ; I could not proceed over the Pamirs to China and try to get through that way to Germany as I had wished.

On the 25th. of March, 1917 as spring appeared I left on way to China. In one month and a few days I reached the roof of the world after travelling over high passes and frozen rivers. Here, however, as I was on the point of leaving the frontier of Afghanistan I got a letter from H. R. H. the Prince Prime Minster of Afghanistan informing me of the declaration of war by China against Germany and of the great revolution in Russia.

So I returned post haste and came back to Khanabad, the capital of Katghan and Badakhshan and tried once again to get through Russia. In the meantime with the consent and wish of H. E. the Governor of Katghan and Badakhshan at Khanabad I was able to send from there three messengers to India. One was my companion named Teja Singh whom I sent to Nepal with H. E. the Chancellor's letter. A few copies of H. E. the Chancellor's letters together with some letters for my friends were also given to him. One horse, two rifles with some ammunition which I had purchased locally and some money was forwarded to our tribal centres in Yagistan. My man went as was directed and the Amir-ul-Mujadeens was kind enough to send with him a guide for Nepal.

Another messenger, Moulvi Saiyed Faizul Haque, a man recommended by H. E. the Governor was sent with letters for H. H. the Nawab of Hyderabad and H. H. the Begum of Bhopal. The fate of these messengers is not known to me. But

another messenger whom I had sent to India from Wekhan on my way back from the Pamirs returned to me later even with a reply from a friend of mine but as on cross-examination it transpired that he did not go himself to my friend and only acquired the reply through some one else and he spoke different lies in this connection I dismissed him.

I may here strongly recommend H. E. the Governnor Mhd. Safar Khan of Khanabad who is a great friend of 'all the enemies of England'.

I returned later to Mazar Sharif and opened a closer communication with the Russian Government at the express wish of H. M. the King Amir. Once again, however, I received an unfavourable reply. In the meantime began the defeat of the Russians. Then followed the second Russian Revolution.

I was getting special news direct from H. R. H, Prince Prime Minister and H. R. H, Prince Ainuddaula had kindly arranged that I got nearly regularly the daily Pioneer from India. I may also relate that at Mazare Sharif four messengers arrived from the frontier centres, two of whom were from the Amir-ul-Mujahideens, a great leader having several thousand fighters under him. These were suitably and they returned and many letter for India were given to them. And, of course, now that I had a little money it was not spared but liberally spent according to the restricted means for our work and in rewards to win sympathies. I have even kept a separate accounts of all that.

When still on the subject of our work in Afghanistan, I may put down in black and white that our two messengers, Messrs Abdul Bari, B. A. and Shujaullah who were sent through Persia

for Germany and Turkey were caught by the enemy in Persia. It may also be noted that the present Governor and General Commander of Afghan Turkestan can he utilised for our cause.

On the 13th. of January the thought came to my mind that I should leave Afghanistan for Europe. On the Ist of February 1918 I received an invitation from the Russian Government to come to Tirmiz and takeover the bread (?) question between Russia and Afghanistan. On the 15th. of February I reached Tirmiz where at the frontiers two Russian officers met me with a car. From that time upto Petrograd I was the guest of the Russian Government which arranged for sometime a special carriage and sometime a special compartment is special trains and provided best lodgings at the best hotels. The highest government officials including Mr. Trotski and Mr. Joffe received me and some very high officials even came to see me at my lodgings. I may also mention that I brought over to Russia three beautiful horses from Afghanistan which I had purchased at Khanabad on way to China and these I presented to the Russian officers in Turkestan and to the Bokhara General on the frontier.

From Petrograd to Germany it was also very easy to travel on account of the papers Mr. Trotski and Mr. Joffe had given me to go to Suitzerland through Germany. From Petrograd I came by railway to Soroshina and thence to Pokoff by sledges over snow fields and frozen roads. At Pokoff I met the first commander of the German forces. He made arrangements very kindly for my trip to Dünaburg. These I was met by Lieutenant Clienow who kindly arranged for my forward Journey.

So I reached Berlin comfortably on the evening of the 23rd.

March, 1918. *I am happy that in the name of God I stand once again under the gracious protection of H.I.M, the Kaisar. Now I am simply eager that I may present the Royal letter of H.M, the King of Afghanistan to H.I.M, the Kaisar at the earliest possible date.*

Then I wish to proceed to Constantinople and present the Amir's letter to the Khalifa. Later I intend to proceed to Suitzerland to work for the only one eternal and universal religion —the Religion of Love. But since the Religion of Love requires its followers to serve mankind and the service of mankind is to make and keep all the people happy and contented, I shall ever consider it a part of my duty to work for the Independence of India. I further believe that the freedom of India can be acquired with greater facility through the help of Germany and Turkey. Therefore I pray for Imperial Goverment's help for our holy country's holy cause.

I have in my mind, based upon extensive experience of India, Afghanistan and Russia some very practical plans equally beneficial for Germany and India. I think if Germany will only be good enough to adopt the lines of my proposals, Germany's influence will, at once, penetrate to Persia, Afghanistan, India, China and Japan through Russia, and then Germany, Russia and Japan together will become the guardians of the East.

If the Imperial Government will be inclined to give ear seriously to this side I shall only be too glad to present my views on the subject.

It is however, immediately necessary that H.M, the King of Afghanistan and our friends there may be informed directly of my safe arrival in Germany and of the present favourable

position in Russia and in Europe. I can send at once for this work my Afghan servant Muhib Ali Khan and one member of the Indian Committee by name of Mr. Nayak could go with him. I have come to know this gentleman only lately and from what I have seen of him during these days I consider him most suitable person available at present.

More here-after if necessary. For the time being I finish at the prayer for all the good friends of India and mankind. Love!

Every page of this account has been initialled at the end by me. (Sd) M. P.

(Sd) M. Pratap (Kumar and Raja)
Servant of Mankind
Tuesday, the 2nd April, 1918

Appendix

I have not tried to speak at length of my very friendly and intimate relations with the Court of Afghanistan but the original private, personal and also official letters which I have in my possession addressed by the Amir and the Princes to me speak volume of the great confidence I enjoyed. I have, for instance, two letters from H.M, the Amir, six from the eldest son of the Amir, the Muinis Saltant, ten from Prince Ainuddaula and twentysix letters from H. R. H, the Prince Prime Minister. Besides I have many other interesting documents and letters proving the above statement.

N.B. Then these are only the remnants since I had to destroy many important papers as a precaution when entering Russia.

(Sd) M. P.
2.4.1918

[Every correction has also been initialled. M.P.]

৭

দ্রষ্টব্য ॥ পৃ. ৬৯

পটসডামের ৎসেণ্ট্রালার্কিভ বা জার্মান কেন্দ্রীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত নাৎসী পররাষ্ট্র দপ্তরের নথিপত্র ঘেঁটে খ্যাতনামা জার্মান ও অস্ট্রিয়ান গবেষকেরা কিছুদিন থেকে যে তত্ত্বতল্লাসী চালাচ্ছেন তাতে সুভাষচন্দ্র ও ভারতীয় যুদ্ধ-বন্দীদের জার্মানিতে অবস্থানকালীন (১৯৪১-১৯৪৩) কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জানা গেছে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য লেখা হল জার্মান গবেষক, ডাঃ ডিয়েথেল্ম ভাইডেমান-এর "The Mutiny of Königsbrück" প্রবন্ধটি (ইংরেজী *G D R Review* পত্রিকার ১৯৭০ সালের দ্বাদশ ও ১৯৭১ সালের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত। কনিগ্‌সব্রুক শিবিরেই স্থান হয়েছিল আজাদ হিন্দ-বাহিনীর —গ্রন্থকার)। 'সপ্তাহ' পত্রিকার ৪, ১১, ১৮ ও ২৫ জুলাই, ১৯৬৯ সংখ্যায় "জার্মানিতে সুভাষচন্দ্র" শিরোনামায় ঐ বিষয়ে একটি রিপোর্টের বাংলা তর্জমাও প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তার থেকে কিছুটা অংশ প্রকাশ করা হল :

"একেবারে শুরু থেকেই জার্মান ফ্যাসিবাদ সুভাষচন্দ্রকে ও তাঁর সহযোদ্ধাদের অবিশ্বাস করত। সুভাষচন্দ্রের প্রতিটি পদক্ষেপের উপর কড়া নজর রাখা হত। সেন্সর করা হত প্রতিটি চিঠি। ভারতের উদ্দেশে বেতার প্রচারও এর ব্যতিক্রম ছিল না" ('সপ্তাহ', ১১ জুলাই ১৯৬৯, পৃ. ১৩) যদিও "২৪শে ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখে রিবেনট্রপ অনুমতি দেয় ভারতের উদ্দেশে বেতার প্রচার শুরু করা হোক ;···ঠিক হয় যে এক গোপন সম্প্রচার কেন্দ্র থেকে নেতাজী ভারতের উদ্দেশে সপ্তাহে তিনবার করে বক্তৃতা দেবেন। এই বক্তৃতাগুলি প্রথমে রেকর্ড করে নেওয়া হবে, তারপর বিকেল ৫-১৫ মিনিট থেকে ৫-৪৫ মিনিট পর্যন্ত পাডিব্রাড বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হবে" (ঐ, পৃ. ১২)। পরবর্তীকালে পশ্চিম জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের চান্সেলর "কিসিংগার নিজেই নেতাজীর বেতার প্রচারের উপর সেন্সরশিপের নির্দেশ দেন এবং নিজেও সে কাজ করেন। ৩০ ডিসেম্বর ১৯৪১ তারিখে পররাষ্ট্র দপ্তরে এক সভা হয়। তাতে কিসিংগারও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এই সভার কার্য-বিবরণীতে লেখা আছে 'সবাই একমত হন যে বেতার প্রচার-গুলির তদারকি চালিয়ে যেতে হবে গ্রামোফোন রেকর্ডিংগুলি বাজিয়ে শুনে-মাজোত্তা-র (নেতাজীর ছদ্মনাম) অগোচরে' " (ঐ, পৃ. ১৩)।

"নেতাজীর পেছনে গোয়েন্দাগিরির ভিতর দিয়ে ভারতীয় দেশপ্রেমিক ও জার্মান ফ্যাসিস্টদের মধ্যকার বিরোধ প্রকাশ পায়। ১৯৪২ সালের শেষদিকে ফ্যাসিস্টরা সুভাষচন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি ক'রে তাঁকে দিয়ে নীতি ও পন্থা মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। এই চাপটা যখন অত্যন্ত বেড়ে গেল তখন নেতাজীর সামনে রইল মাত্র দুটি পথ : হয় নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে ফ্যাসিবাদের একটা ক্রীড়নকে পরিণত হওয়া, না-হয় প্রকাশ্যে ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করা। সুভাষচন্দ্র যদি তাদের নীতি মেনে নিতে সরাসরি অস্বীকার করেন তবে তার পরিণাম অবশ্য হত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বা বন্দী-শিবিরে বাস। নেতাজী স্বভাবতই ফ্যাসিস্টদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পারেন এবং ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ফ্যাসিবাদের হাতে বিসর্জন দেবার ইচ্ছাও তাঁর ছিল না। তিনি মুক্তির একটা উপায় খুঁজে বের করলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দ্রুত জাপানী অগ্রগতিকে তিনি একটা অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করলেন এবং ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ তারিখে তিনি জার্মানি ত্যাগ করে একটি সাবমেরিন করে জাপানে গিয়ে পৌঁছলেন। এই ভাবে তিনি রেহাই পেয়েছিলেন সম্ভাব্য হত্যার হাত থেকে" ('সপ্তাহ', ১৮ জুলাই ১৯৬৯, পৃ. ৯।

জার্মানিতে যে আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠিত হয়েছিল তার অনেকেই কিন্তু রেহাই পান নি সেদিন। ঐ প্রবন্ধের তৃতীয় দফায় (পৃ. ৯, ১৮ জুলাই ১৯৬৯) লেখা হয়েছে "১৯৪৪ সালে হিটলার—জার্মানির সামরিক অবস্থা যখন সঙ্গীন হয়ে উঠল এবং সমস্ত সংরক্ষিত বাহিনীকে যখন যুদ্ধের জন্য টেনে নেওয়া হল, তখন কথা হল আজাদ হিন্দ বাহিনীকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবার।

"কিন্তু জার্মানি ত্যাগ করার সময়ে সুভাষচন্দ্র সৈন্যদের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে তারা যেন শুধু ব্রিটিশের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কিছুতেই নয়। সেইজন্যই ভারতীয় দেশপ্রেমিকরা পূর্ব-রণাঙ্গনের উদ্দেশে যাত্রা করতে অসম্মত হলেন।··· ভারতীয় সৈন্যরা

সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করার ফলে তখনই ১০ জন ভারতীয়কে কোর্ট মার্শাল করে হত্যা করা হয়। এ ছাড়া আরও ৪০ জন ভারতীয়ের বিরুদ্ধে জজ-অ্যাডভোকেট, ডঃ ডুনশ্মানের অধীনে কোর্ট মার্শাল শুরু হয়। বিচারের রায় কী হয়েছিল জানা যায় নি। খুব সম্ভব তাঁদের হত্যা করা হয়েছে। এ ছাড়া অসংখ্য ভারতীয় সৈন্যকে দেওয়া হয়েছে দীর্ঘ-মেয়াদী কারাবাস।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সুভাষচন্দ্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার বীরেন্দ্রনাথ, ভুপেন্দ্রনাথ প্রমুখ বিপ্লবীদের মতোই হয়তো ঠেকে শিখতে শুরু করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদের (শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নয়) কুটিল স্বরূপ, বিশেষ করে ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদের নৃশংস রূপ। দুর্ভাগ্যের কথা বড়ো বেশি জল গড়িয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে।

৮

দ্রষ্টব্য ॥ পৃ.৮২

SUMMARY OF WORK IN STOCKHOLM
DURING A YEAR AND A HALF

1. Regular daily propaganda by giving the Swedish Press in Stockholm and in the country Indian nationalist news.

2. Publication and distribution of our books in Swedish to about 2000 leading *Swedish personalities.*

3. Distribution of the same to Parliament members in *Norway* and *Denmark.*

4. Giving our articles to *Swiss press* and distributing our brochures to the members of the Bundesrat and peace organisations.

5. Distribution of our brochures and supplying articles to the press in *Finland.*

6. Translation and publication of our books into ***French and Russian*** and publishing some of them.

7. Sending our communiques and other articles in German to the German press.

8. Subsidising Swedish publications of value for Indian propaganda, such as *"En bok om England"*, *"Yoga"*, *"En folks sjal"*.

9. Intercourse and maintaining friendship with influential Swedes of different parties.

10. Intercourse and occasional support of useful Ukrainians, Russians, Finns, Local Germans, and Balts. Besides Egyptians and other friends.

11. Subscribing for various books and bulletins published by Swedish and Russian revolutionaries and keeping in touch with their propaganda.

12. Besides keeping relations with Dutch-Scandinavian Committee, telegrams to the Kerensky Govt., the Russian Mahomedans, the Finnish Govt., the Ukrainian Delegation to Brest-Litovsk, the British Labour Party, Northern Peace Committee and President Wilson.

13. Organising the meeting for India in connection with the Swedish 1916 Peace Committee meeting this year, in which the Entente-friendly Ellen Key and others plead for Indian freedom.

14. Books ordered for library from England and India, most of which are received.

15. Subscription for English, Indian, Scandinavian and other periodicals as well as cuttings on India from all these countries and from Switzerland.

16. Besides attacks and counter-attacks in the Swedish press about activity and relations to the various parties and Government, introducing several articles into the Swedish magazines and newspapers, and reviews of our publications in the Swedish press.

17. Lectures to workers and in schools in the country on India, through a Swedish woman teacher. From this month, she will use slides.

18. Telegram to the International Socialist Bureau is ready to be sent, placing India's case for their remembrance.

The manuscripts ready are :—

1.	India as central factor in Asia	Russian
2.	India as central factor in Asia	German
3.	India as central factor in Asia	French
4.	Terrens (?) Empire in Asia (copy)	English
5.	The case for India by Besant	Swedish
6.	American opinions on India and a few minor ones.	Russian

The translations made and already published are

1.	Political situation in India by Lajpat Rai	Swedish
2.	American opinions	French
3.	American opinions	Swedish
4.	Roger Casement and India	Swedish
5.	India and World Peace and Circular	Swedish
6.	India and World Peace and Circular	French
7.	India and World Peace and Circular	German
8.	English Socialists on India	Swedish
9.	English Socialists on India	Russian

10. International Socialists on India Swedish
11. International Socialists on India Russian
12. How England conquered India (from En Bok om England)

৯

দ্রষ্টব্য ॥ পৃ. ১০২

মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' গ্রন্থে ঐ পনেরো জন মুজাহিদ ছাত্রের মধ্যে খুশি মুহম্মদ, আবদুল হামীদ, জাফর হাস্‌মান, আল্লাহ্ নওয়াজ, আবদুল বারী, মুহম্মদ আবদুল্লাহ্, আবদুর রহমান, আবদুর রশীদ, রহমত আলি ও কোহাটের আবদুল মজীদ— এই ১০ জনের নাম দিয়েছেন এবং লিখেছেন : "...বাকী পাঁচজন ছাত্রের নাম আমি জানতে পারি নি" (পৃ. ১৮৯)। জেমস ক্যাম্বেল কার্ ১৯১৭ সালে প্রকাশিত তাঁর *Political Trouble in India : 1907-1917* গ্রন্থের ৩০৮-০৯ পৃষ্ঠায় মোট ১৪ জনের নাম দিয়েছেন আর লিখেছেন যে বাকী জন আফগানিস্তানেই মারা গিয়েছিলেন। এই দুই তালিকার সাতটি নাম এক। একজনের নাম মুজফ্ফর সাহেব লিখেছেন 'মুহম্মদ আবদুল্লাহ্' আর কার্ সাহেব লিখেছেন 'শেখ আবদুল্লাহ'। মুজফ্ফর সাহেবের তালিকার 'আবদুর রহমান' কার্ সাহেবের তালিকায় অনুপস্থিত। আবার আবদুল মজীদের সম্পর্কে কার্ বলেছেন যে ঐ মজীদ নাকি ফকির শাহ্, পীর বক্স ও আবদুল লতিফের সঙ্গে ঐ পনেরো জন ছাত্রের পরে আফগানিস্তানে গিয়েছিলেন। কার্ নতুন নামের মধ্যে উল্লেখ করেছেন আবদুল মালিক, মুহম্মদ হাস্‌সান-খাঁ, সুজাউল্লাহ্, আবদুল কাদির, মুহম্মদ হাস্‌সান ও ফিদা হুসেনের নাম।

১০

দ্রষ্টব্য ॥ পৃ. ১৬২

সোভিয়েত শক্তি প্রতিষ্ঠার আদি পর্বে যে-সব ভারতীয় সোভিয়েত দেশে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আরো কয়েকজনের কথা পরে জেনেছি। তাঁদের খবরগুলি এই রকম :

নিঃস্ব, প্রায় নিরক্ষর ও অনাথ— লুধিয়ানার তেজা সিং আরো তিনজন ঐ রকমেরই সঙ্গী নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন ভাগ্য ফেরানোর আশায়। সাংহাই পেঁছে অনেক কষ্টে তাঁরা সেখানে কাজ জোগাড় করেন জাহাজের মাল খালাসের। হঠাৎ একদিন এক অতিকায় রুশ সাহেব সেখানে তেজা সিংকে দেখে ঠিক করলেন একে নিতে হবে তাঁর সার্কাসের হাতীর মাহুত হিসেবে। ঐ সার্কাসের খেলোয়াড় হয়েই তেজা সিং অতঃপর গেলেন ভ্লাডিভোস্টক ও পূর্ব সাইবেরিয়ার শহরগুলিতে। কিন্তু মালিক হঠাৎ মারা যাওয়ায় ফের তাঁকে কাজ খুঁজতে বেরোতে হল— এবার কয়লাখনি, রেল ও বন্দরের হাড়ভাঙা কুলির কাজ।

এমনি ভাবে চলছিল বছরের পর বছর : এমন সময়ে এল নভেম্বর-বিপ্লব। ঐ ভারত-সন্তান আর দ্বিধা না করে যোগ দিলেন সাইবেরিয়ার এক বিপ্লবী ফৌজে। তারপর এক যুদ্ধে আহত হয়ে গেলেন হাসপাতালে। রুশ-বিপ্লবীরা সেখানে প্রাণপাত শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তুললেন সুদূর ভারতবর্ষ থেকে আগত তাঁদের কমরেডকে। তাঁরাই তাঁকে পরামর্শ দিলেন মস্কো যেতে আর তার আগে চিঠি লিখতে সোভিয়েত রাষ্ট্রপতি কালিনিনকে।

তেজা সিং রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে বললেন, পড়তে চাই। ব্যবস্থা হল। শেষ পর্যন্ত মস্কোর মেডিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট থেকে পাস করে ডাক্তার হলেন তেজা সিং। এখন তিনি উত্তর উজবেকিস্তানের কারাকাল্পক স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রের রাজধানী, নুকুস শহরের বাসিন্দা। বয়স প্রায় ৮০। জীবনের ৩৭ বছর তাঁর কেটেছে সেখানকার মানুষের সেবায়। তাঁরা তাই আদর করে তাঁর নতুন নামকরণ করেছেন 'ফিয়োডর সেমিওনোভিচ। তাঁর স্ত্রী, অল্‌গা-ও জীবিত। বড়ো ছেলে গত যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন নাৎসী অভিযান

রুশতে। আর দুই ছেলে ও এক মেয়ে সন্তানসন্ততি নিয়ে তাঁদের সংগেই থাকে।

খবরটি পাঠিয়েছেন সাপ্তাহিক *New Age* পত্রিকার মস্কো সংবাদদাতা—মাসুদ আলি খাঁ আর প্রকাশিত হয়েছে ঐ পত্রিকার ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সংখ্যায়।

একেবারে ভিন্ন ধরনের অতীত জীবন অন্ধ্রের কোলাচালা সীতারামাইয়া ও পাঞ্জাবের প্রেম সিং গিল-এর। সীতারামাইয়ার কথা আগেই লেখা হয়েছে। পেট্রো-রসায়নের ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের জন্য তিনি সোভিয়েত দেশে আজ বিশেষ সমাদৃত। তিনি ও প্রেম সিং গিল ও-দেশে পেঁছোনোর আগেই কিন্তু তাঁদের উচ্চ শিক্ষাপর্ব শেষ করে বিজ্ঞানী হয়েছিলেন। প্রেম সিং গিলের ইতিহাস এই রকম: ১৯০০ সালের জানুয়ারি মাসে পাঞ্জাবের এক কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম। ১৪ বছর বয়সে তিনি বাড়ি ছেড়ে লাহোরে চলে আসেন এবং সেখানে ১৯১৬ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করেন। তারপর হংকং-এ গিয়ে তিনি প্রায় বছর খানেক কাজ করেন এক পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের দোভাষী হিসেবে। ১৯২০ সালে তিনি মার্কিন দেশে যান এবং সেখান থেকে রাসায়নিক ইঞ্জিনীয়রিং-এ ডক্টরেট করেন ১৯২৩ সালে। ওয়াশিংটনে স্নাতকোত্তর পাঠগ্রহণের সময়ে তিনি যে রাজনৈতিক কাজকর্মে জড়িত হয়ে পড়েন, তারই সূত্রে তিনি শেষ পর্যন্ত পেঁছন সোভিয়েত দেশে। তার আগে তিনি ছিলেন 'গদর' দলের সদস্য।

১৯২৬ সালে 'কমিণ্টার্নে'র আহ্বানে তিনি সোভিয়েত ভূমিতে পেঁছন। সেখানে প্রথম ছ'বছর কাজ করেন মস্কোর এক রাসায়নিক কারখানায়। তারপর তিনি যোগ দেন স্তালিনগ্রাডের রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানে। ইতিমধ্যে ১৯৩১ সালে তিনি সদস্য পদ পেয়েছিলেন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি'র। ১৯৩৫ সালে তিনি আবার মস্কোয় ফিরে আসেন জৈব-রসায়ন সংস্থার প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞান-কর্মী হিসাবে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি একাধিকবার প্রতিনিধিত্বও করেন সোভিয়েত দেশের। দুঃখের বিষয় ১৯৩৬ সালে তাঁর ক্ষয়রোগে মৃত্যু হয় মাত্র ৩৬ বছর বয়সে। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়, হবীব ওয়াফা ও দাউদ আলি দত্ত। তাঁর স্ত্রী এখনো জীবিত। তিনি মস্কোয় থাকেন।

কোলাচালা সীতারামাইয়ার মতোই (তাঁর রুশ নাম কনস্ট্যান্টিন সেগে'ইয়েভিচ—গ্রন্থকার) প্রেম সিং গিলেরও রুশ নামকরণ হয়েছিল—মিহাইল ইভানোভিচ গ্রোমভ।

গোড়ার যুগে ভারতবর্ষ থেকে যাঁরা সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় পেঁৗছেছিলেন তাঁদের মধ্যে সোয়াহি-র নিসার মুহম্মদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি উর্দু ফরাসী ও পশ্‌তু খুব ভালো জানতেন এবং মধ্য এশিয়ার এ দেশগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। ফলে তাজিখ্‌স্তান প্রজাতন্ত্র গঠিত হওয়ার পর তিনি তার প্রতিনিধি নিযুক্ত হন তাসখন্দে ও পরে সমরখন্দে। শেষ পর্যন্ত তিনি তাজিখ্‌স্তানের শিক্ষামন্ত্রী হন এবং ঐ পদে কয়েক বছর কাজ করেন বিশেষ যোগ্যতার সংগে। তারপর তিনি মস্কো গিয়ে সেখানকার প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন স্নাতকোত্তর ছাত্র হিসেবে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সেখানেও এত জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন যে অনতিবিলম্বে তিনি সদস্য নির্বাচিত হন মস্কো পার্টির এক আঞ্চলিক শাখার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে নিসার মুহম্মদ আরো অনেকের মতো গ্রেপ্তার হন নিরাপত্তার অজুহাতে। জেলেই তাঁর মৃত্যু। তখনো তাঁর গবেষণা-নিবন্ধের কাজ সম্পূর্ণ হয় নি।

সোয়াহির নবাবের ছেলে, নিসার রাজা-ও পড়াশুনো করেছিলেন তাসখন্দে। তিনি শেষ পর্যন্ত স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান ঐ দেশের। তবে কিছুদিন পরে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ও মারা যান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবার আগেই।

লাহোর থেকে যে ১৫ জন বিপ্লবী ছাত্র ('মুজাহিদ'—গ্রন্থকার) ১৯১৫ সালে আফগানিস্তানে পালিয়ে যান তাঁদের মধ্যে ছিলেন লাহোর মেডিকেল কলেজের ছাত্র, আবদুল হামীদ। সংগীরা তাঁকে তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য শ্রদ্ধাভরে ডাকতেন 'মাস্টার আবদুল হামীদ' নামে। তিনি সোভিয়েত সীমান্তবাহিনীর সংগে বহুদিন কাটান পামীরে। আমাদের কাছে ভারততাত্ত্বিক হিসেবে পরিচিত, অধ্যাপক ডিয়াকভ ঐ-সময়ে ছিলেন পামীরের স্বাস্থ্য বিভাগসংশ্লিষ্ট পিপ্‌ল্‌স কমিশার। তাঁর এখনো মনে পড়ে সীমান্তবাহিনী তখন 'মাস্টার আবদুল হামীদে'র কাছ থেকে কি রকম সাহায্য পেত নানাভাবে।

আর-একজন ছিলেন মহম্মদ আলি (ইনি খুশি মুহম্মদ ন'ন —গ্রন্থকার) : মধ্য এশিয়া থেকে মস্কো গিয়েছিলেন দোভাষী হিসেবে। তিনি পাঞ্জাবী ভাষা খুব ভালো জানতেন কিন্তু পরিচিত ছিলেন না গুরুমুখী লিপির সংগে ; পাঞ্জাবী ভাষায় লেনিনের রচনা তর্জমা করতেন এইভাবে— তিনি মুখে মুখে বলে যেতেন আর রতন সিং গুরমুখীতে তা লিখে নিতেন। তিনি আবার রুশ জানতেন না কিন্তু গুরমুখী লিপি জানতেন বেশ ভালোই।

অধ্যাপক ডিয়াকভের সংগে পামীরে নিজামুদ্দীন ও গুলাব সিং নামে একজন ডোগরা সুবেদারের দেখা হয়। গুলাব সিং বিয়ে করে পামীরেই থেকে যান। নিজামুদ্দীন ছিলেন নিরক্ষর কিন্তু পরে তাসখন্দে থাকতে লেখাপড়া শেখেন এবং একটি চায়ের দোকান খোলেন বুখারায়। পরে তিনি কাজ করতে যান তাজিখস্তানে। তাঁরও শেষ দশা হয় নিসার মুহম্মদের মতোই।

আর-একজন পরিচিত ছিলেন 'আমীন' নামে। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধানে একদা তিনি আফগানিস্তান হয়ে পেঁীছেছিলেন সোভিয়েত দেশে। পরে তিনি সম্ভবত সোভিয়েত নিরাপত্তা বিভাগের সংগে যুক্ত হন এবং সেই কাজেই ঘোরেন ইয়োরোপের নানা দেশে। স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়ে তিনি ফিরে যান সোভিয়েতে। তারপর সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ। সম্ভবত তিনিও শিকার বনেছিলেন বেরিয়ার অনাচারের।

মস্কোয় সীতারামাইয়া ও সর্দারা সিং চীমা দুজনেই আমায় একজন বিশিষ্ট ভারতীয় বিপ্লবীর কথা জানান যাঁর ও-দেশে পরিচয় ছিল 'আচ্‌কভ' ছদ্মনামে। সীতারামাইয়ার সংগে তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল কিন্তু মন্ত্রগুপ্তির রেওয়াজ অনুসারে তিনি কখনো জানতে চান নি 'আচ্‌কভে'র আসল নাম। আমায় শুধু বলেছিলেন যে 'আচ্‌কভ' 'কমিন্টানে'র গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতেন ও খুব সম্ভবত ছিলেন চট্টগ্রামের লোক। এখন খবর পাওয়া যাচ্ছে যে তাঁর নাম ছিল নিসার। তিনি পূর্ববংগের— খুব সম্ভব চট্টগ্রামের লোক। তিনি এ-দেশ থেকে সোভিয়েত দেশে যান ১৯২৫ সাল নাগাদ। তিনি রুশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন এবং যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা পর্বে যুক্ত ছিলেন সংশ্লিষ্ট প্রচারকার্যের সংগে। একেবারে গোড়ার দিকে তিনি কাজ করতেন এক পেন্সিল কারখানায়। কিন্তু মস্কোর প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে

বেরোবার পর তাঁর দ্রুত পদোন্নতি ঘটে (সর্দারা সিং অবশ্য আমাকে জানিয়েছিলেন যে 'আচকভ' মস্কোর প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, পাঠগ্রহণ করেছিলেন Scientific Research Institute on National and Colonial Question' নামক প্রতিষ্ঠানে —গ্রন্থকার)। তিনি যুক্ত হন 'কমিণ্টার্নে'র জাতীয় ও ঔপনিবেশিক সমস্যা-বিষয়ক গবেষণা বিভাগের সঙ্গে। শোনা যায় ত্রিশের যুগে তিনি একবার গোপনে ভারতবর্ষে এসে নাকি দেখা করেছিলেন জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে। ১৯৩৭ সালে তাঁর মৃত্যুও সম্ভবত 'আমীন' বা অন্যান্যদের মতো একইভাবে।

পাঞ্জাবের শিয়ালকোট থেকে এসেছিলেন গুরুবক্স সিং। 'বিশের যুগে তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বেরুটে এসে মোটর চালকের কাজ শুরু করেন। তারপর কিছুদিন কাজ করেন তেহেরানের সুপরিচিত Anglo-Persion Oil Company-তে। তবে ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়ার জন্য সেখান থেকে তাঁর চাকরি যায় ও জেল হয়। জেল পালিয়ে ১৯৩১ সালে তিনি পেঁছন সোভিয়েত দেশে। তখন তাঁর বয়স ৩০ বছর। সোভিয়েত বাণিজ্য বিভাগের অধীনে মোটর চালকের কাজ করতে করতে তিনি পড়াশুনা চালাতে থাকেন মস্কোর প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে পাস করে তিনি শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন নরিমানভ প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানে। সেখানে তাঁর সহকর্মী ছিলেন হবীব ওয়াফা ও দাউদ আলি দত্ত। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৪৩ সালে।

গুলাম আম্বিয়া খান লুহানী যে বীরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, খানখোজে প্রমুখ 'বার্লিন কমিটি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিপ্লবীদের সঙ্গে ১৯২১ সালে মস্কো পেঁছেছিলেন তা আমরা আগেই দেখেছি। জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নে তিনি ছিলেন কমিণ্টার্নের অন্যতম পরামর্শদাতা। *Inprecor* পত্রিকায় তাঁর একাধিক রচনাও প্রকাশিত হয় এবং ১৯২৮ সালে 'কমিণ্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম প্রতিনিধি। পরে মস্কোর State Literary Publishing House -কর্তৃক প্রকাশিত ইংরেজী পত্রিকার তিনি সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি সদস্য ছিলেন সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির আবার ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি'রও।

সোভিয়েত ভারততাত্ত্বিকদের মতে লুহানী ভারতীয় ও ঔপনিবেশিক

সমস্যা-সংশ্লিষ্ট গবেষণায় নিযুক্ত ছাত্রদের পরিচালনা করতেন। নেহরু পিতা-পুত্র ১৯২৭ সালে যখন সোভিয়েত দেশে যান তখন লুহানী তাঁদের দোভাষীর কাজ করেন। মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে গোড়ায় তাঁর বিরোধ ছিল। তারপর তিনি তিনি খুবই ঘনিষ্ঠ হন মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে, এমন-কি, শেষোক্তের নামের সঙ্গে জড়িত Decolonisation তত্ত্বেরও নাকি তিনি এক দলিল খাড়া করেছিলেন। 'কমিণ্টার্নে'র ষষ্ঠ কংগ্রেসে কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে রায়ের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ঘোষণা করেন।

লুহানীর মৃত্যুর খবর ঠিক জানা যায় নি। তবে তিরিশের কোঠার শেষ দিকে তিনি একবার গ্রেপ্তার হন। অসম্ভব নয়, যে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল জেল-খানায়।

উপরের অধিকাংশ খবর আমি পেয়েছি *Link* পত্রিকার মস্কো সংবাদদাতা, পি, উন্নিকৃষ্ণণের দুটি লেখা থেকে (*Link*, ১৯৬৪ সালের ২৩ অগাস্ট ও ২৭ সেপ্টেম্বর সংখ্যা)।

১৯২১ সালে লুহানীর সঙ্গে বার্লিন-কমিটির যে-সব সদস্য সোভিয়েত দেশে পেঁছিন তাঁদের মধ্যে একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের নাম। তাঁর সম্পর্কে যে-খবর জোগাড় করতে পেরেছি তা এই রকম :

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের নাম প্রথম পেয়েছিলাম ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 'বার্লিন কমিটি'-র নির্দেশে ভারতীয় তরুণ বিপ্লবীরা যে অসমসাহসিক কাজ করেছিলেন তার বিবরণ প্রসঙ্গে ডাঃ দত্ত সেখানে লেখেন (পৃ. ১৭) : "...কমিটি যে স্থানে যাইতে বলিয়াছে, নিঃশঙ্ক হৃদয়ে যুবকের দল তথায় গমন করিয়াছে। আর মৃত্যুর ভয় ? সত্যই 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন' তাঁহাদের ছিল! সুয়েজ খাল রাত্রে সন্তরণ করিয়া মিশরে ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত করিতে হইবে, তৎক্ষণাৎ এক বাঙালী ও এক মাদ্রাজি দুই তরুণ যুবক জলে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হইল। মেদিনায় হাজীদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করিতে হইবে, তৎক্ষণাৎ এক হিন্দু বাঙালী তরুণ যুবক যাইতে প্রস্তুত হইল।"

সেদিনকার সেই বাঙালী তরুণই আজ ৮৪ বছরের প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীবীরেন্দ্র-

নাথ দাশগুপ্ত। খোঁজখবর নিয়ে কলকাতার তাঁর সাউথ এণ্ড পার্কের বাড়িতে বেশ কয়েক বার দেখা করলাম তাঁর সংগে। দেখলাম ৮৪ বছর বয়সেও তাঁর দেহমন যথেষ্ট সতেজ যদিও পুরানো দিনের অনেক কথা স্বভাবতই আজ আর তাঁর মনে পড়ে না সহজে। আমার নানা প্রশ্নের জবাবে তাঁর কাছ থেকে যা জানতে পারলাম তা এই রকম :

বীরেন্দ্রনাথের পৈতৃক বাড়ি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার বিদগ্রামে। পিতা, ঈশানচন্দ্র ওকালতি করতেন জলপাইগুড়ি শহরে এবং বাড়িও করেন সেখানেই। ঐ জলপাইগুড়িতে ১৮৮৮ সালের ১২ মে (জন্মক্ষণ মধ্যরাত্রের পরে ব'লে ইংরেজী হিসেবে ১৩ মে) জন্ম হয় বীরেন্দ্রনাথের। তাঁর শৈশব ও বাল্যকাল কাটে সেখানেই।

১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময় জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের ছাত্র বীরেন্দ্রনাথ সোৎসাহে সেই আন্দোলনে যোগ দেন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। বিলিতি কাপড় পোড়ানোর জন্য একটি ছাত্রকে স্কুলের হেড মাস্টার বেত্রদণ্ড দেন। তারই প্রতিবাদে বীরেন্দ্রনাথ ঐ স্কুল ছেড়ে ১৯০৬ সালে কলকাতায় আসেন এবং ঐ বছরেই যোগ দেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরিচালনাধীন শিক্ষালয়ে। সেখানে তিনি অরবিন্দ ঘোষ ছাড়া আর যাঁদের শিক্ষক হিসেবে পান তাঁদের মধ্যে ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও বিনয়কুমার সরকারের মতো মনস্বী ব্যক্তি। এর মধ্যে পরবর্তী কালে অধ্যাপক সরকারই ছিলেন তাঁর **Friend, philosopher and guide**।

'আপনি প্রথম কবে ও কিভাবে বিপ্লবী আন্দোলনের সংস্পর্শে আসেন ও বিপ্লবী দলে যোগ দেন'—আমার এই প্রশ্নের উত্তরে বীরেন্দ্রনাথ বলেন : 'আমার ঠিক মনে পড়ছে না, তবে ১৯০৮ সালের আগেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের যোগাযোগে আমি গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলাম।'

১৯১১ সালে বীরেন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সহায়তায় ও আর্থিক আনুকূল্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে। প্রথমে উইন্‌কন্‌সিন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর পড়ার পর যোগ দেন ইণ্ডিয়ানা রাজ্যের পার্ডু বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকেই তিনি ১৯১৪ সালে লাভ করেন ইলেকট্রিক এঞ্জিনীয়ারিং-এর বি. এসসি. ডিগ্রি। ইতিমধ্যে ইয়োরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

বেধে যাওয়ার পর সদ্য-প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিপ্লবীদের 'বার্লিন কমিটি'র পক্ষ থেকে জার্মান সাহায্যের খবর নিয়ে 'গদর' দলের সংগে যোগাযোগ করতে আমেরিকায় আসেন অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের ছোটো ভাই, ধীরেন্দ্রনাথ সরকার ও মারাঠে নামে আর-একজন বিপ্লবী। ধীরেনবাবু ছিলেন বীরেন্দ্রনাথের সহপাঠী। তাঁর সাহায্যে বীরেন্দ্রনাথ অনতিবিলম্বে আমেরিকাস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূত দপ্তরের সংগে যোগাযোগ করেন এবং মির্জা আলি হায়দার নামে এক ইরানী তরুণের পাসপোর্ট নিয়ে রটারডেম হয়ে বার্লিনে পেঁছিন ১৯১৪ সালের শেষে। জার্মানিতে কিছুদিন সামরিক ট্রেনিং লাভের পর তিনি কন্‌স্ট্যান্‌-টিনোপ্‌লে যান মৌলানা বরকতুল্লাহ্‌-র সেক্রেটারি হিসেবে। (১৯১৬ সালে কন্‌স্ট্যান্‌টিনোপ্‌লে মির্জা আলি হায়দার-বেশে তোলা বীরেন্দ্রনাথের যে ছবিটি আমি তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি সেটি এই বইয়ে ছাপা হল।)

বরকতুল্লাহ্‌র সংগে বীরেন্দ্রনাথ পরে এলেপ্পো ও জেরুজালেম যান এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াই চালান সিনাই মরুভূমি ও সুয়েজ খাল (আন্তারা) অঞ্চলে। তিনি তুর্কি সৈন্যবাহিনীর 'মেজর' পদ পান এবং জামাল পাশার পঞ্চম সেনাবাহিনীভুক্ত হয়ে আহত হন সুয়েজ খাল রক্ষার লড়াইয়ে। দিনের পর দিন জল না খেয়ে, মরুভূমির মধ্যে শুধু খেজুর ও শুকনো রুটি খেয়ে কোনোমতে লড়াই চালাতে চালাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যখন অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে সুইজার-ল্যাণ্ডে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন তখন তাঁর পাকস্থলী থেকে ক্রমাগত বার করা হতে থাকে মরুভূমির বালি।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের সেই অসম-সাহসিক সংগ্রাম প্রসংগে বীরেন্দ্রনাথ প্রথমেই নাম করেন মৌলানা বরকতুল্লাহ্‌-র যদিও অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মহেন্দ্রপ্রতাপের সংগী হিসাবে পাড়ি দেন কাবুলের পথে। বীরেন্দ্রনাথের মতে বরকতুল্লাহ্‌ সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবী। প্যালেস্টাইনে তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন মহীশূরের প্রতিবাদী আচার্য, মজঃফরপুরের আবদুল ওয়াহেদ, লখনউ-এর জনৈক ভার্মা ও ডাঃ অনসুরের নাম। তিনি নিজে এক সময়ে Administrative Officer হিসাবে তত্ত্বাবধান করতেন বিপ্লবী কর্ম-কেন্দ্রের ও হিসেব রাখতেন সংশ্লিষ্ট তহবিলের।

ডা: ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন যে ১৯২০ সালের গোড়ার দিকে মানবেন্দ্র-নাথ রায় একদিন সান্ধ্যভোজনের পর লেখককে (অর্থাৎ ভূপেন্দ্রনাথকে —গ্রন্থকার) তাঁহার কাছে আসিতে বলেন। তথায় যাইলে তিনি তাঁহার রচিত একটি বিজ্ঞপ্তি (**manifesto**) লেখককে পড়িয়া শুনান। ইহাতে তাঁহার নাম ব্যতীত আলি হায়দারের নাম স্বাক্ষরিত দৃষ্ট হইল। তিনি এই বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করিয়া মস্কোয় যাইতে চান" ('অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', পৃ. ২৫২)। তিনিই কি সেই আলি হায়দার? সেই বিজ্ঞপ্তিতে কী ছিল?— আমার এই দুই প্রশ্নের উত্তরে বীরেন্দ্রনাথ জানান* যে তিনিই সেই আলি হায়দার, তবে এতদিন পরে সে manifesto-তে কী ছিল তাঁর মনে নেই। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রথমবার সোভিয়েত দেশে যাবার প্রাক্কালে মানবেন্দ্র-নাথ যে manifesto-টি প্রকাশ করেন তাতে তাঁর নাম ছাড়া ছিল অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় ও শান্তিদেবীর (মানবেন্দ্রনাথের প্রথমা স্ত্রী, এভেলিন ট্রেন্ট্-এর ছদ্মনাম) নাম। এটি কি তবে অন্য আর একটি manifesto?

যাই হোক, মির্জা আলি হায়দার স্বাক্ষরিত বেশ কিছু চিঠি ও রিপোর্ট রয়েছে ভারতবর্ষের জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত German Foreign Ministry Archives-এর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার ভারত-জার্মান ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপ-সংক্রান্ত ৪ রিল মাইক্রোফিল্মে। যেমন সুইজারল্যাণ্ড থেকে লেখা এই ছোট্ট চিঠিটি:

8 Dec. 1917

I have received with thanks the leaflets both in German and French. It seems some one has opened them on the way though they were very nicely packed, as I received them half open. It was the same with other packets which I received recently by post. *Please do not send any more packets for the present,* until Mr. Schemmel comes, when I will again be in a position to receive them this way. In my last letter I have sent the addressess to whom I am sending our brochures —all of them which I have received recently, will be sent out within the next few days. I do not know what I shall do with

the English Document (Persia) and Graf Reventlow's book ; shall I distribute them to different libraries ?

—Mirza Ali Haider

৫৫ বছর আগে তাঁরই লেখা এ চিঠিটি যখন বীরেন্দ্রনাথকে দেখাই তখন গোড়ায় তিনি এটা চিনতেই পারেন নি— তারপর চিঠিতে উল্লিখিত নাম ও প্রসংগ থেকে তাঁর ব্যাপারটা মনে পড়ে আবছায়াভাবে।

ভূপেন্দ্রনাথ 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাসে' (পৃ. ২৫৬) লিখেছেন : "...রাশিয়ার এই নব বিপ্লব বামপন্থী ভারতীয় বৈপ্লবিকদের চিত্তও আলোড়িত করিয়াছিল। যাঁহারা মস্কোমুখী হইয়াছিলেন তাঁহারা ১৯২০ খৃষ্টাব্দে স্টকহলমে একটি কনফারেন্স আহূত করিয়া নিজেদের কর্মপন্থা স্থির করেন। তথায় লেখক এবং ইরান হইতে আগত পাণ্ডুরংগ খানখোজে, বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং ডেনমার্কে অবস্থিত ভারতীয় ছাত্র, বিশ্বামিত্র একত্রিত হন। পরামর্শ করিয়া এই স্থির হইল যে, যাঁহারা জাতীয়তাবাদী থাকিবেন তাঁহারা একটি সংস্থা স্থাপন করিয়া কার্য করুন, যাঁহারা বামপন্থীয় অর্থাৎ কমিউনিস্ট মতাবলম্বী হইবেন তাঁহারা অন্য আর একটি সংস্থা স্থাপন করিয়া কার্য করুন ; কিন্তু সর্বদলই ভারতের স্বাধীনতার জন্যই কার্য করিবেন।" ভূপেন্দ্রনাথের এই কথাটি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য কী, আমার এই প্রশ্নের জবাবে বীরেন্দ্রনাথ বলেন : ঠিক হুবহু এ ধরনের সিদ্ধান্ত না হলেও এ-ভাবে একটা আলোচনা হয়েছিল।

বীরেন্দ্রনাথ জানান যে ১৯২৯ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁরা মস্কো যান, তবে সঠিক তারিখ তাঁর মনে নেই। তাঁর সেই মস্কোযাত্রার সংগীদের মধ্যে তিনি নাম করেন ভূপেন্দ্রনাথ, মনসুর, খানখোজে ও বরকতুল্লাহ্-র। সেখানে সোভিয়েত সরকার ও বলশেভিক পার্টির নেতৃস্থানীয় অনেকের সংগে তাঁদের আলাপ হয়। তার মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, চিচেরিন ও শিক্ষা-মন্ত্রী, লুনাচারস্কির কথা তাঁর বিশেষভাবেই মনে আছে। বৈষয়িক দিক থেকে সোভিয়েত দেশের তখন বড়োই দুরবস্থা, রাজনৈতিক দিক থেকেও সোভিয়েত শক্তি তখনো সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে ওঠে নি। ঐ সময়ে তাঁরা তিন-চার মাস ছিলেন সে-দেশে। বীরেন্দ্রনাথ তখন রুশ ভাষা ও সোভিয়েত দেশের ইতিহাস আয়ত্ত করার চেষ্টাও করেছিলেন কিছুটা। মানবেন্দ্রনাথের তখন বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল বলশেভিক পার্টি মহলে। বীরেন্দ্রনাথেরা কিন্তু তাঁর সংগে তেমন

মিশতেন না কারণ মানবেন্দ্রনাথের স্ত্রী, এভেলিনকে তাঁরা ঠিক বিশ্বাস করতে পারতেন না।

বীরেন্দ্রনাথ বলেন যে ঐ দুরবস্থার মধ্যেও সোভিয়েত নেতাদের সহৃদয় ব্যবহার তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের ধারণা হয় যে কমিউনিজমের মতবাদ গ্রহণ না করলে ও সোভিয়েত নির্দেশ না মানলে তাঁরা কোনো সাহায্য পাবেন না সোভিয়েতের। এটা তাঁদের আশাভংগের কারণ হয় এবং একে একে তাঁরা অনেকেই তাই চলে আসেন সোভিয়েত দেশ থেকে।

মনে পড়ে গেল গত বছর আর-এক প্রবীণ বাঙালী বিপ্লবী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের (তিনিও ৮০-পেরিয়েছেন কিছুদিন আগে) সংগে আলাপের সময়ে তিনি বলেছিলেন, মানবেন্দ্রনাথ নাকি তাঁদের জানিয়েছিলেন যে সোভিয়েত সাহায্য পাওয়া যেতে পারে যদি তাঁরা সোভিয়েত পক্ষের কর্তৃত্ব মেনে নেন আর তাঁরা তাই রাজী হন নি সে-প্রস্তাবে। আমি যখন এ-প্রসংগে লেনিন ও মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভংগীর পার্থক্যের কথা বলি তখন মনে হয় এ কথা তিনি প্রথম শুনলেন। বললেন, অমনটা হলে তো বদলে যেতে পারত এদেশের রাজনীতির চেহারা।

ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "ইতিমধ্যে যাঁহারা মস্কোতে নিজেদের কমিউনিস্ট মতাবলম্বী বলিয়াছিলেন, তাঁহারা একত্রিত হইয়া একটি কমিউনিস্ট পার্টি স্থাপন করেন। ইহার সভ্য হইয়াছিলেন লেখক (অর্থাৎ ভূপেন্দ্রনাথ —গ্রন্থকার), শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, আবদুল ওয়াহেদ, সুরেন্দ্রনাথ কর এবং ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ" ('অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস', পৃ. ৩০২)। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য কী জানতে চাইলে বীরেন্দ্রনাথ বলেন, তিনি কোনো কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন নি— যাঁদের নাম ওখানে উল্লিখিত হয়েছে তাঁরাও অনেকে দেন নি।

ঐ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কথাটার সমর্থন এখনো পর্যন্ত পাই নি অন্য কোনো সূত্রেও।

তাঁর বিপ্লবী তৎপরতা-সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রগুলি কোথায়। সেগুলি উদ্ধারের কি কোনো ব্যবস্থা হয়েছে?— এ প্রশ্নের জবাবে বীরেন্দ্রনাথ বলেন যে তাঁর কাছে কোনো কাগজপত্রই নেই। তবে কিছু তথ্যসংবলিত micro-film আমাদের জাতীয় মহাফেজখানায় আনা হয়েছে বলে তিনি শুনেছেন। এ'ও শুনেছেন

যে সে সময়কার অনেক কাগজপত্র নাকি সংরক্ষিত আছে বৃটিশ মিউজিয়ামে (না, ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরিতে ?)। এ ছাড়া সুইজারল্যাণ্ডে প্রায় ৭ বছর কাটানোর সময়ে তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বেশ-কিছু প্রবন্ধ লেখেন বিখ্যাত *Nue Zuricher Zeitung* পত্রিকায়।

১৯২৪ সালে দেশে ফেরার পর বীরেন্দ্রনাথ আর প্রত্যক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন নি, তবে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করেছেন যথাসাধ্য। আর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ইন্দো-সুইস ট্রেডিং কোম্পানি প্রভৃতি একাধিক প্রতিষ্ঠান গড়েছেন আর জড়িত থেকেছেন নানা গঠনমূলক প্রচেষ্টার সঙ্গে।

'বার্লিন কমিটি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর-এক বিপ্লবী দাউদ আলি দত্ত সম্পর্কেও কয়েকটি কথা এখানে বলা যেতে পারে। তাঁর আসল নাম প্রমথনাথ দত্ত।

গত শতকের নবম দশকের শেষ দিকে সুকিয়া স্ট্রীটের দত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। খুবই অল্প বয়সে তিনি কলিকাতা অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দ্বারা ভারতবর্ষে বৃটিশ রাজত্ব উচ্ছেদের জন্য অস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালে আমেরিকা পাড়ি দেন। সেখানে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো সামরিক ট্রেনিং স্কুলে যোগ দিতে না পেরে তিনি ১৯০৯ সালে আমেরিকা ছেড়ে ফ্রান্সে যান। সেখানে মাদাম কামা প্রভৃতি বিপ্লবীদের সাহায্যে অনতিবিলম্বে পাঁচ বছরের মেয়াদে যোগ দেন সুপরিচিত Foreign Legion-এ। তিনি ঐ বাহিনীর সৈনিক হিসাবেই ফরাসী ইকোয়েটোরিয়াল আফ্রিকা, ইন্দোচীন প্রভৃতি তখনকার ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত দেশে ঘোরেন এবং পুরো পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ঐ বাহিনী ছেড়ে একটি বৃটিশ সাম্রাজবাদবিরোধী পত্রিকা সম্পাদনার উদ্দেশ্যে যান কনস্ট্যাণ্টিনোপলে।

ঐ কন্‌স্ট্যাণ্টিনোপলেই প্রমথনাথ পরে কাজের সুবিধার জন্য 'দাউদ আলি' ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। ঐখানে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয় আর-এক বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী— নাগপুরের পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজের। ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ বেধে যায়। তখন প্রমথনাথ ও খানখোজে আমেরিকা থেকে আগত 'গদর' বিপ্লবী এবং মধ্যপ্রাচ্যের বৃটিশ ভারতীয় বাহিনী থেকে পলাতক বা বন্দী সৈন্যদের নিয়ে এক মুক্তিবাহিনী গঠন করা মনস্থ করেন। উদ্দেশ্য ইরান ও বালুচিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারতে প্রবেশ ও ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ সাধন।

তাঁদের সে পরিকল্পনা অবশ্য সার্থক হতে পারে নি। আফগানিস্তান ও বালুচিস্তান সীমান্ত এলাকায় ভারতবর্ষে প্রবেশের পথ খুঁজতে গিয়ে প্রমথনাথ বৃটিশ শান্ত্রীর গুলিতে পায়ে আহত হন (এরই জন্য সারা জীবন তাঁকে ক্রাচ্ নিয়ে চলতে হত)। আর দুর্বল ইরান সরকার ইংরেজের চাপে বহু ভারতীয় বিপ্লবীকে সেদিন তুলে দেয় ইংরেজের হাতে। তাঁরা এবং ইংরেজ বাহিনী কর্তৃক পরাস্ত ভারতীয় বাহিনীর যে-সব বিপ্লবী ইংরেজের হাতে বন্দী হয়েছিলেন— তাঁদের প্রায় সকলকেই গুলি করে মারা হয়।

খানখোজে ও প্রমথনাথও একাধিকবার ইংরেজের হাতে ধরা পড়েন কিন্তু প্রতিবারই তাঁরা পালাতে সমর্থ হন। প্রমথনাথকে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিতে হয় উত্তর ইরানের এক পার্বত্য উপজাতির মধ্যে।

ইতিমধ্যে সমস্ত বিশ্ব-পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটে যায় রুশ-বিপ্লবের ফলে। যুদ্ধের সময়ে যে-সব দেশ থেকে নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবী 'বার্লিন কমিটি' গঠন করে জার্মানির সাহায্যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার চেষ্টা করছিলেন তাঁদের অনেকের উপরেই পড়ে ঐ মহাবিপ্লবের প্রভাব। ১৯২১ সালে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে প্রভৃতি একদল বিশিষ্ট বিপ্লবী মস্কো পৌঁছন সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য। তাঁদেরই অনুরোধে সোভিয়েত সরকার সেদিন প্রমথনাথকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেন সোভিয়েত দেশে।

সেখানে শুরু হয় তাঁর জীবনের নূতন এক অধ্যায়। দৈহিকভাবে কিছুটা পঙ্গু হওয়ার দরুন তাঁর পক্ষে আগের মতো কাজ করা আর সম্ভব ছিল না। তিনি তাই বেছে নিলেন শিক্ষকতার পথ। লেনিনের নির্দেশে তখন লেনিনগ্রাডের সুপরিচিত 'ইনস্টিটিউট ফর ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে' আয়োজন করা হচ্ছিল আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষার। সোভিয়েত দেশে প্রথম যে ভারতীয় আধুনিক ভাষাটি শেখানোর ব্যবস্থা হয় তা হল বাংলা আর তার প্রথম শিক্ষক প্রমথনাথ। তারই সঙ্গে তিনি হিন্দী ও উর্দুও পড়াতেন। ভেরা নোভিকোভা, বীকোভা, শেরেব্রিয়াকভ, দানিয়েলচুক প্রমুখ সোভিয়েতের বহু ভারতীয় ভাষাবিদেরই ঐ-সব ভাষা শিক্ষার হাতেখড়ি প্রমথনাথের কাছে। সোভিয়েত দেশে তাঁর বেশ ব্যাপক পরিচয় দাউদ আলি দত্ত নামে।

প্রমথনাথ এক রুশ মহিলাকে বিবাহ করেন। তাঁরে পুত্র, ইগর দাউদোভিচ

দত্ত একজন তরুণ পরমাণু-বিজ্ঞানী। তাঁর কাছ থেকেই আমি উপরের কিছু কিছু মালমশলা ও প্রমথনাথের দুটি ছবি পাই। ১৯৫৪ সালে প্রমথনাথের এবং কয়েক বছর পরে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয় সোভিয়েত দেশে। এখানে প্রমথনাথের যে চিঠিটি ছাপা হল তাতে তিনি 'দাউদ আলি দত্ত' নামই ব্যবহার করেছেন। ইয়াল্টা থেকে ১৯২৬ সালের ১০ অগাস্ট তারিখে লেখা ঐ চিঠিতে তিনি উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছেন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার খবরে— আবার সেইসঙ্গে 'শ্রমিক কৃষক দলে'র উদ্ভব ও তার পত্রিকা 'লাঙলে'র আত্মপ্রকাশেও তাঁর আনন্দ বেশ পরিস্ফুট ঐ চিঠিতেই। তাঁর চিঠি পেঁছিতে পেঁছিতে 'লাঙলে'র স্থান নিতে হয়েছে 'গণবাণী'কে। আর গণবাণী পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে ১৬ সেপ্টেম্বর চিঠির উত্তর দিয়েছেন জনাব মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

গণবাণী ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৭-৯-১৯২৬

রুষিয়ায় পত্র (ইংরেজি হইতে অনুবাদিত)

য়ালতা, ক্রিমিযা

সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট গণতন্ত্র সংঘ

১০ অগাস্ট ১৯২৬

'লাঙল' সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়,

কিছুকাল পূর্বে আমার এক বার্লিনের বন্ধু ১৫ এপ্রিল তারিখের একখানা 'লাঙল' আমায় পাঠিয়েছিলেন। এ কাগজে প্রকাশিত হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধসমূহ পাঠ করে আমি অতিশয় আনন্দিত হয়েছি। কিছুকাল থেকে আমার স্বাস্থ্য খারাপ যাচ্ছিল। তার জন্যে আমি ক্রিমীয় উপদ্বীপের সমুদ্রতীরস্থ স্বাস্থ্যনিবাসে এসে বাস করতে বাধ্য হয়েছি। লেনিনগ্রাডে আমার ঠিকানায় দু-খানা 'লাঙল' ইতিপূর্বে আপনারা পাঠিয়েছিলেন। যদিও সে কাগজ দুখানা আমার হাতে পেঁছায়নি, তথাপি তার জন্য আরও আগে আপনাকে ধন্যবাদ জানানো আমার উচিত ছিল এবং আমি যে পেরে উঠিনি সেজন্য আমি বাস্তবিকই বড় দুঃখিত। যখন থেকে ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটে (প্রাচ্য বিদ্যালয়ে) আমাকে পদ দেওয়া হয়েছে তখন থেকে বাঙলা ও উর্দু ভাষায় প্রকাশিত ভারতীয় সাহিত্য পাঠের আগ্রহ রুষবাসীদের মধ্যে বর্ধিত হয়েছে। কিন্তু এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে

ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক ও সংবাদপত্র এদেশে খুবই কম পাওয়া যায়। শুধু এ কারণেই,—কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে নয়, তারা যে ভারতের বর্তমান ব্যাপার সমূহ জানতে বিশেষ আগ্রহান্বিত সেইজন্য—আমার ছাত্ররা আমার বিনানুমতিতে সেই দু-খানা 'লাঙল' পড়তে নিয়ে গিয়েছিল। যাক, আমার মনে হয় লাঙল যে শ্রেণীর কাগজ, সে শ্রেণীতে ভারতবর্ষে 'লাঙল'ই সর্বপ্রথম পৃথিবীর আলো দেখতে পেয়েছে— অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে ভারতের আত্মোৎপন্ন সম্পদে বঞ্চিত সম্প্রদায়ের (proletariat) জাগরণশীল শ্রেণী-চৈতন্যের 'লাঙল'ই প্রথম মুখপত্র। এর উদ্দেশ্যসমূহের সহিত আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং ইহা সাফল্যমণ্ডিত হোক, সর্বান্তঃকরণে এই কামনা আমি করছি।

অত্যন্ত বিস্ময় ও দুঃখের সহিত আমি রুষিয়ার সংবাদপত্র সমূহে গত হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার অপ্রীতিকর ঘটনাবলীর বিবরণ এবং তার ফলে কলকাতায় যেসকল বিশ্রী কাণ্ড ঘটেছে সে সময়ের কথা পাঠ করেছি। তারপর আপনার ১৫ই এপ্রিলের 'লাঙলে' এসব কথা পড়ে আমার এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। এসব দেখেশুনে মনে হয়, আমরা ভারতবাসীরা এখনো সেই মধ্যযুগেই বাস করছি যখন ইতিহাস লিখিত হচ্ছিল ধর্মানৈক্যের জন্যে দাঙ্গা, উৎপীড়ন ও রক্তপাতের দ্বারা। এই নিয়েই বাঙালীরা দম্ভ করে বেড়ান যে বাঙলা ভারতের আর সকল প্রদেশের চেয়ে আধুনিকতাতে উন্নত! আমি তো ব্যাপারটা মোটেই ধারণাই করতে পারিনে, পৃথিবীর বুকের উপর একমাত্র হিন্দুস্থানেই কেন জনগণের দুটো সম্প্রদায় পরস্পরে এমন সর্বনেশে ঝগড়ায় মেতে থাকে। মুসলমানও সমগ্র জগতেই ছড়িয়ে পড়ে আছে, কিন্তু হিন্দুস্থানে যা ঘটেছে তার তুলনা'ত জগতের কোন দেশই দেখাতে পারবে না। আমি তুরস্ক, মিসর, টিউনিস, আলজিরিয়া, পারস্য ও অপরাপর মুসলমান দেশসমূহে দীর্ঘকাল বাস করেছি—যে সকল দেশের মুসলমান ও অমুসলমানের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগও আমি পেয়েছি, কিন্তু এমন অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটতে কখনো দেখিনি, অথচ সে সকল দেশের লোকেরাও তাদের ধর্মবিশ্বাসে খুব গোঁড়া। এখানে ককেসাস প্রদেশের ক্রিমিয়া এবং সোভিয়েট রুষিয়ার অন্যান্য কেন্দ্রসমূহে মুসলমানরা রুষিয়ার লোকসমাজের অন্যান্য সম্প্রদায় সমূহের সহিত খুব শান্তির সাথে ও বন্ধুভাবে বাস করছে। বল্গা নদীর তীরের

কালমুকেরা ও সাইবেরিয়ার মালভূমির বুরিয়াতেরা ধর্মবিশ্বাসে বৌদ্ধ হয়েও কিরগিজ ও তাতার মুসলমানগণের সহিত এক হয়ে সোভিয়েট গণতন্ত্রের উন্নতির জন্যে চেষ্টা করছে। আজকালকার দিনে জগতের যে কোন দেশে ধর্মরক্ষার ঝগড়া কচিৎ-কদাচিৎ ঘটে। ইহা অতীতের ব্যাপারে পরিণত হয়ে গেছে ; এর জন্য রক্তপাত করা অশিক্ষিত মনের ঘৃণিত অসভ্যতার কাজ।

ধর্মরক্ষার কথা ছেড়ে দিয়ে, আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ঝগড়া বিদ্যমান রয়েছে, আর সে ঝগড়া উভয়েরই পক্ষে এক। কেননা উভয়েই বিদেশী শাসন-যন্ত্রে পিষ্ট হয়ে ভুগছে। স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে আমাদের নেতৃগণ অদ্যাবধি এ দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন কোন সদ্ভাব স্থাপন করতে পারেন নি যদ্দ্বারা ভারতের মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। ভারতের উন্নতি, ভারতের সভ্যতার বিকাশ— সম্পূর্ণরূপে উহার বিভিন্ন দিকটার রাষ্ট্রীয় ও অর্থনীতির পরিস্থিতির উপরে নির্ভর করছে। গোড়ায় যে গলদ রয়েছে তার কোনরূপ সংশোধন না করে একটা জোড়াতালি দেওয়ার নীতির দ্বারা মহাত্মা গান্ধী অল্প-কাল কেবলমাত্র উপরটাকেই চকচকে করার চেষ্টা করেছিলেন। যতদিন সর্ব-সাধারণের দ্বারা সমর্থিত না হয় এবং অর্থনীতিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত না হয় ততদিন কোন আন্দোলনই যে সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে এমন কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না। তবে আমার বিশেষ আনন্দের কারণ এই হয়েছে যে অর্থনীতির নব বিকাশকে ভিত্তি করে 'লাঙল' একটা ফলপ্রদ ও ব্যবহারিক কার্যতালিকা গ্রহণ করে নিয়েছে। একমাত্র এ নব অর্থনীতিক পরিস্থিতিই যে কোন লোকসমষ্টির বৈষয়িক অবস্থার (material condition) সুনির্ধারণ করে দিতে পারে। কেবলমাত্র এরই দ্বারা যুগব্যাপী হিন্দু-মুসলিম বিরোধের প্রকৃত মীমাংসা হতে পারে। ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকগণ ধনের সত্যকারের উৎপাদক হলেও ধনের উপরে তাদের কোন হাত নেই। তারা নানা-ভাবে বৈদেশিক শাসনের দ্বারা ও দেশীয় প্রতিক্রিয়ার দ্বারা শোষিত হচ্ছে। নিজেদের দ্বারা উৎপাদিত সম্পদে বঞ্চিত হয়ে ভারতের কৃষক ও শ্রমিকগণ রোজ রোজ গরীব হয়ে যাচ্ছে, আর মূলধনওয়ালারা হচ্ছে আরো ধনী। শ্রমিক-গণ কখনো বন্ধুভাবে ধনিকের সহিত মিশতে পারবে না। তাদেরকে তাদের আপনাদের পথেই চলতে হবে। গভর্নমেন্টের ভিত্তি ধনিক প্রথার উপরে প্রতিষ্ঠিত বলেই ভিন্ন ভিন্ন এককে মূলধন কেন্দ্রীভূত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ

নির্মাণকারীদের, খনিওয়ালাদের, ব্যাংকওয়ালাদের ও চালানওয়ালাদের কেন্দ্রসমূহের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। এই সবের প্রতিযোগিতার ফলে অদক্ষ প্রতিযোগিতাকারীরা দিন-মজুরে পরিণত হয়। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে এ প্রথায় অল্পসংখ্যক লোক সমস্ত ধনের মালিক হবে আর দেশের সর্বসাধারণ দিন-মজুরে কিংবা বেতনভোগী ভৃত্যে পরিণত হবে। এই জন্যে আজকের দিনে ধনিক সভ্যতার দ্বারা দুশ্রেণীর লোকের উৎপত্তি হয়েছে—যথা, যাদের আছে ও যাদের নেই অর্থাৎ সম্পত্তির মালিকশ্রেণী ও সম্পত্তিহীন শ্রেণী। এই দু'শ্রেণীর মধ্যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম চলেছে। আমি আশা করি আমার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সভ্যতার অধিকারী দেশবাসীগণ এ সংগ্রামেরই দৃঢ় ভিত্তির উপরে আপনাদিগকে শ্রেণীজ্ঞানসম্পন্ন বঞ্চিত সম্প্রদায় হিসাবে দৃঢ়রূপে সংহত করে সংগ্রাম চালাতে থাকবেন। জগৎময় যে কাজের ধারা প্রবাহিত হচ্ছে তারি সাথে তাঁদেরও কাজের একটা সামঞ্জস্য থাকা চাই। ভারতে নব সামাজিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তাঁদের উচিত শেষতম বিকাশের সহিত সমতা রক্ষা করা।

সম্পাদক মহাশয়, আমার পত্র বোধহয় সুদীর্ঘ হয়ে পড়ছে। আর একটা কথা বলেই আমি আমার পত্রখানা শেষ করব। আপনি যদি বংগীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের (The Bengal Peasants' and Workers' Party) কার্যাবলী সম্বন্ধে আমাকে জানাতে থাকেন তবে আমি বড় বাধিত হব। সম্ভব হলে দলের বিবরণ পুস্তিকা ও অন্যান্য পুস্তকাবলী আমায় পাঠাবেন। এই নব গঠিত দলের সহিত আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আমি আপনাকে ও আপনার অন্যান্য সহকর্মীদিগকে এ দল গঠনের জন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের কার্যে সফলতা লাভের জন্যে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি

আপনাদের বিশ্বাসভাজন

দাউদ আলী দত্ত

(লেনিনগ্রাড ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের
পারস্য ও ভারতীয় ভাষাসমূহের অধ্যাপক)

উত্তর

৩৭ হ্যারিসন রোড। কলিকাতা

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৬

মাননীয়,

দাউদ আলী দত্ত মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন—

আপনার ১০ই আগস্ট তারিখের অনুগ্রহ পত্রখানা পেয়ে পরম বাধিত হয়েছি। আপনি যে আমাদের কর্মোদ্যমের প্রশংসা ও সমর্থন করেছেন সে জন্য আপনাকে আমাদের হৃদয়ের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর্থিক অসচ্ছলতাবশতঃ ও অন্যান্য কারণে বিগত ১৫ই এপ্রিলের পর হতে 'লাঙল'-এর প্রচার বন্ধ ছিল। গত ১২ই আগস্ট তারিখে 'গণবাণী' প্রথম বের হয়েছে, আর 'লাঙল' 'গণবাণী'র সহিত একীভূত হয়ে গেছে। এখনো অনেক প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে আমাদিগকে চলতে হচ্ছে। কোনো কাজে প্রথম প্রবৃত্ত হওয়া বড় কষ্টকর ব্যাপার, বিশেষতঃ অর্থ না থাকলে। এদিকে তো এ অবস্থা। ওদিকে আমার নিজের স্বাস্থ্যও ভেঙে গেছে ক্ষয়রোগে ভুগে ভুগে।

যাক্, বাজে কথা বলে আর কাজ নেই। সুদূর রুষের লোকেরাও ভারতীয় ভাষা, বিশেষ করে বাঙলা ভাষা শিখছেন শুনে আমি বড় আনন্দিত হয়েছি। বিশ্ব আমাদের প্রাণের পরিচয় পাবে, এটা কি কম আনন্দের কথা?

আপনি হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কথা শুনে বড় দুঃখিত হয়েছেন। ধর্মের সংস্কারকে কেন্দ্র করে এ বিরোধ আরম্ভ হয়েছে বটে, কিন্তু সত্যকথা বলতে হলে এটা মোটেই ধর্মগত বিরোধ নয়। শোষক-শোষিতের বিরোধ যখন ভারতবর্ষে খুব প্রকট হতে চলেছিল তখনই ধর্ম-সাম্প্রদায়িক বিরোধ বেধে গেল। এমন সময়ে এ বিরোধ কেন বাধল সেটা অনুমান করা বোধ হয় খুবই সহজ। ধনিক সমাজ অবিরত শোষণের দ্বারা একটা বিশাল প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সৃষ্টি দেশে করেছে। এ দলের সহিত তাদের একটা সংগ্রাম আসন্ন জেনেই তারা তার গতিটা অন্যদিকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এটাই হচ্ছে বর্তমান সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রকৃত ব্যাখ্যা। ভারতবর্ষের জনসাধারণ ধর্মকে তো ভক্তি করেই থাকে, ধর্মের নামে অনেক অধর্মের উপরেও তাদের সমান ভক্তি রয়েছে। দেশের মোল্লা-পুরোহিতগণের সর্বনেশে প্রভাবের দ্বারাই এ-দুর্দশা জনসাধারণের

হয়েছে। কাজেই, ধর্মের নামে এদেশের নিরক্ষর জনসাধারণকে উত্তেজিত ও অন্ধ করে তোলা খুবই সহজ। জনসাধারণের এ হেন তথাকথিত ধর্মভাবকে ঘা মেরে পরান্নভোজী বণিক সম্প্রদায় দেশে এ ধর্মগত বিরোধ বাধিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য শ্রেণীসংগ্রামকে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য হলেও চেপে রেখে দেওয়া। এ কাজে দেশের মোল্লা-পুরোহিত, ভাড়াটে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকারী ও বহু সংখ্যক সংবাদপত্রসেবী ধনিক সমাজের সহায় হয়েছেন। মজা এই হয়েছে যে, যে কোন হিন্দু কৃষক মুসলমান জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং মুসলমান কৃষক হিন্দু জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোন কথা যদি বলে, তবে সেটাও ধর্মগত পার্থক্যের জন্য বলেছে এরূপ ব্যাখ্যা আমাদের খবরের কাগজওয়ালারা করে থাকেন। কিছুকাল পূর্বে কুষ্ঠিয়া মোহিনী মিলস্ নামক কাপড়ের কলের তাঁতঘরের লোকেরা ধর্মঘট করেছিল, খবরের কাগজওয়ালারা বললেন,— মিলের পরিচালকগণ হিন্দু আর তাঁত ঘরের লোকেরা সব মুসলমান বলে এ ধর্মঘট হয়েছে। তাঁতীদের মধ্যে হিন্দুও যে রয়েছে লজ্জার মাথা খেয়ে এ কথাটা তাঁরা গোপন করে রাখলেন।

দেশের যখন এ দুর্দশা তখন আমাদিগকে যেতে হচ্ছে চলতি ধারার বিপরীত দিকে। যাক, আমাদের কাজ যতদিন পারি আমরা করে যাব। তারপর যা হয় তা ভবিষ্যৎ দেখে নেবে।

আশা করি এতদিন আপনি সুস্থ হয়ে লেনিনগ্রাডে ফিরে এসেছেন। আপনি আমার প্রীতি ও ভালোবাসা নেবেন।

বশংবদ

মুজফ্ফর আহমদ

সম্পাদক, গণবাণী

এ-ছাড়া ইরানের কের্মান শহর থেকে ১৯১৫ সালের ৩ অগাস্ট প্রমথনাথ তাঁর বন্ধু ও *Gaelic American* পত্রিকার সহ-সম্পাদক, জর্জ ফ্রীমানকে যে চিঠি লেখেন সেটি প্রকাশিত হয়েছে শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায়ের *Two Great Indian Revolutionaries*-বইয়ের ২৪১-৪২ পৃষ্ঠায়। তবে ফরাসী Foreign Legion-এ থাকার সময়ে ফরাসী ইকোয়েটোরিয়াল আফ্রিকার কোনো স্থান ও সাইগন থেকে তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে যে দুটি চিঠি লেখেন ('ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম', পৃ ১১০) তার কোনো হদিশ জোগাড় করতে পারি নি।

১১

দ্রষ্টব্য ॥ পৃ. ১৮১

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় *Mainstream* পত্রিকার ১৯৭১ সালের 'Republic Day' সংখ্যায়। এখানে প্রবন্ধটি সামান্য সংক্ষেপিত আকারে প্রকাশিত হল।

SOME REMINISCENCES AN INDIAN PATRIOT AND FREEDOM-FIGHTER

SUNITI KUMAR CHATTERJEE

Abaninath Mukherji whom I had the privilege of knowing in my boyhood, possibly during my late school years and then from my early college days, was a neighbour of mine in Sukias Street, Calcutta.....

Close to our house there were several old Bengali Brahman families. Prominent among them were two families with the same surname of Chatterji, who possessed big houses, and were considered rich, as they used to perform in their houses the annual Durga Puja, which became virtually a community worship for Hindu residents in our locality. Rai Bahadur Chandi Charan Chatterji, who was a Deputy Magistrate, was one of the big men of our neighbourhood. From the time of Babu Sarada Charan Chatterji, Chandi Babu's father, and with Chandi Babu's sons and his brothers and nephews, the Chatterji House presented the picture of an old zamindari establishment, although they were not landed proprietors.

Next to our own house was the other big Chatterji family, who were our close relations, and that family was also well known, and the prestige of these two Chatterji

families was marked by the fact that the annual Durga Puja which used to be held in our neighbourhood was only in these two houses.....

In our area, which was known both as *Bahir Simulia* and as *Chalta Bagan*, there were two houses, one was No 27 Sukias Street and the other house was in front of No 27 (its number was, as far as I remember, No 59 Sukias Street), which ware connected with Abaninath. Most of the residents in this area owned the houses they lived in, having inherited them from their fathers or having built them themselves. No 59 Sukias Street was owned by three brothers, very well known to my grandfather and my father and to us also. The eldest brother. Narendralal Dutt, was a clerk in the same office where my father used to work—the firm of Messrs Turner Morrison & Co. The second brother, Krishnalal Dutt, was a Veterinary Surgeon, and every morning there used to be something like a horse-show in front of the house—there were few horse doctors in those days and Dr. Krishnalal Dutt was very busy looking after the horses and sometimes dogs of a large clientele. During the end of the first decade of this century, automobiles were just showing themselves, but horse carriages were very much in evidence everywhere.

The youngest of these three brothers was Pramathanath Dutt. When I was a boy he was just several year older than myself, and I used to see him, rather a stoutish young man, who later on became a distinguished freedom-fighter, being forced to be onvoluntary exile and who became a legendary figure in our area. He is said to have fought in the First World War against the British in Mesopotamia and Iran, joining the Germans and their allies, the Turks. Later he sought refuge in Russia. It was also said that he was wounded in some engagement somewhere on the borderdland between Afghanistan and Baluchistan by the British rulers of India—Baluchistan was a part of the British Indian

empire. Pramathanath Dutt's objective was to enter India and seek to contact Indian anti-British revolutionaries. In an encounter with Britsh's Indian troops, he was wounded in his left leg and had to spend a night in bitter cold, in the midst of a snow-fall, and this did a permanent damage to his constitution making him suffer from paralysis. He could escape into Russia where he found asylum for the rest of his life, and had to use crutches for the injury to his left leg. He settled in Leningrad under the assumed name of Daud Ali Dutt. He used to teach Indian languages like Bengali and Urdu, and also Russian, in the University of Leningrad, and became a member of the Leningrad Public Library. (*See* "Daud Ali Dutt—Story of a Patriot", Chinmohoan Sehanavis, *Mainstream*, August 12, 1972).

Abaninath Mukherji's father was an engineer who spent most of his life in the Punjab. After retiring from Government service, he came back to Bengal and decided to settle in Calcutta. He purchased his house, and this house at that time, No. 27 Sukias Street, was almost in front of the house of the Dutts (the three brothers Narendralal, Krishnalal and Pramathanath mentioned above). In those days, when in a Bengali area, or for the matter of that in any old fashioned area, a new-comer came and established himself, he used to make friends with the old residents by calling them to his house at some small party for house-warming. Abaninath's father, after he had come to his new home about the year 1903 or 1904 with his family, as far as I remember, sent an invitation to the local gentry to a little dinner at his place for this house-warming ceremony—the *Griha-Pravesh*.

We came to know our new neighbour Sri Trailokyanath Mukherji and we used to regard him with great respect. He was a high-placed engineer in Government service when he retired, and he was a tall man with a personality and he seemed to be quite an aristocrat in his ways. But we

young people did not have much to do with him ; and he seemed to keep himself a little aloof from the gentry of his age in the neighbourhood.

Trailokya Babu had four sons — Prithwinath, Abaninath, Kshitinath and Tapatinath. Now in the year 1972, only the youngest, Tapatinath, is living, and he is 76. Prithwinath was looked upon with great respect by the younger boys of the neighbourhood, as we found that he was studying at college and had taken his MA in Botany and was trying to get nomination for the post of a Deputy Magistrate. I do not remember whether he actually became a Deputy Magistrate. But I met him several times, and he was a hearty type of a young man who always put younger people at ease and was quite a sociable sort of a person. We felt very keenly sorry when he met with an early death, and everybody in the neighbourhood regretted this untimely death of a bright young man—more so as he had just married a few months before his death.

Abaninath, of course, had a very chequered career and certain aspects of his life and career of which I could get glimpses, and about which he told me himself, I shall try to narrate, Full fifty years have passed from the time when I last saw him (1922), and although in certain matters my memory has not failed me— I distinctly remember a great many events and scenes— in certain other matters I must confess that I may have forgotten some detail. The third brother Kshitinath, after Abaninath had left India, lived with his younger brother in the same house, 27 Sukias Street, and he looked after the family estates, and he and Tapatinath were the only persons in the family who through friends kept their touch with Abaninath for quite a long time. The youngest brother is still living at the same house. But he was rather young when his brother took part in the great events connected with India's fight for freedom, and I had something to do with them in

connection with Abaninath's adventure to visit India when he still had a price on his head in 1922-1923.

As young people who lived in the same area, with neighbourly feelings of the old type still persisting, the boys of the same age group like Abaninath and myself and a few others came to be quite friendly and chummy with each other. In the mean time, a new neighbour had come in our area, and he became permanent resident. The Dutts living in 59 Sukias Street let out a portion of their house as it was larger than their needs, the portion adjoining Sukias Street. In that portion only one room formed the office and dispensary of Dr. Krishnalal Dutt, the Veterinary Surgeon, and the other rooms in the ground floor as well as one or two rooms in the first floor were let out to a venerable gentleman, an Ayurvedic Practitioner, who came from his family home from Magura in Jessore District.

This gentleman came from his village home, quite in an advanced age with his family, and he started practising Ayurvedic medicine in Calcutta. What made him come to Calcutta to try his luck, at an advanced age, after having made some name there, I never knew. But he soon established himself and became quite a prominent figure in our neighbourhood. He had his own little consulting room, and he used to prepare Ayurvedic medicines with the help of some servants whom he employed in Calcutta. There was a little room in front of his consulting room which became a sort of a club for us young people in the neighbourhood because this old gentleman was very affable and he had a smile of welcome for anybody who would come to his house, and particularly people like us who were in friendly terms with his two sons.

Kaviraj Sital Chandra Chattopadhyay was a rather lean and thin person, fair in complexion, with regular features and an intelligent mien, and with a long grizzled beard, and he spoke Bengali with his Khulna or Jessore accent. He

soon became a friend of everybody, and was very much in demand for lesser ailments when he would come to see his patients in their houses and prescribe Ayurvedic medicaments. It was generally in the afternoon and also occasionally in the mornings that we would come to his house and make ourselves comfortable on a plank bedstead (*Takhtaposh*) with a *durry* and a white sheet on it, and spend our time in talking or reading Bengali papers, and discussing politics. Those were the days of the Swadeshi movement, and we younger people were all of us to a man nationalists and we wished the Englishmen to quit the country. But we did not know how that was to be achieved. Kaviraj Sital Chandra Chattopadhyay was also a great nationalist like the rest of us. But how it happened we did not know— his daughter was married, after he had settled in Calcutta for some time, to a young man from his native district, whom, we later came to know was a police informer, and that too in those terrible days of the Swadeshi movement and its attempted suppression with the help of the police and informers by the British Government. It was quite in the nature of things, as we later saw, that determined anarchists or nationlists who wanted to avoid the British as well as the police informers were living under the same roof.

It was round about 1910, when I was a BA student, that I was a frequent visitor to this informal club. I do not remember the names of other, and some of them had been long away from our neighbourhood and others have joined the majority. But somehow I got interested in Abani. His elder brother who, as I said, was a rather stout young man when I first met him, was at that time preparing for his MA examination in Botany, and he used to come occasionally. And there was Kaviraj Sital Chandra Chattopadhyay's younger son. At that time Abaninath had just come from Bombay or some town in Gujarat— Surat or Ahmedabad. He was technician in the textile industry,

and I naturally got interested in him as he used to tell us about his experience in Gujarat and in Bombay.

I was very much intrigued to hear that in Surat in the local dialect of Gujarati (I had already begun to take an interest in the phonetics of Indian languages as well as in general phonetics) they never used the pure gutturals—*k*, *g* sounds. These gutturals they always changed to *ch* and *j*. He informed us that he would find Surat people say *Chali Charan* instead of *Kali Charan*. Later on I discovered for myself, in gathering of Marwaris and Gujaratis in Calcutta, somewhere in Burra Bazar, that actually in some forms of dialectal Gujarati *k*, *kh*, *g*, *gh* were pronounced with a palatalisation— these sounds or letters of the Indian alphabet they pronounced as *ky*, *khy*, *gy*, *ghy*.

He was a very good story-teller, and I was very much interested to hear from him whatever he had to tell me. Then I got still more interested in him as he said that he was at that time planning to go to Japan to study textile technology or some other connected trade, and he managed to get a book which was of prime interest for me at that time—*Japanese Grammar Self-Taught* by Weintz which was published (in Marlborough's *Self-Taught Series*) from London. Quite a good many languages were covered in this series, and later on in 1926 my *Bengali Self-Taught* was also brought out by the same publishers. In Weintz's book, of which I possess a copy myself now, there was a very useful note on the Japanese system of syllabic writing—the *Katakana* and the *Hiragana* syllabaries. It is a very well-written book and gave me all the information that I was eager to get, without knowing about its importance. I borrowed this book from him and kept it for some weeks, and I remember having made copies of the Japanese syllables and also note on the connection between Japanese writing and Japanese pronunciation. Abani, because of his having been to Western India and because he was a lively sort of a person, was well known

even to the elder generation in our neighbourhood, and our respected Sital Kaviraj Mahasaya also liked him.

Then later on I lost sight of him, evidently because he had gone to Japan and it was from that time that I did not have any occasion to meet him in Calcutta. I heard certain stories about him that he had joined the fighters for freedom and was with the "anarchists", as they were generally called in those days, and he had to go underground occasionally. Then the First World War started in 1914. I had heard that he had come back from Japan, but I did not have any occasion to see him. I only heard of him from my father on one occasion, and he as a gentleman of the old school spoke with a certain amount of disapproval— he did not understand the ideology of a young man like Abani—that after Abani's elder brother Prithwinath had passed away leaving a young widow, Abani had scandalised his own people and also the respectable orthodoxy of the neighbourhood by declaring that he would wholeheartedly approve of her marrying again should she feel inclined to do so.

This was the first phase of my knowledge of Abani and of my coming in touch with him.

Time passed by and I almost forgot him. In 1919 I had an opportunity to go to Europe for three years' stay and study as Government of India Linguistic Scholar.....

What I received by way of scholarship from the Government of India was quite enough for my expenses and I managed to save a little money and I earned a little more by taking classes in Bengali in the University College, London, and also by acting as an examiner in Bengali for some of the Indian Civil Services examinations.

With this money, after my period of sojourn for three years was over, I thought of doing my "grand tour" of the Continent, and I managed to visit practically the whole of Italy and Greece, where I could spend three weeks, and some parts of France as well as Germany. That was in 1922,

when I was also arranging for my return journey to India that I found myself in Berlin. There, in Berlin, after I should say about ten years, I met Abaninath for the second spell....

I had....made friends with a number of Indians who were residents in Germany at the time. I do not remember his name now—he was one such friend who was a Bengali from Calcutta, to whose residence I would sometimes go in the evening and meet other Indians who were seeing Berlin like myself.

On one such occasion, when I was talking with other friends, two Indian gentlemen came in. They were known to my friend who used to be our host, when over a cup of coffee we would discuss things. When those two men who were quite strangers came, my friend introduced them to me. One of them he named as A.N. Mukherji. As is my habit, I asked for his full name. He said it was Abaninath Mukherji. Then I was told about him that he had just come from America. I got interested, and asked him how long he was in America. He said: "Well, I was there for only a few weeks." But then I was told by my friend that he was for a longer period in Russia—for several years. And this naturally interested me still more. I took a close look at this gentleman. He was tall and squarely built, and seemed rather dark for a Bengali Brahmin.

Then I wanted to know where he had come from, what was his native place. He said he came from Calcutta, and his home was in Sukias Street. Like a flash of lightning, memories which went back to about ten years from that time came to me. I said: "You are Abani. Do you remember the drawing-room (*Baithak-khana*) of Sital Kaviraj Mahasay?" He also gave a look of surprise, and said, "Sital Kaviraj, of course I do; you are?" "You remember Suniti," and then he at once recognised me and was tremendously surprised and pleased, and gave me a bear-hug.

"You are Suniti! After such a long time, and in Germany too!"

I told him how we lost track of him, and finally by a happy coincidence met after such a long time, and said; "We would read a little about you occasionally in the papers, and you must have had some most wonderful experiences all this time. But I do not know all that you have been doing all these years. I knew you were getting ready for going to Japan for advanced training in textile industry. You remember I borrowed, for some weeks, your Japanese Grammar which I found very useful. What happened when you came back from Japan?" He said: "I went to Bombay-side once again, and then I managed to go to Germany for further technical training, and I came back; and after that I joined the freedom party—the anarchists. I was with our revolutionaries in Bengal who with the help of the Germans tried to smuggle American arms into India when the World War was going on."

I later on learnt that Abaninath was sent to Japan by the great Bengali revolutionary, Jatindranath Mukherji, alias "*Bagha* or *Tiger Jatin*", to contact the revolutionary Ras Bihari Bose who had found asylum in Japan, and to get some details of information in connection with the projected rebellion against British rule. He succeeded in his objective in Japan, and was returning to India with some valuable papers in his possession, but he was betrayed, and arrested by the British at Penang, sent to Singapore for trial, and was summarily tried for treason and condemned to be hanged. It was the duty of other revolutionaries under the directo-Narendranath Bhattacharya (Manabendranath Roy) to escort an American, boat which came from America to Hongkong loaded with small arms—the ship was known as the *Maverick*—through the Bay of Bengal into the Sundarban creeks, and there our people were ready, and arms were to be distributed to them. But the plot failed.

"Condemned to be hanged ?" I asked.

He said : "Through good luck I escaped the rope."

Naturally I was tremendously impressed, and I said : "Do tell me what happened. Are you in touch with your own people ?" He said : "Only rarely." I told him : "Let me hear the whole story. Some day I might write it." (I am redeeming this promise—it was not exactly a "promise" made to him, but it was a resolution which I took in my own mind—after full half a century. And even though my memory has become rather hazy in certain details, it is still perfectly clear in other matters.) After this first meeting in Germany, we used to meet frequently enough, either in my room or in his, but more generally in some restaurant, and bit by bit he narrated his whole story.

In order to make it clear and easily understandable I shall have to say something about his family and also about how he was gradually drawn to this nationalist freedom movement through the path of violence. This last he told me very briefly and at that time I was not interested to know all those steps through which he passed, because I did not know most of his close associates in this history.

His father, Trailokyanath Mukherji, whom I knew by sight, and possibly had an occasional word with him as he became our neighbour in Calcutta, was quite a tall and stalwart looking person who, as I said before, after his retirement from Government service in the Punjab as an engineer, came to Calcutta for settling there permanently, and purchased the premises at No 27 Sukias Street, very close to our house. This happened in 1903 or 1904 (it was precisely in 1903—as I got this date from Abani's youngest brother Tapatinath who is still alive). I think we came to know each other during the days of the Swadeshi movement, with the tremendous wave of patriotic fervour which swept the country, closely following the Partition of Bengal by Lord Curzon, the Viceroy of India. We used to find a

common meeting place in the drawing room of Sital Kaviraj Mahasay. I knew all his brothers, particularly his elder brother, Prithwinath, who died so early. Kshitinath and the youngest Tapatinath I knew later more intimately.

In Berlin, Abaninath told me that there was something in his family which would not be looked upon as proper in a middle-class Bengali family. His father was very masterful and he ruled his family with an iron hand. When serving in the Punjab he had brought into his house to live with him a Punjabi woman. I did not ask Abani to tell me how she got a place in the family, and if his father had married her. But she was there, and she was known to Abani and his brothers *Bara Ma* or "the elder mother". His own mother was a typical Bengali wife of the old type, with a saintly character, as Abani told me. She silently suffered from the indignity of being forced to live in her own house with another woman, and it was sharing her position as the mistress of the household with this other person. She did not complain about it, and got the sympathy of all the four brothers who understood the whole situation. But they could not say anything.

His mother always used to tell him: "Never permit any oppression to go unprotested, even if you cannot do anything to remove that oppression. Your first duty should be to save the weak and those who are without any help from any side from oppression of any sort." She gave her sons, particularly Abaninath, inspiration to fight against the oppression of imperialistic rule in India. Outwardly it may seem to be all right, but one should look deep into the whole matter, and try to remove all indignities which people might not find a voice to express. That is how he gradually thought, after his experience in Japan, in Germany and in Western India, that his first and foremost duty would be to free India from the domination of the British, leading in its train the daily

insults and indignities and exploitation of all kinds and loss of nerve among the people. In this way gradually he came into touch with the political party which believed that India could become free only by meeting violence with violence. Here, of course, was the indirect influence of Sri Aurobindo, who revolutionised the attitude of the Indian nationalists in their approach to the problem of winning freedom for the country. The ideology of Sri Aurobindo at the time had a very great appeal for young Indians who wanted strong and direct action, although the British thought this ideology to be nothing short of rebellion against their rule, and the more timid among the Indian nationalists were frightened as it was dubbed as "terrorism".

Abaninath joined this party of "terrorists"; and it was thought that, during the First World War, when the British were very hard pressed in Europe fighting with the Germans, India might get an opportunity to assert herself for her independence. The very existence of England was at stake. The British were not at all prepared to meet the German Blitzkrieg, and in India there was a secret exultation among most Indians at the news we were getting from the western front, particularly about the reverses which the British (and the French, for whom we had the greatest sympathy in spite of their being allies of the British) were having at the hands of the Germans.

There was an amusing story which was reported in the papers in Calcutta which would give an idea of what even the masses were thinking. The driver of a hackney carriage in Calcutta in front of the Sealdah station, as it was reported, could not manage his horse which would never move forward in spite of the driver from the box starting to belabour it with the butt of his whip. A policeman on duty asked him not to obstruct traffic in this way, and the driver's retort was: "What can I do? This wretched horse of mine has become an *Angrez*, an Englishman. It won't

move forward, but it will always push the carriage backwards. Even you as a policeman will not be able to persuade it to advance."

Some Sanskrit Pandits, innocents of *Welt politik*, expressed a keen interest in the war news, and they could not conceal their satisfaction when they were told that the British were continually retreating. And somebody told them that if the Germans came to India, what would the Pandits do, since these Germans were the sworn enemies of our Government. And the reply was: "That may be. But they are great lovers of Sanskrit: and if the Germans were to come, we shall welcome them in Sanskrit to our country." Most Sanskrit scholars innocently thought that all Germans were lovers of Sanskrit, and they did not see much evidence of the British ruling class's interest in Sanskrit and Hindu learning even though they lived in India, whereas *Bhatta Sri Moksha-Mular* (as Professor Friedrich Max-Mueller is known in Sanskrit) was a household word.

Just as when Rome was invaded by the Germanic barbarians early in the fifth century AD, the Roman people recalled from the distant provinces of theit empire (like Britain) every single soldier of the Roman army available, for the defence of Rome herself, so to save France and Britain, all the resources of India which the British employed in taining up a huge army not only of Indians, but a bigger army of British soldiers trained at Indian expense, were called to the battlefields of France. It was said that even the military police in India were not spared, and they had to go to defend France and Britain against the threatened German invasion of Britain. The heroic deeds of the French and also of the British, who were supported by Indian troops, in the fields of Verdun and in the battle of the Marne are well known, and for the time the British felt very grateful at the supreme sacrifice made by Indian troops to save Britain.

In India this was looked upon by the ardent freedom-fighters as a great opportunity to shake off the British yoke. Some of them took up the dangerous game of joining in this warfare, although they did not have any resources or any training to wage an overt were against the British. They manage to contact in a roundabout way the German Government and German and anti-British organisations outside Germany, in America and elsewhere, and they arranged to smuggle arms—mostly small arms—into India, through the Bay of Bengal, and then into the densely forested creeks and river mouths of the Sundarbans in South Bengal. Signal stations with lights were built on the top of trees in the Sundarban forest creeks at some places by local landlords, to light the arms-ships when they came to the proper places —so it was whispered. The arms were to be handed over to determined freedom-fighters, consisting almost entirely of Bengali Hindus. who were to seize all centres of British administration in Bengal in the first instance with these arms. They knew that they were few trained soldiers to account for, they would easily capture all important centres, and then would declare the independence of India. With this end in view—the details from part of the history of India's fight for freedom, which is yet to be written in full—they managed to arrange for a shipload of arms which was to come from America through the Pacific, and to come to Sanghai where representatives of Indian fighter were to meet them and to lead them, skirting Hongkong and risking the passage through the Strait of Singapore and then come to the Bay of Bengal, and finally enter some fixed area in the Sundarbans. The first ship was ready, and it was known as *Maverick*, and it flew the American flag.

This was happening in 1915 when without any notion of these momentous happenings I was working as a Lecturer in English in the University of Calcutta Every morning we were thrilled by the news of the war which we were getting

from the daily papers, without understanding or realising how some of my own countrymen were making a desperate attempt in this way of using this war to attain the freedom of India. Abaninath and a number of his comrades in this movement—some of them, as I came to know later, were very exalted names in the history of India's freedom movement like Narendranath Bhattacharya (later known as Manabendra Nath Roy), Bholanath Chatterji, Jatindranath Mukherji, Ras Bihari Bose, Bhupati Majumdar and a few others, were actively connected with this plot.

The scene was set and everything seemed to be quite ready. But they did not count upon the dangers of this arrangement. There were traitors among them and some of them disclosed the whole matter to the British Government. The result was that Abaninath could not return home from Japan with certain messages to fulfil, as it was decided originally. He was arrested at Penang, and taken to Singapore, where he was kept in detention in the prison in Singapore Fort. The situation was desperate for the British, and there could not be any thorough trial, but there was a summary disposal of the case and, as Abaninath told me, he was condemned to death by being hanged as a common criminal.

He had, he said, accepted his fate with fortitude and had a sort of secret exultation that he was dying in what could be described as a fight for winning freedom for his people. He had reconciled himself to this, and he was counting the days when he would have to make his final exit : and he did not know the exact date when the supreme penalty would be mated out to him. He was thus at Singapore passing his days in this uncertainty, which was certainly a great test for his courage and fortitude.

But the fate decreed otherwise, and succour came to him from an unexpected quarter. Abaninath told me that his case as a man who wanted to fight the British in India by

importing German and American arms, interested the British officers and soldiers who were in Singapore. The British had already a serious trouble with Indian troops in Singapore. Indian troops consisting of North Indian (Bihari and UP), Brahmins, UP and Punjabi Muslims, Sikhs and Punjabi Hindus, formed the military forces whom the British employed to hold Malaya for them. These Indian soldiers were also employed to cow down the Chinese who resented the presence of the British in their country, both in the Crown Colony of Hongkong and in the International European Settlement of Shanghai. But shortly before the *Maverick* incident, desire for freedom of their country had also boen injected among all the Indian troops, and there was a revolt, even at this critical period of German attack, in Singapore in which, as I was told, the First (or Third ?) Brahman Regiment was largely involved.

I had the unique opportunity of going to Penang in 1912, and in the ship by which I travelled there were soldiers from the First and Third Brahmans as well as from a Punjabi Muslim Regiment, who were going back from their homes in India to join their regiment in Singapore and Shanghai. From these soldiers of India, holding high the Union Jack above the dragon of China, I came to know a lot about the personnel in the Indian forces, and how they lived and what they thought. That is why I was interested in these Indian soldiers who revolted in Singapore. After this affair (and we did not know what happened to the Indian troops and what kind of punishment was meted out to them— but we later heard that a good many were court-martialled and put to death) the British took good care to rely almost solely on whatever British or European troops they could bring there.

Now at Singapore at that time one regiment which was stationed was Irish in composition. Possibly the British Government was not feeling very happy about their allegiance

to the British rule over Ireland, and the *Sinn Fein* movement was at its height at that time in Ireland. But the British here behaved like the stag with the one eye as in the Fables of Aesop. They did not expect any co-operation or collusion between the Indians and the Irishmen in Malaya. Abaninath told me that a young Irish officer in that regiment, which was posted in Singapore Fort, evinced a great interest in him and used to talk to him in a most friendly way ; and he used also to speak about the atrocities perpetrated by the English upon the Irish from the days of Oliver Cromwell down to the infamous Black and Tan troops from England. It was with the help of this officer and a few other men of the regiment which was to look after and guard him, that arrangements could be made with some of Abaninath's friends and sympathisers in Singapore for his escape from Singapore Fort.

I do not remember the details, and neither Abaninath was in position to hear everything about it. But it was finally arranged that on a particular evening, when he would be taken out for his evening constitutional for about half an hour on the rampart of the Fort, he was to make a dash for his escape by sliding down the battlements along the outer wall and to reach the bottom of the trench which surrounded the walls of the fortification, and then run up the high bank on the other side and come to a public road which passed along the outer walls of the Fort. The Fort itself was situated close to the sea which could be seen from the rampart. It was arranged that the man to rescue him was to come with a car—cars were, of couse, not very plentiful in India and the Far East at that time—so that he could not miss it, and this person who was a Japanese, was to stop the car at a particular spot, get out of it, and take out his handkerchief and wipe his face. That was to be the signal. The British soldiers who kept watch on him, it was arranged, were to look some other way, and

then Abaninath was to make his dash for freedom. Abaninath said it was a God-sent opportunity for him, and he thanked his benefactor who had remained for him unknown and unnamed. He did not know at that time what happened to him. Subsequently the whole thing came to be known to him.

This plan succeeded very well. Abaninath, as the shades of evening were coming, and in the tropics as one knows it well that "with one great stride comes the dark", could just get away into the car which was waiting for him and his friend took him to a desolate part of the seashore and there was a small boat which was on the sands by the sea. They left the car there and made a dash for the boat which they dragged into the sea and launched it with some difficulty, and then as the night shades were falling they pulled their oars making straight for the Sumatra coast on the other side. I do not know the exact distance, but as far as I remember, Abaninath told me that it was like that of the Padma in East Bengal. In any case I was not very curious to find out the exact distance that they had to cover. There was a risk from passing steamers which might turn their lights on them. But somehow they managed to escape them — no one saw them and they pulled their oars throughout the night. In the early hours of the morning they arrived at the Sumatra coast.

Here they were under the aegis of the Dutch, and not under the rule of the British. The Dutch, however, were sympathetic towards the British as, being an imperial and colonial power, they had their own problems in their own possessions. The small Dutch nation had to keep under control millions of Javanese, Malays and other peoples, who were becoming restive and who were looking wistfully towards India for guidance in starting a war for freedom from the Dutch. So there was not much of sympathy and support from the Dutch for an Indian freedom-fighter

who was an escapee. Nevertheless it would be some respite for Abaninath. They tried to take their small craft to a suitable place where he could land. But such a place they could not find easily and they were afraid of being seen by the local people and apprehended and ultimately handed over to the British. So in the midst of the swamps by the sea, without a proper landing ground, his Japanese friend and guide left him, and took leave from him, wishing him good luck and then he started on his journey back to Singapore.

What happened to him Abaninath did not know for a long time, but later on he heard that he was caught by the British when he was coming to Singapore, and he was put in jail and then after some months he died in jail. But what they did to him during this time has remained unknown.

After this began Abaninath's adventures in Sumatra, and then in Java. He said that the sea-coast there was terrible. It was marshy land, and there were mangrove swamps. The mangrove plant grows also in the swampy lands forming the mouths of the Ganges, in the area known as the Sundarbans in South Bengal. In Bengali the mangrove is known as *garan* The wood or rather the branches are round and not very thick, and it is brought in huge quantities to Calcutta to be used for posts in thatched hutments, and it is also used as fuel (the fuel used in Calcutta for cremating the dead, another kind of wood, known as *Sundari*, which also comes from Sundarbans and from this word we get the name *Sundarban*). The *garan* wood makes strong sticks with very sharp ends, and there will be disaster for men and beasts if one were to fall on an upright *garan* stick hidden in the thick mud the of marshy seacoast.

For four days, as Abaninath told me, he had a most terrible time. He was moving all the day in the midst of this mud and slush which was sometimes knee-deep, and it

was very difficult for him to extricate himself from it. Then there was nowhere any sweet water to drink and there were no coconut palms in that area so that he could at least have a drink of coconut milk. No food was available. He dod not dare to eat the fruits of some trees which he found on the ground and which looked inviting, but he knew that they might be poisonous. There was fortunately no fear of wild beasts. But one had to be very careful, avoiding scorpions, and also snakes. He spent his nights by dosing, leaning on some bush but here he did not have any respite. There were huge big gnats which filled his body with blisters by their bites. He said he was going to be almost raving mad through this torture. But on the fourth day in the morning from a distance he could see some boats with men in them, and he made a dash for these boats.

He could hear human voices which brought fresh energy and life in him, and he almost ran, and came close upon the nearest boat, and raised his hands to be lifted up in the boat. The people on the boat, as he could realise, were local Malays. They helped him up, and wanted to know who he was. But there was no common language between them. That was no handicap. While in prison in Singapore, he had picked up just a few words of Malay, although that did not carry him far. By gestures he could make them understand he was dying from hunger and wanted to eat. These people were kindly souls— they drew him up on the boat, and made him sit on the deck of their small craft, and gave him on a plate made of some leaves plenty of rice and some fish—lobsters highly seasoned with hot chillies. All that food was like ambrosia to him. The rice was coarse and big in grain and red in colour. As a Bengali he could manage it all right with the fish, and he ate voraciously, and then fell into a dizziness. His rescuers understood his position and allowed him to sleep curled in a small corner of the deck.

Abaninath said that he fell into a deep sleep immediately, and slept for several hours, and it was towards the afternoon that he woke up. The people in the boat and in other boats who came to see him—were all interested in him. He made them understand that he was an indentured cooly from British Malaya who found his life in a rubber plantation too hard and he had somehow taken this desperate step and had come in a small boat to escape this cooly life, which was virtually slaverly. They were not surprised at this ; evidently, this was not an infreequent occurrance—indentured coolies from India who were working in rubber plantations in British Malaya sometimes escaped into Sumatra, where they got better wages and evidently also better conditions of work.

In this way, a new phase—quite an unexpected one—started in Abaninath's life. He said that after about three days when they had enough fish for their purposes, some of which were dried on the shore, they went back to their village. It was a part of Sumatra which was well inhabited, and there were plenty of villages. The people were Muslims and every village had its mosque. The boat which had rescued him reached its own village, and the owner of the boat as his saviour and host then took him to the Headman of the village who was the *Mulla* in charge of the local mosque. They evidently explained how they found him, in their own language which Abaninath did not understand. But he could naturally make out what they were talking about. The Mulla was a middle-aged man who sported a little beard, looked at him critically and then asked him whether he was a Muhammedan. He understood this question, and he said by nodding he was. Then he was asked to recite the *Kalimah*, the Muhammadan creed in Arabic. He did not know that, so he kept silent. This was a great offence in the eyes of the Mulla and he came near to Abaninath and gave him a smart slap on his face, rebuking

him at not being a good Musalman. Abaninath said that he could only look abjectly apologetic.

However, the Mulla was a good sort, and he agreed to keep him, as he came to understand, by signs, to be his servant. Abaninath was to live with him in the mosque and to serve the Mulla as a personal servant, and to keep the place tidy. He was also to learn the proper prayers in Arabic. Abaninath said that he continued to be there and he could easily pick up enough Malay to understand what was going on. (I could tell from my personal experience that as Malay has no complicated grammar, it is one of the easiest language to pick up.) The Mulla took kindly to him because Abaninath said that he was an expert at massaging, and he worked himself into the good graces of this local magnate by massaging his person regularly everyday. In return, he got his food and keep, and at the same time a good Islamic education. He learnt by rote all the Arabic prayers, particularly the sentences which are used in the regular calls to prayers five times a day, which he could recite, of course with a Malay accent. At this juncture, just to test him, I asked him : "Will you tell me what are the Arabic verses for the *Azan* or, 'the Call to Prayer' in the early hours of the morning ?"

He at once repeated "*Allahu Akbar* (God is greatest) ! (thrice), *Ash-hadu ana la ilaha illa-Allah* (I bear witness that there is no God excepting Allah) ! *Heiya aala as-salat* (Come ye to prayer) ! *As-salatu khairun min-an-Naum* (Prayer is better than sleep)" ; etc.

Next, both to test his knowledge, as also to show off to him my interest in the Koran and my knowledge of some of the smaller *surahs* or chapters of the Koran, I made him repeat to me some of the lesser *surahs* which I knew, and this he did faultlessly. So I could see that his education in Islamic theology and ritual was well attended to by this kindly Malay Mulla.

In this way, as Abaninath told me, he found breathing space for some months. He could not as yet decide about his future plans, and he was wondering what he would do next. Then an unexpected turn of events took place. The long arm of the British Government did not allow the matter to rest with his escape from Singapore. They came in touch with the friendly Dutch Government in what was at that time *Nederlands Indie* (now after their independence they call this country *Indonesia*), and wanted their friendly offices in finding out and arresting the escaped "rebel" and handing him over to them for "justice" in Singapore. A search was instituted, evidently, in that area. One evening his protector, the Mulla told him that the Government had come to know of his presence there, and they would be very soon sending some police officers to arrest him and take him away. But he knew that as an escaped cooly he should be supported, as they were in the habit of doing. Otherwise they would be putting him to trouble for having deserted from his indentured service or slavery in the cooly lines. So without delay, and it should be next morning, he should go to some other place which this Mulla had already fixed for him.

It was a rubber plantation where this Mulla had a friend who was a headman among the coolies, and word had been sent to him to take him in as an additional hand in the rubber plantation owned by Dutch people to which he was to go, some miles away from the village where he was living for all this period. The Mulla was visibly moved to part with him, and Abaninath told me that although a Brahman from India, and he had to do menial service to this half-barbarian, and particularly to please him by his massaging, he felt a pang of sorrow for having to leave his benefactor. The next day he left with a few pieces of clothing and a very meagre sum, and found himself in the rubber plantation and met the friend of this Mulla. He was duly taken in as a

new cooly, and had a hutment assigned to him in the cooly lines.

He began his new life once again with hope and zest. He told me: "I had to live as a cooly in the cooly lines for some months afterwards. Now, after having been to Rùssia, I am a confirmed communist. Because I know what it means to live the life of a day labourer as a cooly in a capitalistic system of social organisation. Life there was hell. They sweared at us, bullied us, insulted us. We were denied even the most elementary necessities of life." He told me something about it. "Our pay was 50 cents Dutch per day. It meant work from nearly dawn till dusk, with perhaps half an hour's respite. So whatever little time we got we could manage to come and cook our meals. But it was expected that we should have our meals before joining work sometime after six. Of the 50 cents as our daily wages, we had to give from 12 to 15 cents to the headman or the licence-holder who supplied coolies to the establishment. For rice and other eatables and a few groceries, and an occasional *sarong* or loin cloth (*lungi*), we were forced to make our purchases from shops maintained by the owners of the plantation within the cooly lines. There were occasional fines for neglect of work, and abuse and occasional kicks were our daily lot. Our food was of the meagrest kind. It was day after day, only boiled rice and some salt and perhaps a chilly. The day that we could get hold of an onion or a single vegetable was something like a feast-day for us. Still we had to keep body and soul together for this work. When I came to Russia, I could understand what communism promised for the likes of us and what communism was doing for the Russian *Muzhik* or farmer and factory labourer, who was almost like a serf. I have seen with my own eyes the rapid change for the better which transformed, in the Soviet state, social outcasts and neglected specimens of humanity into men with the dignity of man. This was a miracle which

the teachings of Karl Marx as applied by Vladimir Lenin brought to mankind."

He was living in this situation for over a month in that particular rubber plantation. I do not remember whether I heard from him that he had to shift to some other plantations, because things were getting a little risky there, as the British did not give up their search for him. But, nevertheless, it happened that in one such plantation, whether it was the first one or the second or the third one where he had to go, he found that the situation was getting intolerable for him, and that he was losing all hope. He had no news of the war excepting what he heard as rumour in the cooly lines. He could not have anything in common with these coolies who were mostly local people. He also heard that the Germans were latterly getting the worst of it. The Dutch had sympathies with Britain but at the same time they were nearer to the Germans through language and culture and their proximity in Europe.

It happened that in this particular rubber plantation, the Manager was a German, although the proprietors were Dutchmen. He made a desperate resolve. He would come to this German and after surrendering to him tell him everything about himself and place himself entirely at his mercy, and seek his help; and that seemed to be the only way to free himself from the spirit of brooding over the uncertainty of the situation which was filling his mind.

Abaninath had been in Germany for some time before, and he could speak some German. One day in his desperate resolution, while the evening shades were falling and the coolies were in their lines preparing their evening meal, he was walking through the grounds of the plantation near the residence of the manager. He found him walking to his house along the avenue of trees, and he followed him for some time, and came close to him. Then from behind his

back he addressed him by his name in German, and said : "*Herr So-und-so, bitte nur ein Wort*—Mr So and-so, please only one word." When he heard these German words it was for him like a bolt from the blue. It was unthinkable that an ordinary cooly would accost him in a familiar way, and in German too. Then he turned round, and Abaninath was waiting in front of him, almost trembling with excitement.

This German gentleman took a good look at him and then he gave a sort of a smile : "So you are the person whom we are hunting for ! Come along with me." He followed him to his house. This German gentleman made him sit on a chair in his drawing room, closed the door and said. "Now let me hear your story." Abaninath said : "I told him as much as would interest him. Of course, everything about our country would not be understood by this German." He said : "This is the situation : I have just escaped the hangman's noose, and I have been living all these months under a terrible strain. I give myself up to you entirely. The English are your enemies, they are our enemies also. If trying for the freedom of one's country is a crime, then I am a criminal. If you think otherwise, then I hope to receive some consideration from you." This gentleman, who had listened quietly, began to pace up and down the room slowly, perhaps trying to make up his mind. And then he said : "What do you want me to do ?" Abaninath said : "I leave myself entirely in your hands. As you can see, you can save me, or you can send me to the gallows. I want to leave this country and somehow manage to go to Europe, and particularly to Germany."

After a little while this German gentleman opened the door and called for his son. He was a teenager boy, about 17 or 18, and he looked enquiringly at his father and to Abaninath. The father said : "Salute this man. He is a wonderful person, he has been trying to find freedom for his

country, and for that he was condemned to death, and is now being hunted like a wild beast." The young man was bewildered, but nevertheless he gave Abaninath a military salute. His father told him his story. Then they began to discuss among themselves how best he could be removed from Dutch Indies and sent to Europe. They finally decided that he was to be shifted to some other rubber plantation, also as a cooly, and this time from Sumatra to Java, thence to Batavia, the capital of Java (now renamed as Jakarta). The German gentleman, with the help of his Dutch friends, was able to do that quietly, and Abaninath found himself in a plantation in Java. He was waiting in the cooly lines for a chance to get out of the country, and the chance came soon. He was taken and introduced to a Dutch gentleman who was to be his new benefactor, as he had agreed to take him as his personal servant in his voyage from Java to Holland in the same ship.

They prepared a faked passport for Abaninath, and Abaninath had that with him, and he showed it to me in Berlin. I found that it was just a card with usual seals and other writings in Dutch. It was not a regular passport, but an Identity Card which coolies had to carry. There was his photograph on it, and a Muhammadan name was given to him, which was Saaheed or Shaheer, as far as I remember it. His description was "Cooly in a plantation", and by religion a Mohammedan "born in the cooly lines, father's name unknown, working in such and such a plantation". Then they gave him a paper that he was going to Holland as personal servant of Mijnheer or Mr so and-so that year.

He was taken to the passport office for having his papers put in order. Not being a born cooly and a Javanese subject under the Dutch, he did not know how he was to behave as a native cooly in front of European officers. When he

was brought before the Dutch officer who was doing his papers, seated at a table, he was standing in front of him, of course in a respectable attitude. But his friend this German gentleman, came and gave him a kick on his back, and told him angrily in Malay that he ought to behave himself. Did he not know that a cooly was not to stand in front of a Dutch official in an arrogant attitude? He at once took the hint, and knelt down and sat on his haunches, and with his two palms joined he did the Javanese equivalent of the Indian *pranam* or *namaskar* which is called in Javanese *sembah*, and had to speak out something in Malay or Javanese, which Abaninath spoke out to me—I could not get at the words but it sounded like *Engge Djoro*, which as he told me meant "Yes, Master".

After that he was waiting silently for his orders, when the German gentleman and the Dutch persons exchanged a joke amongst themselves in German. Abaninath told me that he understood this joke, and he involuntarily smiled. This was noticed by his German friend, who came and helped him with another kick, telling him not to be impertinent and smile when his superiors were smiling.

After this experience, which evidently had created a deep impression in his mind— otherwise he would not have told me all these in detail – everything was fixed, and Abaninath started on his adventurous journey from Batavia to Rotterdam in that Dutch ship. This long journey was without any incident. But all the while Abaninath had a great fear that while passing through Colombo and Aden, which were British ports, something untoward might happen and he might get caught once again.

When they came to Colombo, Abaninath hid himself in his master's cabin and in the interior of the ship, and did not venture on the decks. His master with other passengers went out to spend some time in the town. They were away for about three or four hours. From the port-hole of his

master's cabin, he saw that, soon after the ship had stopped, some police officers with constables were boarding the steamer. They were on the upper decks, and that made him terribly frightened ; were they coming to arrest him ? He said that he was in mortal fear, and he shut himself in his master's cabin. He knew that his master had kept his pistol within a drawer in the cabin, which was open, He took that pistol out and had it in his hand and then resolved— come what may, they would not be able to take him alive. He would shoot as many as he would be able to, and then shoot himself, and in this frame of mind he was waiting for all these long minutes and hours, as he thought.

After how long he did not remember, he found his master knocking at the door of the cabin. He asked him if they left. His master said. "Open the door ; who have left ?" He said ; "The police who had come." He said, "They have left long ago. They had nothing to do with you. But what has happened to you ? Do you think they came to arrest you ? You look flushed and your eyes are red, and what are you doing with my pistol ?" So it was a great relief to Abaninath and he could only burst into tears, particularly when he heard the ship's engines started working. Of course, the ship did not leave at once. But his master assured him that that was only a routine visit of the lccal Ceylon police. They would come and visit every ship which came to the port and there was no fear for him. So that was a great burden off his mind.

He passed the few days from Ceylon to Aden also in the same sort of fear, in spite of his master's assurances. Nothing happened at Aden, and then in due time through Red Sea, Port Said, the Mediterranean, the Straits of Gibraltar and the Atlantic Ocean, and the Bay of Biscay his ship finally arrived in Rotterdam in Holland.

He had one or two addresses given by his German friend in Rotterdam, and with his meagre belongings he got down from the ship and set his foot on the soil of Holland. It was a moment fraught with tremendous emotion for him. So he was going to live and work for the freedom of his country after all, when he had this miraculous escape ! He said that though he was not a religious man, without let or hindrance tears began to flow from his eyes, and after a few minutes he had to stand and wipe his eyes. At the same time he was anxious that the people did not see him in that emotional frame of mind. Before finding himself to meet people in the addresses given to him, he came to a street by the quayside, and was within his bearings, but all the time his eyes were flooded with tears.

I do not remember the details, but he soon found himself among some friends. By this time he had come to know that everything was not well with the Germans, and the British with the help of America and with all the sacrifices made in the interest of Britain by India and the Indian troops and of course, the French who were fighting most heroically, there was a stalemate in the situation, and, the Germans definitely were heading for defeat. But he found himself among friends, and they made arrangements for him to go from Rotterdam to Berlin. In Holland the German army of occupation evidently was disliked by the people. But nevertheless he could be somehow sent away to Berlin, and as the Russians were getting strong on the eastern side he somehow managed to be bundled into Russia by some Russians who had become his friends by this time.

But he had one little adventure in Rotterdam. While waiting for his next move, to be decided by the German friends, he would be strolling about the city, and one evening he found himself in a small park close to the seaside. He was seated on a bench in the park, and he found that a

motor car had come very close to him, and then three people got down from it. And before he could understand what was happening, they came in big strides, and before he could find out what they were going to do, he found his hands pinioned behind his back, and he was being dragged to the car. He suspected that they were British agents who got hold of him at last and might kidnap and arrest him, which later proved to be true.

He was a tall and strong man, and he tried to shake himself off from them, and gave a series of terrible yells, crying for help. There were some people who were moving in the park, and hearing this they came running to find out what it was, or to help him, and as several people came up, his assailants thought that discretion was the better part of valour and they left him, their task unaccomplished, and they ran back to the car and drove away. When the people who came to his help heard everything they asked him to be particularly careful, as men of the secret service in all these belligerent countries were particularly active, and he was not to stir out unless he had his friends with him. So that was another narrow escape for him, he said.

In Russia he was in Moscow and Leningrad, and he was there during the throes of the Bolshevik Revolution and subsequently in the perpetual fights with the Germans which Russia was waging at that time. That was recent history and I was more anxious to hear about what he did in the circumstances and what part he took in the events of contemporary Russian history. He said that he was able to get the fullest sympathy and support from the Russian revolutionaries who were eager to help countries like India which were anxious to secure their freedom from the stranglehold of Britain.

In fact, most of the peoples of Asia and Africa had their fullest sympathy. He had a number of fellow workers from among the Indian revolutionaries whom he met in Russia.

Most prominent among them were Virendra Nath Chatto-padhyaya, a brother of Mrs. Sarojini Naidu, Manabendra Nath Roy (previously known as Narendra Nath Bhatta-charya) Raja Mahendra Pratap, Maulvi Barkatullah, Dr. Bhupendra Nath Dutta (a younger brother of Swami Vivekananda) and Pramatha Nath Dutt (of Sukias Street, Calcutta, an old neighbour of Abaninath and myself in Calcutta, who had taken up in Iran a Muslim name, *Daud Ali*, and was engaged as a teacher of Indian languages, Urdu, Hindi and Bengali and Sanskrit and Persian, and had ultimately got a post in Leningrad Public Library).

What Abaninath did after he reached Russia is part of both Russian as well as Indian history. When I met him in Berlin, I found that he was cherishing a great hope that he would be able to come to India once again, and take up the broken threads of his work and fight for India's freedom along the lines which formed his main preoccupation. He would eagerly want to know from me what chances were there still of the revolutionary, and if necessary, terroristic work.

At that time, in 1922, India was under the influence of Mahatma Gandhi and his non-violent non-cooperation movement, and Mahatma Gandhi was openly against the principles and practices of the revolutionaries. He condemned violence of any sort, even if it meant total destruction. physical and otherwise, of those who were suffering under political oppression. I tried to make it clear to him that he had very little chance of getting even a hearing, because the younger generation were not in favour of his creed—their minds were being oriented towards a different set of ideas ; and he would have to feel baffled, and at every step he would find frustration. But he did not believe me, and he thought that things were exactly what they were ten years before.

I finished my three-years stay in Europe in the two

Universities of London and Paris, and after a tour of Italy, Greece and Germany I returned to Calcutta during the fourth week of November 1922. Immediately I rejoined my post in the University of Calcutta, and now I was the Khaira Professor of Indian Linguistics and Phonetics, besides continuing to be, as before, Lecturer in the Department of English. I began my work with great zeal, and although I remembered Abaninath and my sojourn in Germany quite well, there was no occasion, however, to think about these matters seriously.

It was possibly just after Christmas the same year, in December 1922, that one evening when I came back home at about 9 o'clock from a meeting, my elder brother told me that there were three men who came to see me, and they were rather mysterious-looking people. Two of them were Europeans, and they spoke a few words of English in a foreign accent. The third man was a tall and hefty chap, rather dark in colour, and he seemed to be an African person. I could not exactly make out who these people might be. But I was told that they said that they would come the next evening also, and I was to wait for them.

Next evening only one person called. I could not immediately recognise him, because it was dark. But I took him into our drawing room, and at once found out that it was Abaninath. I was quite astonished, one might say dumbfounded, to find him back in India. It was certainly serious—most dangerous for him, with a price on his head. So I said, "Well, you did not listen to my views. But how did you come, and when ?" He said that he managed to get in touch with the crew of a German boat, who were all communists, and through their help he managed to have this long voyage as a stow-away. They found a place for him in some of the cellars where they kept their coal for the ship, and he could only move about a little bit in the dead of the night, and he used to find his food there. It was most uncomfortable

living like that, but he came nevertheless with the idea of carrying on the fight burning in his heart.

It was also risky, coming from the ship (where he was still in hiding) to the shore and to get back there once again. He must find an abode in Calcutta, and above all he must contact some of his old friends, or at least some of the new recruits to his political party. Either of these was a very difficult proposition for me to solve. I thought I must consult some friends, who knew Abaninath and knew his past history ond his future plans, understood him, and would be able to help him. The only person whom I could think of at that time was Dilip Kumar Roy who later became an inmate of Sri Aurobindo's *Ashram* at Pondicherry. He was a close friend of Subhas Chandra Bose and several other nationalist leaders, and he himself was a staunch nationalist, although he was being more and more drawn to religion and mysticism. I also remembered that a great friend of his was Professor Satyendranath Bose, now a National Professor of India in Physics....

I thought I could take Satyendranath Bose into confidence. So I asked Abaninath to come and see me the next day towards the afternoon, and I thought I must exert myself to find some way out. I managed to see Satyen at his residence and told him about the case of Abaninath, and I said that he must come with me to Dilip's place, and there we should take Abaninath and jointly discuss what to do. Dilip Roy, as I knew, had come back to India, I think, just a couple of months before me, and he was *au courant* with what was happening among some of the revolutionaries in the continent in Europe; and Satyen and Dilip being good friends they would put their heads together to help Abaninath out.

The next day Abaninath came to me in the afternoon and and Satyen was there, and Abaninath, Satyen and myself went to Dilip's place....At that time,....I think he was

stopping with his maternal uncle— Dr. Jitendra Nath Mazumdar.....

We did not have anything to do with Dr Mazumdar. But Dilip, Satyen and myself as well as Abani had a little serious consultation at a corner of the room, and we came to a plan of action. I wanted them, if they could, to find out the names of some persons who belonged to the *Anushilan Samiti*, the revolutionary nationalist party, which would certainly offered to take Abani immediately to some of the Samiti people whom he knew, and do something for him right then ; and that was beyond my power to do. So we started from Dilip's uncle's place. I returned to my house, and Satyen took Abani to the *Anushilan Samiti* gentleman who would be able to look after him.

His problem was solved for the moment and I thought it would be quite all right for him, at least for the time. Then, after a short while, Satyen returned to Dacca, and I did not see or hear anything of Abani for some weeks. After about a month and a half—but I am not sure about the time--Abani called at my place one evening. He seemed to be quite a broken man, and he was quite desperate. He was almost in tears—he said he was moving about trying to meet his old associates or to find younger people who had taken up the task—revolutionary activities for the freedom of India.

He said that people at that time mostly had "new faces and other minds", and they were also, some of them suspicious ; and that was the thing which had cut him to the quick, that, after all his trials and sufferings, this was the least he expected among his own people. So I did not know again the remedy. He said that he had decided to return to Germany and Russia as quickly as possible because he would not be able to do anything, and as days passed, his difficulties would grow more and more. So the problem with him was how he could make his exit from this country.

In the first instance he needed some money, and for that the only source he could think of was his brothers. As a son of the house he was entitled to a part of what his father had left for the brothers, and on the basis of that he wanted few hundred rupees, to start with. I thought I should make him meet his brothers ; and I sent word to Abani's younger brother Tapatinath, who was living in the old family house near my own (Abani's father had passed away in 1915). I had forgotten this fact when thinking over the whole story. But of the two brothers living in India at the time Kshitinath the brother next to Abani, was not in Calcutta at the time—he had gone to America, and the youngest brother, Tapatinath, alone was in Calcutta.

I managed to bring Tapatinath to my house next day in the evening when Abaninath also came, and there was a touching meeting. The two brothers talked, and, of course, I had told Tapatinath that he must arrange for some money for his brother. Tapatinath was a very devoted brother and had a great heart, and he said that he would try his very best. I knew from him that he had no money ready, but he was willing to mortgage his family residence to find money for Abaninath For this purpose I took him to the firm of an Attorney friend of mine who was a noted attorney doing business with a partner under the title of Messrs Pal and Roy (both the partners are now dead). With them Tapatinath had a discussion about this matter, and the Attorneys told him that he could be accommodated with the sum he wanted if he mortgaged the papers relating to the family property.

I do not know what finally came out of it. But I know this episode and Tapatinath himself reminded me of the whole matter a short while ago. When I met him after thirty years and talked about his brother. The brothers met, and I thought unless I was called again I had nothing more to do. I only told Abaninath that after he managed to

reach Germany and Russia alive, while he need not write to me, he might send me a Russian book ; and I would understand. This he did.

This was all that I knew at the time in 1923—it was about Abaninath and his dare-devil misadventure in India. Then I had some news—through whom I do dot remember—that he was well in Russia and he was also moving between Russia and Berlin occasionally, and he wanted badly some money, and I was to procure it from his brothers. At that time Kshitinath, the third brother, had come back from America, and I met Kshitinath at his residence and asked him to find some money for his brother who was in a difficult situation—what it was I never knew.

Kshitinath told me to write to his brother that he would certainly get whatever his share of the family patrimony was for him. But the younger brothers had spent almost everything, and they were using it as their own property. Kshitinath made an abject apology to be conveyed to his brother. He said : "As younger brothers, they were just like his children. Since they thought he was not coming back, they were using his share of the money also. But he and Tapatinath would be trying their best to find some money and send something to Abaninath."

This was done in this way. I came to know, after Abani's wishes were communicated to me about his necessity to get some funds, that Satyendranath Bose, as a most distinguished Indian scientist, was once again going to Europe—not for any university degree or recognition, but for doing some original work with some of the top-ranking scientists, like the Curies in France and Albert Einstein in Germany. So I told him that if I got some money from the brothers of Abaninath, I would send that money to him in his address in Germany, and this was to be the code to tell him the purpose of the money—I would write to him that this money which I was sending to him was to buy for me

some Sanskrit books. He would then understand, and pass this money to Abaninath. His brothers gave me about Rs. 300 and they knew that I was sending it to him through Satyen Bose. This money reached him all right.

Then I got further news from Abaninath in Russia. He graduated from the Institute of Red Professors in 1928, and became a Senior Learned Specialist in the Institute of Oriental Studies under Prof. H. Oldenberg, for two years, 1930-32. He was employed, as I heard, as a lecturer in Moscow University on Indian Economics and Indian History, and he then published a couple of books in Russian, one jointly with Manabendra Nath Roy. The other book was also in Russian which was based on William Digby's famous book *Prosperous British India*. These two books were quite substantial volumes and had for many years a corner in my library where I could spot them immediately when I wanted these two books.

We had heard during the closing phases of the First World War that Lord Curzon, former Viceroy of India, was accusing the Russians for trying to damage British interests in India by sending as their emissaries, to stir up trouble in Afghanistan and India, men like Abaninath Mukherjee, Maulvi Barkatulla, and Raja Mahendra Pratap to Kabul. We did know much about the "other misdeeds" of these three sons of India who had found asylum in Russia. But we were all thrilled about it, and wished them all success on behalf of India. Then subsequently I heard that Abaninath had some rift with the ruling party in Soviet Russia and had even to go to jail. But all these later on cleared off: and then I lost all trace of him.

This was all that I came to know about Abaninath and about all that momentous time when he was in Sumatra and Java working as a cooly, with the hangman's rope swinging in front of him.

In the above narration, as I have found recently after

consulting Tapatinath and one or two other friends, that there were some lacunae and my memory had become hazy about some events. In order to get the whole story, one must piece all incidents together from the statements as made above and from what Prof. Satyen Bose and Tapatinath and other friends had to say. Thus, for example. about Abaninath's relations with the other Indian freedom-fighters, who were under Russian umbrage flying from the vengeance of the British Government will enable us to know about many details. We were told also that there was a Muslim gentleman who posed as a revolutionary and was a Barrister, who informed the British Government that Satyendranath Bose knew Abaninath and therefore he should not be looked upon as *persona grata* by the British Government. This was when Satyendranath went to Europe after Abaninath had returned there.

It is said that Dr. Hartog, who was an Englishman and the first Vice-Chancellor of the newly created Dacca University, where Satyendranath was employed as Professor, was asked to give a confidential report of Satyendranath's doings in Europe. At that time Satyendranath Bose was in Paris working with the Curies in the Sorborne, and Dr. Hartog, who was a Jewish gentleman himself, got from Sylvain Levi, another scholar who was one of the great authorities on Sanskrit and Indology in France and Europe, a most glowing account of Satyendranath that he was a pride for India, being one of the finest scholars who came out to Europe from India. Dr. Hartog's report based on Professor Sylvain Levi's opinion removed the stigma of suspicion from the mind of the bosses in the British Government with regard to Satyendranath.

From Tapatinath I heard that after he had met me for the second time and met his brother in their house, and got whatever money Tapatinath would scrape for him, that Abaninath asked Tapatinath to accompany him to the

Punjab. In Punjab something was happening which the outside world did not know. The Maharaja of Nabha, Ripudaman Singh, was forced to abdicate his *gaddi* because the British had suspicions about his loyalty. In this matter, the Maharaja of Patiala's name had been heard, and he and the Maharaja of Patiala (who was in the good books of the British) were quite ininmical to each other. Tapatinath told me that his brother had quite a mass of papers and documents with him, and he went to Nabha and met the Maharaja and some other people behind closed doors. Even Tapatinath did not have any access there, but he had to wait outside. After his meetings with some prominent people in Nabha, Abaninath seemed to feel quite satisfied and told his brother Tapatinath that he was quite happy with the result of his visit and of this interview. He evidently also got some money.

I heard also from Tapatinath that after that they came to Delhi, the two brothers stopped at different hotels, and from Delhi Abaninath came down to Madras; and then from Madras by sea he went to Colombo, and from Colombo with a passport (which he was able to secure in Delhi) he could go to London. He went to London as an agent or manager of an Indian Muslim gentleman who had dealings with the Indian nationalists, and this Muslim gentleman who was a businessman had a stall in the International Olympic Exhibition which was being held in London at the time. Abaninath went out with as assumed Muslim name in his passport. In this way he could go to Europe, and finally he found his way back to Russia. This is what seems to have actually happend, enabling him to return to Russia after coming to India and meeting me in Calcutta in 1922-23.

Satyendranath did not know all these happenings and from him I heard, when Abaninath was in Dacca, he was living almost in hiding in a house which was run by the *Anushilan Samiti*. There he found some Indians back from

Russia who had different political views from his—belonging to different political groups within the same Communist party: and they did not have any love for each other. Manabendra Nath Roy, quite distinguished as a writer in the Soviet camp and an important personage during the time of Lenin, and Abaninath did not like each other. In his own *Memoirs* Manabendra Nath Roy has a whole chapter devoted to Abaninath, the chapter being headed "An Embarrassing Associate".

To find out what exactly happened to Abaninath when he came to India, it would be throwing a most welcome light on a most important but very obscure episode in his life. It can only be done by careful research into the happenings in India. and by piecing together bits of information from persons who were in touch with Abaninath. The little that I came to know has been expressed above, and many friends in Russia (which I visited five times) and also in India have been pressing upon me to write it out for whatever it is worth.

I had heard from Abaninath, in Germany (as far as I remember), that he had married a Russian lady, and he had a son, who was named *Gorà* after the hero of Rabindranath Tagore's novel of the same name. Both Maulavi Barkatullah and Raja Sri Mahendra Pratap, among others, were present at the name-giving ceremony in Moscow.

In a recently published book in Bengali, giving in two volumes and in great detail the doings of the Indian freedom fighters by one of them, Sri Ganga Narayan Chandra (*Avismaraniya* or "unforgettable", second edition in two volumes, Calcutta 1969, available at "Manisha" Bookshop, 4/3 Bankim Chatterji Street, Calcutta), there is a resume of the political doings and career in the Soviet Union and in India of Abaninath Mukherji (Vol I of *Avismaraniya*, pp 118-125). It is fairly detailed, but very succint, and evidently from hearsay, as in its account of his escape from Singapore

to Sumatra, his life there, and final escape to Holland for Java (I have given it as I heard it. myself from his mouth). Ganga Narayan Chandra's account is very valuable. He says in it that before the Second World War, Abaninath, along with Virendranath Chattopadhyay and several others, was executed by the Soviet Government on the suspicion that they were Trotskyites (p. 124 of Chandra's books). I myself could not check up this statement.

Chandra has given the name of Abaninath's wife—she was Miss Rosa Solemona Fittingoff, who was an assistant to Mm. Sydia Fotyeva, a secretary of Lenin. Abaninath and Rosa had two children—the son Gora, who was killed fighting for Russia during the Second World War, and the daughter Maya, who is now a distinguished specialist doctor for tuberculosis in Leningrad. In Chandra's book are to be found also good portraits of Abaninath and his wife. Chandra's books so far has sought to give the most detailed account of Abaninath, and it would appear to have successfully vindicated Abaninath from the adverse comments made against him by his political opponents from India.

I am thankful to Sri Chinmohan Sehanavis for his help, in enabling me to pay a debt of love, and to redeem a promise I made to myself in 1922 in Berlin. It is thus after fifty years when I had contacted Abaninath in a foreign country (in Berlin) in 1922, that with fragments of the story I heard from his own mouth which have still remained in my mind, I have been able to set down the above narration. And this I do with a sincere tribute to the sacred memory of a great soul— a true patriot, a lover of suppressed and oppressed humanity, a man of cool courage and reckless contempt of death, and withal a good son and brother, and a friend who drew the admiration and affection of all.

১২

দ্রষ্টব্য ॥ পৃ. ১৮৫

অবনীনাথের মতো নলিনী গুপ্ত সম্পর্কেও মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন যে তিনিও নাকি ছিলেন 'বিপ্লবী হিসাবে ভুঁইফোঁড়। আগে তাঁরা যে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী পার্টিতে ছিলেন এমন কোনো প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে না' ('আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পৃ. ২৪২)। এ-প্রসঙ্গে অবনীনাথের কথা আগেই লিখেছি। এখানে নলিনী গুপ্ত সম্পর্কে কয়েকটা কথা বলব।

'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত "শ্রীঅরবিন্দ এ্যাক্রয়েড ঘোষ" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্র অরবিন্দ আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা থেকে ছাড়া পাওয়ার পরবর্তী ঘটনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "৩০শে আশ্বিন বঙ্গব্যবচ্ছেদ দিবস ও রাখীবন্ধন দিবস আসিয়া পড়িল, উহা উদ্যাপনের কোন সাড়াশব্দ নাই। অরবিন্দের নিকট এই কথা বলিলে তখনও যে কয়েকজন এ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির সভ্য ছিলেন ও সোসাইটির গৃহে বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে অরবিন্দ উক্ত দিবসে সভা করিয়া প্রতিবাদ জানাইবার নির্দেশ দিলেন। সোসাইটির অন্যতম কর্মী বন্ধুবর শ্রীনলিনী গুপ্তকে প্রত্যেক মেস ও হোস্টেলে যাইয়া যুবকদিগকে এই কার্যে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করিতে বলিলেন।...

"এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, এ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির সদস্যগণের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হইলেও তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন পৃথিবীর নানাস্থানে যাইয়া ভারতের মুক্তির চেষ্টা করিয়াছেন; অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ও বিদেশী রাজ্যের সাহায্য গ্রহণেরও চেষ্টা করিয়াছেন। নলিনীবাবু লুকাইয়া য়ুরোপে গমন করেন ও তথা হইতে রাশিয়ায় যান। কয়েক বৎসর পরে সে স্থান হইতে লুকাইয়া এ-দেশে আসিয়াছিলেন। অপর কর্মী স্বর্গীয় হেরম্ব গুপ্ত চীন জাপান ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যাইয়া নানাভাবে মুক্তির চেষ্টা করেন। বৃটিশের দীর্ঘ হস্ত ঐ সকল রাজ্যেও প্রসারিত হইয়া তাঁহাকে ধৃত ও নিপীড়ন করিতে চেষ্টা করে। অপর কর্মী শ্রীঅবনী মুখার্জিও এইরূপ কার্যে নিযুক্ত থাকেন। এখন তিনি সোভিয়েত রাজ্যে আছেন" ('মাসিক বসুমতী', চৈত্র ১৩৫৮)।

এর থেকে বোঝা যায় যে নলিনী গুপ্ত রাজনীতি ক্ষেত্রে মোটেই ভুঁইফোঁড় হিসেবে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করেন নি ১৯২২ সালে—'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র সভ্য হিসেবে তিনি ছাত্র ও যুব-আন্দোলনের সক্রিয় সংগঠকের কাজ করেছিলেন স্বদেশী যুগেই আর তার জোরেই আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলেন স্বয়ং অরবিন্দের। রাশিয়া থেকে গোপনে তিনি যখন এ দেশে ফেরেন তখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল কি না, আমার এ-প্রশ্নের জবাবে সুকুমারবাবু জানালেন 'হয়েছিল। শুধু তাই নয় তিনি প্রস্তাব করেছিলেন "সঞ্জীবনী" পত্রিকাটিকে ঢেলে কমিউনিস্ট রূপে সাজানোর—এমন কি তার জন্য তিনি টাকা খরচ করতেও রাজী ছিলেন'। সুকুমারবাবু অবশ্য রাজী হন নি সে প্রস্তাবে।

'অনুশীলন সমিতি'র প্রবীণ নেতা, শ্রীযুক্ত নলিনীকিশোর গুহও আমাকে বলেন: 'নলিনীগুপ্ত অনুশীলন সমিতির পাঁচ ছ'শো শাখার কোনটির সভ্য ছিলেন কি না বলতে পারি না। হয়তো দীক্ষাগ্রহণ করে সভ্য হন নি। কিন্তু তখনকার দিনে দীক্ষিত না হয়েও বহু তরুণ জড়িত হতেন বিপ্লবী কাজকর্মে। সম্ভবত নলিনী গুপ্ত ছিলেন তাঁদেরই একজন। পরে তিনি যখন রাশিয়া থেকে গোপনে দেশে ফিরে আসেন তখন বিপ্লবী হিসেবেই তাঁকে অনুশীলন সমিতি আশ্রয় দিয়েছিলেন তাঁদের ঢাকার এক আস্তানায়।'

নলিনী গুপ্ত সম্পর্কে ঢাকার গোপাল বসাক তাঁর মৃত্যুর মাসখানেক আগে "The face of Nalini Gupta that I did not see" নামে আমার কাছে একটি প্রবন্ধ পাঠান 'কালান্তরে'র একটি বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য। দুঃখের বিষয় প্রবন্ধটি দেরিতে পাওয়ার জন্য তখন ছাপা যায় নি। পরে শ্রীগৌতম চট্টোপাধ্যায় ঐ লেখাটি আমার কাছ থেকে নিয়ে প্রকাশ করেছেন তাঁর *Communism and Bengal's Freedom Movement* বইয়ে, পরিশিষ্ট হিসেবে (পৃ. ১৫৭-৬২)।

দ্রষ্টব্য ॥ পৃ. ২০৬

'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কমিটি' তুলে দেওয়ার এই প্রস্তাবটি পেয়েছি জাতীয় মহাফেজখানায় সংরক্ষিত German Foreign Ministry Archives-এর ৪০২ নং মাইক্রো-ফিল্ম রীলে —গ্রন্থকার।

B. N. DATTA ON RESOLUTION ON LIQUIDATION OF I. I. C.

INDIAN INDEPENDENCE COMMITTEE

Berlin, 6th December 1918

To

Herrn Geheimrat Rhomberg,

Auswartiges Amt

Berlin

We have the honour to bring to your notice that the following resolution was passed today at the Committee's setting.

"Proposed, resolved and passed unanimously in the meeting of the Indian Independence Committee held on this day, the 6th of December 1918, in the Bureau of the Committee, that the said Indian Independence Committee be dissolved. The Indian Independence Committee has however neither any connection with nor any claim upon either the Indianhe Gesellschaft or Europaisches Zentralkomitee der Indischen National-

isten which, in English, is named 'The Indian Nationalists' European Central Committee.' All political and financial connections of the I.I.C. with the other two Committees mentioned above ceases, from this day, the 6th of December of 1918, to exist.

sd. M. N. Kaul, L. P. Verma, M. Acharya
B. N. Datta, S. D. Singh, K. K. Nayek,
A. Chaudhri, V. Joshi and R K. Latta."

B. N. Datta

নির্দেশপঞ্জী

াক্টারলোনি মনুমেণ্ট ৫, ২৮০
অক্টোবর-বিপ্লব ৭৫, ৭৯, ৮৩, ১২০, ১২৯, ১৩৮, ২৪৪, ২৪৭, ২৯৪, ২৯৬, ৩১৩
অক্ষয়কুমার দত্ত ৬
অক্সফোর্ড ২৮, ২৪৬, ২৬৭, ২৭২
অক্সাস (আমুদরিয়া) ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৯
অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ৬১, ৬৩
অজিত সিং (সর্দার) ৩১, ৪৯
অজেয় বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাঃ) ২৪৬
অদ্বৈত আশ্রম ১৯
অধরচন্দ্র লস্কর ২১৯
অধিকারী, গঙ্গাধর— গঙ্গাধর অধিকারী দ্রষ্টব্য
অনুশীলন সমিতি ৬৩, ১৭৩, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৮, ১৯৩, ২৪৭, ২৫৯, ২৬০, ২৬২, ৩৭৬
—কলিকাতা ১১৩, ১৮৬, ১৮৮, ৩২৪
অন্ধ্র ২৮৯, ৩১৪
অপূর্বকুমার ঘোষ (এথেনেসিয়াস) ২৫৮-২৬১
'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস' ২৫, ৪৪, ৪৬, ৫৯, ৬৭, ৬৮, ৭২, ৮০, ৮৫, ৮৭, ৮৮, ১০২, ১১৫, ১৪৭, ১৮৫, ১৯২, ১৯৫, ২০৬, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১৩, ২১৫, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৮, ২৩২, ৩১৮, ৩২১, ৩২২, ৩২৩
অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় ৯৯, ১০৪, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১২৩, ১২৪, ১২৭, ১৪৬, ১৪৭, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০-১৯৭, ১৯৮, ২০৭, ২০৮, ২১৩, ২২৩, ২২৫, ২৩০, ২৪১, ২৪৩, ২৪৮, ২৬৩, ৩১৪, ৩২১, ৩৭৫
অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য (ডাঃ) ৩৩, ৩৪, ৩৯, ৪৯, ৫০, ৫৪, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৭০, ২৮৫, ২৮৬
অভয়চরণ দাশ ১৪, ১৫
'অভিজাত শ্রমিক' ৫৪
অভিনব ভারত সংঘ ৩৮, ৪১, ৬১
অমিতা রায় ১৩৮, ১৬৩, ১৮০, ১৮১, ১৯৭
'অমৃতবাজার পত্রিকা' ১১, ১৭, ১৮, ২১, ২২৬
অমৃতলাল হাজরা (শশাঙ্ক) ১৮৫
অমৃতসর ২২৮, ২৩৩
অম্বাপ্রসাদ (সুফী) ৬৫, ২২০
অম্বিকাচরণ মজুমদার ২০১
অযোধ্যা ২৪৮
অরবিন্দ ঘোষ ১৮, ১৯, ২৩, ২৪, ২৭, ৭১, ২০১, ৩১৯, ৩৭৫, ৩৭৬
অরুণ বসু ২৪৭
অলগা ৩১৩
অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫৮, ২৫৯, ২৬১, ২৬২
'অসকার' (গুজরাট) ২৩৬
অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার (কাবুল) ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৯৮, ৯৯, ১০৩, ১০৫, ১০৬, ১১০, ১১৩, ২৪৭
অস্ট্রিয়া ১০১
অস্ট্রিয়ান ৩০৭
অস্ট্রেলিয়া ১০, ৫৬, ২৬৮

অ্যাংগ্লো-জার্মান শক্তি ৭০, ৭১
অ্যাণ্ড্রুজ, সি. এফ. ২৯০
অ্যানি বেসাণ্ট ২৮৯
'অ্যাণ্টি-সার্কুলার সোসাইটি' ৩৭৫, ৩৭৬
'অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ান ইন সেণ্ট্রাল ইউরোপ' ২৪০
'অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্টস ইন ইউরোপ' ২৪০

আইনস্টাইন ২৪০
আইরিশ ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৯, ৪৯, ৬১, ৬৩, ৭৯
আইরিশ-আমেরিকান জাতীয়তাবাদী ৯৫
আউংগ সান ৬৯
আকবর খান, মহম্মদ ১১২, ১৩৯, ১৪২, ১৪৯, ১৫০, ১৫২
আকবর জান, মুহম্মদ ১৪৩, ১৪৫
আকবর শাহ্, মিঞা ১৩৯, ১৫২, ১৬৭, ২০২
আকালী ২৩৩
আগনেস স্মেডলি ২০৮-২১১, ২১৩, ২২৪
আগাশে (মহম্মদ আলী) ৬৫, ২২০
'আগুয়ান নীতি' ('Forward Policy') ১১৮
আগ্রা জেল ২৫৮
'আচ্কভ' ২৩৭, ৩১৬, ৩১৭
আচ্ছার সিং ছিনা (অমৃতসর) ২৩৬
আজাদ হিন্দ ফৌজ ৬৫, ২৯১, ৩০৭
—সরকার ২৯১
'আজাদ হিন্দুস্থান আখ্‌বর' ১১২, ১২৩, ১২৮
আজীজ আহম্মদ ২০২, ২০৬
'আঠারো জন কমিউনিস্টের বিবৃতি' ১৫
আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (জাতীয়) ৫৫, ৫৭, ৬২, ৭৮-৮১, ৯৬, ১২১
আনন্দমোহন পাল ২৬২
আনন্দরাও যোশী ২২১
আনাটোলিয়া ১৩০, ১৪০, ১৪২
আনোয়ার পাশা ১৪৩, ১৪৭
আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন ১৭১, ১৭৮, ২৪০
আন্তর্জাতিক কানুন ২৭৫, ২৭৭
আন্তর্জাতিক গান— 'ইণ্টারন্যাশনাল' দ্রষ্টব্য
আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন ৫৯
আন্তর্জাতিক প্রচার সংসদ ১২১
আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলন ৪১
আন্দামান ৩৯
আন্দিজান ১২০, ১৪৮
আফগান ৯২, ১৪১, ১৪৩, ১৬০
আফগানিস্তান ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭৬, ৭৮, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৯, ৯০, ৯২-৯৭, ৯৯, ১০২, ১১৮, ১২৭, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, ১৪৫, ১৫৫, ১৫৮, ১৬৩, ১৬৬, ২০৭, ২৩০, ২৩৭, ৩১২, ৩১৫, ৩১৬, ৩২৫
আফ্রিকা ৫১, ৫৬, ৭৬, ২৩১, ২৩৬
—দক্ষিণ ৫৬, ২৬৮
আফ্রিকান ২৭৭
আবদুর রব (পেশোয়ারী) ৯০, ৯১, ১০১, ১০৯, ১১১, ১১৭, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৪, ১৩৯, ১৪০, ১৪৭, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ১৯৮, ১৯৯, ২০১, ২০২, ২০৯

আবদুর রশীদ ৩১২
আবদুর রহমান ৩১২
আবদুর (আবদুল) রহিম আনোয়ারী ১৪৩, ১৫৬, ১৫৭, ২০২
আবদুর রাজ্জাক খান ১৭৩, ১৭৮
'আবদুল' ১৪৭
আবদুল আজীজ ১৩০, ২০২, ২০৬
আবদুল ওয়াহেদ ২০৮, ২১০, ২১৩, ৩২০, ৩২৩
আবদুল করিম ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬২
আবদুল কাইয়ুম ১৬২
আবদুল কাদির ৩১২
আবদুল কাদির খান (সেহ্রাই) ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৬৭, ২০২, ২০৩
আবদুল বারী ৩১২
আবদুল মজিদ (কোহাট) ১০৯-১১২, ২০২, ৩১২
আবদুল মালিক ৩১২
আবদুল লতিফ ৩১২
আবদুল হামীদ (মাস্টার) ২০২, ২০৬, ৩১২, ৩১৫
আবদুল্লা ১৩০
আবদুল্লা আনসারী, মহম্মদ ৮৯, ৯০
আবদুল্লা খান ১৪৯
আবদুল্লা সফদর ১৪৩, ২০২, ২০৫
আবিসিনিয়া ২৯
আমস্টার্ডাম ২৫, ৫৫
'আমাদের পতাকা' ২৮৪, ২৮৯
আমানুল্লাহ্ আমীর ৯৬, ১৩৫, ১৩৭, ১৫৮
'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' ১০৫, ১০৯, ১১১, ১১৭, ১২৪, ১৩১, ১৩৮, ১৪৯, ১৫৮, ১৭০-১৭৪, ১৭৯, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৭, ১৮৯, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৬, ২০৮, ২১২, ২১৯, ২২৪-২২৭, ৩১২, ৩৭৫
'আমার দেখা বিপ্লব ও বিপ্লবী' ১৮৬
'আমীন' ৩১৬, ৩১৭
আমীর ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১১৯
—তন্ত্র ১১৮
আমীর হায়দর খান ২৪৭
আমুদরিয়া— অক্সাস দ্রষ্টব্য
আমেরিকা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) ১০, ২২, ৫৬, ৬৪, ৬৭, ৭১, ৯৫, ১০০, ১০১, ১১৪, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২৮, ২৩০-২৩৩, ২৪৭, ৩১৪, ৩১৯, ৩২০, ৩২৪, ৩৭৫
আয়ারল্যাণ্ড ১৫, ২৬, ২৭, ৭৯
আরব ১২৬
আরল হ্রদ ১২৯
আর্নেস্ট বেলফোর্ট ব্যাক্স ১৭
আর্মস্ট্রং, জে. ই. ১৭৮
আর্মানী (আর্মেনিয়ান) ১২৬, ১২৭
আর্য সমাজ ২৯
আলজিরিয়া ৩২৭
আলিপুর জেল ২৬১
আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা ২৯, ৩৯, ৪৩, ৩৭৫
আলি শাহ্ ২২৭
আলেক্সিয়েভ ২৬৩
আল্লাহ্ নওয়াজ ৩১২
আশ্কাবাদ ১২৯, ১৩০
আশরফ, কে. এম. ২৪৬
আশুতোষ চৌধুরী, স্যার ২৮২, ২৮৪
আসানসোল ২৬২
আস্ত্রাখান ১২০
আহ্মদ, জেড. এ. ২৪৬

আহ্‌মদ হাদি ৮৪, ৮৭
আহ্‌মেদাবাদ ১৭৯, ২২৫

ইউনিৎস্কাইয়া, আর. ২১৪, ২১৬
ইউনিয়ন জ্যাক ৫, ২৮০, ২৮৯
ইংলণ্ড ২৮, ৩১, ৩৬, ৩৮, ৪৬, ৫৮, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৯৪, ৯৬, ২০১, ২৩৯, ২৪৪, ২৬৮, ২৭৪, ২৭৬, ২৯৩
ইকবাল সইদাই ১৫০, ১৫১, ২২৮
ইকবাল সিং ধাদিয়াল (জলন্ধর) ২৩৬
ইগর দাউদোভিচ দত্ত ১৫২, ৩২৬
'ইজভেস্তিযা' ৮৫, ৮৭, ৯০, ৯২
—তুর্কসিকা' ১১৭, ১২৩
ইজিপ্ট— মিশর দ্রষ্টব্য
ইজিপ্সিয়ান— মিশরী দ্রষ্টব্য
ইটালি ২৯, ১০৯
ইটালীয় (বা ইটালীয়ান) ১৫৯, ১৬০, ১৬২, ২৭১
'ইনকিলাবি কে শরগুদাস্ত' ২২৮
'ইনপ্রেকর' (বা 'ইন্টারন্যাশানাল প্রেস করেস্পণ্ডেন্স') ৪৪, ১১১, ২৪২, ২৪৫
ইনস্টিউট অফ ওরিয়েন্টোলজি— ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট দ্রষ্টব্য
'ইনস্টিটিউট অফ মার্কসিজম-লেনিনিজম' ৮৪, ১২৪, ১২৫, ২০১, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২২৩, ২২৬, ২৩৩
ইনস্টিটিউট অফ রেড প্রফেসার্স ১৭২, ১৮১, ১৮২, ২০৫
'ইন্টারন্যাশানাল' (প্রথম আন্তর্জাতিক অর্থে) ১৩
'ইন্টারন্যাশানাল' (গান) ১০৫, ১৫৭
ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট লেবার পার্টি ২৪৪, ২৫৮
—ভারতীয় কমিটি ২৪০
ইণ্ডিয়া অফিস ২৩০, ৩২৪
ইণ্ডিয়া হাউস (তাসখন্দ) ১৪৭
ইণ্ডিয়া হাউস (লণ্ডন) ৩০, ৩১, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৫, ৫০, ৬১, ২৭২, ২৭৩, ২৮৮
'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স কমিটি'— 'বার্লিন কমিটি' দ্রষ্টব্য
ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পার্টি ৯৯,
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (এডিনবরা) ২৪০
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ('কলিকাতা') ২৮২
ইণ্ডিয়ান কমিটি ফর রাশিয়ান ফেমিন রিলিফ ৯৯
ইণ্ডিয়ান মজলিস (অক্সফোর্ড) ২৩৯
'ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট' ৩৭, ৪৬, ৪৭, ৬১
ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি— হোমরুল সোসাইটি দ্রষ্টব্য
ইন্দিরা দেবী ১৭
ইন্দুলাল যাজ্ঞিক ৩৪, ৪০
'ইন্দুস্কি কুর্স' (বা 'ইণ্ডিয়ান মিলিটারি স্কুল') ১৫০
ইন্দোচীন ২৩৯, ৩২৪
ইন্দোনেশিয়া ১৭০, ১৮৮, ২০৩, ২৩৯, ২৪০, ২৪২
ইন্দোর ১১৯
ইন্দো-সুইস ট্রেডিং কোম্পানি ৩২৪
ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ২৪৭
ইফতিখার উদ্দীন (মিঞা) ২৪৬
ইব্রাহিম ৯১, ৯৩
'ইমরোজ' ২২৮

ইমানুয়েল (দ্বিতীয়) ৪২
ইয়াল্টা (বা য়ালতা) ৩২৬
ইয়োরোপ ১০, ১৩, ২৫, ২৯, ৩৩, ৩৫, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫৩, ৫৬, ৫৮, ১০৭, ১০৮, ১১১, ১১৪, ২১৬, ২২১, ২৩৮, ২৬৭, ৩১৬, ৩১৭, ৩৭৫
'ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা' ৩৩, ৩৪, ৩৯, ৪৯, ৫৪, ৬১, ৭০, ২৮৫
ইরান ৬৫, ৬৮, ৭৮, ১০৪, ১২৭, ১২৯-৩২, ২১০, ২২০, ২২১, ২২২, ২৩৭, ৩২২, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৭, ৩২৯, ৩৩১
ইরানী ১২৬, ১২৭, ১৩০, ১৩১, ১৫৯, ২২০, ২২১, ২৬৪, ৩২০
ইরানী পার্টি ১৬৪
'ইশ্‌ত্রাকিয়াৎ' ৯৬
ইসলাম, ইসলামিক ৯৮
—আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র ১৩৬, ১৪৬
'ইসলাম ও সমাজতন্ত্র' ১৫১
'ইস্টার বিদ্রোহ ও গেরিলা যুদ্ধ' ২৭
ইস্তাম্বুল (বা স্তাম্বুল বা কনস্ট্যান্টি-নোপল) ৬৪, ৬৫, ৮৮, ১০৬, ১০৭, ১৪৭, ৩২০, ৩২৪
ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেল ২৬০-৬২
'ইস্ত্রাকিউন' ১১৭

ঈশানচন্দ্র দাশগুপ্ত ৩১৯
ঈশ্বর সিং ২৩১
'ঈশ্বরের সৈন্যবাহিনী' (Army of Allah) ১০৬, ১১০

উইন্‌কন্‌সিন ৩১৯
উইগুমিলার ১২৫
উইলিয়াম ডিগ্‌বি ১৮
উগ্র জাতীয়তাবাদ ৫৩, ৬৯, ২০৮
উজাগর সিং (ফিরোজপুর) ২৩৫
উজাগর সিং বোপা রাই (জলন্ধর) ২৩৬
উজবেক ১১৭, ১২৩
—কমিউনিস্ট পার্টি ১৬৫
উজবেকিস্তান ৯৮, ৩১৩
উজ্জয়িনী ৪২
উড্রো উইলসন ৭৪
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৯০, ১০২, ১০৩, ১১২, ১১৮, ১২৮, ১২৯, ১৩৬, ১৩৯
উত্তর প্রদেশ ২০২
উত্তর মেরু ১৬০
উদয়পুর ২৮
উধম সিং ২৩১
উন্নিকৃষ্ণণ, পি. ৩১৮
উপনিবেশ ৫৩, ৫৪, ৭০, ৭৬, ৭৮, ১০৪
উপনিবেশবাদের প্রশ্ন (জাতীয় ও) ৫২, ৫৩, ১১৬, ১২৪, ২০৭, ২১৬, ২৯৪
—মূল নিবন্ধ (লেনিন) ১২৪, ২১৬, ২৯৪
—পরিপূরক নিবন্ধ (রায়) ১১৬, ১২৫, ১২৬, ২০৭, ২১৪, ২৯৪
উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত ২৪৫
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩
উমা মুখোপাধ্যায় ৭৪, ৩৩১
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫
উর্দু ১০৪, ১০৫, ১১২, ১৪১, ১৫৪, ১৫৭, ৩১৫, ৩২৫, ৩২৬
উসমানীয় ১৩৮

২৫

এক্স, ডা: ১৪৬
এংগেলস, ফ্রেডারিক ৩, ৮, ১৪, ২০, ২১, ১১৮, ২৪২, ২৪৫
'এডাম' (লাহোর) ২৩৬
এতোয়ান ৫০, ২৭০
এনড্রোনভ ৯১, ৯২
এনভার পাশা — আনোয়ার পাশা দ্রষ্টব্য
এনার্কিজম ১৯
এনার্কো-সিণ্ডিকালিস্ট ১৭২
এবার্ট ১১৪
'এ. বি. সি. অফ কমিউনিজম' ১৭২
এভেলিন রায় ('শান্তি দেবী') ৫৯, ১১৪, ১১৫, ১৪৭, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ২২৫, ৩২১, ৩২৩
'এমডেন' ২০৮
এলান অক্টেভিয়ান হিউম—হিউম, এলান অক্টেভিয়ান দ্রষ্টব্য
এলেপ্পো ৩২০
এশিয়া ৫৬, ৬৫, ৯৫, ৯৬, ১২২, ১৯৯, ২৩১, ৩০৮, ৩১৬
এশিয়া মাইনর ১৩৫
'এশিয়া ও আফ্রিকার উপরে আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রাম' ২৬৩
এশিয়াটিক সোসাইটি (রয়্যাল) ৪৬
এশে ৬৫
এ. সি. রায় ২৬১
এস্কিশের ৬৫

ওপেনহাইম, ব্যারন ৬৩
ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, মৌলানা ৬৫, ৬৬, ৯৯, ১০২, ১০৩, ১০৫-১১০, ১৩৯, ১৪৭, ২০৬, ২২৬, ২৪৮
ওভারস্ট্রীট ১২৫
ওয়াদিয়া ২০১
ওয়াফা, আনিস ১৫২, ১৫৩, ১৫৫
—এস. হবীব ১৫২-১৫৫, ৩১৪, ৩১৭
ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজেন্টস পার্টি ১৭৩, ২৪৭
ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার লীগ অফ ইণ্ডিয়া (লণ্ডন) ২৪০
ওয়াশিংটন ২৩১, ৩১৪
ওয়াহাবি (ওহাবি) আন্দোলন ৭, ৮৭, ১৩৮
ওয়েন — রবার্ট ওয়েন দ্রষ্টব্য
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২৩১
ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট ১৭২, ১৮২, ২২৮
—ভারত বিভাগ ১৮২
ওরেগান ২১৯, ২৩১
ওর্জোনিকিৎজে ১৩৩
ওলন্দাজ ৫৩, ৮০, ১৭১
ওল্ডেনবার্গ ১৮২, ১৮৪, ১৮৮, ২৬৩, ২৬৪
ওস্ ১৪৮
'ওসোড়িয়াখিন' ১৬০

'ঔপনিবেশিক অত্যাচার ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মেলন' ২৩৯, ২৪০
'ঔপনিবেশিক ও জাতীয় নীতির প্রশ্ন এবং তৃতীয় আন্তর্জাতিক' ২৬৩
'ঔপনিবেশিক কমিশন' (তৃতীয় আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসের) ১২৫

ককেশাস ৯০, ১৩১, ৩২৭
কংগ্রেস (ভারতের জাতীয়) ১, ১২, ১৫, ১৭, ২৩, ২৪, ২৬, ২৯, ৩১, ৩৪, ৪৯, ৫৪, ৬৬, ৬৭, ১০০, ১০৬, ১৩৪, ১৩৬, ২০২, ২২৬, ২৩৯,

২৪০, ২৪১, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৮২, ২৮৮, ২৯০, ২৯১, ২৯২
—কমিটি ১০৬, ২৮৯, ২৯১
—কাবুল কমিটি ১০৬-১০৮
—আহ্‌মেদাবাদ অধিবেশন ১৬৮, ২২৫, ২২৬
—গয়া অধিবেশন ২২৬
—সেবী (কংগ্রেসী) ২৫, ২৬, ২৭, ১০৬, ২৮৩, ২৯০
'কংগ্রেসের ইতিহাস' ১৩৬
কচ্ছ ২৮, ২৬৭
কন্‌স্ট্যান্‌টিনোপল— ইস্তাম্বুল দ্রষ্টব্য
কনক কড়াল ৩৭, ২৯০
কনস্টাণ্টিন সেগে'ইয়েভিচ— সীতারামইয়া, কোলাচালা দ্রষ্টব্য
কনিগ্‌সব্রুক ৩০৭
'কবির সঙ্গে ইউরোপে' ২৩৮
কমলাকান্ত ১৩
'কম্পাস' ১৩৫, ১৩৬, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৫, ১৫০, ১৫১
কমিউন— প্যারি কমিউন দ্রষ্টব্য
কমিউনার্ড ১১
কমিউনিজম ৭, ১১, ১৩, ৪৮, ৮৭, ১০৩, ১০৯, ১১০, ২৩০, ২৩২, ৩২৩
কমিউনিস্ট ৭, ১১, ১৩, ৪৮, ৫৯, ৬০, ৭২, ৮৭, ৯৫, ১০০, ১০৩, ১০৯-১১২, ১১৫, ১২৬, ১৬৪, ১৬৮, ১৭০, ১৭৮, ১৮৯, ১৯৫, ২০৩, ২০৫, ২০৭, ২১২, ২১৩, ২২৫, ২২৬, ২৩০, ২৩৩, ২৩৯, ২৪৩, ২৪৬, ২৪৮, ৩২২, ৩২৩, ৩৭৬
—আন্দোলন ২৪৫, ৩১৭
—ইস্তেহার ২২
'কমিউনিস্ট পথ' ১৩৩
কমিউনিস্ট পার্টি (দল) ৫৮, ৭৩, ১০৪, ১১০, ১১১, ১৪৮, ১৬২, ১৬৫, ১৬৬, ২১৩, ২১৪, ২১৮, ২২৩, ২৩০, ২৪৪, ২৯৪, ৩১৬, ৩২৩
'কমিণ্টান'— তৃতীয় আন্তর্জাতিক দ্রষ্টব্য
'কয়েকজন বিপ্লবীর ছবি'/বিপ্লবীদের ছবি ৩৭, ২৬৩-৭৯
কর, মজুমদার এণ্ড কোং ২০১, ২০২
করম সিং ধূত (কপুরথলা) ২৩৪
করম সিং ধুলেতা (জলন্ধর) ২৩৪
করাচী ১০৯, ১৩৪, ২৯০
করুনোভ্‌স্কাইয়া, লিডিয়া এডোয়া-র্ডোভ্‌না ২১৫, ২৪২, ২৪৩
কর্ক ২৭
কর্তার সিং মুসাপুর (জলন্ধর) ২৩৬
কর্তার সিং সরিন (লায়ালপুর) ২৩৪
কর্তারামজী ২৮৯
কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ২০১
কলিকাতা ৮, ১০, ১৫, ২৭, ৬২, ৬৩, ৮২, ১৬৪, ১৭৮, ১৮১, ২০১, ২৫৮, ২৬২, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ৩২৭, ৩৩০
কলেজ স্কোয়ার (৬নং) ৬৩, ২৫৮
কল্পনাশ্রয়ী সমাজতন্ত্র (Utopian Socialism) ৩, ৪
কসাক ১৩৩
কাইজার ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭৩, ৭৬, ৭৭, ৮৮, ১০২, ২৯৭
কাউট্‌স্কি, কার্ল ২৫, ২৬৫, ২৮৫
কাচ্‌ ১৫৯, ১৬১, ১৬২

কাজাখ্‌স্তান ১৮৩
'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা' ১৩৩
কাটায়ামা, সেন— সেন কাটায়ামা দ্রষ্টব্য
কানপুর (বলশেভিক) ষড়যন্ত্র মামলা ১৫২, ১৭৭, ২২৭
কানাইলাল দত্ত ৩২, ২৬১
কানাডা ২২০, ২৩১, ২৩২, ২৩৬, ২৬৮
কানিংহাম ২০, ২৪
কাপ্রি ৩৫
কাবার্দা ১৩২
কাবুল ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৯৩, ৯৪, ৯৯, ১০২, ১০৩, ১০৬, ১০৭, ১০৯-১১১, ১১৩, ১১৮, ১২২, ১২৩, ১৩৯, ১৪০, ১৪৭, ১৫১, ১৫৮, ২০৯, ২১০, ২২৬, ২৪৭, ৩২০
কাবুল মিশন— ভারত-জার্মান-তুর্ক মিশন দ্রষ্টব্য
কামা, খুরসেদজী রোস্তমজী ৪৯
কামা, ভিখাজী রোস্তম ২৮, ৩১-৩৩, ৩৮-৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৭-৫২, ৫৪-৬৩, ৭০, ৭৩, ২৪৮, ২৭০, ২৭১, ৭৭-২৭৯, ২৮৪-২৮৮, ২৯৩, ২৯৫, ৩২৪
কামা, রোস্তম কে. আর. ৪৯
কার, ই. এইচ. ১২৫, ১২৭, ১২৮
কার, জেমস ক্যাম্বেল ৩৯, ৪৮, ৩১২
কারগিুকার ৬৪
কার্বোনারি ২৫
কার্জন (লর্ড) ১৬২, ১৬৩, ২৬৯
কার্জন ওয়াইলি, উইলিয়াম ৪৩, ৬১
কার্ল মার্কস— মার্কস দ্রষ্টব্য
কারাকাল্পক ৩১৩
কালমিক ৩২৮
'কালান্তর' ২৪৬, ৩৭৬
কালিঘাটের হালদার ২৮৩
কালিদাস নাগ ২৯১
কালিনিন্‌ ৩১৩
কালীপদ বিশ্বাস ১২, ১৮, ২১
কালীপ্রসন্ন সিংহ ৬
কাশ্মীর ১১৯
কাসিম বে ৬৫
কাম্পারোভা, ভি. ৫৯
'কাম্পি' ৮১
কির্কি ১৩১, ১৪১, ১৪২, ১৪৯, ১৬২, ২০৫
কিরঘিজ ৩২৮
কিরঘিজিয়া ১৮৩
কিসিংগার ৩০৭
কিংস কম্পানি ২২৫
কুইবিশেভ ১১৭
কুকা আন্দোলন ১১৯
কুতালমারা ৬৫
কুদঘাট ১৮৮
কুদ্‌লে বাগুলা (জলন্ধর) ২৩৫
কুরবান, ফজল ইলাহী ১৪০, ১৫২, ২০২
কুর্দ ১২৬
কুষ্ঠিয়া মোহিনী মিলস্‌ ৩৩১
কৃষক আন্দোলন ২১৭
কৃষক সমিতি ২১৭
কৃষ্ণকুমার মিত্র ৬৩, ২৫৮, ২৮২
কৃষ্ণদাস পাল ২৫৬
কৃষ্ণবর্মা, শ্যামজী ২৮-৪৯, ৫১, ৫২, ৬১, ৯৫, ২৬৬-২৭০, ২৭২, ২৭৩, ২৮৬
কৃষ্ণান, এন. কে. ২৪৭
কৃষ্ণান, পার্বতী ২৪৭

কেয়ার হার্ডি ৫৬, ২৫৮, ২৬১, ২৯২
কে. চৌধুরী ২৫৮
কেদারেশ্বর গুহ ৬৪
কেনিয়া ৬৫
কেপটাউন ২৮০
কেম্ব্রিজ ২৩, ২৪৬
কেমাল পাশা, মুস্তাফা ১৩৪, ১৪০
কের্মান ২২০, ৩৩১
কেরসাস্প, দাদাচানজী ৬৪, ৬৫, ১৪৭
কেরালা ২২
কেরেনস্কি ৮০, ৮৩, ১২০
কেশবচন্দ্র সেন ১০
কেশর সিং ২৩১
কেহার সিং (ফিরোজপুর) ২৩৫
কৈলাসচন্দ্র দত্ত ৫
কৈলাশ বসু স্ট্রীট ১৮৬
কোকন্দ ১১৯
কোঠাওয়ালম, এইচ. আর. ১৭৪, ১৭৬, ১৯১
কোমাগাটামারু ১০২
কোমারভ, ই. ১৫, ২০, ৫৭, ২১৫, ২৯২
কোয়েটা ২০২
কোরীয় ১২২, ১২৬
কোলি ২৭৫
'ক্যাথলিক সোশ্যালিজম' ১৫
ক্যাবে, ইতিয়েন ১১৪
ক্যাভরনিন-লোম্যান ২৭৫
ক্যালিফোর্নিয়া ২১৯, ২২৮, ২৩১
ক্রনস্টাড ৩২, ২২২, ২২৪
ক্রাসনোভদস্ক ১৩০, ১৩১, ২০৩
ক্রাসিন ২০১
ক্রাসেনিন্নিকভ ২২১, ২২২, ২২৪
ক্রিমিয়া ৩২৬, ৩২৭
ক্রিস্টিন (ভগিনী) ১৯
ক্রুগার, হুর্ট ৫৭, ৬৮, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৮৯, ২১৫, ২৯২
ক্রুপস্কায়া ২৯৫, ২৯৬
ক্রেমলিন ৯১, ৯২, ২০১, ২০৩, ২০৪
ক্রোপোট্কিন (প্রিন্স) ১৯, ৪৫, ২৭৬
ক্লুগম্যান, জেমস ৮, ৯
ক্লেম ১১৯, ১২০
ক্লেমেন্স দত্ত ১১১, ১১৩, ২৪৫, ২৪৬
ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২৪৬
ক্ষুদিরাম বসু ৩১, ৩২

খগেন্দ্রচন্দ্র দাস ২১৯
খান ২৪৬
খানখোজে পাণ্ডুরঙ্গ ৬৫, ২০৮, ২১০, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৭-২২৪, ২৩১, ২৩২, ২৪৮, ২৯৪, ২৯৫, ৩১৭, ৩২২, ৩২৪, ৩২৫
খাসগড ১৪৮
খাঁসি রাও ২৮৮
খিভা ১১৮, ১২৯
—খানতন্ত্র ১১৮, ১২৯
খিলাফৎ ১৩০, ১৩৫-১৩৮, ১৫০, ১৫১, ২০৭, ২২৯
—কমিটি ১৩৪, ১৩৫
—সম্মেলন ১৩৫
খুশগুল খান ১৯৯
খুসী মহম্মদ— মহম্মদ আলি দ্রষ্টব্য
খৃস্ট (বা খৃস্টান) ধর্ম ৩, ৪, ৬৮
খৈরী, আবদুল জাব্বার ৮৪, ৮৮
—আবদুল সাত্তার ৮৪, ৮৮, ৮৯
—ভ্রাতৃদ্বয় ৮৪, ৮৯
খোরাসান ১২৭, ১২৯, ১৩১

গওহর রহমান খান ১৩৯, ১৫২, ২০২

গঙ্গাধর অধিকারী ১৫, ৫৭, ৭৭, ৮৮, ১২৪, ১২৫, ১৪০, ২০৯, ২২৯, ২৩০, ২৯২
গজনভী, আবদুল হালিম ২৮২, ২৮৪
গঞ্জন সিং (ফিরোজপুর) ২৩৫
'গণবাণী' ৩২৬, ৩৩০, ৩৩১
গদর দল (বা পার্টি) ২২, ৬৪, ৬৬, ৯৫, ১০০, ২০৬, ২২০, ২২৭-২২৯, ২৩১-২৩৪, ২৩৭, ২৩৯, ২৪৮, ৩১৪, ৩২০, ৩২৪
—আন্দোলন ২৪৮
গভর্নমেণ্ট ছাপাখানা ২৬০-২৬২
গর্কি, ম্যাক্সিম ৩৪-৩৬, ৫১, ৫২, ৫৮, ৮৭, ২১৭, ২৭০, ২৭৯
'গরীবের কথা' ১৮৩
গরুড়ধ্বজা ২৭৯
গাড্‌গিল, ডি. আর. ২৪৬
গান্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ ৩০, ৫১, ১৫৫, ২০১, ২৪৫, ২৮৯, ২৯০, ৩২৮
গান্ধীবাদী ২৯২
গায়কোয়াড় ৩৬
'গালিবনামা' ১০৫, ১০৬
গালিব পাশা ১০৬
গিকালো, নিকোলাই ১৩২, ১৩৩
—ভেরা ফিওডোরোভ্‌না ১৩৩
গিবাল্লি, প্রিমো ১৬০, ১৬২
গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী ২৩
গুজরাট ২৮
গুজরাটী ২৮, ৩৮
গুড্‌সিগ, এম. ২৬৩
গুণু— মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় দ্রষ্টব্য
গুপ্ত আন্দোলন ২৩
—সমিতি ২৭, ৪২, ৪৮, ২৫৮
গুপ্ত, আর. ২২৪
গুপ্ত সাম্রাজ্য ২৭৯
গুর্কো-ক্রিয়াজিন, ভি. এ. ৩৭, ২৬৩, ২৬৪
গুরু গোবিন্দ সিং ১১৯
গুরুচরণ সিং ১১৯
গুরু নানক ১১৯
গুরু রাম সিং ১১৯
গুরুবক্স সিং ৩১৭
গুরুমুখী ৩১৬
গুলজার সিং (ঝিন্দ) ২৩৫
গুলাব সিং ৩১৬
গুলাম আহ্‌মদ খান ২০২
গুলাম ফরিক ১২৮
গুলাম মহম্মদ ১২১
গুলাম রুবাহি ১২১
গুলাম হাইদার ১৩০
গুলিস্তান ১৩৪
গেস্তাপো ১১১
গোখলে, গোপালকৃষ্ণ ৩১, ২৫৮
গোপাল পরাঞ্জপে—পরাঞ্জপে, গোপাল দ্রষ্টব্য
গোপাল বসাক ৩৭৬
গোপেন্দ্রকৃষ্ণ চক্রবর্তী ১০৫, ২৪৭
গোরি (জর্জিয়া) ১৩২
গোল্ডবার্গ ১৫১
গৌতম চট্টোপাধ্যায় ৫, ১০১, ১১৪, ১১৫, ১৮৩, ১৯০, ৩৭৬
গৌহাটি ৬৭
গ্যারিবল্‌ডি ২৫
গ্যালিন, ভি. ২৬৩
'গ্যেলিক-আমেরিকান' ৪৬, ৯৫
গ্রাম্‌ ২৭৫
গ্রাস্‌কোভিয়া ১৬১
গ্রিয়ার পার্ক ২৮২
গ্রেজ ইন ৪৬, ২৭১
গ্লাসেন্যাপ, এইচ. ভি. ৭৫

ঘোষ, ডাঃ   ১৯২

চঞ্চল সরকার   ২৫৩
চট্টগ্রাম   ২৩৭, ৩১৬
চতুর্বর্ণ   ৪২
চন্দননগর   ৪৪, ৬৩, ১৮৫, ১৮৬
চমন   ১৩৪
চম্পকরমণ পিল্লাই   ৬৪, ৬৭, ৯৯, ১০৪, ২০৮-২১০
চরমপন্থী   ১, ২৭, ৩৭, ৬৬, ৭৪, ২০১, ২৬৬, ২৬৮, ২৬৯, ২৯২
চারুজও   ১৪০, ১৪২, ১৪৪
চার্টিস্ট আন্দোলন   ৪, ১০
চারুচন্দ্র দত্ত   ১৯, ২৪, ২৬
চিচেরিন   ৯৮, ৯৯, ১২৭, ২২২, ৩২২
চিৎপাবন ব্রাহ্মণ   ২৭১
চিত্তরঞ্জন দাশ (দেশবন্ধু)   ২৮, ১০৬, ২০১, ২২৬, ২৬০
চিত্রশালা প্রেস   ৬৭
চিন্তা সিং (লায়ালপুর)   ২৩৪
চিররঞ্জন দাশ   ২২৬, ২২৭
চীন   ১৯, ২৯, ৬৬, ৭৮, ২০১, ২৩৯, ৩৭৫
চীনা   ১২১, ১২২, ১২৬, ২০৩, ২৬৪
—কমিউনিস্ট পার্টি   ১৬৪
'চেকা'   ১৯৪
চেম্বারলেন, লর্ড   ২৬৭

ছত্রভুজ আমিন   ৪০, ৫০, ২৭৩

জওহরলাল নেহরু   ৩৩, ৯৪, ১০০, ১০৬, ১০৯, ১৩৬, ১৩৮, ২৩৮-২৪০, ৩১৭, ৩১৮
জন, 'ওবলি'   ১৪৮
জন রীড   ১২৭
'জন নিরাপত্তা কমিটি'   ১৯৪
জবলুস সিরাজ   ১৪০, ১৪২, ১৪৯, ১৫০
'জমীনদার'   ১১২
জয়সূর্য নাইডু (ডাঃ)   ২৩০, ২৪০
জর্জীয়   ১২৬
জলন্ধর   ২২৮
জলপাইগুড়ি   ৩১৯
জাওয়ান্দ সিং (অমৃতসর)   ২৩৪
জাকারিয়া, রহমৎ আলি   ৯৯, ১০১-১০৫, ১১০, ২৩০, ২৪৮, ৩১২
জাকীর হোসেন (ডাঃ)   ২৩০
জাতীয় (বা জাতীয়তাবাদী) আন্দোলন (বা সংগ্রাম)   ৮৭, ১২৫, ২০৭, ২১৭, ২৬১, ২৬২, ২৬৯, ২৮১, ২৮৭, ২৯৩
জাতীয় পতাকা   ৫৪, ২৭৯-২৯২, ৩২১, ৩২৩, ৩৭৭
জাতীয় (বা জাতীয়তাবাদী) বিপ্লবী   ১, ২৩, ২৫, ৫৬, ৬১, ৭০, ৭২-৭৪, ৭৮, ১৩৮, ১৭০, ১৭৫, ১৭৮, ১৮৫, ২১৭, ২৯২, ২৯৬
জাতীয় শিক্ষা পরিষদ   ৩১৯
জাতীয় সংগীত   ২৮১
'জাতীয়তা সম্মেলন'   ৭৪
জাপান   ৫৬, ৬৬, ৬৭, ৯৫, ১৮৫-১৮৭, ৩০৮, ৩৭৫
জাপানী   ৫৫, ৯৫, ১২১, ৩০৮
জাফর ইমাম   ৮৪, ৮৫, ৮৯, ৯০, ১০৬, ১০৭, ১২৬, ১২৭, ১৩২
জাফর হাসসান   ১০৭, ২০৬, ৩১২
জাভা   ১৮৮
জামসেদপুর   ২৮৯
জামাল পাশা   ৩২০
জার   ১০৭, ১১৯

জারতন্ত্রী ৫১, ৭৮, ৮১, ৮৩, ১১৮-১২০
—রাশিয়া ২৭৫
—সরকার ২৭, ৮৩, ১১০, ১১৯
জার্মান ২৫, ৪৩, ৫৫, ৫৭, ৬৪, ৬৫, ৬৭-৬৯, ৭২, ৭৪-৭৭, ৭৯, ৮০, ৯১, ৯২, ১০০, ১০৪, ১১৩, ১১৪, ১৬২, ১৯৫, ১৯৬, ২০৮, ২১৩, ২১৫, ২১৮, ২৩৯, ২৪১, ২৮৫, ২৮৮, ২৯২, ২৯৭, ৩০৭, ৩০৮, ৩২০
—কমিউনিস্ট পার্টি ১৬৪, ২৩০, ২৩৯
—গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ৯, ২১৬
—বিপ্লব ৭৭, ১০০
—সমাজতন্ত্রী আন্দোলন ১৩
—সরকার ১০৪, ২৩০
জার্মানি ২১, ৪৯, ৬১-৬৪, ৬৭, ৬৯-৭১, ৭৩, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮৩, ৮৫, ৮৮, ৯০, ৯৪, ৯৫, ১০০, ১৬০, ১৬১, ১৬৮, ১৭৫, ১৭৭, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৮, ২২০, ২২৯, ২৩০, ২৩৩, ২৩৯, ২৪১, ২৪৪, ২৯৩, ৩০৭, ৩০৮, ৩২০, ৩২৫
'জার্মানিতে সুভাষচন্দ্র' ৩০৭
জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ১১১, ১৫৬
'জাস্টিস' ৪৭, ২৫৭
জাঁ লুঙেগ ২৭৫
জি. আই. পি. রেলওয়ে সিগ্‌নালার্স ইউনিয়ন ২৬০
'জিজ্‌ন নাৎসিওনাল নস্তেই' ১০৬
জিনোভিয়েভ ৮৭, ১২৪, ১২৭, ২১৮, ২৯৪
'জিনোভিয়েভের সার্কাস' ১২৭
জিব্রল্টার ২৬৯
জিমার ৯
জিমারভাল্ড ৭৩
জিয়াণ্ড সিং (অমৃতসর) ২৩৫
জীতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী ৬৪, ১৮৬
জীবনলাল কাপুর ২৪৬
'জীবনস্মৃতি' ২৪
জুনাগড় ২৮
জে. এন. রায় ২৬১
জেনিভা ২৮, ৩২, ২২৫
জেরুজালেম ৩২০
জোফে ৮৩
জ্ঞানী গোপাল সিং ২৩৩
জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দাসগুপ্ত (ডাঃ) ৬৪
জ্যাকসন ৪০, ৫০, ২৭৩
জ্যোতি বসু ২৪৭
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৪
জ্যোতীন্দ্র ৬৭
জ্যোরে ৪৩, ৫৪, ৬৩, ২৭৪, ২৮৫, ২৯৩
টট, ইস্তভান ১৬০
টম কোয়েল্‌শ ১২৭, ২০৩, ২১৩
টম পেন ৪
টম মান ২০, ২৪, ২৫
টয়েনবি ১৩৬
টল্‌স্টয়—তলস্তয় দ্রষ্টব্য
'টাইম্‌স' ৩১, ১৪৯
টাটা ২৪৪
টিউনিস ৩২৭
টিনাভেলি ৪০
টিপু পাগলা ৭
'টেগোর কাস্‌ল' ৮২
টেরেন্স ম্যাক্‌সুইনী ২৭
টোকিও ৯৫
টোগো (এডমিরাল) ৫৯

ট্রইয়ানোস্কি ৭৬, ২১৪
ট্রটস্কি ৭৭, ৭৯-৮১, ৮৩, ২১৮, ২২২, ২৪৩, ২৯৪
ট্রান্স ককেশাস ১৩২
ট্রান্স-কাস্পিয়ান মালভূমি ১২৯, ১৩২
—রেলপথ ১২৯, ১৩০
ট্রেড ইউনিয়ন ২০১, ২০৩, ২৪৫, ২৫৯
—হল্ (মস্কো) ২০৩
—কংগ্রেস (নিখিল ভারত-মাদ্রাজ অধিবেশন) ১৫২
ট্যাম্বাকভ ১৫১

ডাংগে, শ্রীপাদ অমৃত ১০৫, ২২৭
ডাণ্ডী ২৯০
ডাল্স্কি, এ. ২৪৩
ডিগ্বি, উইলিয়াম— উইলিয়াম ডিগবি দ্রষ্টব্য
ডি. ভ্যালেরা ২৭
ডিমিট্রভ ২৪০, ২৬৩
—মিউজিয়াম ১০৭, ২৩৯, ২৬৩
ডিয়াকভ, অধ্যাপক ৩১৫, ৩১৬
ডিরোজিও ৪, ৫, ৬
ডেট্রয়েট ২৪৭
ডেনমার্ক ৩২২
ডেভিট, মাইকেল— মাইকেল ডেভিট দ্রষ্টব্য
ডেরি, ফেজের ১৬০
ডোগরা ৩১৬
ডোমিনিয়ান স্টেটাস ২৮৯
ড্রুহে, ডেভিড এন. ১২৭
ড্যান ব্রিন ২৭

ঢাকা ৩১৯, ৩৭৬

'তত্ত্বকৌমুদী' ১৩
'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ৬, ৭
তপতীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৭১
'তরুণ বাংলা' (Young Bengal) ৪, ৫
তলস্তয়, লিও ৫১, ২৬৫, ২৬৬, ২৭০
তলস্তয়বাদ ৯২
'তলোয়ার' ৩৮, ৬২, ২৮৮
তাজিখ্স্তান ৩১৫, ৩১৬
তাতার ৩২৮
তারকনাথ দাশ ৬৪, ৬৫, ৮২, ৯৫, ২০৮, ২১৯
তারিণী পি. সিংহ ২৪০
তাসখন্দ ৮৩, ৮৭, ৯০, ৯৭, ১০৩, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১১২, ১১৭, ১১৯-১২১, ১২৩, ১২৬-১২৯, ১৩৪, ১৪০, ১৪২-১৫১, ১৫৫, ১৫৭, ১৫৯, ১৬৩-১৬৮, ১৭০, ১৮২, ১৯৮, ২০৩, ২০৭-২১০, ২১২, ২১৩, ২২৬, ৩১৫, ৩১৬
—'কার্য নির্বাহক সমিতি' ১২০
—'ইণ্ডিয়ান মিলিটারি স্কুল' (বা একাডেমি) ১২৮, ১৪৩, ১৪৮, ১৪৯, ১৫১-১৫৩, ১৫৫, ১৫৮, ১৬২, ১৬৩, ১৬৭, ১৯৮, ২০২, ২০৭
তিফ্লিস ১৩২
'তিব্বত' ২৬৩
তিভেল ১৫১, ২২৯
তিরমিজ ১৪২
তিলক, বালগংগাধর ২৭-২৯, ৩১, ৬৭, ১১৯, ২১৯, ২২০, ২৬০, ২৬১
তুর্ক ১২৭, ১৩৫, ১৬২, ২৬৪
তুর্কমেন ১৪০, ১৪১, ১৪৩-১৪৫
তুর্কি (তুরস্ক) ৪৯, ৬৩, ৬৫, ৭৮, ৮৫, ৮৮, ১০১, ১০৫-১০৭, ১২১,

১২২, ১২৬, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৪৪, ১৪৭, ১৫১, ২০৩, ২২০, ২২২, ৩২০, ৩২৭
তুর্কিস্তান ৮৭, ৯০, ৯৮, ১০২, ১২৯, ১৩০, ১৩২, ১৪২, ১৪৬, ১৯৮, ২২০
—কমিউনিস্ট পার্টি ১০৩, ১২১, ১৬৪, ১৬৬
—ট্রেড ইউনিয়ন ১২০
—'ব্যুরো' ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭-১৬৯, ১৯৮
'তুর্কিস্তানে বিদেশী কমিউনিস্ট' ১৬৪
তৃতীয় (কমিউনিস্ট) আন্তর্জাতিক (বা কমিন্টার্ন) ৩৩, ৪৪, ৫৫, ৫৬, ৫৯, ৮৭, ১১০, ১১১, ১১৪-১১৬, ১২৩, ১২৬, ১২৭, ১৬৪-১৬৬, ১৭৫-১৭৭, ১৯০, ১৯৮, ১৯৯, ২০৩, ২০৮, ২১২, ২১৪, ২১৮, ২১৯, ২২২-২২৪, ২২৬-২২৯, ২৩৩, ২৪২, ২৪৪, ২৪৫, ২৯৪, ৩১৪, ৩১৬, ৩১৭
—দ্বিতীয় কংগ্রেস ১১২, ১১৪, ১১৬, ১১৭, ১২৩-১২৫, ১৮৯, ১৯৪, ২০৭, ২১৪, ২৯৪
—তৃতীয় কংগ্রেস ১৭৫, ১৮৯, ১৯৮, ২১৪, ২১৮, ২১৯, ২২২-২২৫, ২৯৪
—চতুর্থ কংগ্রেস ২২৬-২২৯
—পঞ্চম কংগ্রেস ১১১
—ষষ্ঠ কংগ্রেস ১১১-১১৩, ২৪৭, ৩১৭, ৩১৮
—কার্যনির্বাহক সমিতি (ECCI) ১২৬, ১৬৯, ২১৪, ২৪৫
—'মধ্য এশিয়া ব্যুরো' ১২৬
-'স্মল ব্যুরো' ১২৬
তৃতীয় আফগান যুদ্ধ ৯০, ১১০
তেজা সিং ৩১৩
তেজা সিং 'স্বতন্ত্র' (গুরুদাসপুর) ২৩৪
তেহেরান ৩১৭

থভের ১৬২
থসেন্ট্রালাকির্ভ ৩০৭

থেলহাইমার ২১৩
থেস ১৩৫

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ৬৬
দত্ত, রজনী পাম—রজনী পাম দত্ত দ্রষ্টব্য
দয়ানন্দ সরস্বতী ২৯, ৩০
দলীপ সিং গিল ৯১, ১০০, ১০১,
দাউদ আলি (প্রমথনাথ) দত্ত ৬৫, ১৫২, ২১০, ২২০, ২২৮, ৩১৪, ৩১৭, ৩২৪-৩২৬, ৩২৯-৩৩১
দাক্ষিণাত্য ৭১, ২৭১
দাগেস্তান ১৩২
দাদাভাই নৌরজী ১৭, ২৪-২৬, ২৯, ৩৮, ৪৯, ২৫৫-২৫৭, ২৮২
দানিয়েলচুক ৩২৫
দিগম্বর বিশ্বাস ৬
দিলীপকুমার বিশ্বাস ৩, ৫৩
দিল্লী ৮১, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ১৩৫, ২০২ ২৭২, ২৯১
—নিউজ' ২৭৬
দীনবন্ধু মিত্র ৬
দুল্লা সিং ২৩৬
দূর প্রাচ্য ২০৩, ২৩১
দেবব্রত বসু ৭১
দেবেন্দ্র কৌশিক (ডাঃ) ৯০, ৯৭,

৯৮, ১০৩, ১০৫, ১১৭-১১৯, ১২৩, ১২৮, ১২৯, ১৬৪-১৬৭
দেরাদনু ৯৪, ১৯৩
'দেশহিতৈষী' ১৯০
দেশীয় রাজ্য ১১৯, ২৬৭
দ্বারকানাথ ঠাকুর ৪
দ্বিজেন্দ্র নন্দী ১৭৭
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৯০
দ্বিতীয় (সমাজতন্ত্রী) আন্তর্জাতিক ১৮, ২৫, ৫৫, ৫৭, ৭৪, ৭৮, ২৮৫, ২৯৩

ধনতন্ত্র ১২৮
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ১০৮
ধরম সিং কোট্‌লি (জলন্ধর) ২৩৭
ধরসানা ২৯০
ধিংড়া, মদনলাল ৩২, ৪৩, ৪৬, ৬১, ২৭৩
ধীরেন্দ্রকুমার সরকার ৬৪, ৩২০
ধীলন (লুধিয়ানা) ২৩৬

নজরুল ইসলাম, কাজী ১৩৩, ১৩৪
নভেম্বর বিপ্লব—অক্টোবর বিপ্লব দ্রষ্টব্য
নয়না সিং (হোশিয়ারপুর) ২৩৬
নয়না সিং ধুত (কপুরথলা) ২৩৬
'নয়া অর্থনৈতিক নীতি' (NEP) ২০৩
'নযে ভারতকে নয়ে নেতা' ১৪০
নর্থব্রুক, লর্ড ২৬৭
নরওয়ে ২৭৪
নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ৪৩, ২৬১
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (বা মানবেন্দ্রনাথ রায়) ১১৩, ১১৪
নরেন্দ্রনাথ সেন ২৮২
নরিমানভ ইনস্টিটিউট ১৫৩, ৩১৭
নলিনীকিশোর গুহ ১৯১, ১৯৩, ৩৭৬
নলিনী গুপ্ত (বা নলিনীভূষণ দাসগুপ্ত) ১৭৭, ১৭৮, ১৮৪-১৮৬ ১৮৯, ২০৮-২১০, ২২৪, ২২৭, ২২৯, ৩৭৫, ৩৭৬
নাগপুর ২২১, ৩২৪
নাজির সিদ্দিকি ১৫৭-১৬২
নাটাল ৩০
নাটুভাই ২৮
নাৎসী ১৬০, ১৬১, ২৪১, ৩০৭, ৩১৩
নামধারী শিখ ১৯৯
নাম্বিয়ার, এ. সি. এন. ২০৮, ২১১, ২৩০, ২৪০
'নারায়ণ'—'সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর' দ্রষ্টব্য
নাসিক ৩৯, ৪০, ৫০, ২৭১, ২৭৩
নিউ ইয়র্ক ৩, ৪৯
—পাবলিক লাইব্রেরি ২৫৩
নিউটন, আইজাক ৩
'নিউ টাইমস্‌' পত্রিকা ১৬৩, ১৯৭
নিকিতিন, এ. ১৫৬, ১৫৭
নিখিল চক্রবর্তী ২৪৭
নিজাম কলেজ, হায়দ্রাবাদ ৬১
নিজামুদ্দীন ২০২, ৩১৬
'নিজের কথা' ২৪৬
নিধান সিং (ফিরোজপুর) ২৩৬
নিবেদিতা (ভগিনী) ২৭, ৪৯, ২৮৪
নির্মলকুমারী মহলানবীশ ২৩৮
নিরঞ্জন সিং পাণ্ডোরি (হোশিয়ারপুর) ২৩৬
নিসার ('আচকভ') ২৩৭, ৩১৬
নিসার মুহম্মদ (সোয়াহি) ৩১৫
নিসার রাজা (সোয়াহি) ৩১৫

নিহিলজম ১৯
নীরেন সেন ১৭৩
নীল আন্দোলন ৬
'নীলদর্পণ' ৬, ১৫
নীহারেন্দু দত্তমজুমদার ২৪৬
নুকুস ৩১৩
নুর মহম্মদ (ডাঃ) ২০৬
নুরি সিদ্দিকি ১৬১
নৃকুলবিজ্ঞান ২৪১, ২৪২
'নেপ' ২০৩
'নেলসন' (জলন্ধর) ২৩৬
নৈরাজ্যবাদ ১৯
নৈরাজ্যবাদী ২০, ২৪, ৩৭, ৪৮, ৭৭, ২০৩, ২৬৯, ২৭০, ২৭২
নোভস্তি প্রেস ১৯৯
নোয়াখালি ২৩৭
নোস্‌কে ১১৪
নৌশহরা ১৩৪
'ন্যাশানাল লিবারাল ক্লাব' ২৪৪

পঞ্চম জর্জ ৩৬
পট্‌সডাম ৩০৭
'পনেরো দফা ভারত-জার্মান চুক্তি' ৬৩, ৭০
পণ্ডিচেরি ১১০
পরমানন্দ, ভাই ৩৯, ৪০
পরাঞ্জপে, গোপাল ৬৪
'পরিচয়' ১৪১
'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উদ্ভব' ২৪২
পলাতক ভারতীয় সিপাহী ১২৩, ১২৭-১৩৪, ১৪২, ১৪৯, ২৮৯
পশ্‌তু ১৬০, ৩১৫
পশ্চিম জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র ৩০৭
পশ্চিম পাকিস্তান ২০৫
পাক্‌ (Pak) ১২৬
পাকিস্তান ১০৯
পাথার সিং কালা (কপুরথলা) ২৩৪
'পাগলপন্থী' ৭
পাঞ্জাব ৯৩, ৯৭, ১০২, ১১০, ১১২, ১১৯, ১২০, ১৩৬, ১৫৬, ২২৯, ৩১৪ ৩১৭
পাঞ্জাবী ১২৮, ১৩৩, ২৩১, ২৪১, ৩১৬
'পাঞ্জাবে শ্রমিক কৃষক সম্মেলন' ১১১
পাঠান ১৩০
পাডিব্রাড ৩০৭
পাতাকেসর ১৪২
পাতিয়ালা ১০০
পানামা ২৩৬
পানিক্কর, কে. এম. ২৪০
পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে— খানখোজে পাণ্ডুরঙ্গ দ্রষ্টব্য
পাবনা বিদ্রোহ (ও বিদ্রোহী) ১৪
'পাপ দিয়ে পাপকে প্রতিরোধ না করার নীতি' ২৬৬
পাভলোভিচ, মিখায়েল ৩৭, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৫০, ৫৭, ৫৮, ২৬৩, ২৬৪, ২৯৩
পামীর ৩১৫, ৩১৬
পার্ডু বিশ্ববিদ্যালয় ৩১৯
পালকি-বেয়ারাদের ধর্মঘট (কলিকাতা) ২৬২
পার্শী ৪৮, ৫৮, ৬৪, ১৪৭
পারসিক ১২২
পারস্য— ইরান দ্রষ্টব্য
পারস্য মিশন ৬৪, ৬৫, ৬৬, ১০৭, ১১৮, ১২৬, ১৫৫

পি. ঘোষ ২৫৯
পিটার ১৯৪
'পিটার ও পল' দুর্গ ৫১
পিটার্সবুর্গ ৭৯
'পিপলস ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট' ২৩০
পিপলস পাবলিশিং হাউস ৮১, ৯৭
পিয়াটিগোর্স্ক ১৩৩
'পিয়াটিগোর্স্কায়া প্রাভ্দা' ১৩৩
পিয়াটনিস্কি ২৯৬
পীরবক্স ৩১২
পিশ ২৭৪
পি. সি. নন্দী ২৪৬
পুনা ২০, ৬৭
'পুরাণো কথা-উপসংহার' ১৯, ২৬
পুলিনবিহারী দিন্দা ২৪৬
পূর্ণ স্বাধীনতা ২৮৯
পূর্ববঙ্গ ৩১৬
পূরণচাঁদ যোশী— যোশী, পূরণচাঁদ দ্রষ্টব্য
পূরণ সিং (রুরকা) ২৩৪
'পেজেন্টস অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি' ১৭২
পেট্রোগ্রাড— লেনিনগ্রাড দ্রষ্টব্য
'পেট্রোগ্রাড প্রাভ্দা' ৯৫, ৯৬
পেনাং ১৭০
পেশোয়ার ১১২, ১৩৪, ১৪৩, ২০২, ২৯০
—'মস্কো ষড়যন্ত্র মামলা' ১১১, ১১২, ১৪৯, ১৫২
পোপ লিউ ১৬
পোলোগ্নি ১৬০
পোলিশ ৩৯, ৪৯, ৬১, ৬৩, ১০১
—কমিউনিস্ট পার্টি ১৬৪
পোস্তার বাজার ২৬২
প্যাটেল ১২৩
প্যান-ইসলাম ৮৭, ৮৮, ৯৭, ২১৫
প্যারি কমিউন ১১, ১৩, ৫৬, ২৯২
প্যারিস ১১, ১৯, ২৮, ৩১, ৩২, ৩৬-৪০ ৪৫-৪৮, ৫০, ৫৫-৫৭, ৫৯, ৬১-৬৪, ৬৬, ৭৯, ১০৫, ১১১, ২২৫, ২৪৫, ২৪৬, ২৬৪-২৬৬, ২৬৮, ২৭২, ২৭৩, ২৭৫, ২৭৭, ২৭৮, ২৮৪-২৮৮, ২৯৩
—সম্মেলন ৭৯
প্যালেস্টাইন ৩২০
প্রগতি প্রকাশনী, মস্কো ('Progress Publishers') ৭, ৮৫, ১০৪, ১১৮
প্রতিবাদী আচার্য ৩১, ৬৫, ৭৩, ৭৪, ৮২, ৯১, ১০১, ১০৪, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৭, ১২৩, ১২৪, ১৩৯, ১৪০, ১৪৭, ১৫১, ১৬৫-১৬৯, ২৩০, ২৩৮, ৩২০
প্রতিবিপ্লবী ৯১, ১৪০, ১৪২
প্রতুল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৩
'প্রথম আন্তর্জাতিক' ৭, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৪
—সাধারণ সংসদ ৮, ১০
প্রফুল্ল চাকী ৩১, ৩২
'প্রবাসী' ৩২, ৫১
'প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন' ১৩১, ১৩৫, ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৮, ১৫০, ১৫২, ১৫৬, ১৫৭, ১৭২, ১৭৪, ২০২, ২০৬, ২০৯, ২১১
প্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী ২৬০, ২৬১
প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ৩
প্রমথনাথ দত্ত— দাউদ আলি দত্ত দ্রষ্টব্য
প্রমথনাথ মিত্র (ব্যারিস্টার পি. মিত্র) ২৫৯, ২৬২
প্রমোদ সেন ২৪৬
প্রলেটারিয়েট ১৮, ১৯, ৫৩

প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতা ৭৮
প্রাচ্যতত্ত্ব (-বিদ,-চর্চা,-তাত্ত্বিক) ৩৭, ৪৪, ৪৭, ৪৯, ১০৪, ১৫৫
—সংস্থা ১৫৫, ১৮২
প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের সারা ইউনিয়ন সমিতি ১৮২
'প্রাচ্য দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ' ২৬৩
প্রাচ্যদেশ মুক্তিসাধন লীগ ১২১
'প্রাচ্যদেশ সংক্রান্ত রিপোর্ট ও নিবন্ধ' ২২৭
প্রাচ্যবাসী সম্মেলন (বাকু সম্মেলন) ১২১, ১২৬-১২৮, ২০৪
প্রাচ্য বিদ্যা প্রতিষ্ঠান (নরিমানভ) ৩১৭
প্রাচ্য শ্রমজীবী বিশ্ববিদ্যালয় ১৪৯, ১৫২, ১৬১, ১৬৩, ১৬৭, ১৯৮, ২০২, ২০৩, ২০৫, ২০৬, ২২৬, ২৩৩, ২৩৭, ৩১৬, ৩১৭
'প্রাভ্দা' ১২২
প্রিয়নারায়ণ (ডাঃ) ১৪৬
প্রুধোঁ ১৪
প্রুশীয় ৬৯
প্রেমতোষ বসু ২৫৮, ২৬১, ২৬২
'প্রেমধর্ম' ৯৪
প্রেমসিং গীল ২৪৮, ৩১৪, ৩১৫
প্রেসিডেন্সি কলেজ ১৮১, ১৮৭
প্লেখানভ ৫৫, ২৬৫

ফইজুল্লা মাহমুদ ১২১
ফকির শাহ্ ৩১২
ফজিল অল কাদির ১২৮
ফণীন্দ্রনাথ বসু ২৮০
'ফরভেরাৎস' ৪৩
ফরাসী (—ভাষা, ইত্যাদি) ৪৪, ৪৫, ৪৮, ৫১, ৫৪, ৫৭, ৯২, ১০৫, ১১০, ১১২, ১২৬, ২১৯, ২৪১, ২৭০, ২৭৪-২৮০, ২৮৫, ৩২৪, ৩৩১
—ইকোয়েটোরিয়াল আফ্রিকা ৩২৪, ৩৩১
—কমিউনিস্ট পার্টি ১০৫
—তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ৫, ২৮০, ২৮৩
—বিপ্লব ৪, ২৫, ১০৮, ১৯৪, ২৮৩, ২৮৪
'—বিপ্লবের মহৎ সব নীতি' ২৭৯
—সরকার ৪৫, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৯
—সমাজতন্ত্রীদল (সোশ্যালিস্ট পার্টি) ৪৩, ৫৭, ৫৮, ৬৩, ৭০, ৭৩, ২৪৮, ২৭৪, ২৯৩
—সমাজতন্ত্রী নেতা ৪৩, ৪৪
—সাম্রাজ্য ৩২৪
ফরেন ল্যাংগোয়েজ পাবলিশিং হাউস ১৩২
ফারসী ১৪১, ১৫১, ২০৩, ৩১৫
ফিটিংহফ, রোজা ১১৬, ১৪৭, ১৬৫, ১৬৬, ১৮২, ১৮৩, ১৯৬
ফিদা আলি (পেশোয়ার) ২০২
ফিদা হুসেন ৩১২
ফিজি ২৩১, ২৩৬
ফিনবার্গ ২০৩
ফিনল্যাণ্ড ৭৮
ফিনিয়ান ২০, ২৪
ফিনিশ ৭৪
ফিমেন, এডো ২৪০
ফিরোজ শা মেহ্‌তা ৪৯
ফিরোজুদ্দিন মনসুর ১১২, ১৫২, ২০২, ২০৫
ফিয়োডর সেমিওনোভিচ ৩১৩
ফুরিয়ের ৩, ৬, ৭, ১৪
ফুরীরিজম ১৪

ফেবিয়ান সমাজবাদ ২০
ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ৭৩, ৭৯, ৮৩, ৮৪, ১২০
ফেল বুচার ৫
ফোর্ট ক্যানিং ১৭০, ১৯১
ফোর্ড কোম্পানি ২৪৭
ফ্রান্স ১১, ১৭, ২১, ৩২, ৩৮, ৪৩, ৪৪, ৪৯, ৫৭, ৫৮, ৬৩, ৭৮, ৮০, ২৩৯
ফ্রী ইণ্ডিয়া সোসাইটি ৩৮, ৪১, ৬১
ফ্রীম্যান, জর্জ ৪৬, ৯৫, ৩৩১
ফ্রুঞ্জ (মার্শাল) ১১৭, ১৪৪
ফ্র্যাঙ্কফুর্ট ৩৪
ফ্যাসিজম (ফ্যাসিস্ট) ৮৯, ১০৫, ৩০৭-৩০৯
ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলন ২৪৬

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩-১৫
'বঙ্গদর্শন' ১৩
বঙ্গভঙ্গ ২৮৩, ৩৭৫
বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল ৩২৯
'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' ১৩৩
বন্দারেভস্কি, জি. এল. ১৯৯
'বন্দেমাতরম' ২৭১, ২৮৩, ২৮৬, ২৮৭,
—পত্রিকা ৩৮, ৬২, ২৮৩
'বন্ধ-ট্রেনে (Sealed train) যাত্রা' ৭৩, ২৯৩
'বড়লোক' ১১
বরকতুল্লাহ্ (মৌলানা) ৩১, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৮৯-৯৩, ৯৫-১০০, ১২০, ১৫১, ১৯৬, ১৯৮, ২০৯, ২৩০, ২৩১, ২৩৯, ২৪৮, ৩২০, ৩২২
বরিশাল সম্মেলন ৩১
বরোদা ২৭, ৩৬, ২৮৮
বলরাম, এন. ই. ২২
বলশেভিক ৫৫, ৫৬, ৫৯, ৭৫-৭৮, ৯৪, ৯৬, ৯৭, ১১৫, ১৮২, ১৯০, ২৯২, ৩২২
'বলশেভিকবাদ ও ইসলামিক রাজনীতি ক্ষেত্র' ৯৭
বলশেভিজম (বা বলশেভিকবাদ) ৫৬, ৯৮, ১০১, ১৭৮, ২৯৩
বঙ্গা নদী— ভঙ্গা দ্রষ্টব্য
বাওয়া সিং (হোশিয়ারপুর) ২৩৫
বাকু ৮১, ১১২, ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৬-১২৮, ১৪০, ১৪২, ১৪৪
বাকের আলি মির্জা ২৩৯
বাগদাদ ১২০
—মিশন ৬৪-৬৬
বাংলা ৬৬, ৭১, ৯৬, ৯৭, ১৭০, ১৭২, ১৭৮, ১৮৫, ১৯০, ২৬৩, ২৬৯, ২৮৮, ৩০৭, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩৩০
'—সাহিত্যের উদাহরণমালা' ২৬৩
'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা' ২৯, ৩৯, ৪২, ৪৬, ৬২, ২৬১, ২৮৬
'বাংলায় বিপ্লববাদ' ১৯১-১৯৩
বাঙালী ৭১, ১২৩, ২৩৬, ৩১৮, ৩২৭
বাচান সিং ঘোলিয়া (ফিরোজপুর) ২৩৫
বাচান সিং তখনওয়াদ (ফিরোজপুর) ২৩৫
'বাজপাখির গান' ৫১, ২৭০
বাটাভিয়া ১১৩, ১৮৬
বাণিজ্যগত বয়কট ২৬৯
বাল্টা সিং ভুল্লারাই (জলন্ধর) ২৩৪
বাপত, সেনাপতি ৪০
বাম ২২০
বামনদাস বসু, মেজর ২৮১
বারবুাস, আঁরি ২৪০

বারাখ্রিকোভ, আলেক্সাই ৩৫
—পিয়তর ৩৫, ৩৬, ৫২
'বাকো' (জলন্ধর) ২৩৫
বার্ন্স্টাইন ৫৩
বার্নেয়ার ২৭৪
বার্লিন ৫৭, ৫৯, ৬৪, ৬৬-৬৯, ৭৪-৭৮, ৮১, ৮৪, ৮৫, ৯৩, ৯৪, ৯৯, ১০০-১০২, ১০৪, ১১৩, ১১৪, ১১৬, ১২৪, ১৯৫, ১৯৬, ২০৮-২১১, ২১৩, ২১৫, ২১৬, ২১৯, ২২২, ২২৪, ২২৫, ২২৯, ২৩০, ২৩৮-২৪০, ২৪৫, ২৬৭, ২৮৫, ২৮৮, ২৮৯, ২৯৫, ৩২০, ৩২৬
'বার্লিন কমিটি' ৩৩, ৬৪, ৬৬-৬৯, ৭৩, ৭৫-৭৮, ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৮, ৯৩, ৯৫, ১০০, ১১৩-১১৫, ১৪০, ১৬৮, ১৮৭, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৮, ২০৬-২১০, ২১৩, ২১৯, ২২০, ২২২-২২৪, ২২৯-২৩২, ২৩৮, ২৪৭, ২৮৮, ২৮৯, ৩১৭, ৩১৮, ৩২০, ৩২৪, ৩২৫, ৩৭৭
'বার্লিনের ভারতীয় বিপ্লব কমিটির কথা' ৬৪
বালাবানোভা ৮৭, ১১৬
বালাবুশেভিচ ১৫৩
বালুটি ২২০
বালুচিস্তান ১০৭, ১৩৪, ১৫২, ২২০ ২২১, ৩২৪, ৩২৫
বাস্মাচি ৯৮, ১৪১, ১৪২
বাসুকাকা ৬৭
বাহাদুর শাহ (মোগল বাদশাহ্) ২৭২
'বাহুবল ও বাক্যবল' ১৩
বিকানীর ২০২
বিক্রমপুর ৩১৯
বিজয়ওয়াড়া ২৮৯
বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বি. সি. চ্যাটার্জী) ৬২, ৬৩
বিঠলভাই প্যাটেল ৪০
বিদগ্রাম ৩১৯
'বিদেশী জীবনের কাহিনী' ৩৬
বিনয়কুমার সরকার ৬৪, ১৮১, ১৯২, ২২৯, ৩১৯, ৩২০
বিপিনচন্দ্র পাল ২০১, ২৫৮, ২৬০, ২৬১
বিপ্লব (১৯০৫ সাল) ২৭০
বিপ্লববাদ ৩১৮
'বিপ্লবী অবনী মুখার্জী' ১৮১
বিপ্লবী আন্দোলন ৩১৯
'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' ১৮৬, ১৯২, ২৫৯, ২৬০
বিপ্লবীদল ৩১৯
'বিপ্লবীদের ছবি' ৪৭, ২৬৩-২৭৯
'বিবিধ প্রবন্ধ' ১৩
বিবেকানন্দ (স্বামী) ১৯
বিমানবিহারী মজুমদার ৪, ৬, ৭, ২৮০
বিলাত (বিলেত) ২৪, ২৭-২৯, ৩৬, ৪১, ৯৫
বিলিতি ৩১, ৩১৯
বিলিতি সামগ্রী বয়কট ২৬৯
বিশ্বভারতী ৪০
বিশ্বযুদ্ধ (১ম) ৫৭, ৭২, ১৭৭, ২২০, ২৩১, ২৩২, ২৭০, ৩০৯, ৩১৮, ৩১৯, ৩২১, ৩২৪
—(২য়) ৬৯, ৭২, ৮৯, ২০৫, ৩০৯, ৩১৫
'বিশ্বযুদ্ধ ও কৃষ্ণমহাদেশ ভাগাভাগির সংগ্রাম' ২৬৩
বিশ্বযুদ্ধের প্রতি শ্রমিক শ্রেণীর মনোভাবের প্রশ্ন ৫২, ৭০

'বিশ্ব রাজনীতি ক্ষেত্রে দাহ্যপদার্থ' ২৫৮
বিশ্বামিত্র ৩২২
বিষ্ণু বিশ্বাস ৬
বিসমার্ক (প্রিন্স) ১৩
বিহারীলাল গুপ্ত ১২
বীকোভা ৩২৫
বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ('চ্যাটো') ৩১, ৩৩, ৪০, ৪৩, ৪৬, ৫৬, ৫৭, ৬১-৬৫, ৬৮-৭৬, ৮০, ১০৪, ১০৭, ১৯০, ১৯৫, ২০৭-২১১, ২১৩-২২০, ২২৩, ২২৪, ২৩০, ২৩৮-২৪৩, ২৪৬, ২৪৮, ২৫৮, ২৬৩, ২৮৮, ২৯২, ২৯৫, ২৯৬, ৩০৯, ৩১৭, ৩২০, ৩২৫
বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ৩৩, ৬৪, ৬৫, ৯৮, ১১৫, ১৪৭, ২০৮, ২১৩, ২২৪, ২৩৮, ৩১৮-৩২৪
বুখারা ১১৮-১২০, ১২৩, ১২৯, ১৩০, ১৪০, ১৪২-১৪৫, ৩১৬
—আমীরতন্ত্র ১১৮, ১২৯
—কমিউনিস্টদের প্রথম কংগ্রেস ১৩০
—সরকার ১২০
বুখারিন ১৭২, ১৮৪, ২০৩, ২১৮, ২৯৪
বুয়র ২৯, ৩০
বুরিয়াত ৩২৮
বুলগারীয় ১৫৯
বুস্তান ১৩৪
বৃটিশ ২৪, ২৫, ২৯, ৩০, ৪৩, ৪৫, ৫০, ৫৪, ৫৬, ৭৮, ৮০, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯১-৯৩, ৯৭, ৯৮, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১১০, ১১৭-১২০, ১২৬, ১২৯-১৩২, ১৩৪-১৩৯, ১৬৩, ১৮১, ১৮৩, ১৯৩, ২১৩, ২১৪, ২২১, ২২২, ২৪৫, ২৪৭, ২৪৮, ২৫৫, ২৬৭, ২৭০, ২৭৮, ২৯২, ৩০৮, ৩০৯, ৩২০, ৩২১, ৩২৪, ৩২৫, ৩৭৫
—ইণ্ডিয়ান সৈন্য বাহিনী ১২৭-১৩১, ১৩৪, ১৪২, ১৪৯, ৩২৪
—কমিউনিস্ট পার্টি ২৪৬
—কলম্বিয়া ৩৯, ২৩১
—পররাষ্ট্র সচিব ৪৩
—পার্লামেন্ট ২৪৫, ২৫৮
—বুর্জোয়া ৩৭, ৫৩, ২৬৯
—মিউজিয়াম ১৮২, ৩২৪
—সরকার ৩১, ৫০, ৭৪, ৮৩, ৮৭, ৯৫, ১০৭, ১১৭, ১২৩, ১৮২, ২৬৯, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৭
বৃটেন ২৪, ২৫, ২৯, ৩০, ৬৬, ৬৯, ৭৮, ৯০, ১৩৫, ২৪৪, ২৪৫, ২৫৮
'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' ২৮১
বেইরুট ৮৮, ৩১৭
বেইস, অধ্যাপক ২৭৫
বেঙ্গল টেকনিকাল ইন্‌স্টিটিউট ১৭৯, ১৮৮
'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' ৪
বেঙ্গলী রেজিমেন্ট (৪৯ নং) ১৩৪
বেনারস ৪৭, ১৪৬
—হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ১৪৬
বেবেল, অগাস্ট ৪৩, ৫৪, ৫৫, ২৬৫
বেরিয়া ৩১৬
বেলগাঁও ২৯০
বেলজিয়াম ২২১
বেলা কুন ১২৭
বেলি, কর্নেল ৯০
বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র (Scientific Socialism) ৩

বোম্বাই ২০, ২৭, ৪৮, ৫০, ৫৮, ১১৯, ১৫৮, ১৮৬, ২৬০, ২৬৭, ২৭১ ২৭৩, ২৭৪, ২৯৩
'বোম্বাই' ১৫৩
বোরোডিন ১১৪, ১৭১, ২০৩, ২১৩
বৌদ্ধ ৩২৮
ব্যাক্স, আর্নেস্ট বেলফোর্ট—আর্নেস্ট বেলফোর্ট ব্যাক্স দ্রষ্টব্য
ব্যাটারসি ২৪৫
'ব্যথার দান' ১৩৩, ১৩৪
ব্রহ্মদেশ ৬৬
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ৩১৯
ব্রাউনিং পিস্তল ৪০, ৫০, ২৭৩
ব্রাগিনস্কি ১৫৩, ১৫৫
ব্রাহ্মসমাজ ৩, ১২
ব্রাসেলস ৩৩, ৯৯, ২৩৯
ব্রিগস ১৩৬
ব্রেস্ট-লিটভস্ক শান্তিচুক্তি (বা আলোচনা) ৭৯

ভগৎ সিং ২৭, ৩৪
ভগৎ সিং 'বিলগা' (জলন্ধর) ২৩৪
ভজনেসেনস্কি ৯২
ভলগা ১৬০, ৩২৭
ভলটেয়ার ৪
'ভলনা' ১৩২
ভলস্ক ১৬০
ভ্লাডিভোস্টক ৩১৩
ভশিট্রকভ, এ. আই. ২৪১
ভাইডেমান, ভিয়েথেল্ম ৩০৭
ভাট, কে. এস (ডাঃ) ২৪০
ভান কল (Van Kol) ৫৩
ভানুমতি ৪০
ভার্মা ১০১, ৩২০
ভারত (বা ভারতবর্ষ) ৯, ১০, ২৮, ৩০, ৩১, ৪৫, ৩৭, ৪০, ৪১, ৪২, ৫২-৫৪, ৫৬, ৫৯, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৭৯-৮১, ৮৫-৮৭, ৮৯, ৯০, ৯৩, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৬-১০৮, ১১০-১১২, ১১৫-১২০, ১২২, ১২৪, ১২৭-১২৯, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৯, ১৪০, ১৪৮, ১৬২, ১৬৭, ১৭৭, ১৮১-১৮৪, ১৯৯, ২০৩-২০৫, ২০৭, ২১৪, ২১৬, ২১৭, ২১৯-২২৩, ২২৫-২২৭, ২৩১, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৯, ২৪২, ২৪৫, ২৫৭, ২৫৯, ২৬৬-২৭০, ২৭৯, ২৮২, ২৮৪, ২৮৬, ২৯২, ২৯৩, ২৯৬, ৩০৭, ৩১৩, ৩১৫-৩১৭, ৩২১, ৩২৪, ৩৩০, ৩৭৫
—তাত্ত্বিক (-তত্ত্ববিদ) ৭৬, ১৩৩, ৩১৫
— -বাসী ৩৬, ৩৯, ৪৩, ৫১, ৫৪, ৬৯, ৮১, ৮৩, ৮৫, ১০২, ১২১
—সরকার ৩১, ৩৬, ৫৭, ৮১, ১০২, ১০৪, ১১১, ১৬৩, ১৯৬, ২৩০, ২৬৭, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৯
'ভারত ছাড়' আন্দোলন ২৯১
ভারত-জার্মান-তুর্ক মিশন (বা 'কাবুল মিশন') ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭৬, ৮৩, ৯৫, ১০২, ১০৬, ২৯৭
ভারতবন্ধু জার্মান সমিতি ৬৪
'ভারত-শ্রমজীবী' ১২
'ভারতবর্ষ ও দূর প্রাচ্যে নারী আন্দোলন' ৫৯
'ভারতে বাউড়িয়া জুটমিলে লক আউট' ১১১
'ভারতবর্ষের যুক্ত প্রজাতন্ত্র' ১০৯
ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ১৭৫, ২২৯

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ২৩৩, ২৪৬
—'বৈদেশিক ব্যুরো' ১১১, ২৪৫
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (তাসখন্দ) ১০৩, ১০৪, ১১০-১১৩, ১৬৩-১৭০, ১৭২-১৭৪, ১৮৯, ১৯৮, ২০২, ২০৭, ২১২, ২১৩, ২১৮, ২২৫, ৩১৭
ভারতের জাতীয় মহাফেজখানা ৬৮, ৭৪, ৮৭, ৯৭, ১০০, ১০১, ১৮০, ২২৩, ২২৭, ২২৯
'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম' ৭১, ২৫৯-২৬১, ২৮০, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ৩৩১
ভারতের সংবিধান পরিষদ ২৯১
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন (বা সংগ্রাম) ৭৪, ৮৩, ১২২, ২৪২, ২৪৫, ২৪৮, ২৪৯, ২৬৪, ২৬৭, ২৭০
ভারতীয় কমিউনিস্ট ইস্তেহার ১১৪-১১৬, ১৬৮
'ভারতীয় নৃকুল বিজ্ঞান বিষয়ক সাহিত্য' ২৪২
—বিপ্লবী সংঘ (বা সমিতি) ১২১-১২৪, ১২৮, ১৬৮, ১৬৯, ২৪৮
—বিপ্লবী সম্মেলন ১২২
—মুসলিম জাতীয় লীগ ৮৫-৮৭
—মোস্লেম কমিটি ৮৮
'—রেল শ্রমিকদের সংগ্রাম' ১১১
'—ভীমরুল' ২৬৬
'—শিল্প' ২৬৪
ভার্লের, চকালভ্ ১৬০
ভিক্টোরিয়া (রানী) ২০
ভিক্টোরিয়া (ব্রিটিশ কলম্বিয়া) ৩৯
—স্টেশন ২৭৩
ভিন্‌সেণ্ট ক্রাফ্‌ট ২৮৮, ২৮৯
ভিশি ৫৮
ভুনশমান ৩০৯
ভুজা সিং চাকমৈদাস (জলন্ধর) ২৩৪
ভূপতি মজুমদার ১৭৩, ১৮৭, ১৯১, ১৯২
ভূপাল ৯৫, ১৩৯, ২০২
ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ২২৭
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (ডাঃ) ২৫, ৪৪, ৪৬, ৫৯, ৬৪, ৬৫, ৬৭-৬৯, ৭১, ৭২, ৭৯, ৮০, ৮৫, ৮৭, ৮৮, ৯১, ৯৩, ৯৯, ১০২, ১১৪, ১১৫, ১৪৭, ১৮৫, ১৮৮, ১৯০, ১৯২, ১৯৫, ১৯৬, ২০৬-২১১, ২১৩-২২০, ২২৩-২২৫ ২২৮, ২৩০, ২৩২, ২৩৩, ২৩৮, ২৪৮, ২৫৯-২৬১, ২৮০-২৮৩, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৮, ২৮৯, ২৯৪, ৩০৯, ৩১-৩২৩, ৩২৫, ৩৩১
ভূপেন্দ্রনাথ বসু ২৮২
ভূপেশ গুপ্ত ২৪৭
ভেস্াই ১১
ভেরা নোভিকোভা ৩২৫
ভেরা সেজোনোভা ৩২
ভেল্টমান, এস. ৩৭, ২৬৪
ভেসেনভেংক, ফন ৬৮
'ভ্যান-গার্ড অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' ১৫৬
ভ্যাড্রোস্কি ২৪১
ভ্যালেন্টিনা ১৬২
ভ্যাসিলিয়েভ, এ. ৮৪, ১০৭, ১০৮, ১২০-১২২

ম

মক্কা ১০৬
মগিলোস্কি ১৯৫
মজঃফরপুর ৩১, ৩২০

মজার-ই-শরীফ ১৪২
মডারেট ২৬, ২৯, ৩১, ৪৯
মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস ২৪৭
মতিলাল নেহর্ ২৪০, ৩১৮
মতিলাল রায় ৪৪, ১৮৫, ১৮৬
মথ্রা সিং (ডাঃ) ১১০
মদনলাল ধিংড়া— ধিংড়া, মদনলাল দ্রষ্টব্য
মধ্য এশিয়া ১১৮-১২০, ১৩১, ১৩২, ১৪৩, ২৪৮
মধ্য প্রদেশ ২২১
মধ্যপ্রাচ্য ৯৮, ১০৫, ১৯৯, ৩২০, ৩২৪
'মধ্যশক্তি' (Central Powers) ৮৯
মনস্র, মহম্মদ (ডাঃ) ৬৪, ৬৫, ১০০, ১০১, ১৯৪, ২০৯, ৩২০, ৩২২
মনিয়ার উইলিয়ামস ২৮, ২৬৭
ময়মনসিংহ ৭
মর্লি (লর্ড) ২৪৪, ২৬৭
মরক্কো ৪৯
মরিশাস ২৩১
মস্কো ৭, ৫৯, ৭৫, ৮৩-৮৭, ৮৯, ৯০, ৯৩, ৯৬, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১১২, ১১৪-১১৬, ১১৮, ১২৩, ১২৪, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৭, ১৫২, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৭, ১৫৯-১৬৪, ১৬৭, ১৬৯, ১৭৫, ১৮২, ১৮৪, ১৮৮, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ১৯৯, ২০১-২০৪, ২০৭-২১১, ২১৩, ২১৭-২২০, ২২২-২২৬, ২২৮, ২২৯, ২৩১-২৩৭, ২৪২, ২৬৩, ২৬৪, ২৮৪, ৩১৩-৩১৮, ৩২১-৩২৩, ৩২৫
—প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠান ৩১৫
মহম্মদ আবদুল্লাহ্ ৩১২
মহম্মদ আলী ১৩৫, ৩১৬
মহম্মদ আলী (বা খুশী মহম্মদ বা আহ্‌মদ হাসান বা 'সিপাসসি') ৯৯, ১০৩, ১০৪, ১০৯-১১১, ১১৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ২২৫, ২৩০, ২৩৭, ২৪৫, ২৪৮, ৩১২
মহম্মদ ইব্রাহিম হিন্দী ১৩০
মহম্মদ ফরিক খাজাঞ্চি ১২৮
মহম্মদ বশির ৬৬, ৯৯
মহম্মদ মিঞা আনসারী ১০৫
মহম্মদ শফিক (হিন্দুস্তানী) ১০৯, ১১১-১১৩, ১২৪, ১৪০, ১৪৭, ১৬৪-১৬৮
মহম্মদ হাস্‌সান ৩১২
মহম্মদ হাস্‌সান খাঁ ৩১২
মহম্মদ হাতা ২০৩, ২৪০
মহম্মদ হাদি ৮৪
মহাজাতি সদন ১৮৮
'মহাভারত সর্বরাজ্য পার্টি ও তার কর্মসূচী' ১০৮
মহারাষ্ট্র ২১৯
মহীশূর ৩২০
মহেন্দ্রপ্রতাপ ৩৩, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭৬, ৭৭, ৮৩-৮৫, ৮৮, ৯০-৯৬, ৯৮-১০২, ১০৫, ১০৯, ১১০, ১১৭, ১২০, ১৮০, ১৮১, ১৯২, ২৪৮, ২৯৭, ৩২০
মাইকেল ডেভিট ২০, ২৪, ২৬
মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৬
মাইরন ফেল্পস, ৯৫
মাওলা বখ্‌শ ১৩৭
'মাজুৎ' ১১৩
'মাজোত্তা' ৩০৮
মাৎসিনি ২৫, ৩৫, ৪৬, ২৭১, ২৭২
মাতঙ্গিনী হাজরা ২৯১

মাদ্রাজ ১৫২, ২০৮
মাদ্রাজি ৩১৮
মাদ্রিদ ১৬০
মাধব রাও ৩১, ৪৬, ৬৩, ১২০
মাধোরাও ২৮৮
মানববন্ধু কানুনগো ২৮৬
মানবেন্দ্রনাথ রায় ৯৩, ৯৪, ৯৯, ১০৪, ১১১-১১৬, ১২৩-১২৭, ১২৯-১৩১, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৮, ১৪৩-১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৩ ১৬৫-১৬৯, ১৭১, ১৭৩-১৭৬, ১৭৮, ১৭৯, ১৮৩, ১৮৬, ১৯০, ১৯৩-১৯৬, ১৯৮, ২০১, ২০৫, ২০৭, ২০৮, ২১০-২১৫, ২১৭, ২১৯, ২২৩-২২৯, ২৪২, ২৪৩, ২৪৫, ২৪৮, ২৬৩, ২৯৪, ৩১৮, ৩২১-৩২৩
'—স্মৃতিকথা' (Memoirs) ১২৫, ১২৭-১২৯, ১৩৬, ১৪৩, ১৪৫, ১৬৭, ১৭১, ১৭৪, ১৭৫, ১৯৩, ১৯৪, ২১৭, ২২৫
মান্দাভী ২৮
মার্কস, কার্ল ৪, ৮, ৯, ১০, ১৪, ২০-২২, ৪৪, ১১৮, ২৪৫, ২৬৫
মার্কসবাদ ২২, ৫২, ৭২, ২৩৭, ২৭০
মার্কসবাদী ৩৭, ৪৪, ৫১, ৫৩, ৫৪, ১৩৫, ১৭০, ২০৫, ২৪৮, ২৬৩
'—দল' ১৮৩
মার্কসীয় ১০৫
মার্টিনিক ৪০
মার্তণ্ড ৫৫
মার্ভ ১৩০, ১৩১
মার্সাই ৪৩, ৪৪, ২৭৪, ২৭৫
মারাঠী (বা মহারাষ্ট্রীয়) ২৮, ১২০, ২১৯, ২২০, ২৮৯
মারাঠে, এন. এস. ৬৪, ৩২০
মারিয়া আলেকজাণ্ড্রোভ্না ফর্টুস ১৬১, ১৬২, ২০৫
মালায়ালি ২২
মালিনোভ্স্কি ২৯৬
মালটা ১০৬, ১০৮, ২৬৯
মাসানি, আর. পি. ২৫৬
'মাসিক বসুমতী' ৩৭৫
মাসুদ আলি খান ১৬১, ১৬২, ২০৫, ২০৮, ২১১, ৩১৪
মাসুদ আলি শাহ্ (কাজী) ১৬৭, ২০২
'মাহ্মুদ' ১১৩
মাহমুদ-উল-হাসান ১০৫, ১০৬, ১০৮
মাহ্মুদজ্জাফর ২৪৬
মিখায়েল ইভাবনোভিচ গ্রোমভ ৩১৫
মিখায়েল তুবিয়ানস্কি ২৬৩
মিত্রমেলা ৪১, ২৭১
'মিত্রশক্তি' (Allied Powers) ৮০, ৮৩
মিত্রোখিন, লিওনিড ৯০-৯২, ৯৭, ২০৪, ২১৯, ২২১, ২২৩, ২২৪
মিনায়েভ ১৪, ১৫
'মির্জা আলি হায়দার' ৯৮, ১১৫, ১৪৭, ৩২০, ৩২১
মিল ২৬৫
মিলখা সিং আট্টা (জলন্ধর) ২৩৫
মিলখি কেরনানা (জলন্ধর) ২৩৬
মিলহ্যাণ্ডস ইউনিয়ন ২৬২
মিশর ৪৯, ৭৯, ১০২, ২৬৯, ৩১৮, ৩২৭
মিশরী ৬১, ৬৩, ৭৯, ২৬৪
মীর আবদুল মজীদ (লাহোর) ১০৯, ১১২, ১৫০, ১৫২, ২০২, ২০৩, ২০৫
মীরাট ১৫, ১৫৬

—ষড়যন্ত্র মামলা ১৫, ১১১, ১৫২, ২৬০, ২৪৭
মুঘল সাম্রাজ্য ২৭৯
মুজফ্ফর আহ্মদ ১৫, ১০২, ১০৫, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৭, ১২৪, ১৩১, ১৩৩-১৩৫, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৪১, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৮-১৫০, ১৫৬, ১৫৮, ১৭০-১৮০, ১৮৪, ১৮৬-১৯৩, ১৯৫, ১৯৮, ২০২, ২০৬, ২০৮, ২১১, ২১২, ২১৯, ২২৪, ২২৫, ২২৭, ৩১২, ৩১৬, ৩৩১, ৩৭৫
মুজাহিদ ১০২, ৩১২
মুজিব আলি ৮৩
মুনজেনবুর্গ ২৩৯
'মুনসি' (জলন্ধর) ২৩৫
মুনীর সিদ্দিকি ১৬১
মুর্তজা আলি ১৩২, ১৩৩
মুশো ২০৩
মুহাজির ৮৯, ১০৩, ১৩২, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৯, ১৪১-১৪৭, ১৫১, ১৫৩, ১৬৩, ১৬৫-১৬৭
মুহাজিরীণ ৯৯, ১০৯, ১২৮, ১৩১, ১৩২, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৫-১৫০, ১৫২, ১৫৭, ১৫৮, ১৬২, ১৬৩, ১৬৫-১৬৭, ২০৬, ২০৭
মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায় ('গুণু') ৬২, ৬৩
মে দিবস ১১২, ১১৬
মেক্সিকো ১১৪, ১৭১, ২২১
—কমিউনিস্ট পার্টি ১১২, ১১৪, ১২৩
—সমাজতন্ত্রীদল ১১৪
মেদিনা ৩১৮
মেদিনীপুর ৩৮
মেনশেভিক ৭৯, ৮০, ২৯২
মেলা সিং 'বিলগা' (জলন্ধর) ২৩৬
মেশেদ ১২৯-১৩২
মেশেদ-কোয়েটা সড়ক ১২৯, ১৩১
মেসোপটেমিয়া ২৮৯
মোপলা (মালাবার) অভ্যুত্থান ১৮৩, ১৮৪
'মোরিয়া' ৪৩
মোহন কুমারমঙ্গলম ২৪৭
মোহিত বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৭
মৌর্য সাম্রাজ্য ২৭৯
ম্যাকডোনাল্ড, র‍্যামজে ৫৪, ১৯০, ২৮৫
'ম্যাক্সিম গর্কি ও ভারত' ৩৫
ম্যাক্সিমালিস্ট ৭৬
'ম্যাভেরিক' ৬৭

যতীন্দ্রনাথ দাস ২৭
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ('বাঘা যতীন') ৬৭, ১৮৫-১৮৭
যবদ্বীপ ৬৬
যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় (ডাঃ) ১৮৬, ১৮৮, ১৯২, ২৫৯, ২৬০
যুক্তপ্রদেশ (উত্তরপ্রদেশ) ১৫৬, ২৪৮
'যুগান্তর' (দল) ১১৩, ১১৫, ১৮৬, ১৯৩, ২২৭
'যুগান্তর' (পত্রিকা) ৪৬, ১১৩, ২৬১, ২৮৩, ২৮৪
'যুগান্তর' (বর্তমানদৈনিকপত্র) ৬৪
যোগা সিং পাণ্ডোরি (হোশিয়ারপুর) ২৩৭
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ২৫
যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৮

যোশী (ডাঃ) ৬৪
যোশী, পূরণচাঁদ ৮১, ৮২, ৮৭

রজনী পাম দত্ত ৫৫, ১১১, ২৪৫, ২৪৬, ২৮১
রটারডেম ৩২০
রণজিৎ সিং ৪০
রতন সিং ২২৮, ২২৯, ২৩২, ২৩৩, ৩১৬
রফিক আহমেদ ১১২, ১১৭, ১৩৫, ১৩৯-১৪৫, ১৪৮, ১৫০-১৫২, ১৫৬, ১৫৭, ১৬১, ১৬২, ১৬৭, ২০২, ২০৪, ২০৫
রফিক মণ্ডল ৬
রবার্ট ওয়েন ৩, ৭, ১৪, ২৫৩
রবার্ট ডেল ওয়েন ৩, ২৫৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫-১৭, ২৪, ২৫, ২৯, ৩২, ৪০, ২০১, ২৩৮, ২৩৯
রমেশচন্দ্র ২৪৭
রমেশচন্দ্র দত্ত ১২, ১৪, ২৪৫
রয়টার ২২৬
রহমান ৬৪
রহমান, এম. এ. ২৪০
রাউলট ১৮৮
—আইন ১১১
—রিপোর্ট ১৮৭, ২০১
রাখালচন্দ্র ঘোষ ১৪৬, ১৮১, ১৮৭, ১৮৮
'রাখি বন্ধন' দিবস ৩৭৫
রাজনারায়ণ বসু ২৪, ২৮১, ২৮৪
'রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণের অধিকার' (Right of Political Asylum) ৪৩-৪৫
রাজপুতানা ৭১
রাজা সিং গ্রৌদি (হোশিয়ারপুর) ২৩৫
রাজা সিং সরদুল্লাপুর (হোশিয়ারপুর) ২৩৫
রাজাবাজার বোমার মামলা ১৮৫
রাটলাম ২৮
রাডেক ১২৭, ২০৩, ২১৮, ২৪৩, ২৯৪
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ১৮১, ৩১৯
রাধানাথ শিকদার ৪
রানা, সর্দার সিং রাওজী ১৮, ৩১-৩৩, ৩৮-৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৭-৫০, ৫৪, ৫৬, ৫৮, ৬১, ৬২, ২৮৫
রানীগঞ্জ ১০
রাপোপার্ট, কার্ল ২৯৩
রাম সিং দত্ত (গুরুদাসপুর) ২৩৭
রামকৃষ্ণ পিল্লাই ২২
রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ১৫
রামচন্দ্র (পণ্ডিত) ২৩১
'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' ৭
রামদাস, গুরু ২৭১, ২৮৯
রামমোহন রায় ৩, ৪, ২৫৩, ২৮০
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ৫১
রাশিয়া ১৫, ১৯, ২৭, ৩৪, ৫২, ৫৩, ৫৮, ৭৩-৭৫, ৭৮-৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৯০, ৯৩, ৯৪, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ১০১, ১০৭, ১১৮-১২১, ১২৯, ১৩২, ১৩৯, ১৫৪, ১৫৫, ১৭৭, ২৩০, ২৪৭, ২৭০, ২৭৬, ২৭৯, ৩২২, ৩২৬, ৩২৭, ৩৭৫, ৩৭৬
রাসবিহারী বসু ৬৭, ১৮৫, ১৮৭, ২৪৭
রাহুল সাংকৃত্যায়ন ১৪০
রিবেনট্রপ ৩০৭
রুটগের্স ১৭৯, ১৮৪, ২১৩
রুমিয়ানৎসেভ, ই. ১৫২, ১৫৩

রুশ ২৭, ৩২, ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৫১-৫৩,৫৫, ৫৭-৬০, ৬৩, ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৮০, ৯০, ৯২, ৯৩, ৯৭, ১০০, ১০৮, ১১৭-১১৯, ১২৬, ১৩১, ১৫৫, ১৫৭, ১৫৯, ১৬২, ১৬৩, ১৮৩, ২০২, ২২১, ২২২, ২৪১, ২৬৪-২৬৬, ২৭৬, ২৭৮, ২৭৯, ২৮৫, ২৯৬, ৩১৩, ৩১৬, ৩২২, ৩২৬, ৩৩০
—কমিউনিস্ট ১১৪, ১৩০
—কমিউনিস্ট পার্টি ৮৭, ১৬৯
—জাপান যুদ্ধ ৫৫
—প্রাচ্যতাত্ত্বিক ২৬৩
—সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ৫৭, ৬২, ২৯৩
—সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি ৩৭, ৫১, ৫৬, ২৯২
রুশবিপ্লব ১, ২৭, ৫১, ৫৮, ৭০, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮৬, ৯০, ১০৩, ১০৬, ১০৮-১১০, ১২৭, ১৩৪, ১৬১, ২০৫, ২০৭, ২৩০, ২৩২, ২৪৪, ২৪৬-২৪৯, ২৭৯, ৩২৫
'—ও ভারতবর্ষ' ১৩৫, ১৩৬, ১৪২, ১৪৩, ১৪৫, ১৫০, ১৫১
"রুশ বিপ্লবী, লাল ফৌজ ও কাজী নজরুল ইসলাম" ১৩৩
'রুশম শ্যামা' ৫৯, ৬০
'রুশো' ১৩
রেডক্রশ ৩০
রেডমণ্ড ২৬
রেজনিকভ, এ. ১২৫
রেণু চক্রবর্তী ২৪৭
রেনস্কি (Wrenski) ৭৫, ২৯৪
রেপসন, ই. জি. ২৬৩
'রেশমি রুমাল ষড়যন্ত্র' (Silk Letter Conspiracy) ১০৬, ১০৮
'রোজার্স' (হোশিয়ারপুর) ২৩৬
রোম ১৬
রোমাঁ রলাঁ ১৯
রোমান ক্যাথলিক ১৬
'র‍্যান্‌ডলফ' (দক্ষিণ ভারত) ২৩৬

লক ৩
লখনউ ৩২০
লঙ, জেমস ৬, ১৫
লণ্ডন ২৪, ২৮, ৩১, ৩৮, ৪৬, ৪৯, ৫০, ৫৬, ৬১, ৬৪, ৬৬, ২২৬, ২৪৬, ২৫৯, ২৭১-২৭৩, ২৮৮, ২৯২, ২৯৬
—ইণ্ডিয়ান মজলিস ২৪০
—ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ৩৮
লাইডেন ২৮
লাইপজিগ ১০৭, ২৩৯
'লাঙল' ৩২৬-৩২৮, ৩৩০
লাজপৎ রায় (লালা) ৩১, ৪০, ৪৯, ১০১, ১০৬, ২০৬, ২৬০, ২৬১
লাড্‌লিপ্রসাদ বর্মা ২৩৮
লাড্‌লিমোহন মিত্র ১৮১, ১৮৬, ১৮৭
লান্সবেরি. জর্জ ২৪০
লাফবরো ৮
লাভ সিং জামশের (জলন্ধর) ২৩৫
'লারসেন' ৬৭
'লাল প্রজাতন্ত্র' ১১
'লাল প্রজাতন্ত্রী' ৭
লালফৌজ ৯৯, ১২৮, ১৩০-১৩৪, ১৩৮, ১৪১, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৯, ১৫২, ১৫৫, ১৫৭, ১৬১, ১৬২
—আন্তর্জাতিক বাহিনী ১৩০-১৩২

লাল-বাল-পাল ১, ২০১
লাহোর ১০৯, ১১০, ২০২, ২২৮, ২৮১, ২৯০, ৩১৪, ৩১৫
—ষড়যন্ত্র মামলা (১) ২৩১
—ষড়যন্ত্র মামলা (২) ৩৪
লাহোরের মুজাহিদ ছাত্র ৯৯, ১০২, ১০৬, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১৫৮, ১৬৬, ৩১২, ৩১৫
লিউডিমিলা, মিখায়েলোভ্না ১৬২
'লিটন' ২৩৬, ২৩৭
লিটভিনভ ২৮৫
লিডিয়া এডোয়ার্ডোভনা করনোভ্স্কাইয়া করনোভ্স্কাইয়া, লিডিয়া এডোয়ার্ডোভনা দ্রষ্টব্য
লিডিয়া ফটিয়েভা ১৮২
লিবক্লেখ্ট, কার্ল ৫৪-৫৬, ১০০, ১১৪, ২৮৫
লিভারপুল ৮
লিম্বর্ডি ৩৮
লিলিয়ানা ১৩২
লিস্টারশায়ার ৮
লুই ব্লাংক ৭, ১৪
লুই রোলা ২৭৫
লুক্সেমবুর্গ, রোজা ৫৩-৫৫, ১১৪, ২৮৫
লুঙে, জাঁ ৪৪, ৬৩, ২৭৫, ২৯৩
লু চুং লিঙ ২৪০
লুধিয়ানা ৩১৩
লুনাচারস্কি ২২২, ২৮৫, ৩২২
'লুমানিতে' ৪৩, ৬৩, ২৭৪, ২৯৩
লুস্তারনিক, ইভা ৫২
লুহানী, গুলাম আম্বিয়া খান ১১৩, ১৯৫, ২০৮-২১৫, ২১৭, ২১৮, ২২৪, ২২৫, ২৪৮, ২৯৪, ২৯৫, ৩১৭, ৩১৮
লেথব্রিজ ৬
লেনিন (ভি. উলিয়ানভ বা 'ইলিচ') ৪৩, ৫১, ৫৩-৫৭, ৫৯, ৬২, ৬৯, ৭০, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৮৩-৮৬, ৮৯, ৯১-৯৪, ৯৬-১০১, ১০৪, ১০৯, ১১৬, ১১৭, ১২১, ১২২, ১২৪-১২৬, ১৪৬, ১৫৪, ১৫৯, ১৮১-১৮৪, ১৮৮, ১৯৪, ১৯৯, ২০১, ২০৩-২০৫, ২০৭, ২০৯, ২১৪-২১৯, ২২১-২২৪, ২২৬, ২২৮, ২২৯, ২৪১, ২৪৩, ২৪৫, ২৪৭, ২৪৮, ২৫৮, ২৬০, ২৬৫, ২৮৫, ২৯২-২৯৬, ৩১৬, ৩২৩, ৩২৫
—মিউজিয়াম ৮৬
—লাইব্রেরি ১৬৪, ২৬৪
'লেনিন ও ভারতবর্ষ' ২৯৬
'লেনিন প্রসঙ্গে প্রাচ্যপ্রতীচ্যের রাজনীতিবিদ ও লেখকবৃন্দ' ১০৪
'লেনিন ভাইয়ের ডাকে সাড়া দাও' ১৯৭
লেনিনগ্রাড ১৫, ৬২, ৭৪, ৭৫, ৮৩, ৮৪, ৮৭, ৯৫, ১৫৫, ১৫৬, ১৭২, ১৮২, ২৪১, ২৬৩, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩১
—বিজ্ঞান একাডেমি ৫৬, ৭০, ২১৫, ২৯২, ২৯৫, ২৯৬
—বিশ্ববিদ্যালয় ১৪
—'ইনস্টিটিউট ফর ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ' ২৬৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৯
লেনিনবাদী ২২৩
লেরয় স্কট ৩১, ৩২
ল্যাটিন আমেরিকা ৬৬, ২৩১
ল্যাটভিয়ান ১৬২
ল্যাভরভ, আর. ৮৪, ২০১, ২৩৩

শওকৎ উসমানি ১১২, ১১৩, ১৩২, ১৩৫-১৩৮, ১৪০-১৪৫, ১৪৮-১৫২, ১৬২, ১৬৭, ২০২, ২০৩, ২০৮-২১১, ২২৯
শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ২৮১, ২৮২,
'শততারের আতি' ১৫৪
শম্ভু রায় (জমাদার) ১৩৪
শরণ সিং বাটুরা (জলন্ধর) ২৩৪
শরণ সিং সন্ধালি (জলন্ধর) ২৩৬
শরৎচন্দ্র দাস ১৫
শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২
শাইডেমান ১১৪
শান্তিদেবী— এভেলিন রায় দ্রষ্টব্য
শান্তিনিকেতন ২৯০
শামসুল হুদা ২৪৭
শাহ্জাহানপুর ২০২
শাহীর, আর. ১৭১
শিখ ১০২, ১২০, ২২০, ২৩১, ২৯০
শিটভ্ ১৮২
শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৬, ৯৯, ১০২, ১০৬, ১০৭, ১১০, ১৪৭, ২০৬, ২১৬
শিবনাথ শাস্ত্রী ৭, ১২, ১৩
শিবপ্রসাদ গুপ্ত (বাবু) ৩৪
শিব সিং (জলন্ধর) ২৩৬
শিবাজী ৩৮, ২৭১, ২৭৯
—উৎসব ২৬১
শিয়ালকোট ৩১৭
শিল্পবিপ্লব ২১
শিশিরকুমার ঘোষ ৬, ১১
শেখ আবদুল্লা ৩১২
শেবোব্রবাকভ, আই. ১৩৩, ২৪১, ২৪২, ৩২৫
শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ৮২
শোভান ৬৪
শোলাপুর ২৯০
'শৃঙ্খলাবদ্ধ ভারত' ১৫৩
শৌকতুল্লা আনসারী ২৪৬
'শ্রমজীবী' (ভারত) ১২
'শ্রমজীবীদের যুক্তরাষ্ট্র' ১০৯
শ্রমজীবী সমিতি ১২
শ্রমিক ও কৃষকের প্রজাতন্ত্র ১২১ ১২৬
'শ্রমিক কৃষক দল' ৩২৬
শ্রমিক কৃষকের দাবিদাওয়া আন্দোলন ১২৬
'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলায় স্বদেশী যুগ' ১৩
শ্রীকিষণ ৬২
শ্রীশচন্দ্র বসু ২৮০, ২৮১
শ্রীশচন্দ্র সেন ৬৪
শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা— কৃষ্ণবর্মা, শ্যামজী দ্রষ্টব্য
সঈদ আহ্মদ রাজ ২০২
সখারাম গণেশ দেউস্কর ২৬০, ২৬১
সংস্কৃত ২৮, ২৬৭
'সঞ্জীবনী' (পত্রিকা) ৬৩, ২৫৮ ২৮৩, ২৮৪, ৩৭৬
'সঞ্জীবনী সভা' ২৪
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২০, ১৩৯
সতীশচন্দ্র রায় ৫৪
সতীশ পাকড়াশী ২৮৩
সত্যনারায়ণ সিংহ (ডাঃ) ১৯৬
সত্যব্রত সামশ্রমী ৪৭
সত্যমূর্তি ২০১
সত্যেন্দ্রনাথ বসু (বিজ্ঞানী) ১৮১
সত্যেন্দ্রনাথ বসু (মেদিনীপুর) ৩১ ২৬১, ২৬২
সত্যেন্দ্রনাথ সেন ২৩১

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ২৩৮, ২৩৯
সন্ত সিং 'গণ্ডিউইণ্ড' (অমৃতসর) ২৩৪
সন্তোখ সিং ২২৮, ২২৯, ২৩২, ২৩৩
সন্ত্রাসবাদ ৭, ১৭৭, ১৯১, ১৯৩, ২৬৬
সন্ত্রাসবাদী ১৮৪, ১৮৫, ২৬৯, ৩৭৫
'সন্ত্রাসবাদী' ২৬৯
'সন্ধ্যা' ২৬০
'সপ্তাহ' ৩০৭, ৩০৮
সমরখন্দ ১২০, ১২৩, ৩১৫
'সমাজভেদ' ২৯
'সমসাময়িক সাহিত্যে ভারতবর্ষ' ১৮২
সমাজতন্ত্র (বা সমাজতন্ত্রবাদ বা সমাজবাদ) ১৭, ১৯, ২১, ২২, ২০৭, ২৬২
সমাজতন্ত্রী (বা সমাজতান্ত্রিক) ১, ৩, ১৮, ২০-২২, ২৫, ২৭, ২৯, ৪৫, ৪৭, ৪৯, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৬৩, ৭৩, ৭৫, ৭৭, ৮০, ১০৯, ১৭০, ২০৭, ২৫৮, ২৭৪, ২৭৫, ২৮৪, ২৮৫, ২৯৩
শম্ভাশিব রাও ৬৪
সর্দার সিং রাওজী রানা—রানা, সর্দার সিং রাওজী দ্রষ্টব্য
সর্দারা সিং চিমা ২২৮, ২৩১, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৭, ৩১৬, ৩১৭
'সর্বরাজ্য' ১০৭
সরফ আথার আলি ২৪৭
সরলা দেবী ৫৯
সরোজিনী নাইডু ৫৯, ৬১, ২০১, ২৩০
সাইগন ৩৩১
সাইবেরিয়া ৩১৩, ৩২৮
সাকলাৎওয়ালা, সপুরজী ২৪০, ২৪৪-২৪৬
সাংহাই ১৯৩, ৩১৩
সাজ্জাদ জহীর ২৪৬
'সাধনা' ১৫, ১৬
'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ৩, ২৮৩
সান্‌ফ্রানসিস্কো ১০০, ২৩৪
সাফারভ ২২৯
সাফ্রান্‌স্কি, নিকলাস ৪৮
সাভারকার, গণেশ দামোদর ৩২, ৩৯, ৪১, ২৭১, ২৭৩
সাভারকার, বিনায়ক দামোদর ৩১, ৩২, ৩৬, ৩৮, ৪০-৪৬, ৫০, ৫২, ৫৮, ৬১, ২৭১-২৭৭, ২৮৬, ২৮৭
'সাম্য' ১৩, ১৪
'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা' ২৮০, ২৮৪
সাম্রাজ্যবাদ ৭৩, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৯২, ৯৭, ৯৮, ১২৮, ১৩৪, ২০৭, ২১৪, ২১৫, ৩০৯, ৩২০, ৩২৪
সাম্রাজ্যবাদী ৭১, ৭৪, ৭৫, ৭৮, ৮৯, ৯০, ৯৬, ১১৮, ১৩০, ১৩৫, ২৯৪, ২৯৬
'সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংঘ' (বা 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও জাতীয় স্বাধীনতা সমর্থক সংঘ') ৩৩, ৯৯, ২১৬, ২৩৯, ২৪১, ২৯৫
'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মেলন ৩৪
সার্ডিনিয়া ৪২
সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ২৬১
সাল্টিকভ-সেড্রিন লাইব্রেরি ৯৫
সাঁহরি ৩৯
সিঙ্গাপুর ৬৬, ১৭০, ১৭৪, ১৮৭-১৯৩, ১৯৫

সিদ্দিকী ৬৪
সিনাই মরুভূমি ৩২০
সিপাহী বিদ্রোহ ৫, ২০, ৩১, ৪২, ৪৫, ৫২, ১১৯, ২৬৯, ২৭২, ২৭৩
সিরিয়া ৮৮
সিরিলিক ৬০
সীতারামাইয়া, কোলাচালা ২৪৭, ২৪৮, ৩১৪-৩১৬
সীতারামাইয়া পট্টভি (ডাঃ) ৫৪, ১৩৬, ২৯০, ২৯১
সুইজারল্যাণ্ড ৩৩, ৩৪, ৪০, ৪৯, ৬৪, ৭৩, ১০০, ১২০, ২০৯, ২৮৮, ২৯৩, ৩২০, ৩২১, ৩২৪
সুইডেন ৬৯, ৭৪, ৮৪, ৮৫, ১০১
সুকতাংকার ৬৪
সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৫৩
সুকিয়া স্ট্রীট ১৮৬, ৩২৬
সুকুমার মিত্র ৬২, ৬৩, ২৫৮, ২৮২-২৮৪, ৩৭৫, ৩৭৬
সুচকভ, ইলিয়া ১৮১, ১৮৪
সুজাউল্লাহ ৩১২
সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮৩
সুন ইয়াট্-সেন (মাদাম) ২৪০
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৮১, ১৮৭, ২৯০, ২৯১, ৩৩২
সুফী অম্বাপ্রসাদ— অম্বাপ্রসাদ, সুফী দ্রষ্টব্য
সুবা সিং ঠাঠিয়া (অমৃতসর) ২৩৬
সুভাষচন্দ্র বসু ২৭, ৬৫, ৬৯, ১৭৮, ২২৬-২২৮, ২৯১, ৩০৭-৩০৯
সুমাত্রা ১৮৮
সুমিত সরকার (ডাঃ) ২৬২
'সুয়েজ খাল মিশন' ৬৪-৬৬, ১৪৭, ৩১৮, ৩২০
সুরিৎস, ইয়াকভ ৯২, ৯৬, ১৫৮
সুরেন্দ্রনাথ কর ২৩০-২৩৩, ২৪৮, ৩২৩
সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ২৮১
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২, ২৫, ৩১, ২০১, ২৫৬, ২৮২-২৮৪
সুরেন্দ্রনাথ হালদার ২৬১
সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ৩২৩
সুলতান জাদে ১২৬
সুলতান মাহ্মুদ রিহানা ১৩৯, ২০২
'সুলভ সমাচার' ১০, ১১
সুলেমান ১১৮
সুশোভনচন্দ্র সরকার (অধ্যাপক) ২৪৬
সুসং পরগণা ৭
সুহাসিনী চট্টোপাধ্যায় ২৩০
সেইন ৫৭
'সেকেন্দার সুর' ১১৩
সেন কাটায়ামা ৫৫, ৫৬, ২৩৯
সেণ্ট পিটার্সবার্গ (লেনিনগ্রাড) ১৫, ৩৬, ৫১
সেণ্ট সাইমন ৩, ৬, ৭, ১৪
সেবাস্তোপোল ১৫৭, ১৫৯
সেসিল কে ১৯০, ২২৬
সেগেইয়েভা, এন. ১৬৩, ১৯৭
সোফিয়া ডবসন কলেট ৩
'সোভ্রেমেন্নিক' ৩৬
সোভিয়েত (সোভিয়েত দেশ, সোভিয়েত ইউনিয়ন) ৩৩, ৩৭, ৪৮, ৫৯, ৭৫, ৭৭-৮১, ৮৩-৮৬, ৮৯-৯২, ৯৫, ৯৭, ৯৯, ১০১, ১০৩-১০৯, ১১১, ১১৩, ১১৬-১১৮, ১২০, ১২২, ১২৩, ১২৯, ১৩১-১৩৪, ১৩৭-১৪৩, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০-১৫৮, ১৬০-১৬৪, ১৬৮, ১৮১, ১৮২, ১৯৪-১৯৮, ২০১, ২০৪, ২০৫, ২০৭,

২১০, ২১১, ২১৫, ২১৭-২২৪, ২২৮-২৩০, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৯, ২৪০-২৪৪, ২৪৬-২৪৮, ২৬৩, ২৯২, ২৯৪, ২৯৫, ৩০৮, ৩০৯, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫-৩১৮, ৩২১-৩২৩, ৩২৫-৩২৭, ৩৭৫
—আন্তর্জাতিক বিমান বাহিনী ১৬২
—আফগান মৈত্রী চুক্তি ৯৬
—এনসাইক্লোপিডিয়া ১৫৫
—কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৭, ১৯৮, ২১৮, ২৪৩, ৩১৪, ৩১৭
'—দেশ' ৮৪, ১০৪
—মধ্য এশিয়া ১২০, ১৬৩, ৩১৫
—লেখক সংঘ ১৫৫
—রাশিয়া ৭৯, ৮৬, ৮৯, ৯৬, ১০৭, ১৭৭
'—রাশিয়া, আজারবাইজান, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, তুর্কি' ২৬৩
'—রাশিয়ায় ভারতীয় বিপ্লবী' ৮৪
—সোশ্যালিস্ট গণতন্ত্র সংঘ ৩২৬, ৩২৮
'—সমীক্ষা' ৩৫
—সরকার ৮৩, ৮৫, ৯৬, ৯৭, ১০৯, ১২৯, ১৪৩, ১৬১, ১৬৩, ২০৪, ৩২২, ৩২৫
—সারা রাশিয়া কেন্দ্রীয় কার্য নির্বাহক কমিটি ৮৬, ১৮২
—সুহৃদ সংঘ ৭২
'সোমপ্রকাশ' ৬
সোলোগিউবভ, আই. এস. ১৬৪
সোয়াহি ৩১৫
সোরাবজী ফ্র্যামজী প্যাটেল ৪৯
সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ৭৩
—ডেমোক্র্যাটিক দল ৫৭, ৭০
—ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশন ২৪, ৪৬, ২৫৭
—রেভলিউশনারি ৩২
সোশ্যালিজম ১৬, ১৭, ১৯, ৪৮, ২১৪, ২৫৯
সোশ্যালিস্ট ৪৬-৪৮, ৭২, ৮৮, ৯৫, ২৫৯, ২৬১, ২৭৯
—ইন্টারন্যাশনাল ১৮
—পার্টি (দল) ৫, ৮
'সোশ্যালিস্টিক বিড়াল' ১৩
সোহন সিং কোটলি (জলন্ধর) ২৩৭
সোহন সিং ভাখনা ২৩১
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১১৩, ২৪৭
সৌরাষ্ট্র ৩৮
স্কলিয়ানস্কি, এ. এম. ১৫৮, ১৫৯
স্কোবোলেভ ৭৯
স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ২৪৫
স্টকহল্ম ৬৯, ৭৩, ৭৪, ৭৭-৮২, ৮৪, ১১৩, ২৯৩, ৩২২
স্টানিৎস্কি ১৫৫
স্টুটগার্ট ২৮৪
—সম্মেলন (সমাজতান্ত্রিক বা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন) ৪৭, ৫২, ৫৪-৫৭, ৬২, ২৮৫-২৮৭, ২৯৩, ২৯৫, ২৯৬
স্ট্রম্ ২০৭
স্তাম্বুল— ইস্তাম্বুল দ্রষ্টব্য
স্তালিন ১৬২, ২৪৩
স্তালিনগ্রাদ ১৬১, ৩১৪
স্নেহাংশু আচার্য ২৪৭
স্পার্টাকুস গোষ্ঠী (লীগ বা আন্দোলন) ৫৬, ৭৩, ৭৭, ৮০
স্পেন ১১৪
—গৃহযুদ্ধ ১৬০, ১৬১, ২০৫, ৩১৬

—প্রজাতন্ত্রী সরকার ১৬০
'স্বদেশ' ২৯
'স্বদেশাভিমানী' ২২
স্বরাজ্য ১০৮
'স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস' ১৩৫, ১৩৮
'স্বাধীনতা সংগ্রামে তুর্কি' ২৬৩
'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতবর্ষ' ৩৭, ২৬৪
স্বামী বিবেকানন্দ ৩১৯
স্ভাদ'ল্ভ, ইয়াকভ ৮৬
'স্যাঙ্গার' (হোশিয়ারপুর) ২৩৬

হংকং ৬৬, ৩১৪
হফমান ৮০
হবিবুল্লা (আমীর) ৯৬, ১০২
হবীব আহ্মদ নসীম ১১৩, ১৪৩, ২০২
হবীব, মহম্মদ ১৪৩
হর্স্ট' ক্রুগার— ক্রুগার, হর্স্ট' দ্রষ্টব্য
হরজব সিং 'মাহিলপুরী' (হোশিয়ারপুর) ২৩৪
হরদয়াল (লালা) ২১, ২২, ৩১, ৩৩, ৪০, ৬৪, ২১২, ২২০, ২৩১
হরনাম সিং ২৩১
হরনাম সিং (সাহ্রি) ৩৯
হরনাম সিং (সর্দার) ১০২, ১০৩
হরনাম সিং 'কাসেল' (অমৃতসর) ২৩৪
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৫
হরবংশ সিং বাণ্ডালা (জলন্ধর) ২৩৫, ২৩৬
হরিশ মুখার্জি ৬, ১৫, ২৫৬
হরিশ্চন্দ্র সিংহ ১৮১, ১৮৭
হরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৩৭
'হল অফ কলাম্স' ৮৭
হল্যাণ্ড ২৭৪
হাইণ্ডমান ২০, ২৪, ২৫, ২৯, ৪৬, ৫৪, ৫৬, ২৫৫-২৫৮, ২৯২
হাওড়া ১৪
—আমতা লাইট রেলওয়ে ১৮৭
হাঙ্গেরিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি ১৬৪
হাজরা বেগম ২৪৭
হাজারা ২০২
হাজী ৩১৮
হান্টার, ডবলিউ, ডবলিউ. ৭
হান্টার রিপোর্ট ২০১
হাফিজ, আবদুল ২০৯
হায়দ্রাবাদ ৬১, ৬২, ২৩০
হার্বার্ট স্পেন্সার ৩০, ২৬৫, ২৬৮, ২৭২
হিউম, এলান অক্টেভিয়ান ১৭, ১৮
হিজরৎ (আন্দোলন) ৮৯, ১০৩ ১৩৫, ১৩৬, ১৩৮, ১৪৪, ১৪৫, ১৬৬, ২০৬, ২০৭, ২৪৭, ২৪৮
—প্রথম কাফিলা ১৩১, ১৪০, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭-১৫২, ১৫৭, ১৬২, ১৬৬, ১৬৭
—দ্বিতীয় কাফিলা ১৪০, ১৪৩-১৪৫, ১৪৮-১৫১, ১৬৭
হিজরতী ১১৭, ১২৩, ১২৮
হিটলার ১১১, ২১৬, ২৪১, ২৯৫, ৩০৮
হিন্দী ৪২, ৩২৫
হিন্দু কলেজ ৫, ২৮০
হিন্দুকুশ ১১৮, ১৪২
হিন্দু জাতীয়তাবাদ ১৩৯
'হিন্দু পেট্রিয়ট' ৬
'হিন্দুস্তান মঞ্জিল' ১০৭
হিন্দুস্তান সেবাদল ১০০, ২৪০
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ২৬২

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৪৬
হুকুমা সিং (জলন্ধর) ২৩৫
হৃষিকেশ লাট্টা ৬৫
হেগ ২৭৪, ২৭৭
—ট্রাইবুনাল (বা আন্তর্জাতিক আদালত) ৪৪, ৪৫, ২৭৪-২৭৭
হেজাজ ১০৫
'হেনরী, এস.' ৬৭
হেল্টিজ, ফন ৬৫, ৬৮
হেমচন্দ্র কানুনগো (দাস) ২৯, ৩২, ৩৮-৪১, ৪৬-৪৮, ৬২, ২৬১, ২৮৬-২৮৮
হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডা: ৩২৩
হেরম্বলাল গুপ্ত ২০৮, ২১০, ২২৪, ২৮৭, ২৮৮, ৩৭৫
'হোমরুল' ৩০
—সোসাইটি (ইণ্ডিয়ান) ৩০, ৩১, ৩৮, ৪১
হ্যামিলটন ডেকার (লর্ড) ২৭৫
হ্যারিসন রোড ৩৩০

Ainuddaulla ৩০৩, ৩০৬
Abaninath Mukherjee (A. N. Mukherjee) ৩৩২-৩৩৭, ৩৩৯-৩৪৪, ৩৪৯-৩৫১, ৩৫৩-৩৫৫, ৩৫৮-৩৬১, ৩৬৪-৩৭৪
Abdul Bari ৩০৩
'About the Founding of the Communist Party of India at Tashkent' ১৬৬
Acharya, M. ৩৭৭
Aden ৩৬০, ৩৬১
'Admiral Togo' ৫৯
'Advance-Guard' ২২৫, ২২৯
Afghanistan ২৯৭, ২৯৮, ৩০১-৩০৬, ৩৩৩, ৩৭০
—Government ২৯৯-৩০১, ৩৬৩
Africa ৩৬৩
'Age of Reason' ৪, ৩০৭
'Agrarian India' ১৮৩
Ahluwalia, M. M. ১১৯
Ahmedabad ৩৩৭
'All-seeing heart of a poet' ১৫২
America ৩৪০, ৩৩১, ৩৪৬, ৩৬২, ৩৬৮, ৩৬৯
Amir-ul-Mujahideen ৩০৩
'An Apology for Pubna Rioters' ১৪
'An Autobiography' (Nehru) ৯৫, ১০০, ১০৬, ১০৯, ১৩৭, ২৩৮
'An Embarassing Associate' ১১৬, ৩৩৭
Anglo-Persian Oil Company ৩১৭
Angrez ৩৩৪
Anushilan Samiti ৩৬৭, ৩৭২
Arabic ৩৫৩, ৩৫৪
'Army of God' ১০৩
Asia ৩৬০
Atlantic ৩৬১
Aurobindo, Sri ৩৪৪, ৩৬৬
Answartiges Amt. ৩৩৭
'Autobiographical Writings' (Lajpat Rai) ১০১
Avdul Kadir Khan ৩০২
'Aviswaraniya' ৩৭৩

'Awakening East' ৯১
'Awakening in Bengal' ৫
Azan ৩৫৪

Bahir Simulia ৩৩৩
Balt ৩১০
Baluchistan ৩৩৩
Bankim Chatterjee Street ৩৭৩
Barkatullah, Maulavi ২৯৮-৩০১, ৩৬৪, ৩৭০, ৩৭৩
Bashir, Maulavi ৩০১
Batavia ৩৫৯, ৩৬০
Bay of Bengal ৩৪১, ৩৪৬
Bay of Biscay ৩৬১
Bengal ৩৩৪, ৩৪১, ৩৫১
—Partition ৩৪২
'—Magazine' ১৪
Bengali ৩৩২, ৩৩৪, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৬, ৩৫২
—(language) ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৫৩, ৩৬৪
'Bengali Self-Taught' ৩৩৮, ৩৭৩
Berlin ২৯৭, ৩০৪, ৩৪০, ৩৪৩, ৩৫৯, ৩৬২, ৩৬৪, ৩৬৯, ৩৭৪, ৩৭৭
Bholanath Chatterjee ৩৪৭
Bhopal ৩০২
Bhupati Mazumdar ৩৪৭
Bhupendranath Dutt (Dr.) ৩৬৪, ৩৭৭
Bihar ৩৪৮
Black and Tan ৩৪৯
'Bodley Head' ৩৪
Bolshevik Revolution ৮৭, ১২৫, ৩৬৩
Bombay ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪১
'Bombay Chronicle' ৪৯
Bokhara ৩০৪
Brest-Litovsk ৩১০
Britain ৩৪৫, ৩৫৭, ৩৬২, ৩৬৩
British Labour party ৩১০
—Rulers of India ৩৩৩
—Government ৩৩৭, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫৫, ৩৭১
Bucharest ২৯৭
Budapest ২৯৭
Bundesrat ৩০৯
Burra Bazar ৩৩৮

Cabet, Etienne ১৪
Calcutta ৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৬-৩৪০, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৫১, ৩৬৪-৩৬৬, ৩৬৮, ৩৭২, ৩৭৩
—University ৩৪৬, ৩৬৫
—University Calendar ৬
'—Literary Gazette' ৫
'Cambridge History of India' ২৬৩
Carr, E. H. ৮৭
'Caste, Culture and Socialism' ১৯
'Central Asia in Modern Times' ৯৮, ১০৫, ১১৭, ১১৮, ১২৮
Ceylon ৩৬১
Chalta Bagan ৩৩৩
Chandicharan Chatterjee, Rai Bahadur ৩৩২

Chatterjee House ৩০২
Chaudhuri, A. ৩৭৭
China ৩০২, ৩০৪, ৩০৫, ৩৪৮
Chinmohan Sehanavis ৩৩৪, ৩৭৪
Clienow ৩০৪
Collet, Sophia Dobson ২৮০
Colombo ৩৬০, ৩৭২
'Colonialism in East-West Relations' ৮৪, ১০৭, ১২৬, ১৩২
'Comintern Congresses and the C.P.I.' ১২৪, ২০৯, ২২৯
'Condition of the Working Class in England in 1844' ২১
Communism ৩৫৬
'Communism in India' ১২৫, ২২৬, ২২৮
'Communism and Bengal's Freedom Movement' ১৭৮, ১৮৩, ৩৭৬
Communist ৭, ৫৯, ৩৬৫, ৩৭৩
'Communist Revolution—Final Solution of the Problem' ২১৬
Constantinople ২৯৭, ২৯৮, ৩০৫
'Constitution of the Federal Republic of India' ১০৭
'Council for International Propaganda' ১২১
Comwell, Oliver ৩৪৯
Curie ৩৬৯, ৩৭১
Curzon, Lord ৩৪২, ৩৭০

Dacca ৩৬৭, ৩৭২
—Univresity ৩৭১
Dadabhai Naoroji ২৫৬
'Daily Express' ৩৬
'Daily Telegraph' ৩৬
Daud Ali (Promothonath) Dutt ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৬৪
'Daud Ali Dutt— Story of a Patriot' ৩৩৪
'Dawn' ২০, ২১
'Decolonisation Theory' ৩১৮
'Decolonisationist' ১৯৭
Delhi ৩৭২
Denmark ৩০৯
'Der Neue Orient' ৭৯, ৮৮
Devendra Kaushik ১১৭
'Dialectics of Land Economics of India' ৯১, ২১৭
Dilip Kumar Roy ৩৬৬, ৩৬৭
'Documents relating to early Indian Communists and controversies around them' ১৭৭
Dünaburg ৩০৪
Dutch ৩১০, ৩৫০, ৩৫৫-৩৫৭, ৩৫৯, ৩৬০
—Indies ৩৫৯

East Indies ২৫৪
'Eastern Post' ৮, ৯
'Economic Situation in India and the British Policy' ১৮০, ১৯৬
E'C C I ১২৬
Egyptian ৩১০
E. I. Railways ২৬০
Einstein, Albert ৩৬৯

Ellen Key ৩১০
'Ercydae' ১৪
England ৩১০
'England's Debt to India' ২০১
Enver Pasha ২৯৭
'Ethics of Dynamite and the British Despotism in India' ৩২
Europaisches Zentralkomitee der Indischen Nationalisten ৩৭৭-৩৭৮
Europe ৩০৪, ৩০৬, ৩৩৯, ৩৪৪, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬৪, ৩৬৬, ৩৭১
'Evolution of Indian Nationalism' ২০১

Faizal Huque ৩০২
Far East ৩৪৯
Finland ৩০৯
Finn ৩১০
First International, General Council ৮
Fitinghoff, Rosa Solemona ৩৭৪
'Foreign Legion' ৩২৪, ৩৩১
'Forward Policy' ১১৮
Fourier ৬
France ৩৩৯, ৩৪৫, ৩৬৯, ৩৭১

'Gaelic American' ৪৯, ৩৩১
Gandhi Mahatma ৩৬৪
Ganga Narayan Chandra ৩৭৩, ৩৭৪
German ২৯৭, ৩০০, ৩০৪, ৩১০, ৩২১, ৩৩৩, ৩৪১, ৩৪৪-৩৪৬, ৩৪৮, ৩৫৭-৩৬০, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৭
—Foreign Ministry Archives ২৯৭, ৩২১
—Government ২৯৮, ৩৪৬
Germanic ৩৪৫
Germany ২৯৯, ৩০১, ৩০২, ৩০৪, ৩০৫, ৩৩৯-৩৪৩, ৩৪৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬৫, ৩৬৯, ৩৭৩
Gibraltar ৩৬১
Girish Mathur ২৭
'Glasgow Socialist' ১১৫
'Glimpses of World History' ১৩৯
'Gora' ৩৭৩, ৩৭৪
Greece ৩৩৯, ৩৬৫
'Griha Pravesh' ৩৩৪
Gujarat ৩৩৭, ৩৩৮
Gujarati ৩৩৮
Gupta, J. N. ১১

Hazi Abdul Rasiq ৩০১
Hamilton ২৫৪
Hartog, Dr. ৩৭১
Hentig, von ২৯৮
Herat ২৯৮, ৩০১
Herr Geheimrat Rhomberg ৩৭৭
Hindi ৩৬৪
'Hindu Patriot' ২৫৬
'Hindusthan Association (of Central Europe) ২৩০
Hiragana ৩৩৮
'History of the Congress' ২৯১
'History of the Political Thought from Rammohan

to Dayananda 1821-84' ৪, ২৮০
'History of the October Revolution' ৮৫, ৮৬
Holland ৩৫৯, ৩৬১, ৩৬২, ৩৭৪
'Homeless World' ১৩৬
'Home Rule League' ২৮৯
Hongkong ৩৪১, ৩৪৬, ৩৪৮
Hyderabad ৩০২
'Hyndman and India' ২৫৮

'I am a Socialist' ১৯
'In Common They Fought' ১৩২
'In Search of Freedom' ১৮৮
India ২৮৫, ৩০৩, ৩০৫, ৩১০, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৪০-৩৪৭, ৩৪৯, ৩৫৩, ৩৬২-৩৭৪
'—and Early Years of Soviet Foreign Policy' ১৯৯
'—and the Russian Revolution ২০৩, ২০৮
—Government of ৩৩৯
'—in Transition' ১৬৮, ১৮৩, ২২৫, ২৬৩
'—in the Victorian Age' ১৪
—Provisional Government ৩০০
'—Today' ২৪৫, ২৪৬, ২৮১
'—under the early British Rule' ১৪
—Western ৩৩৮, ৩৪৩
Indian ৩০৬, ৩১০
—Civil Service ৩৩৯
—Committee for Russian Famine Relief ২৩০
'—Economic Problem' ২০
'—Fairy Tales' ২৬৩
'—Freedom' ১৮
'—Hijrat of 1920' ১৩৬
'—Independence' ২২৯
—Independence Committee (I.I.C.) ৬৪, ২৮৮, ৩৭৭
'—Musalmans' ৭
—National Committee of Stockholm ৭৯
—National Society ২৮০
—Nationalist Party ৪২
—Nationalists' European Central committee ৩৭৭
—News and Information Bureau ২২০, ২২১, ২২৯
'—Opinion' ৫১
—Revolutionary Association' ১২১, ১২৪
—Revolutionary Committee ১৬৮
'—Revolutionary Party' ১২৪
'—Revolutionaries in Soviet Asia' ৯০, ১০৩
'—Revolutionaries in Soviet Russia' ১০৭, ১২০
'—Ryot' ১৪, ১৫
'—Seditionists' ২৩০
'—Sociologist' ২৮, ৩০, ৩১, ৩৩-৩৫, ২৬৬, ২৬৯
'—War of Independence' ৩১, ২৭২

'Indianhe Geselleschaft' ৩৭৭
Indology ৩৭
Indonesia ('Netherlands Indie') ৩৫৫
Industrial Workers' World (I. W. W) ১৪৮
Institute of Ethnography ২৪১
Institute of Oriental Studies ৩৭০
Institute of Red Professors ৩৭০
International Agency of Aid to the Fighters of Revolution ২১৫
International Olympic Exhibition, London ৩৭২
'International Press Correspondence' ('Inprecor') ৫৯, ২২৭ ৩১৭
International Socialist Bureau ৩১১
'Internationale', The ৫৩, ৫৫
Iran ৩৩৩, ৩৬৪
Ireland ৩৪৯
Irish ২৫, ৩৪৮, ৩৪৯
Islamic ৩৫৪
Italy ৩৩৯, ৩৬৫

Jakarta ৩৫৯
Japan ৩০৫, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৭
'Japanese Grammar Self-Taught' ৩৩৮, ৩৪১
Jatindranath Mukherjee ('Bagha Jatin') ৩৪১, ৩৪৭
Java ৩৫১, ৩৫৯, ৩৭০, ৩৭৪
Jessore ৩৩৬
Jewish ৩৭১
Jitendranath Majumdar ৩৬৭
Joffe ৩০৪
Joshi, V. ৩৭৭
'Justice' ২৫৬, ২৫৭

Kabul ২৯৯-৩০১, ৩৭০
Kach ১৫৯
Kalima ৩৫৩
'Karl Marx—a Modern Rishi' ২২
Kasim Bey ২৯৮, ৩০৩, ৩০১
Katakana ৩৩৮
Kaul, M. N. ৩৭৭
Ker, James Campbell ৬৩
Kerensky ৩১০
Khaira Professor of Indian Linguistics and Phonetics ৩৬৫
Khanabad ৩০২, ৩০৪
'Khilafat to Partition' ১০৯
Khariuddeen Bey ৩০১
Khulna ৩৩৬
Koran ৩৫৪
Krishnalal Dutta ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৬
Kshitinath Mukherjee ৩৩৫, ৩৪৩, ৩৬৮, ৩৬৯
Kshudiram ২৮৮
Kukas—the Freedom Fighters of the Punjab' ১১৯
'K U T V' ১৬৩, ২০২

Labour Aristocracy ৫৪

'Labour Monthly' ২৪৬
'La citoyenne' Cama ৫৭
Lahore ৩০২
Latta, R. K. ৩৭৭
Latvia ৩৭৪
League against Imperialism and for National Independence ৩৩, ২৩৯
League for the Liberation of the East ১২১
'Left-wing Socialist' ১২৪
Lenin, Vladimir ৩৫৭, ৩৭৩, ৩৭৪
—Collected Works ৪৩, ৫৩, ৫৬, ৭০, ৮৫, ৯১, ৯৮, ১২২, ১৮৪, ২১৭, ২২৪, ২৫৮
'—and Indian Revolutionaries' ২১৪
'—his Image in India' ৯৭
'—in Contemporary Indian Press' ৮১
'—On Roy's Supplementary Colonial Theses' ১২৫
'—Through the Eyes of the World' ১০৪
Leningrad ৩৫৪, ৩৬৩, ৩৭৪
—Public Library ৩৩৪, ৩৬৪
—University ৩৩৪
'L' Humanite' ৪৩
'Liberal' ২৮১
'Life and Works of Ramesh Chandra Dutt' ১১
'Life of Sris Chandra Bose' ২৮০
'Life of Vivekananda' ১৯
'Link' ৯০, ৩১৮
'List of Books about Indian Movement' (For Lenin) ১৯৯-২০১
Locke ২৫৩
London ৩৭২
—University ৩৬৫
'Lotus and Dagger' ২৩, ২৪

Madras ৩৭২
Magura ৩৩৬
Mahendra Pratap ২৯৭, ৩০৬, ৩৬৪, ৩৭০, ৩৭৩
'Mainstream' ১২, ১৪, ১১৪, ১৩৭, ১৪৫, ১৪৯, ১৫১, ১৯৯, ২০৩, ২০৮, ২০৯
'Malabar Uprising' ১৮৩
Malaya (and Malayas) ৩৩৪
Manabendranath Roy ৩৪৮-৩৫০, ৩৫২-৩৫৪, ৩৬০
—Memoirs ৯৩, ১০৩, ১১৫, ১১৬, ১২৬-১২৮, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৮, ১৪০, ১৪৪, ১৪৭, ১৪৮, ১৫৫, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৮, ২০৮, ২১১-২১৩, ২১৭, ৩৪১, ৩৪৭, ৩৬৪, ৩৭০, ৩৭৩
Marlborough ৩৩৮
'Masses of India' ২২৫, ২২৬
Mathura Singh (Dr.) ৩০১
Marx, Karl ৩৫৭
'Marxist Miscellany' ১২৪, ১২৫, ২০৯, ২২৯
'Maya' ৩৭৪
Mazar-i-Sharif ৩০১, ৩০৩
Mazzini ২৩৮, ২৫৬
Mediterranean ৩৬১

Mesopotamia ৩৩৩
Mijnheer ৩৫৯
Mirza Ali Haidar ৩২২
'Mission to Tashkent' ৯০
'Modern India' ২৪৬
'Modern Review' ২১, ৫১, ৯৯, ১০২, ১০৬, ১৪৭, ২০৬, ২৫৮, ২৮৪, ২৯০, ২৯১
Moin Shakir ১০৯
Monarchical States ৪২
Moscow ৩৭৩
—University ৩৭০
Mujib Ali ৩০৬
Muzhik ৩৫৬
'My Fight for Irish Freedom' ২৭
'My Life-story of 55 Years' ৯১, ১৮০

'Namdharis and the Russians in Central Asia' ১১৯
Narendralal Dutta ৩৩৩, ৩৩৪
Narendranath Bhattacharjee ৩৪১, ৩৪৭, ৩৬৪
'National Flag' ২৮৬, ২৯০
'Nationalism' ২০১
Nava, Maharaja of ৩৭২
Nayek, K. K. ৩৭৮
Nepal ৩০২
'New Age' ১১২, ১৬১, ১৬৬, ২০৫, ৩১৪
'New Economic Menace to India' ২০১
'New Lamps for Old' ১৯
'New Times' ৯১
'Nineteenth Century' ২৫৫
'Nobody is Forgotten' ১৫৭
Norway ৩০৯
'Nue Zuricher Zeitung' ৩২৪

Obeidullah (Maulavi) ২৯৯, ৩০০
Oldenberg, Prof. H. ৩৭০
Owen, Robert (and Robert Dale) ২৫৪

Pacific ৩৪৬
Padma ৩৫০
'Page from My Life' ১৫৬
Pal & Roy, Messrs ৩৬৮
Pamir ৩০২, ৩০৩
Paris ৩৭১
—University ৩৬৫
Patiala, Maharaja of ৩৭২
'Patriot' ২৭
Peasants' and Workers' Party, Bengal ৩২৯
Penang ৩৪১, ৩৪৭, ৩৪৮
Persia ২৯৭, ২৯৮, ৩০১, ৩০৪, ৩০৫, ৩২২
Persian ৩৬৪
'Peshawar to Moscow' ১৩২
Petrograd ৩০৪
'Ph. D.' ৪৭
'Political Trouble in India 1907-1917' ৩৯, ৪৮, ৬৩, ৩১২
Pokoff ৩০৪
Pondicherry ৩৬৫
Port Said ৩৬১

Poverty and un-British Rule in India' ২৫৫
Prafulla Chaki ২৮৮
Prithwinath Mukherjee ৩৩৫, ৩৩৯, ৩৪৩
Prosperous British India' ১৮, ৩৭০
Punjab ৩৩৪, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৭২
Punjabi ৩৪৮

Rabindranath Tagore ৩৭৩
'Raja Rammohun Roy' ২৮০
Rameshchandra Dutt ১২
Rammohun Roy ২৫৪
Ras Bihari Bose ৩৪১, ৩৪৭
'Record of an Adventurous Life' ২৫৫
'Red Republican' ৭
Red Sea ৩৬১
'Religion of Love' ৯২
Religion of Socialism' ১৭
'Republican States' ৪১
Reventlow, Graf ৩২১
'Revolutionary Board' ২১৪
'Review of Reviews' ২৬৬
Ripudaman Singh ৩৭২
'Right of Political Asylum' ৪৩
'Rise of Christian Power in India' ২৮১
'Rise of Foreign Socialists: Their Remarkable Growth in the Continent in Recent Years' ২১
Roman ৩৪৫
Rome ৩৪৫
Rotterdam ৩৬০-৩৬২
'Ruin of Indian Trades and Industries' ২৮১
'Rusham Shama' ৫৯
Russia ২৯৭, ৩০১, ৩০২, ৩০৪-৩০৬, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৪০, ৩৫৬, ৩৬২-৩৬৪, ৩৬৭, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭২, ৩৭৪
Russian ৩০১-৩০৪, ৩১০, ৩৩৪, ৩৫৬, ৩৬২-৩৬৪ ৩৬৯-৩৭১, ৩৭৩
'—Revolution and India' ১৩৭

Saaheed ৩৫৯
Sachchidananda ২৫৮
Safar Khan ৩০৩
Sanghai ৩৪৬, ৩৪৮
Sanskrit ৩৪৫, ৩৬৪, ৩৭০, ৩৭১
Saradacharan Chatterjee ৩৩২
Sarong ৩৬৫
Satyendranath Bose, Prof. ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৯-৩৭২
Saiyud ৩০১
Scandinavian ৩১০
Schemmel ৩২১
Scientific Research Institute on National and Colonial Problems ২৩৭, ৩১৭
Scientific Socialism ৩
Sealdah ৩৪৪
Shaheer ৩৫৯
'Shyamaji Krishnavarma : Life and Time of an Indian Revolutionary' ৩৪, ৩৫

Singapore ৩৪১, ৩৪৬-৩৪৯, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৫, ৩৭৩
—Fort ৩৪৭, ৩৪৯
Sinn Fein Movement ৩৪৯
Sitalchandra Chattopadhyay (Kaviraj) ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪৩
S. K. Lahiri & Co. ১২
'Smriti and Bismriti' ৯৯, ১০২, ১৪৭, ২০৬
'Socialist Ideas and Indian Revolutionaries Abroad' ৭৯
Sofia ২৯৭
'Song of the Falcon' ৫১
Sorborne ৩৭১
Sarojini Naidu ৩৬৪
Soroshina ৩০৪
Soviet ৩৫৬, ৩৭৩
'—Foreign Policy : Early Years' ১৯৯
—Government ৩৭৪
'—Land' ৯০, ৯১, ১৫২, ১৫৬, ১৫৭, ১৮১, ২১৪, ২১৬
—Russia ৩৭০, ৩৭৩
'—Russia and Indian Communism' ১২৭
St. Simon ৬
State Literary Publishing House ৩১৭
Stockholm ৩০৯
Subhas Chandra Bose ৩৬৬
Shujaullah ৩০৩
Sukias Street ৩৩২, ৩৪০, ৩৬৪
—No. 27 ৩৩৩-৩৩৫, ৩৪২
—No. 59 ৩৩৩, ৩৩৬
Sumatra ৩৫০, ৩৫১, ৩৫৩, ৩৫৯, ৩৭০, ৩৭৪
Sundarban ৩৪১, ৩৪৬, ৩৫১
Suniti Kumar Chatterjee (Dr.) ৩৩২, ৩৪০, ৩৪১
'Supplementary Theses on National and Colonial Questions' ২০৭
Surat ৩৩৭, ৩৩৮
'Survey of International Affairs' ১৩৬
Swadeshi Movement ৩৩৭, ৩৪২
Swaraj ১৮
Swedish ৩১০, ৩১১
Switzerland ৩০৪, ৩০৫, ৩১০
Sylvain Levi ৩৭১

Talat Pasha ২৯৭
Tapatinath Mukherjee ৩৩৫, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭২
'Teja Singh' ৬০২
'Terrorists' ৬১
'Theses on India and the World Revolution' ২১৪
'Three Years in Europe' ১২
Tirmiz ৩০৪
'Tirmiz to Tashkent, From' ১৪৫, ১৪৮, ১৪৯
'Tilak and the Russians' ২৭
'Times', London ৩৬, ১৫০
'Times of India' ২৫৯
Trailokyanath Mukherjee ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৪২
Trotsky ৩০৪

Trotskyites ৩৭৪
Turk (Turkish) ২৯৮, ৩০০, ৩৩৩
Turkestan ৩০৪
Turkey ২৭৯, ২৯৯, ৩০১, ৩০৪, ৩০৫
Turner Morrison & Co. ৩৩৩
Tver ১৬২
'Two Great Indian Revolutionaries' ৭৪, ৩৩১

Ukranian ৩১০
'Ultimatum' ১৬২
Union Jack ৩৪৮
'Universal Man' ৩
University College, London ৩৩৯
'University of the Toilers of the East' ১৪৯, ২০২
U. P. ৩৪৮
Urdu ৩৩৪, ৩৬৪
Utopian Socialism ৩

'Vanguard' ১৫৭, ২২৮, ২২৯
'Vanguard of Indian Independence' ২২৫, ২২৯
Van Kol ৫৩
Velikii Oktiabri Narody Vostoka, Sboinik ৮৫
Verdun ৩৪৫
Verma, L. P. ৩৭৭
Vienna ২৯৭
Virendranath Chattopadhyay ৩৬৪, ৩৭৪
Vivekananda, Swami ৩৬৪
'Vorwaerts' ৪৩

Weintz ৩৩৮
William Digby ৩৭০
Wilson Woodrew ৩১০
'Wobblies' ১৪৮
World War I ৩৩৩, ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪৪, ৩৭০
World War II ৩৭৪
Wrenski ৭৫

'Young Bengal' ৪

—

অশুদ্ধি সংশোধন

কতকগুলি প্রয়োজনীয় সংশোধন

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৭	৯	বড়াল	করাল
৫১	১	গভীরতম	গভীরতর
৫৩	৬	Van Col	Van Kol
৬৩	১৫	৮৫	৮৯
৯৩	১৮	৮৬	৮৭
১১২	৪	ফরাসী	ফারসী
১২৫	৭	এভারস্ট্রীট	ওভারস্ট্রীট
১৩২	৯	ইসলাম	ইমাম
১৩৩	২০	বৃটিশ	লাল
১৫১	২২	তেভিল	তিভেল
১৫৬	১৫	সরকারী	সহকারী
১৭০	৩	সালের মাসে	সালের সেপ্টেম্বর মাসে
১৮৪	১৩	৪৬	৪৫
১৯৩	১০	১৯২০	১৯২২
২২৬	১৮	কমিউনিস্ট	কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক
২৩৩	৪	১৯৩৪	১৯২৪
২৪০	১৯	ফানিমেন	ফিমুমেন
২৪৬	১০	সুশোএনচন্দ্র	সুশোভনচন্দ্র